নূরনবী

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

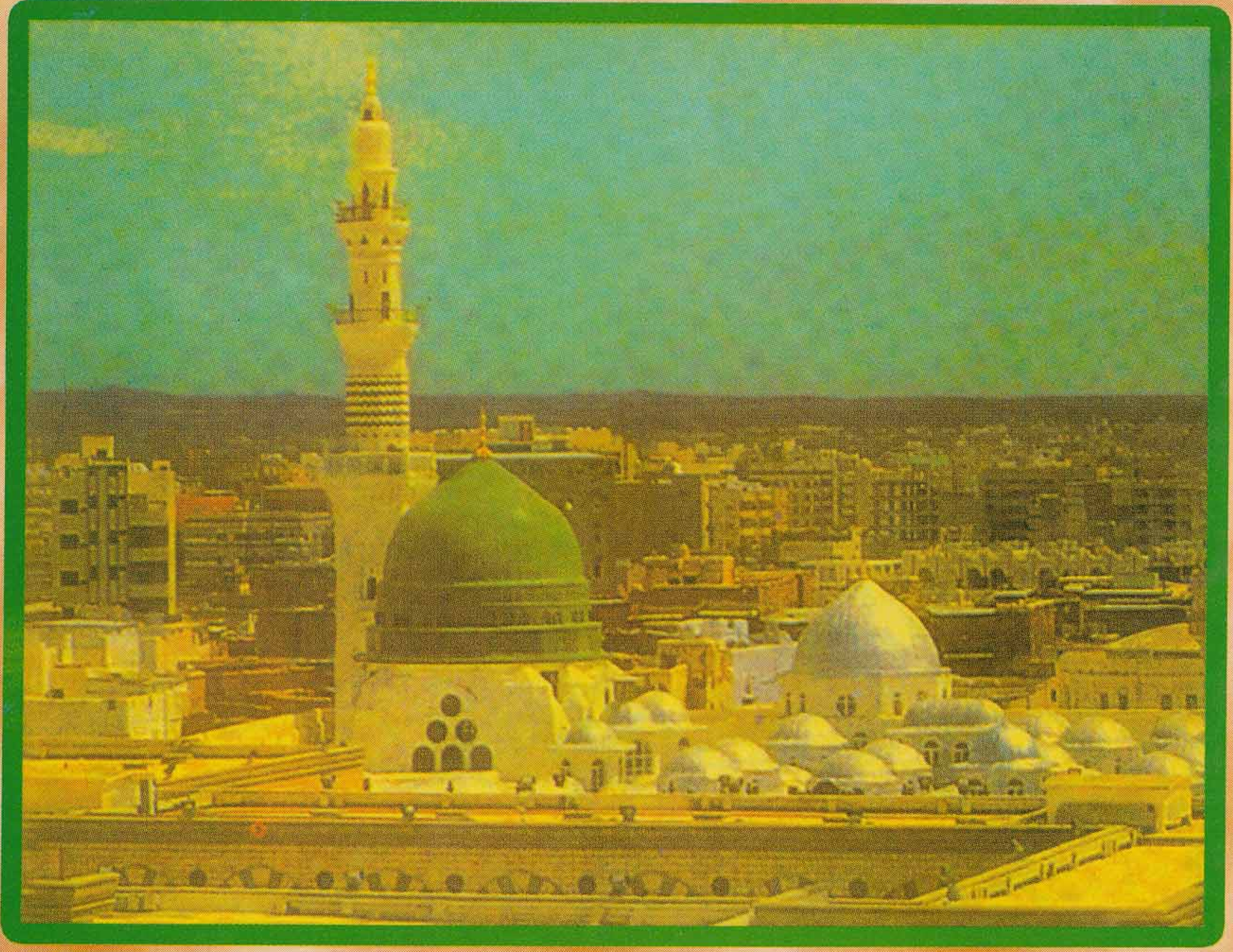

(অধ্যক্ষ) হাফেয মুহাম্মদ আবদুল জলিল

(এম এম, এম এ, বিসিএস)

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

নূরনবী

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

অধ্যক্ষ হাফেয মুহাম্মদ আবদুল জলিল
(এম এম-এমএ-বিসিএস)

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

নূরনবী
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

প্রণেতা ঃ অধ্যক্ষ হাফেয মুহাম্মদ আব্দুল জলিল (এমএম-এমএ-বিসিএস)
গ্রাম ঃ আমিয়াপুর, পোষ্ট ঃ পাঠান বাজার
উপজেলা ঃ মতলব (উঃ), জিলা ঃ চাঁদপুর ।

স্বত্ব ঃ প্রণেতা কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

১ম প্রকাশ ঃ ১৯৯৭ইং জানুয়ারী
২য় প্রকাশ ঃ ১৯৯৯ইং জুন
৩য় সংস্করণ ঃ ২০০৪ইং এপ্রিল
৪র্থ সংস্করণ ঃ নভেম্বর, ২০০৭ ইং (তথ্যসমৃদ্ধ)

প্রকাশক ঃ সুন্নী গবেষণা কেন্দ্র
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৯১১১৬০৭, মোবাইল ঃ ০১৭১১ ৪৬৯২০৩ ।

হাদিয়া ঃ ২৫০.০০ (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র । £10.00

মুদ্রণে ঃ এইচকে প্রিন্টিং এ্যান্ড কালার প্রসেস লিঃ
১৩১, ডিআইটি এক্সটেনশন রোড
ফকিরাপুল, ঢাকা । ফোন ঃ ৯৩৩২৬১৬

This book has been compiled by principal Hafiz Muhammad Abdul Zalil (MM-MA. BCS) on the life of Prophet Muhammad (SM)

HADIA TAKA : 250.00 £10.00

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

সূচীপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	লেখক পরিচিতি	
২	উৎসর্গ, অভিমত ও পেশ কালাম	
৩	ভূমিকা	
	প্রথম অধ্যায়	
	সৃষ্টির শুরু	১-৫
৪	নূরে মোহাম্মদী (দঃ) এর সৃষ্টি রহস্য ও প্রকৃতি	
৫	হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণি হাদীস-নূরে খোদা হতে নূরে মোহাম্মদী পয়দা	
৬	নূরের দ্বিতীয় হাদীসঃ আদম সৃষ্টির পাঁচশত এগার কোটি বৎসর পূর্বে নবীজীর নূর বিদ্যমান ছিল	
৭	নূরের তৃতীয় হাদীস– জিব্রাইলের বয়স এক হাজার আট কোটি বৎসর। হাবীবে খোদার বয়স তার চেয়েও বেশী।	
৮	নবী করিম (দঃ)-এর তিন সুরতঃ বশরী, মালাকী ও হক্কী	
	দ্বিতীয় অধ্যায়	
	হুযুরের দেহতত্ত্ব ঃ নূর না মাটি?	৬-১৭
৯	নবী করিম (দঃ)-এর দেহ মোবারক নূর-না মাটি?	
১০	মাটির হাদীসখানা মউজু ঃ (নূরের ১০টি দলীল)	
১১	নূরে মোহম্মদীর স্থানান্তর ঃ নবীজীর নূর হযরত আদম (আঃ)-এর ললাটে	
১২	মিলাদপাঠ স্বয়ং নবী করিম (দঃ) করেছেন	
	তৃতীয় অধ্যায়	
	পৃথিবীতে আগমনের ধারা	১৮-০
১৩	নূরে মোহাম্মদী কখন ও কিভাবে পৃথিবীতে আসলেন?	
১৪	শীশ পয়গাম্বরের প্রতি হযরত আদম (আঃ)-এর উপদেশ	

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	চতুর্থ অধ্যায়	
	হযরতের পূর্ব পুরুষ সকলেই তৌহীদপন্থী মুমিন ছিলেন	১৯-২৩
১৫	হযরতের পিতা-মাতা পূর্বে মিল্লাতে ইব্রাহীমী মতে হানিফ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।	
১৬	দশম হিজরীতে পুনঃজীবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন ও সাহাবীর মর্যাদা লাভ করেন	
	পঞ্চম অধ্যায়	
	হুযুরের পিতা মাতার বিবাহ	২৪-২৭
১৭	বিবি আমেনার গর্ভে নূরে মোহাম্মদীর সরাসরি আগমন	
১৮	গর্ভকালীন বিভিন্ন মোজেযা প্রকাশঃ উম্মে কিতালের সাক্ষ্য ও ওহাবী পীরের বেয়াদবীঃ বেলাদত শরীফের দিন ও তারিখের মীমাংসা	
	ষষ্ঠ অধ্যায়	
	কিভাবে ভূমিষ্ট হলেন	২৮-৩৪
১৯	স্বাভাবিক নিয়মে-না অন্য নিয়মে?	
২০	মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী সাহেবের ফতোয়া ঃ সাধারণ জন্মের প্রবক্তাদের কতল করা ওয়াজিব	
	সপ্তম অধ্যায়	
	ঈদে মিলাদুন্নবী ও জন্মবার্ষিকী পালন	৩৫-৩৮
২১	মিলাদুন্নবী মাহফিল জায়েয-সিরাতুন্নবী নয়।	
২২	হযরতের ইনতিকাল দিবস পালন করা হয় না কেন?	
	অষ্টম অধ্যায়	
	মিলাদুন্নবী (দঃ) উপলক্ষে জুলুছ (ধর্মীয় আনন্দ মিছিল)	৩৯-৪১
২৩	হুযুরের জন্মের সম্মানে ফিরিস্তাদের জুলুছ। পূর্বযুগের জুলুছ	

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	নবম অধ্যায়	
	মিলাদুন্নবী (দঃ) যুগে যুগে	৪২-৪৬
২৪	খেলাফতে রাশেদা ও পরবর্তী যুগে	
২৫	মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া কিতাবের বর্ণনা–	
	দশম অধ্যায়	
	মায়ের কোলে শিশু নবী (দঃ)	৪৭-৪৮
২৬	আবু লাহাবের খুশী তার নাজাতের কারণ, চাঁদের সাথে খেলা করা ও কথা বলা	
২৭	শিশুকালে তৌহিদ ও রিসালাত ঘোষণা ঃ জন্মসূত্রে তিনি নবী– জনৈক অধ্যাপকের বেদ্বীনী উক্তি	
	একাদশ অধ্যায়	
	বিবি হালিমার কোলে শিশু নবীর ইনসাফ	৪৯-৫১
২৮	ন্যায়পরায়ণতা ও অন্যান্য ঘটনা–	
২৯	প্রথম সিনা চাক–(বক্ষ বিদারণ)	
	দ্বাদশ অধ্যায়	
	শিশুকালে মদিনায় গমন	৫২-৫৫
৩০	পিতা আবদুল্লাহর কবর যিয়ারত, মক্কায় ফিরতি পথে আব্ওয়া নামক স্থানে মায়ের মৃত্যু	
৩১	হিজরতের পর বিবি আমেনার কবর যিয়ারতঃ মায়ের মুমিন হওয়ার দলিল	
	এয়োদশ অধ্যায়	
	মক্কায় প্রত্যাবর্তন	৫৬-৫৭
৩২	দাদার লালন পালনে, হযরতের নবী হওয়া সম্পর্কে আবদুল মোত্তালেবের আগাম স্বীকৃতি	

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা

চর্তুদশ অধ্যায়

চাচা খাজা আবু তালেবের প্রতিপালন ৫৮-৬০

৩৩ নবুয়তের পূর্বাভাসঃ হিলফুল ফুযুল গঠন

পঞ্চদশ অধ্যায়

বিবাহিত জীবন ৬১-৬৪

৩৪ সামাজিক সেবাকর্ম- নবুয়তে অভিষেকের পূর্বে ১৫ বৎসরের ঘটনা সংক্ষেপ (বিবাহিত জীবন)

ষোড়শ অধ্যায়

কাবাগৃহ পুণঃ নির্মাণ ৬৫-৬৬

৩৫ কাবাগৃহের প্রথম নির্মাণ ও সর্ব শেষ নির্মাণের ইতিহাস

৩৬ কাবাগৃহ পুনঃ নির্মাণে হযরতের অংশগ্রহণ ও হাজরে আসওয়াদ স্থাপন

সপ্তদশ অধ্যায়

আবির্ভাব ও আত্মপ্রকাশের পূর্বাভাস ৬৭-৬৯

৩৭ নির্জন সাধনা ও গিরিগুহায় চিল্লাকাশী

৩৮ মসজিদে তাবলিগী চিল্লার কোন ভিত্তি নেই- স্বপ্নে প্রাপ্ত ছয় উসুলী ইলিয়াছি তাবলীগ হারাম হওয়ার কারণ

অষ্টাদশ অধ্যায়

নবুয়তের দায়িত্ব লাভ ৭০-৭৩

৩৯ ২৭শে রমযান প্রথম কোরআন নাযিল- জিব্রাইলের আলিঙ্গনের তাৎপর্য্য ও প্রথম আনুষ্ঠানিক নামায আদায়

৪০ স্বামীর চরিত্র সম্পর্কে স্ত্রীর সাক্ষ্যই চরম সাক্ষ্য- বিবি খাদিজার সাক্ষ্যঃ প্রথম মুসলিম কে কে?

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	উনবিংশতম অধ্যায়	
	কোরায়েশদের শত্রুতা	৭৪-৭৫
৪১	আবু লাহাব, তার দুই পুত্র ও স্ত্রীর পরিণতি, নবীর সাথে বেয়াদবীর পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ	
	বিংশ অধ্যায়	
	প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার	৭৬-৭৯
৪২	কোরাইশদের অত্যাচার	
	একুশতম অধ্যায়	
	চন্দ্র বিদারণ	৮০-৮২
৪৩	আকাশে ও চাঁদে নবীজীর কর্তৃত্ব ঃ নবীজীর ইলমে গায়েব প্রকাশ ও ইয়েমেনের রাজার ইসলাম গ্রহণ	
	বাইশতম অধ্যায়	
	দ্বীনের খাতিরে দেশ ত্যাগ ঃ আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরত ঃ	৮৩-৮৪
৪৫	নাজ্জাশীর ইসলাম প্রীতি–৭ম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ ও ৯ম হিজরীতে ইনতিকাল	
৪৬	মদিনা শরীফ হতে নাজ্জাশীর জানাযার নামায আদায় ঃ নবীজী হাযির ও নাযির হওয়ার প্রমাণ ঃ গায়েবী জানাযা যায়েয নেই ঃ	
	তেইশতম অধ্যায়	
	সামাজিক বয়কট	৮৫-৮৬
৪৭	নবীজীর ইলমে গায়েবের প্রকাশ ও প্রমাণ	
	চব্বিশতম অধ্যায়	
	শোকের বছর	৮৭-০
৪৮	চাচা আবু তালেব ও বিবি খাদিজার ইনতিকাল – শোক প্রকাশ ও শোক দিবস পালন করা যায়েয।	

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা

পঁচিশতম অধ্যায়

তায়েফ গমন ৮৮-৯০

৪৯ অত্যাচারের বিনিময়ে হেদায়াতের দোয়া– গযবের ফেরেস্তাকে ফেরত প্রেরণ–নূহ নবীর সাথে তুলনা– জ্বীনদের ইসলাম গ্রহণ

ছাব্বিশতম অধ্যায়

পবিত্র মি'রাজ ৯১-১১৫

৫০ বিশ্বজগত অতিক্রম করে লামাকানে গমন এবং চর্ম চক্ষে আল্লাহর দর্শন লাভ

৫১ মি'রাজের প্রথম পর্যায় ঃ মি'রাজের রাত্রে নবীজীর সম্মানে অসংখ্য সম্বর্ধনার আয়োজন

৫২ বায়তুল মোকাদ্দাসের পথে বিভিন্ন বরকতময় স্থানে নফল নামায আদায়

৫৩ আম্বিয়ায়ে কেরামকে নিয়ে বাইতুল মোকাদ্দাসে জামাতে নামায আদায়– নবীগণের স্বশরীরে আগমনের প্রমাণ।

৫৪ মি'রাজের দ্বিতীয় পর্যায় ঃ বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে সিদরাতুল মোন্তাহা পর্যন্ত ঘটনাবলী– নবীজীর মালাকী ছুরতের প্রকাশ।

৫৫ দ্বিতীয় আকাশে হযরত যাকারিয়া (আঃ) কে করাতে তাঁর শরীর দ্বিখন্ডিত করার অবস্থা জিজ্ঞাসা করা।

৫৬ হযরত মুছা (আঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ– বিভিন্ন প্রশ্ন ও উত্তর-ইমাম গায্যালীর রুহানী বাহাছ

৫৭ নবী ও অলীগণ অতীত ও ভবিষ্যতের গায়েবী বিষয়ে আল্লাহ্ কর্তৃক অবগত।

৫৮ ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর কাশফ।

৫৯ হযরত গাউসুল আযম আবদুল কাদের জিলানীর (রাঃ) গায়েবী এলেম।

৬০ মি'রাজের তৃতীয় পর্যায় ঃ রফরফে আরোহন ও আরশে আযীমে গমনের বিবরণ।

৬১ হযরত জিব্রাইলের গতিসীমা যেখানে শেষ, প্রিয় নবীর গতিসীমা সেখান থেকে শুরু

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৬২	নবীজীর খেদমতে জিব্রাইলের একটি আবেদন- পুলসিরাতের উপর নূরের পাখার কার্পেট বিছানো।	
৬৩	রফরফে হযরত আবু বকরের আওয়াজ শ্রবণ	
৬৪	আল্লাহর সালাত আদায় ও তার স্বরূপ	
৬৫	লাওহে মাহ্‌ফুয দর্শন–লাওহে মাহ্‌ফুয়ের সর্বশেষ বাক্য দর্শন	
৬৬	আরশের সাথে কথোপকথন।	
৬৭	লা–মাকানের উদ্দেশ্যে রওয়ানাঃ আল্লাহ্ তায়ালা কর্তৃক সম্বর্ধনা প্রদান	
৬৮	ওয়াহ্‌দানিয়াতের নূরের মধ্যে নবীজীর ফানা হওয়ার বিবরণ	
৬৯	আল্লাহর সাথে কথোপকথন ঃ ৯০ হাজার কালামের রহস্য	
৭০	আল্লাহ কর্তৃক নবীজীকে ছালামঃ নামাযের মধ্যে নবীজীকে ছালাম সম্বোধন করা ওয়াজিব	
৭১	ফতোয়া শামী ও আলমগীরীর ফতোয়া ঃ নবীজীকে নামাযে ছালাম দেওয়া ওয়াজিব	
৭২	৭০০ বার উম্মতের জন্য মাগফিরাত প্রার্থনাঃ প্রত্যেকবার সত্তর হাজার লোকের ক্ষমার প্রতিশ্রুতি প্রদান	
৭৩	মি'রাজের শেষ পর্যায় ঃ ৫০ ওয়াক্ত নামায নিয়ে নবীজীর প্রত্যাবর্তন	
৭৪	কিভাবে ৪৫ ওয়াক্ত মাফ হলো ঃ ৬ষ্ঠ আকাশ থেকে ৯ বার আল্লাহ্‌র দরবারে পূন:পূন:গমন	
৭৫	মুছা (আঃ) কোন্ উদ্দেশ্যে নবীজীকে আল্লাহর দরবারে ফেরত যেতে নিবেদন করেছিলেন?	
৭৬	ইনতিকালের পর জীবিতদের উপকার ও কল্যাণ করা যায় কিনা?	
৭৭	খোদার দর্শন মোট কতবার হয়েছিল এবং কোথায় কোথায়?	
৭৮	সমস্ত বিষয়ের গায়েবী এলেম দানঃ তাফসীরে রুহুল বয়ান ও ইমামে রাব্বানীর মকতুবাত শরীফ	
৭৯	মি'রাজের মাধ্যমে নবীজীর মালাকী ও হাক্কী সুরত প্রকাশঃ তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব ও অতিমানব	
৮০	মি'রাজের সত্যতার নিদর্শন ঃ স্বশরীরে গমনের প্রমাণ।	

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৮১	হুযুর (দঃ)-এর দেহতত্ত্ব ঃ নূরের সৃষ্টি	
৮২	মাটির হাদীসটি মউজু ও ভিত্তিহীন ঃ মা'আরিফুল কোরআন বাংলা ৮৫৬ পৃষ্ঠা	
	সাতাশতম অধ্যায়	
	হিজরত ও হিজরী সন	১১৬-১৩০
৮৩	হিযরতের রাতে অসংখ্য মোজেযার সমাহার	
৮৪	মদিনায় হিজরতের ক্ষেত্র তৈরী মদিনাবাসীদের ইসলাম গ্রহণ	
৮৫	১লা মহররম হতে হিজরতের প্রস্তুতি শুরু ঃ দুটি উট খরিদ- কাসওয়া ও আদ্‌বা	
৮৬	নবীজীকে শহীদ করার প্রস্তুতি গ্রহণ- সফর মাসের শেষ শনিবার ঃ শেখে নজদীর সুরতে শয়তানের অংশগ্রহণ	
৮৭	দারুন নাদওয়া কাফেরদের এসেম্বলী ও শয়তানের আস্তানার প্রতীক	
৮৮	নবীগৃহ কাফেরদের দ্বারা ঘেরাও হযরত আলীর ঈমানের পরীক্ষা	
৮৯	হযরত আলীর দীর্ঘ জীবন ও শাহাদাতের আগাম গায়েবী সংবাদ প্রদান	
৯০	নবীজীর গৃহত্যাগ ও হযরত আবু বকরের গৃহে গমন ঃ আবু বকর, আসমা ও আয়েশা (রাঃ)-এর নবী প্রেম	
৯১	গারে ছাওরে আশ্রয় গ্রহণ ঃ অসংখ্য মোজেযা প্রদর্শন-	
৯২	হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর নবী প্রেম ও সর্প দংশনের বিবরণ	
৯৩	আসমান-জমিন ও সৃষ্টি জগত নবীজীর তাবেদার ও অনুগত	
৯৪	ছাওর গুহায় বেহেস্তী পানির নহর ও আশ্চর্য নৌকা দর্শন	
৯৫	হিজরতের পর মদিনার রওযা মোবারকই সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম স্থান	
৯৬	ঐ মদিনার পথে ঃ উম্মে মা'বাদের গৃহে দুধের নহর	
৯৭	সুরাকার ঘোড়াকে জমিন গ্রাস করেছিল ঃ নবীজীর নির্দেশে মুক্তিলাভ	

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৯৮	গায়েবী ধন ভান্ডার ও জমিন নবীজীর নিয়ন্ত্রণাধীন ঃ তার দলীল	
	আটাইশতম অধ্যায়	
	মদিনায় আনন্দ মিছিল	১৩১-১৩৩
৯৯	মদিনায় নবীজীর আগমন সংবাদে খুশীর ঢেউ ঃ আনন্দ মিছিল ও জুলুছ	
১০০	"ইয়া মোহাম্মাদা, ইয়া রাসূলাল্লাহ" শ্লোগানের প্রমাণ– মদিনাবাসীদের আমল– ইয়ামামার যুদ্ধে ৩০ হাজার সাহাবীর শ্লোগান ছিল "ইয়া মোহাম্মাদা-ইয়া রাসূলাল্লাহ"– মুসলমানদের মূল প্রতীক–"ইয়া রাসুলাল্লাহ" শ্লোগান	
	উনত্রিশতম অধ্যায়	
	১৪০০ বৎসর পূর্বে নির্মিত নিজ গৃহে অবস্থান	১৩৪-১৩৬
১০১	আবু আইউব আনসারীর গৃহে অবস্থান ও একটি ইলমে গায়েব	
১০২	হযরতের আবির্ভাবের ১৪০০ বৎসর পূর্বে তিব্বা বাদশাহর ইসলাম গ্রহণ ও নবীজীর জন্য গৃহ নির্মাণ	
	ত্রিশতম অধ্যায়	
	মসজিদে নববী নির্মাণ	১৩৭-১৪০
১০৩	মৃত খেজুর গাছে মানুষের জীবন ঃ নবীবিচ্ছেদে ক্রন্দন জায়েয	
১০৪	নবীজীর সংস্পর্শে এসে স্থায়ী জীবন লাভ ঃ হযরত আবুবকর এবং হযরত ওমরও জীবিত	
১০৫	মসজিদ আলোক উজ্জল করা হযরত তামীম দারী (রাঃ) ও হযরত ওমরের (রাঃ) সুন্নাত	
১০৬	তারাবিহ, শবে বরাত ও শবে কদর ইত্যাদি উপলক্ষে মসজিদ আলোময় করার ফতোয়া (তাফসীর রুহুল বয়ান)	

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	একত্রিশতম অধ্যায়	
	মক্কা শরীফ উত্তম-নাকি মদিনা শরীফ উত্তম?	১৪১-১৪২
১০৭	চার মাযহাবের সম্মিলিত ফতোয়া	
	বত্রিশতম অধ্যায়	
১০৮	মদিনার জিন্দেগী ঃ এক নযরে	১৪৩-১৪৪
	তেত্রিশতম অধ্যায়	
১০৯	মদিনায় আগমনের পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রাথমিক কাজ ঃ	১৪৫-১৪৭
১১০	বিভিন্ন জাতির সাথে আন্তর্জাতিক চুক্তি ঃ মদিনার সনদ–বিশ্ব ইতিহাসের প্রথম লিখিত সনদ ঃ	
	চৌত্রিশতম অধ্যায়	
	বদরের যুদ্ধ	১৪৮-১৬০
১১১	কোরাইশদের চক্রান্ত ঃ মদিনা আক্রমনের প্রস্তুতি ও যুদ্ধ	
১১২	কোরেশদের পক্ষে শয়তানের অংশগ্রহণ এবং সুরাকা কেনানীর সুরত ধারণ। ফেরেস্তা দেখে শয়তানের পলায়ন	
১১৩	যুদ্ধে জয়লাভ ও ৭০ জন কাফেরের মৃত্যুস্থান নির্ধারণ এবং তাদের নিহত হওয়ার ব্যাপারে নবীজীর আগাম গায়েবী সংবাদ	
১১৪	মুসলমানদের পক্ষে ৫ হাজার ফিরিস্তার যুদ্ধে অংশগ্রহণ–	
১১৫	মুসলমানদের প্রথম বিজয় লাভ ঃ হক ও বাতিলের চূড়ান্ত ফয়সালা	
১১৬	যুদ্ধে খেজুরের ডাল তলোয়ারে পরিণত– নাম রাখা হয় আউন	
১১৭	জনৈক সাহাবীর দ্বিখন্ডিত হাত নবীজীর থুথু মোবারকের বরকতে জোড়া লেগে যায়	
১১৮	রাসুলের হাত আল্লাহর কুদরতি হাত	
১১৯	ফানা ফিল্লাহর উচ্চ মাকামে পৌছলে অলীর হাত-পা সব কিছুই আল্লাহর অধীন হয়ে যায়	
১২০	মৃত কোরাইশ সর্দারদের সাথে নবীজীর কথাবার্তা বলাঃ মৃত ব্যক্তিরা জীবিতদের চেয়ে বেশী শুনে	

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১২১	অলী-আল্লাহগণ ইনতিকালের পর মেছালী সুরতে পৃথিবীময় ভ্রমণ করেন, সব শুনেন ও দেখেন	
১২২	৭০ জন যুদ্ধবন্দীর সাথে হুযুরের আচরণ	
১২৩	বন্দীগণের নিকট থেকে মুক্তিপণ আদায়	
১২৪	আব্বাস (রাঃ) অমুসলিম অবস্থায় বন্দীঃ মুক্তিপণ আদায়ে অসামর্থতা প্রকাশ	
১২৫	নবী করিম (দঃ) ইলমে গায়েবের মাধ্যমে মক্কায় রক্ষিত হযরত আববাছের গচ্ছিত সম্পদের সংবাদ দান এবং তাঁর ইসলাম গ্রহণ, নবীজীর ইলমে গায়েব সম্পর্কে মোজাদ্দেদ আলফেসানী (রহঃ)-এর ফতোয়া	
	পঁয়ত্রিশতম অধ্যায়	
	ওহোদের যুদ্ধ	১৬১-১৬৮
১২৬	বিজয় লাভ সত্ত্বেও সাময়িক বিপর্যয় এবং তার কারণ	
১২৭	নবীজীর পবিত্র রক্ত চুষে পান করায় মালেক বিন সিনান-এর জন্য দোযখ হারাম	
১২৮	শুকনো খেজুরের ডাল তরবারী হয়ে গেল– নাম রাখা হলো উরজুন	
১২৯	হযরত ক্বাতাদার (রাঃ) ঝুলন্ত চক্ষু নবীজীর থুথুতে স্ব-স্থানে লেগে গেল।	
১৩০	হযরত হানযালার লাশ ফেরেস্তারা গোসল দিয়েছেন- নবী প্রেমের পুরস্কার	
১৩১	শহীদানে ওহোদের শানে কোরআনের আয়াত নাযিল- শহীদগণ জীবিত- তাঁদেরকে এবং নবীগণকে মৃত ধারণা করা হারাম	
	ছত্রিশতম অধ্যায়	
	বনু নযীরের বিতাড়ন	১৬৯-১৭০
১৩২	মদিনার ইয়াহুদী গোত্র বনু নযীরকে চুক্তি ভঙ্গের কারণে মদিনা থেকে বিতাড়ন	

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	সাইত্রিশতম অধ্যায়	
	খন্দকের যুদ্ধ	১৭১-১৭৭
১৩৩	খন্দক তৈরী-বিভিন্ন দেশ জয়ের সু-সংবাদ- ইলমে গায়েব প্রকাশ	
১৩৪	হযরত জাবের (রাঃ)-এর ঘরে তৈরী স্বপ্ন খাদ্য দিয়ে ১০০০ লোকের যিয়াফত	
১৩৫	হযরত জাবেরের ২ ছেলেকে জীবিত করার বিবরণ- রান্না করা ছাগল জীবিত হলো	
১৩৬	নবীজীর দোয়ায় প্রবল বায়ু প্রবাহ ও শত্রু শিবির ধ্বংস	
১৩৭	কোরাইশ কর্তৃক আক্রমণাত্মক যুদ্ধের পরিসমাপ্তির অগ্রীম ঘোষণা (ইলমে গায়েব)	
	আটত্রিশতম অধ্যায়	
১৩৮	চুক্তি ভঙ্গের দায়ে ইয়াহুদী গোত্র বনু কোরায়যার শাস্তি-(হত্যা)	১৭৮-১৭৯
	উনচল্লিশতম অধ্যায়	
	হোদায়বিয়ার সন্ধি	১৮০-১৯০
১৩৯	বাইআতে রিদওয়ান	
১৪০	বাইআত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা-বাইআতে শেখ সুন্নাত হওয়ার প্রমাণ (তাফসীরে রুহুল বয়ান ও তাফসীরে সাভী)	
১৪১	হযরত ওসমানের পক্ষে বাইআত গ্রহণ- ইলমে গায়েবের তাহকীক ও বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যা	
১৪২	গায়েব দুই প্রকার ঃ যাতি ও আতায়ী- আতায়ী গায়েব নবী অলীদের জন্য খাসঃ যাতী ইলমে গায়েব আল্লাহর জন্য খাস	
১৪৩	হুযুর (দঃ)-এর আঙ্গুল মোবারক থেকে জান্নাতী পানির নহর প্রবাহিত	
১৪৪	মদিনায় ফিরতি পথে কুরাগামীম নামক স্থানে ১০ই মহররম আশুরার দিনে গুনাহগার উম্মতের গুনাহ ক্ষমার শুভ সংবাদের আয়াত নাযিল- আয়াতের ব্যাখ্যা	

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	চল্লিশতম অধ্যায়	
	খায়বর যুদ্ধ	১৯১-১৯৭
১৪৫	যুদ্ধ জয়ের গায়েবী সংবাদ- ইলমে গায়েব	
১৪৬	হযরত আলীর চক্ষুরোগ থুথু মোবারক দিয়ে আরোগ্যঃ আছাদুল্লাহ লকব প্রাপ্তি। হযরত আলীর অন্যান্য লকব	
১৪৭	হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ)-এর শরীর মৃত্যুর পর সংরক্ষিত থাকার জন্য দোয়া	
১৪৮	নজদী সউদী ওহাবীরা উম্মুল মোমেনীনগণের মাযার ভেঙ্গে দেয় ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে	
১৪৯	ইয়াহুদী রমনী কর্তৃক খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করা এবং নবীজীর ক্ষেত্রে বিষক্রিয়া বন্ধ হওয়া	
১৫০	আঙ্গুলের ইশারায় ডুবন্ত সূর্য পূনঃ উদয় হওয়ার ঘটনা ঃ মাকামে ছাহবায়	
	একচল্লিশতম অধ্যায়	
	৭ম হিজরীতে বিদেশে ইসলামের দাওয়াত	১৯৮-২০১
১৫১	বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রধানের নিকট পত্র প্রেরণ ও কাফেরের দেশে ইসলামী তাবলীগী দল প্রেরণ	
১৫২	ছয়জন সাহাবী দূত এক মুহুর্তে সংশ্লিষ্ট দেশের ভাষা বলতে লাগলেন	
১৫৩	দেওবন্দী আলেমের স্বপ্ন ঃ রাসুল (দঃ) নাকি দেওবন্দী আলেম থেকে উর্দূ ভাষা শিখেছেন-খলীল আহমদ আম্বেটীর স্বপ্ন	
১৫৪	ছয়জন সাহাবী দূতের নাম ও সংশ্লিষ্ট দেশ	
১৫৫	আবিসিনিয়ার বাদশাহ (নাজ্জাশী) আসহামার ইসলাম গ্রহণ	
১৫৬	প্রকৃত তাবলীগ হলো অমুসলিমদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানো-মুসলমানদের জন্য হচ্ছে তালিম	

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ক্রমিক বিষয় পৃষ্ঠা

বিয়াল্লিশতম অধ্যায়

মুতা যুদ্ধ ২০২-২০৪

১৫৭ গায়েবী এলেমের মাধ্যমে প্রথম তিনজন সেনাপতির শাহাদাতের অগ্রিম সংবাদ প্রদান

১৫৮ মৃত্যু সম্পর্কিত গায়েবী ইলম নবী জানেন

১৫৯ মদিনা শরীফ থেকে মূতার দৃশ্য অবলোকন ঃ নবী হাযির ও নাযির

১৬০ শহীদ জাফরের গায়েবী সালামের জবাব দান–নবীজীর এলমে গায়েবের স্বরূপ ঃ জানাযার পর দোয়া

তিতাল্লিশতম অধ্যায়

মক্কা বিজয় ২০৫-২১৪

১৬১ কোরআনের মহাবিজয়ের ঘোষণার বাস্তবায়ন

১৬২ নবীজীর বিছানায় নিজ পিতাকে (আবু সুফিয়ান) বসতে দিতে উম্মে হাবিবা (রাঃ)-এর অস্বীকৃতি

১৬৩ এক মহিলা কর্তৃক মক্কাবাসীদের নামে গোপন চিঠি বহন-এর ব্যাপারে নবীজীর ইলমে গায়েব

১৬৪ দশ সহস্র সাহাবী নিয়ে নবীজীর মক্কার দিকে রওনা ঃ আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ

১৬৫ দয়াল নবীর অনুপম ক্ষমা ঘোষণা

১৬৬ কাবাগৃহে প্রবেশ ঃ লাঠির ইশারায় মূর্তির পতন

১৬৭ কাবাগৃহের চাবি সম্পর্কে হযরতের পূর্ব ঘোষণার বাস্তবায়ন, ইলমে গায়েব

১৬৮ নবীজীকে কেবলা বানিয়ে কাবার ছাদে হযরত বেলালের আযান ঃ নবীজী কা'বারও কা'বা

১৬৯ ফোযালার মনের গোপন কথা নবীজী কর্তৃক প্রকাশ

১৭০ কবি কা'ব এবনে যোহাইর-এর ইসলাম গ্রহণ– নবীজীর শানে নূরের কসিদা পাঠ– নবীজী কর্তৃক চাদর উপহার-নবীজী নূর

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ক্রমিক বিষয় পৃষ্ঠা

চুয়াল্লিশতম অধ্যায়

তাবুকের যুদ্ধ ২১৫-২২৩

১৭১ যুদ্ধের এক তৃতীয়াংশ চাঁদা দিয়ে হযরত ওসমানের দ্বিতীয় বার জান্নাত লাভ

১৭২ হযরত ওমরের ঈমান হযরত আবু বকরের অর্ধেক হওয়ার তাৎপর্য

১৭৩ তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকার অপরাধ

১৭৪ আল্লাহর গযবের স্থানে অবস্থান না করা উচিত

১৭৫ হযরত আবুযর গেফারীর একা তাবুকে গমন- তাঁর সম্পর্কে হুযুরের ভবিষ্যৎবানী

১৭৬ পথিমধ্যে নবীজীর দোয়ায় বৃষ্টি বর্ষণ ও পিপাসা নিবারন

১৭৭ হারানো উটের সন্ধান দান–ইলমে গায়েবের প্রকাশ

১৭৮ মোনাফিকরাই ইলমে গায়েব অস্বীকার করে

১৭৯ শুকনা কুফে পানির ফোয়ারা জারি

১৮০ তীব্র বায়ু প্রবাহের অগ্রিম সংবাদ-ইলমে গায়েব

১৮১ ২১টি খেজুর দিয়ে ত্রিশ হাজার সৈন্যের যেয়াফতের পর ২১টিই অবশিষ্ট

১৮২ ঐ ২১টি খেজুর দিয়ে হযরত আবু হোরায়রার ২৬ বৎসর জীবন-যাপন

১৮৩ নবীজী গায়েবী ধন ভান্ডারের মালিক

নবীজী একই সময়ে তাবুক ও মদিনায় হাযির

১৮৪ জেহাদে আসগার থেকে জেহাদে আকবরে প্রত্যাবর্তন-এর অর্থ

পঁয়তাল্লিশতম অধ্যায়

মোনাফিক সর্দার ইবনে উবাইর মৃত্যু ২২৪-২২৬

১৮৫ হুযুর (দঃ) কর্তৃক তার জানাযা পড়ার রহস্য– রাসূলকে 'সর্বজ্ঞ' বলা সাহাবীগণের সুন্নাত

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	ছেচল্লিশতম অধ্যায়	
	৯ম হিজরীতে ইসলামের প্রথম হজ্ব পালন	২২৭-২২৯
১৮৬	আবু বকর (রাঃ) আমিরুল হজ্ব মনোনীত, নবীজী পরবর্তী বৎসর পর্যন্ত বেঁচে থাকার ইঙ্গিত	
১৮৭	সুরা তৌবার ৪০ আয়াত নাযিল ঃ মুশরিকদের হজ্ব নিষিদ্ধ	
১৮৮	কেয়ামত পর্যন্ত খানায়ে কা'বা মুসলমানদের দখলে থাকবে (ইলমে গায়েব)	
	সাতচল্লিশতম অধ্যায়	
	বিদায় হজ্ব	২৩০-২৪১
১৮৯	এক লক্ষ চব্বিশ হাজার সাহাবীর হজ্ব আদায়	
১৯০	৯ম হিজরীতে হুযুর (দঃ)-এর হজ্ব না করার রহস্য	
১৯১	মক্কায় গমনের পথে হযরতের অবতরণ স্থলে পরবর্তীকালে মসজিদ নির্মাণ	
১৯২	নিদর্শন স্থান সমূহ ধ্বংস করা ওহাবীদের কাজ।	
১৯৩	মক্কায় আবতাহ নামক স্থানে হুযুরের অবস্থান–এজন্য তিনি আবতাহী	
১৯৪	আরাফাতে অবস্থান ও হজ্বের ভাষণ দান।	
১৯৫	কোরআনের শেষ আয়াত নাযিল–ইসলামের পূর্ণতার ঘোষণা	
১৯৬	মোজদালেফায় রাত্রি যাপন ঃ মোজদালেফায় হযরত আদম ও বিবি হাওয়ার প্রথম বাসর	
১৯৭	মীনায় ৪ দিন অবস্থান ঃ ইনতিকালের আভাস দান	
১৯৮	হুযুরের পিতামাতার পূনর্জীবন লাভ ও সাহাবীর মর্যাদাপ্রাপ্ত–ফিক্‌হে আকবর কিতাবের একটি শব্দ পরিবর্তন করায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি	

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	আটচল্লিশতম অধ্যায়	
	মদিনায় প্রত্যাবর্তন	২৪২-২৪৪
২০০	গদীরে খুমের ভাষণ এবং শিয়াদের ভ্রান্ত আক্বিদা	
২০১	নবী করিম (দঃ) এবং হযরত আলী মোমেনদের 'মাওলা'	
২০২	পথিমধ্যে সর্বশেষ পূর্ণ সুরা আন্-নাস্র নাযিল	
	উনপঞ্চাশতম অধ্যায়	
	ইনতিকালের প্রস্তুতি শুরু	২৪৫-২৪৭
২০৩	মিম্বারে দাঁড়িয়ে ইনতিকালের আভাস দান	
	পঞ্চাশতম অধ্যায়	
	বিদায়ের প্রত্যক্ষ লক্ষণ	২৪৮-২৪৯
২০৪	সফর মাসের মধ্য ভাগে অসুখ আরম্ভ	
২০৫	দুনিয়ার ধনভান্ডার ও দীর্ঘ হায়াতের এখতিয়ার প্রদান	
	একান্নতম অধ্যায়	
	আখেরী চাহার শোম্বা	২৫০-২৫২
২০৬	সফরের শেষ বুধবার– রোগমুক্তির গোসল	
২০৭	হুযুরের রোগমুক্তির সংবাদে সাহাবীগণের আনন্দ ও আল্লাহর রাহে দান	
	বায়ান্নতম অধ্যায়	
	আল্লাহর সাথে মহামিলন	২৫৩-২৫৭
২০৮	শেষ ১২ দিনের ঘটনা	
২০৯	আমরা মউতের অধীন, কিন্তু মউত হুযুর (দঃ)-এর এখতিয়ারাধীন	
২১০	শেষ বৃহস্পতিবার ৮ই রবিউল আউয়ালের ঘটনা	
২১১	পরবর্তী ৫দিন ১৯ ওয়াক্ত নামায গৃহে আদায়	

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
২১২	হযরত আবু বকর (রাঃ) কে ইমামতির দায়িত্ব অর্পণ	
২১৩	খেলাফত প্রদানের স্পষ্ট ইঙ্গিত	
২১৪	বিদায়ী ভাষণ, খলিল ও হাবীবের পার্থক্য	

তিপ্পান্নতম অধ্যায়

খেলাফতের ইঙ্গিত

২১৫	হযরত আবু বকর (রাঃ) ১৯ ওয়াক্ত নামাযের ইমামতি করেন	২৫৮-২৫৯

চুয়ান্নতম অধ্যায়

শেষদিন ২৬০-২৬২

২১৬	১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার-এর ঘটনা প্রবাহ	
২১৭	ইনতিকালের যন্ত্রণা শুরু ঃ হুযুর (দঃ)-এর শেষ ওসিয়ত	
২১৮	বিদায় মুহূর্ত, বিবি ফাতেমার আহাজারী	
২১৯	বিবি ফাতেমার মৃত্যু সম্পর্কে গায়েবী সংবাদ প্রদান	

পঞ্চান্নতম অধ্যায়

বিদায়ে বিলম্ব ২৬৩-২৬৫

২২০	হযরত আজরাঈল ও হযরত জিব্রাইলের আগমন ও কথোপকথন ঃ এক হাজার কোটি ফেরেস্তার আগমন	
২২১	আল্লাহর জিম্মায় উম্মতে মোহাম্মদীকে সোপর্দ	

ছাপান্নতম অধ্যায়

সন্দেহ অপনোদন ২৬৬-২৬৯

২২২	ইনতিকালের তারিখ ও দিন সম্পর্কে ভুল ধারণার আপনোদন	
২২৩	ইবনে কাছিরের সিদ্ধান্ত ও সহীহ্ বর্ণনা, আ'লা হযরতের ফতোয়া	

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	সাতান্নতম অধ্যায়	
	বাইয়াতে আবু বকর (রাঃ)	২৭০-২৭৬
২২৪	খেলাফত ও বাইআত পদ্ধতি	
২২৫	বাইয়াতে শেখ সুন্নাত এবং তার বিস্তারিত দলীল খোলাফায়ে রাশেদীনে বাইআত পদ্ধতি	
	আটান্নতম অধ্যায়	২৭৭-২৮১
	কাফন দাফনের অগ্রীম ব্যবস্থা	
২২৬	গোসল ও কাফন-দাফনের নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কে হুযুর (দঃ)- এর অগ্রিম সংবাদ প্রদান	
২২৭	হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর বর্ণনা ও দাফনে বিলম্বের কারণ	
২২৮	গোসল, কাফনের কাপড় ও সংখ্যা	
	উনষাটতম অধ্যায়	২৮২-২৮৮
	হুযুরের জানাযা-বনাম-দরূদ	
২২৮	হুযুর (দঃ) এর জানাযার ধরন শুধু দরূদ ও সালাম	
২২৯	হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) -এর আমল	
২৩০	বিভিন্ন রেওয়ায়াত	
২৩১	দাফন কার্য ঃ রওযা মোবারকের স্থান হুযুর (দঃ) নিজেই নির্দিষ্ট করে যান	
২৩২	রওযা মোবারকে ইয়ামানী চাদর বিছানোর কারণ	
২৩৩	বেদনা বিধুর মুহুর্ত	
	ষাটতম অধ্যায়	২৮৯-২৯১
	হায়াতুন্নবী	
২৩৪	রওযা মোবারকে রূহ মোবারক ফেরত	
	একষট্টিতম অধ্যায়	২৯২-২৯৩
	রওযা মোবারক-বনাম-আরশ	
২৩৫	রওজা মোবারকের মাটি উত্তম-নাকি আরশ মোয়াল্লা?	

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	বাষট্টিতম অধ্যায়	
	হায়াতুন্নবীর চাক্ষুস প্রমাণ	২৯৪
২৩৬	প্রসঙ্গ ঃ মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ ও রওযা মোবারককে মসজিদের ভিতরে আনয়ন ঃ হযরত ওমর (রাঃ)-এর পা এবং রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর হাত মোবারক প্রকাশ।	
	তেষট্টিতম অধ্যায়	
	হযরত ফাতেমার আহাজারী	
২৩৮	প্রসঙ্গ ঃ হযরত ফাতেমা (রাঃ) ও জিব্রিল আলাইহিস সালামের শোক প্রকাশ	২৯৫-২৯৬
২৩৯	সংযোজনী-১ ঃ নবী করিম (দঃ) -এর একক মর্যাদা	২৯৭-২৯৯
২৪০	সংযোজনী-২ ঃ হুযুর (দঃ)-এর পরিবারবর্গ (আহলে বাইত)	৩০০
২৪১	সংযোজনী-৩ ঃ হুযুর (দঃ)-এর ১৬১ নাম	৩০১-৩০৬
২৪২	সংযোজনী-৪ ঃ কোরআনে আল্লাহর সাথে রাসুলের নাম	৩০৭-৩১৩

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

লেখক পরিচিতি

লেখকের নাম ঃ হাফেয মোহাম্মদ আব্দুল জলিল। আক্বিদা বিশ্বাসে সুন্নী, মাযহাবে হানাফী এবং তরিকায় ক্বাদেরী। পিতার নাম ঃ মুন্সী আদম আলী মোল্লা। মাতার নাম ঃ মালেকা খাতুন। জন্ম ঃ ২৬শে ভাদ্র, শনিবার, ১৩৪০ বাংলা। চার বোন ও ছয় ভাইয়ের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ।

বংশ পরিচয় ও জন্মস্থান ঃ গ্রাম ঃ আমিয়াপুর, পোঃ পাঠান বাজার, থানাঃ মতলব উত্তর, জিলা- চাঁদপুর। দিল্লীর প্রখ্যাত বুযুর্গ ফেকাহ্‌বিদ মুফাচ্ছির এবং বাদশাহ আলমগীরের ছেলের ওস্তাদ হযরত মোল্লা জিয়ুন (রহঃ) ছিলেন লেখকের বংশের পূর্ব পুরুষ। হযরত মোল্লা জিয়ুন (রঃ) রচিত ফেকাহ নীতিশাস্ত্র নূরুল আনওয়ার গ্রন্থখানি দুনিয়াব্যাপী সমাদৃত এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ফাযিল জামাতের পাঠ্যভুক্ত কিতাব। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের কারণে ইংরেজ কর্তৃক মুঘল সালতানাতের পতনের পর হযরত মোল্লা জিয়ুন (রহঃ)-এর বংশধরগণের একটি শাখা প্রাণভয়ে তৎকালীন ত্রিপুরা বর্তমান কুমিল্লার ময়নামতিতে হিজরত করে চলে আসেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। কালক্রমে ঐ বংশই বর্তমান আমিয়াপুর গ্রামে এসে নেছা বিবির সম্পত্তি ক্রয় করে বসবাস করতে থাকেন। (পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য)

শিক্ষা দীক্ষা ও কর্মজীবন ঃ লেখক প্রথমে মক্তবে কুরআন মজিদ ও কিছু কিতাব শিক্ষা করেন। ৪র্থ শ্রেণী পাস করার পর হিফ্‌য আরম্ভ করেন এবং ১৯৫২ সালে দু'বছর তিন মাসে হিফ্‌য শেষ করেন। তারপর ১৯৫৫ সালে মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল (হাদীস) ১ম বিভাগে বৃত্তিসহ (১৯৫৬-১৯৬৪ইং সালে) উত্তীর্ণ হন। তারপর ইন্টারমিডিয়েট, ডিগ্রি ও এমএ (জেনারেল ইতিহাস) উচ্চতর দ্বিতীয় বিভাগে স্টাইপেন্ডসহ (১৯৬৪-১৯৭০) সালে পাস করেন। ১৯৭০ সালে জেনারেল শিক্ষা সমাপ্তির পর ১৯৭২ সালে কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। ছাগলনাইয়া কলেজ ও নওয়াব ফয়জুন্নেছা কলেজে ১৯৭৫ইং সাল পর্যন্ত ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনা করেন। উচ্চতর শিক্ষা লাভের পাশাপাশি জীবিকা নির্বাহের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম শহরে ১৯৬৪-৭৮ইং পর্যন্ত হযরত তারেক শাহ (রহঃ) দরগাহ মসজিদে ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব পালন করেন। অধ্যাপনার ফাঁকে ১৯৭৩ইং সালে ১ বছর অগ্রণী ব্যাংকে প্রবেশনারী অফিসার হিসেবে কাজ করে ইস্তফা দেন। ১৯৭৩ ইং সালে বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। হাজীগঞ্জ বড় মসজিদে ১৯৭৫ সালে ছয় মাস ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব পালন করে ইস্তফা দিয়ে পুনরায় চট্টগ্রাম চলে যান। চট্টগ্রামের জামেয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে ১৯৭৭ সালে যোগদান করেন। ১৯৭৮ সালে ঢাকা মোহাম্মদপুর কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে যোগদান করে স্থায়ীভাবে ঢাকা চলে আসেন। ১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৯০ইং সাল পর্যন্ত মধ্যখানে ৪ বছর ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর ইমাম ট্রেনিং প্রজেক্ট ও ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ে ডাইরেক্টর পদে দায়িত্ব পালন করে ১৯৯০-এর ডিসেম্বরে কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলীয়া মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ পদে পুনরায় যোগদান করেন। অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি মসজিদের খতীব, ওয়াজ নসিহত ও আহলে সুন্নাতের নির্বাচিত মহাসচিবের দায়িত্বও পালন করে আসছেন। বুখারী শরীফসহ তার লিখিত, অনূদিত ও সম্পাদিত ২০ খানা গ্রন্থের মধ্যে এ পর্যন্ত ১৮খানা প্রকাশিত হয়েছে। "মহাসমর" ট্রেসিং তৈরী হয়ে আছে।

বিদেশ ভ্রমণ ঃ ১৯৮০ইং সালে প্রথম বিদেশ ভ্রমণ করেন। ভারতের আজমীর শরীফে হযরত খাজা গরীব নওয়াজ (রহঃ) ও বেরেলী শরীফের আ'লা হযরত ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত হযরত শাহ আহমদ রেজা খান বেরলভী (রহঃ)-এর মাযার শরীফ যিয়ারত করে ফয়েয ও বরকত লাভ করেন। ১৯৮২ইং সালে ইরাক সরকারের আমন্ত্রণে বাগদাদে অনুষ্ঠিত মোতামারে ইসলামী সম্মেলনে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেছীন প্রতিনিধি দলের সাথে গমন করেন। সেই সাথে পবিত্র হজ্ব ও যিয়ারত করার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং কারবালা ও বাগদাদ শরীফের গাউসুল আযম (রাদিঃ)-এর মাযারসহ অসংখ্য ওলী ও নবীর মাযার শরীফ যিয়ারত করেন। ১৯৮৪ইং ও ১৯৮৫ইং সালে দু'বার ইরাক সরকারের আহ্বানে পুনরায় জমিয়াতুল মোদাররেছীন প্রতিনিধি হিসাবে ইসলামী সম্মেলনে যোগদান করেন ও সেই সাথে যথাক্রমে হজ্ব ও ওমরাহ পালন করেন। বর্তমানে অবসর জীবনে অন্যান্য দায়িত্বের পাশাপাশি সুন্নী গবেষণা ও লেখালেখির কাজে ব্যস্ত আছেন। মাসিক সুন্নীবার্তা ১৯৯৯ সাল থেকে প্রকাশ করে আসছেন। বাংলাদেশে সুন্নিয়ত প্রতিষ্ঠার জন্যে বাতিল ফের্কার বিরুদ্ধে সংগ্রামে আহ্‌লে সুন্নাতের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। ঢাকার শাহজাহানপুর ১১তলা বিশিষ্ট (প্রস্তাবিত) গাউসুল আযম জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন। শরিয়ত ও তরিকত প্রচারের কেন্দ্ররূপে উক্ত মসজিদ গড়ে তোলার জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ১৯৯৭ইং ২৪শে নভেম্বর বাগদাদ শরীফের মোতাওয়াল্লী সাইয়্যেদ আবদুর রহমান জিলানী সাহেব তাঁকে কাদেরিয়া তরিকার খেদমত করার জন্য হস্তলিখিত খেলাফতনামা প্রদান করেন। লেখকের নিজ গ্রাম আমিয়াপুরে হযরত বিবি ফাতেমা (রাঃ) মহিলা দাখিল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে যাচ্ছেন।

তারিখ ঃ নভেম্বর' ০৭

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

উৎসর্গ

১৯৯৫ ইংরেজী সালটি ছিল আমার জন্য বেদনা ও শোকের বছর। জীবন সঙ্গিনীর দীর্ঘ সাড়ে চাঁরমাস অসুস্থতার পর ১৬ই জুলাই তাঁর ইনতিকালে আমার জীবনের একাংশ পঙ্গু হয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও ১৯৯৫ সালের মার্চের মাঝামাঝি সময় থেকে নভেম্বর '৯৫-এর মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে শোকের ফাঁকে ফাঁকে নূরনবীর পাণ্ডুলিপি লেখার কাজ করে দরবারে রেসালতে শান্তনার আশ্রয় খুঁজেছি, বিপদে ধৈর্য ধারণের শিক্ষা লাভ করেছি ও কিছুটা প্রশান্তি পেয়েছি। তাই অত্র গ্রন্থখানা রহমতের ভান্ডার রাহমাতুল্লিল আলামীন (দঃ), অলিকূল সম্রাট হযরত পীরানে পীর দস্তগীর গাউসুল আযম আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ), মুর্শিদে বরহক গাউসে জামান হযরতুল আল্লামা হাফেয ক্বারী শাহসুফী সৈয়দ মোহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (রাঃ), জান্নাত বাসী আব্বা, আম্মাও সহধর্মিনীর স্মরণে উৎসর্গ করা হলো। পরকালে আমার নাজাতের উছিলা এবং নবী প্রেমিক মুসলমান ভাই ও বোনদের চলার পথের দিশারী হিসাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করুন। আমিন! বিহুরমাতে ছাইয়িদিল আম্বিয়ায়ে ওয়াল মোরসালীন। সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাঈন।

বিনীত

গ্রন্থকার

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

অভিমত

প্রফেসর আলহাজ্ব মোঃ আবদুল হাই
(এম কম) বিসিএস-শিক্ষা
প্রাক্তন চেয়ারম্যান, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা
বহু গ্রন্থ প্রণেতা-অনার্স ও মাষ্টারস শ্রেণী (বাণিজ্য বিভাগ)
সাবেক বিশেষজ্ঞ--কমার্স এডুকেশন এনসিসি
সভাপতি মন্ডলীর সদস্য-আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত।

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম

আলহামদুলিল্লাহ! সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য। লক্ষ কোটি দরূদ ও সালাম নবী মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর। নবী পাকের অনুপম আদর্শ ও শিক্ষা পৃথিবীর সকল মানুষের নিকট পৌছিয়ে দেয়া, তাঁর সুন্দর আখলাক ও সাধনা জনগণের কাছে তুলে ধরা, বিশেষ করে ইসলমী আকিদা অনুযায়ী খোদা প্রদত্ত তাঁর প্রকৃত শান-মান তুলে ধরা বর্তমান যুগের চাহিদা।

এ লক্ষ্য সামনে রেখে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী অধ্যক্ষ আল্লামা হাফেয মুহাম্মদ আবদুল জলিল (এমএম,এমএ, বিসিএস) সাহেব কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা করে কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে গবেষণামূলক "নূরনবী" জীবনী গ্রন্থখানা রচনা করেছেন। এ গ্রন্থটিতে আমি যা লক্ষ্য করেছি, তাহলো-নবীপাক (দঃ)-এর সৃষ্টির মূল রহস্য, সৃষ্টির উপাদান, খোদা প্রদত্ত তাঁর ইলমে গায়েব, হাযির নাযির ও দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা প্রবাহের সমাহার ঘটিয়েছেন লেখক। তাঁর উদ্যোগ নূতন জীবনী লেখকদের জন্য পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। রাসূলপ্রেম হলো ঈমানের জীবনী শক্তি। বিজ্ঞ লেখক তা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টার ত্রুটি করেননি। বর্তমান যুগে রাসুল-পরিচিতির ক্ষেত্রে বিকৃত মনোবৃত্তি লক্ষ্য করা যায় প্রচুর পরিমাণে। আল্লামা আবদুল জলিল লিখিত অত্র গ্রন্থখানা নবী করিম (দঃ)-এর প্রকৃত রূপ উদঘাটনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমাদের দেশে বাংলা ভাষায় এ ধরনের উন্নত তথ্যবহুল পুস্তকের খুবই অভাব। সুধী লেখক সহজ ও সরল ভাষায় নবী জীবনের প্রকৃত তথ্য সমাহারে সমৃদ্ধ করে গ্রন্থখানি বিজ্ঞ পাঠকদের খেদমতে পেশ করেছেন। আমি আন্তরিকভাবে গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করছি।

জানুয়ারী -১৯৯৭ইং **প্রফেসর আলহাজ্ব মোঃ আবদুল হাই**

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

প্রথম প্রকাশ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

অত্র গ্রন্থখানি রচনায় ও প্রকাশনায় অনেকের কাছ থেকেই মূল্যবান পরামর্শ, উৎসাহ ও আনুকূল্য লাভ করেছি। জুমার খুতবায় ও ওয়াজ মাহফিলে হাকিকতে মোহাম্মদী (দঃ) বয়ান করার সময় অনেক মুসল্লী ও শুভাকাংখীই ঐগুলো গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার জন্য তাগিদ করেছেন। গুণগ্রাহী ছাত্রবৃন্দ অনুরোধ করেছে—তাদের জন্য কিছু প্রামাণিক তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে নবী করিম (দঃ)-এর প্রকৃত স্বরূপ লিখিত আকারে রেখে যেতে। এক্ষেত্রে স্নেহাস্পদ মাওঃ আবুল খায়ের, মাওলানা মাসুদ হোসাইন ও মুফতী হাফেয আবদুর রহমান প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। বন্ধু মহলের অনেকেই উৎসাহ যুগিয়েছেন--নবী বিদ্বেষী কিছু লেখকের মোকাবেলায় তথ্যপূর্ণ কিছু লেখার জন্য। তাদের এ আব্দার ও অনুরোধ রক্ষা করতে গিয়ে জ্ঞানের দীনতা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কলম হাতে নিতে বাধ্য হয়েছি। পাণ্ডুলিপি তৈরী করলাম নানা ধরনের বাধা-বিপত্তির মাঝে। স্নেহাস্পদ মোহাম্মদ আবুল হাশেম ও গোলাম কিবরিয়ার এইচ,কে প্রিন্টার্স প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কম্পিউটার কম্পোজের কাজ সমাধা করে বসে আছি। এমন সময় স্বনামধন্য শিক্ষানুরাগী জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও হিসাববিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান বহু গ্রন্থ প্রণেতা জনাব প্রফেসর আলহাজ্ব মুহাম্মদ আব্দুল হাই এবং ইঞ্জিনিয়ার জনাব কুদরত উল্লাহ সাহেবদ্বয় আংশিক অর্থানুকূল্য নিয়ে এগিয়ে আসলেন। তা না হলে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস আলোর মুখ দেখতো কিনা-সন্দেহ। আমি ধন্যবাদের সাথে তাঁদের ইহকালীন ও পরকালীন উন্নতি ও শান্তির জন্য দোয়া করছি এবং সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

জানুয়ারী, ১৯৯৭ইং

বিনীত
[signature]
গ্রন্থকার

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

দ্বিতীয় প্রকাশ
লেখকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম

আস্-সালাতু আস্-সালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ্ (দঃ)

আমার কিছু ছাত্র ও কিছু বন্ধুর অনুরোধে নূরনবী (দঃ) গ্রন্থখানি রচনায় হাত দিয়ে কিছু গবেষণামূলক তথ্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমাকে অনেক আরবী গ্রন্থ পড়তে হয়েছে। উর্দূ ও বাংলা ভাষায় নবী করিম (দঃ)-এর জীবন চরিত আলোচনা করতে গিয়ে অনেক লেখকই শুধু ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতার দিকে বেশী মনোযোগ দিয়েছেন। কিন্তু ঘটনাবলীর মাধ্যমে যেসব মো'জিযা বা অলৌকিক শক্তির বহিঃপ্রকাশ হয়েছে-তা সযত্নে পাশ কাটিয়ে গেছেন। এটা এক ধরনের কৃপণতা। আমি প্রতিটি অধ্যায় বা ঘটনাবলীর মাধ্যমে নবী করিম (দঃ)-এর প্রকৃত যে রূপটি ফুটে উঠেছে-তা পাঠকের সামনে নির্ভিক চিত্তে প্রামাণিক দলীল দ্বারা তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। আমি এমএ-তে ইতিহাসের ছাত্র ছিলাম। ইতিহাস রচনায় লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী প্রচুর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আমি নবী করিম (দঃ)-এর নূর, ইলমে গায়েব ও হাযির-নাযির দিকগুলোর উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছি- যাতে হুযুর (দঃ)-এর ঐসব গুণাবলী অস্বীকারকারীদের স্বরূপ জনগণ সঠিকভাবে বুঝতে পারেন।

১৯৯৭ইং সালে নূরনবী (দঃ) গ্রন্থখানা ছাপার সাথে সাথেই অল্পদিনের মধ্যে সব বই শেষ হয়ে যায়। নবী প্রেমিক পাঠকগণ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এবং লন্ডন ও আমেরিকা থেকে বইখানা পুনঃমুদ্রণের জন্য অনুরোধপত্র লিখতে থাকেন। ধারণা হয়-জনগণের কাছে নূরনবী (দঃ) গ্রন্থখানা সমাদৃত হয়েছে। তাই আর্থিক সংকট সত্ত্বেও কায়-ক্লেশে দ্বিতীয়বার প্রকাশ করা হলো। আল্লাহপাক যেন অত্র গ্রন্থখানা দরবারে রিসালাতে (দঃ) কবুল করে আমার আখেরাতের নাজাতের ব্যবস্থা করেন। আমিন!

তারিখঃ ১২ই রবিউল আউয়াল ১৪২০ হিজরী
আষাঢ়-১৪০৬ বাংলা
জুন-১৯৯৯ইং

বিনীত
(স্বাক্ষর)
গ্রন্থকার

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

তৃতীয় সংস্করণের কথা

আল্লাহর অশেষ রহমতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উছিলায় "নূরনবী" (দঃ) গ্রন্থখানা প্রথম থেকেই জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে– যার প্রমাণ–দ্বিতীয় সংস্করণ অল্প সময়েই শেষ হয়ে গেছে। দেশে-বিদেশে নূরনবীর চাহিদা প্রচুর। বিদগ্ধজনের হৃদয়ে নূরনবীর তথ্যসমূহ আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে- আলহামদুল্লিাহ! তাই আর্থিক অসঙ্গতি সত্ত্বেও তৃতীয় সংস্করণ ছাপতে বাধ্য হয়েছি। সুন্নী আক্বিদা-তথা হুযুরের (দঃ) নূর, ইলমে গায়েব, হাযির-নাযির ও ঐশীকর্তৃত্ব সম্পর্কে "নূরনবীর" তথ্যসমূহ শিক্ষিত সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তাই ভবিষ্যতেও পুস্তিকাটির চাহিদা অটুট থাকবে বলে বিশ্বাস। সুন্নীয়ত প্রচারে গ্রন্থখানার খেদমত অনস্বীকার্য। মুসলমানদের আক্বিদা বিশ্বাস মজবুত রাখার জন্য গ্রন্থখানা পাঠ করা খুবই প্রয়োজন। কেননা, বর্তমানে মউদূদীবাদ, ওহাবীবাদ, তাবলীগীবাদ, কাহহারীবাদ প্রভৃতি নবীজীর ইলমে গায়েব, হাযির নাযির, নূর ও কর্তৃত্বের উপর মারাত্মক আঘাত হেনে চলেছে। এমতাবস্থায় "নূরনবী" গ্রন্থখানা তাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে সক্ষম হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। এক কথায়-বিশ্বনবীর পবিত্র জীবন চরিত সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার জন্য "নূরনবী" পাঠ করা প্রত্যেক শিক্ষিত লোকের উচিত। কেননা, এতে কিছু নূতন ধারা রয়েছে– যা অন্য গ্রন্থে নেই।

গ্রন্থ রচনা করতে হলে সমালোচনার জন্যও তৈরী থাকতে হয়। আমিও সেজন্য সব সময় প্রস্তুত। গঠনমূলক সমালোচনা ও গ্রহণযোগ্য সংশোধনী আসলে তা সাদরে গ্রহণ করার সাহস ও মানসিকতা নিয়ে আমি সর্বদা প্রস্তুত। কিন্তু ইতিপূর্বে সিজদা গ্রহণকারী জনৈক আলেম "নূরনবীর" বিরুদ্ধে কিছু ভুল তথ্য সম্বলিত লিফলেট ছেপে গোপনে বিলি করছেন বলে শুনেছি। যেমনঃ হযরত আলী (রাঃ)-এর মারেফাত জ্ঞান সম্পর্কে, নবীজীর পিতামাতার পুনর্জীবন ও সাহাবী হওয়া সম্পর্কে এবং নবীজী কর্তৃক তাঁদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া সম্পর্কে তিনি ভুল ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য ছড়াচ্ছেন। আমি মনে করি- এতে আমার "নূরনবীর" চাহিদা আরো বেড়ে যাবে। তিনি যদি একটি কিতাব লিখেও সুন্নী জনগণের খেদমত করতেন- তাহলে বুঝা যেতো তিনি একজন

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

লেখক এবং সমালোচনা করার যোগ্য ব্যক্তি। কিন্তু জীবনের শেষপ্রান্তে এসেও তা তাঁর দ্বারা সম্ভব হয়নি। পরশ্রীকাতর লোক আল্লাহ রাসূলের নিকট অতি ঘৃণিত।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই হেদায়াতের অধিকারী। কোরআনপাকে আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেন- "ওয়া ইন্নাকা লাতাহদী ইলা ছিরাতীম মোস্তাক্বীম"- "হে রাসূল! অবশ্যই আপনি সিরাতুল মোস্তাকীমের পথপ্রদর্শক ও হেদায়াতকারী।"

তৃতীয় সংস্করণে দু-এক জায়গায় প্রিন্টিং ভুল সংশোধন করা হয়েছে এবং অস্পষ্ট তথ্য স্পষ্ট করা হয়েছে। আল্লাহপাক গ্রন্থখানা কবুল করুন এবং আমার পরকালীন নাজাতের উছিলা বানিয়ে দিন! আমীন! বিহুরমাতে ছাইয়েদিল মোরছালীন!

তারিখ ১০-০৪-২০০৪ইং

বিনীত

গ্রন্থকার

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

চতুর্থ সংস্করণের কথা

গ্রন্থ রচনা করলে পরবর্তীতে কিছু না কিছু সংস্কার করতেই হয়। কেননা, মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধতার উর্দ্ধে নয়। নূরনবীর বেলায়ও তা সত্য। শব্দ চয়ন ও বাক্য বিন্যাস পুনর্গঠন করলে গ্রন্থের পক্কতা বাড়ে। তদুপরি, রাসুল-জীবনের সব তথ্য একসাথে মনে আসা ও লিপিবদ্ধ করাও সম্ভব নয়। যতই দিন যায়-লেখকের চিন্তা-চেতনাও ততই সমৃদ্ধ হতে থাকে। নূরনবীর ৪র্থ সংস্করণে তাই করা হয়েছে। তাই পূর্ববর্তী কপি হতে বর্তমান কপির শব্দ ও বাক্য পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে। তবে তথ্য বা মর্মের কোন পরিবর্তন হয়নি। পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই-পূর্ব কপির চেয়ে বর্তমান কপি অনেক বেশী তথ্য সমৃদ্ধ ও পরিমার্জিত এবং পৃষ্ঠাও অনেক বেশী। বর্তমানে ইহাই অনুসরন যোগ্য।

আমার ১৯ টি গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়তা দেখেছি নূরনবী (দঃ)-এর ক্ষেত্রে। ঢাকার কোন লাইব্রেরী আমার লিখিত গ্রন্থ বিক্রি করতে রাজী হচ্ছে না। কারণ, তাহলে তাদের মতবাদের ভরাডুবি হবে। কিন্তু বাতিলপন্থীদের এত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও নূরনবী (দঃ)-এর চাহিদা দিন দিন বেড়ে চলেছে। অল্পদিনের মধ্যে ৩টি সংস্করণ শেষ হয়ে গেছে। তাই ৪র্থ সংস্করণে হাত দিতে হয়েছে। এই সুযোগে শব্দ বিন্যাস, বাক্য বিন্যাস ও অতিরিক্ত তথ্য সংযোজনের সুযোগ পেয়ে গেলাম।

প্রিয় নবীজীর শানমান যতই যুক্ত হবে-গ্রন্থের মর্যাদাও সে পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে-এটা বাস্তব অভিজ্ঞতা। আমি সে চেষ্টাই করেছি বক্ষমান সংস্করণে। সাথে সাথে বর্ণিত কোটেশান গ্রন্থের অধ্যায়, খন্ড ও পৃষ্ঠা এবং আয়াতে কোরআনের নম্বর সংযোজন করে পাঠকদের যাচাইয়ের সুযোগ করে দিয়েছি। আল্লাহর প্রিয় হাবীবের সদকায় ৪র্থ সংস্করণ পাঠক সমাজে ও নবীপ্রেমিক হৃদয়ে স্থান করে নিতে পারবে।

পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে বলছি-৪র্থ সংস্করণে একটি মূল্যবান পরিশিষ্ট সংযোজনী যুক্ত করেছি। তাহলো-"আল্লাহর নামের ও কাজের সাথে কোন্ কোন্ আয়াতে নবীজীর নাম যুক্ত আছে"-তার বিশদ বিবরণ ও আয়াতের অর্থ এবং নম্বর-যাতে পাঠকবৃন্দ যাচাই করে দেখতে পারেন। আমার বিশ্বাস-এই সংযোজনীর ফলে একদিকে ইসলামী আক্বিদা দৃঢ় হবে-অপরদিকে দুশমনদের অপপ্রচার বন্ধ হয়ে যাবে অথবা প্রতিপদে তারা হোঁচট খাবে-ইন্শাআল্লাহ! নবপ্রজন্মের সুন্নী স্কলারদের গবেষণায় প্রচুর রসদ যোগাবে অত্র সংযোজনীটি।

অবশেষে সকলের দোয়া প্রার্থী -হাবীবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শান শওকত ও আযমত চর্চায় যেন জীবনের শেষ মুহুর্তগুলো কাজে লাগাতে পারি। এতেই হৃদয়ে পাবো পরম শান্তি ও তৃপ্তি।

কি সাধ্য আছে মোর-গাইতে নবীর গান,
কলম মোর ধন্য হলো-লিখে নবীর শান

তারিখ ঃ নভেম্বর, ২০০৭ইং

বিনীত
হাফেয মোহাম্মদ আবদুল জলিল

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

গ্রন্থকারের পেশ কালাম

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যখন ছিলেন একা-ছিলনা তাঁর সখা। ছিল না তাঁর পরিচয়। তিনি ছিলেন গুপ্ত ধন ভান্ডারের ন্যায়। নিজের আত্মপরিচয়ের ও আত্মপ্রকাশের উদ্দেশ্যে তিনি আপন যাতি নূরের ফয়েয, ঝলক ও জ্যোতিঃ হতে সৃষ্টি করলেন আপন হাবীবের নূর মোবারক। ঐ নূরে মোহাম্মদী (দঃ) হতেই পয়দা করলেন আরশ-কুরছি, লাওহ্-কলম, আসমান-জমিন-তথা সবকিছু। তখন আগুন-পানি-মাটি-বায়ু-অর্থ্যাৎ সৃষ্টির মৌলিক কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব ছিলনা। সুতরাং নূরে মোহাম্মদী (দঃ) হলো প্রথমও মৌলিক সৃষ্টি। এই সৃষ্টি রহস্যের তো তখন কোন সাক্ষীই ছিলনা খোদা ভিন্ন। সন্তান যেমন জানেনা পিতা-মাতার সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে, তদ্রূপ খোদার সৃষ্টি জগতও জানেনা তাদের সৃষ্টির মূল উৎসের রহস্য সন্ধান। এমন কি-ফেরেস্তাকুল শীরোমণি হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালামও হাকিকতে মোহাম্মদী সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ছিলেন না। তিনি শুধু একটি তারকাকে বাহাত্তর হাজার বার উদিত হতে দেখেছেন-সত্তর হাজার বছর পর পর। আর সত্তর হাজার বছর পর পর ডুবন্ত অবস্থায় বাহাত্তর হাজার বার দেখতেই পাননি। অংকের হিসাবে পাঁচশত চার কোটি বছর উদিত অবস্থায় ঐ তারকার যাহেরী সুরত মাত্র দেখেছিলেন হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম। বাতেনীরূপে ঐ তারকা অনুরূপ পাঁচশত চার কোটি বছর অবস্থান করছিলেন। যাহেরী ও বাতেনী অবস্থায় মোট এক হাজার আট কোটি বৎসর নবী করিম (দঃ) নূরানী চতুর্থ হিজাবে বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু জিবরাইল (আঃ) ঐ বাতেনী সুরতের বিষয়ে সম্যক অবগত ছিলেন না। হযরত আবু হোরায়রা রাদিল্লাহু আনহুর বর্ণিত হাদীস মোতাবেক নবী করিম রাউফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাইল আলাইহিস সালামকে ঐ তারকার তথ্য জানিয়ে বলেছিলেন "আমি ছিলাম ঐ তারকা" (সীরাতে হলবিয়া ১ম খন্ড ৩০ পৃষ্ঠা ও রুহুলবয়ান সুরা তৌবা ১২৮ আয়াত)। সুতরাং এই হাকিকতে মোহাম্মদীর অর্দ্ধেক বাতেনী অংশ বা বাতেনী রূপ সম্পর্কে জিবরাইলেরও জানা ছিলনা প্রকৃত অবস্থা।

মে'রাজ রজনীতে খোদার দীদার লাভ করে যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরতি পথে একা একা ৬ষ্ঠ আকাশে নেমে আসলেন, তখন মুসা আলাইহিস সালামের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। হযরত মুসা আলাইহিস সালামের অনুরোধে তিনি পুনরায় নয় বার আল্লাহর দরবারে একা একা আসা-যাওয়া করেছিলেন উম্মতের নামাযের সংখ্যা কমানোর জন্য। বাহ্যিক দৃষ্টিতে উম্মতে মোহাম্মদীর প্রতি মুসা আলাইহিস সালামের মায়া ও দরদ দেখা গেলেও প্রকৃত পক্ষে মুসা আলাইহিস সালামের আর একটি উদ্দেশ্য এখানে গোপনে ও প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করছিলো। সেটা

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ছিল আল্লাহর নূরের তাজাল্লী দর্শনের প্রবল আকাংখা। (তাফসীরে সাভী) আড়াই হাজার বছর পূর্বে তূর পর্বতে আল্লাহর নূরের জালালী তাজাল্লী সহ্য করতে না পেরে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলেন। আজ মেরাজ রাতে সেই নূরের তাজাল্লী নবীজীর চেহারা মোবারকে প্রতিফলিত দেখে মুসা আলাইহিস সালামের সুপ্ত বাসনা পুনরায় জেগে উঠে। তাই তিনি উম্মতে মোহাম্মদীর নামাযের বাহানায় পুনঃ নয় বার আল্লাহর নূরের দীদার নবীজীর মাধ্যমে লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আল্লাহর প্রিয় হাবীব (দঃ) হলেন আল্লাহ্ দর্শনের আয়না স্বরূপ (মসনবী)। এই আয়নাতেই আল্লাহর নূর প্রতিবিম্বিত হয় এবং তখন দেখাও সম্ভব- যেমন পূর্ণ সূর্য গ্রহণের সময় এক্সরে ফিল্মের মাধ্যমে সূর্যগ্রহণের রূপ দেখা যায়-খালী চোখে সম্ভব নয়। মসনবী শরীফে সুফী সম্রাট আল্লামা জালালউদ্দিন রুমী রাহ্মতুল্লাহি আলাইহি বলেছেনঃ

"মোস্তফা আয়নায়ে জিল্লে খোদাস্ত,

মুনআকাছ দর ওয়ায় হামা খোয়ে খোদাস্ত।"

অর্থঃ "নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন আল্লাহর নূরানী তাজাল্লী দর্শনের আয়না স্বরূপ। ঐ আয়নাতেই আল্লাহর পবিত্র যাতের সবকিছু প্রতিবিম্বিত ও প্রতিফলিত হয় (মসনবী শরীফ)"। মাওলানা রুমীর উচ্চমার্গের এই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব মূলতঃ মুসা আলাইহিস সালামের নবী দর্শনের তথ্য হতেই উৎসারিত।

উপরের দুটি ঘটনা থেকে এই শিক্ষাই পাওয়া গেল যে, হাকিকতে মোহাম্মীর স্বরূপ উদঘাটন করতে হলে হযরত জিবরাইল ও হযরত মুসা আলাইহিস সালাম থেকেই তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং তাঁদের দৃষ্টিতেই দেখতে হবে। মানুষের দৃষ্টিতে দেখতে গেলে তিনি আমাদের মত বলেই মনে হবে। আবু জাহেল ও আবু বকর উভয়েই নবীকে দেখেছে। প্রথমজন দেখেছে কুফরী নযরে। তাই বলেছে -"তিনি তো আমাদের মতই একজন সাধারণ মানুষ"। দ্বিতীয়জন দেখেছেন ঈমানী নযরে। তাই বলেছেন- "মোহাম্মদুন বাশারুন লা-কাল বাশারী" অর্থ্যাৎ "মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুরতে মানবজাতি হয়েও কোন মানুষের মতই নন"- (আল্লামা বুছেরীর কাসিদায়ে বোরদা)। সুবহানাল্লাহ!

হুযুর (দঃ)-এর ক্ষেত্রে এসেই ঈমান ও কুফরীর পার্থক্য ধরা পড়ে যায়। আল্লাহ সম্পর্কে তেমন আশংকা কম। একদল লোক নিজেদের দাঁড়িপাল্লা দিয়ে নবীজীকে ওজন করতে চায়। আর একদল লোক নবীজীর দাড়িপাল্লায় নিজেকে ওজন করে নেয়। ঝিনুক দিয়ে সাগরের পানি মাপা যায় না। মাপতে গেলে সাগরের পানি কমবে

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

না। কিন্তু ঝিনুকের জীবন সর্বনাশ হয়ে যাবে। তাই বলছিলাম– যেখানে হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম এবং হযরত মুসা আলাইহিস সালাম নবীজীর নূরের পূর্ণ হাকিকত অনুধাবনে অক্ষম– সেখানে আমরা কে?

কিন্তু হাল জামানার একশ্রেণীর জ্ঞানপাপী নামধারী আলেম ও জাহেল পীর নবী করিম (দঃ)-এর নূরকে অস্বীকার করে তাঁকে মাটির সৃষ্টি বলে অজস্র টাকা খরচ করে বই লিখে ব্যাপক প্রচারণা চালাচ্ছে। তাদের বই পুস্তকে নবীজীর আল্লাহ প্রদত্ত ইলমে গায়েব ও হাযির নাযির সিফাতকে তারা অস্বীকার করেছে। তাদের এই কুফরী প্রচারণায় মানুষ ধোকায় পড়ে বিভ্রান্ত হচ্ছে। তাই এই অধম লেখক নিজের এলেমের দীনতা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে মসি তলোয়ার উত্তোলন করতে চেষ্টা করেছি। বক্ষমান গ্রন্থের নামকরণ করেছি "নূরনবী" বা "ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) সংকলন"। নবী করিম (দঃ)-এর আদি সৃষ্টি হতে ইন্তিকাল পর্যন্ত আক্বিদা ভিত্তিক জীবনী ও চরিতাংশ আলোচনা করেছি এই গ্রন্থে। দলীল প্রমাণ যথাসাধ্য কোটেশন ভিত্তিক উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি। সাধারণতঃ রেফারেন্স ভিত্তিক অনুবাদ পেশ করেছি। মূল গ্রন্থ সংরক্ষিত রেখেছি, প্রয়োজনে পেশ করার জন্যে। প্রতিটি অধ্যায়ে সংশ্লিষ্ট আক্বিদা ও শিক্ষণীয় বিষয় উল্লেখ করেছি– যাতে ঘটনার মাধ্যমে ঈমান আক্বিদা সংশোধন করা যায়।

পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনায় এটি আমার প্রথম প্রয়াস হলেও অন্যান্য জীবনী লেখকদের থেকে এটি স্বতন্ত্র প্রয়াস। উদ্দেশ্য মাত্র একটি। নূর, ইলমে গায়েব, হাযির-নাযির ও নবীজীর আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ও এখতেয়ার সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদী সম্প্রদায়ের মুখোশ উন্মোচন করা এবং সরল মুসলমানদের ঈমান ও আক্বিদা অক্ষত রাখা। মানবীয় দুর্বলতা থেকে আমি মুক্ত নই। নবীগণই কেবল মুক্ত। তাই অজ্ঞাতে বা অসাবধানতা বশতঃ ভাষায় বা ভাবে ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তদুপরি–মুদ্রণজনিত ত্রুটির তো সম্ভাবনা আছেই। যদি কোন নবীপ্রেমিক মোহাক্কিক আলেম আমার ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে দলীল ভিত্তিক সঠিক ও উন্নত তথ্য দিতে পারেন, তবে পরবর্তী সংস্করণে তা সংযোজন করা হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

বিনীত

গ্রন্থকার

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

প্রথম অধ্যায়

সৃষ্টির শুরু

প্রসঙ্গ ঃ নূরে মোহাম্মদীর (দঃ) সৃষ্টি রহস্য ও প্রকৃতি

অনাদি ও অনন্ত স্বত্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যখন একা ও অপ্রকাশিত ছিলেন, তখন তাঁর আত্মপ্রকাশের সাধ ও ইচ্ছা জাগরিত হলো। তখন তিনি একক সৃষ্টি হিসেবে নবী করিম (দঃ)-এর নূর মোবারক পয়দা করলেন এবং নাম রাখলেন মোহাম্মদ (দঃ) (কানজুদ্দাকায়েক-ইমাম গাযালী)। সেই নূরে মোহাম্মদীর সৃষ্টি রহস্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে স্বয়ং নবী করিম (দঃ) মারফু মুত্তাসিল হাদীসের মাধ্যমে পরিস্কার ব্যাখ্যা করে গেছেন। উক্ত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে রাসুলে পাক (দঃ)-এর একনিষ্ঠ খাদেম ও মদিনার ৬নং সাহাবী হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) কর্তৃক। উক্ত হাদীসটি প্রথম সংকলিত হয়েছে "মোসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক" নামক হাদীস গ্রন্থে। মোহাদ্দেস আবদুর রাজ্জাক ছিলেন ইমাম বোখারী (রাঃ)-এর দাদা ওস্তাদ এবং ইমাম মালেকের শাগরিদ। পরবর্তীতে উক্ত গ্রন্থ হতে অনেক হাদীস বিশারদগণ নিজ নিজ গ্রন্থে হাদীসখানা সংকলিত করেছেন। যেমন–ইমাম কাস্তুলানী (রহঃ) তাঁর রচিত নবী করিম (দঃ)-এর জীবনী গ্রন্থ 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়ায়' উক্ত হাদীসখানা সংকলন করেছেন। মিশরের আল্লামা ইউসুফ নাব্হানী তাঁর রচিত আন্ওয়ারে মোহাম্মাদীয়া নামক আরবী গ্রন্থেও উক্ত হাদীসখানা উল্লেখ করেছেন। নবী করিম (দঃ)-এর সৃষ্টি সম্পর্কে এই হাদীসখানা স্বব্যাখ্যাত এবং বিস্তারিত। তাই বিজ্ঞ পাঠকের সামনে আমরা উক্ত হাদীসখানা অনুবাদসহ তুলে ধরছি। এ রেওয়ায়াত ছাড়া অন্যান্য রেওয়ায়াত অসম্পূর্ণ, অস্পষ্ট ও খন্ডিত এবং উসুলে হাদীসের মাপকাঠিতে অনির্ভরযোগ্য বা মারজুহ্। হাদীসখানা নিম্নরূপ ঃ

رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ اِبْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ
رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ اَخْبِرْنِيْ
عَنْ اَوَّلِ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى قَبْلَ الْاَشْيَاءِ قَالَ يَاجَابِرُ اِنَّ اللّٰهَ
تَعَالٰى خَلَقَ قَبْلَ الْاَشْيَاءِ نُوْرَ نَبِيِّكَ مِنْ نُوْرِهٖ فَجَعَلَ ذٰلِكَ النُّوْرُ

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

يَدُوْرُ بِالْقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلَمْ يَكُنْ فِيْ ذٰلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ
وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا اَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ
وَلَا قَمَرٌ وَلَا جِنِّيٌّ وَلَا اِنْسِيٌّ - فَلَمَّا اَرَادَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْ يَّخْلُقَ الْخَلْقَ
قَسَّمَ ذٰلِكَ النُّوْرَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الْاَوَّلِ الْقَلَمَ وَمِنَ
الثَّانِيْ اللَّوْحَ وَمِنَ الثَّالِثِ الْعَرْشَ ثُمَّ قَسَّمَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ
اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الْاَوَّلِ حَمَلَةَ الْعَرْشِ وَمِنَ الثَّانِيْ
الْكُرْسِيَّ وَمِنَ الثَّالِثِ بَاقِيَ الْمَلَائِكَةِ ثُمَّ قَسَّمَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ اَرْبَعَةَ
اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْاَوَّلِ السَّمٰوٰتِ وَمِنَ الثَّانِيْ الْاَرَضِيْنَ وَمِنَ
الثَّالِثِ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ثُمَّ قَسَّمَ الْقِسْمَ الرَّابِعَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ
مِنَ الْاَوَّلِ نُوْرَ اَبْصَارِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمِنَ الثَّانِيْ نُوْرَ قُلُوْبِهِمْ وَهِيَ
الْمَعْرِفَةُ بِاللّٰهِ تَعَالٰى وَمِنَ الثَّالِثِ نُوْرَ اُنْسِهِمْ وَهُوَ التَّوْحِيْدُ لَا اِلٰهَ
اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ. (الْجُزْءُ الْمَفْقُوْدُ مِنَ الْمُصَنَّفِ)

অর্থ–ইমাম আবদুর রাজ্জাক (ইমাম বোখারীর দাদা ওস্তাদ) মোয়াম্মার হতে, তিনি ইবনে মুন্‌কাদার হতে, তিনি হযরত জাবের ইব্‌নে আবদুল্লাহ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেনঃ হযরত জাবের (রাঃ) বলেন- আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসুল (দঃ)! আপনার উপর আমার পিতা-মাতা উৎসর্গীত হোক, আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম কোন্ বস্তু সৃষ্টি করেছেন? তদুত্তরে নবী করীম (দঃ) বললেন–"হে জাবের, আল্লাহ তাঁয়ালা সর্ব প্রথম সমস্ত বস্তুর পূর্বে তাঁর 'নিজ নূর হতে' তোমার নবীর নূর পয়দা করেছেন। তারপর আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছানুযায়ী ঐ নূর (লা-মাকানে) পরিভ্রমণ করতে থাকে। কেননা ঐ সময় না ছিল লাওহে-মাহফুয, না ছিল কলম, না ছিল বেহেস্ত, না ছিল দোযখ, না ছিল ফিরিস্তা, না ছিল আকাশ, না ছিল পৃথিবী, না ছিল সূর্য, না ছিল চন্দ্র, না ছিল জ্বীন জাতি, না ছিল মানবজাতি।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

অতঃপর যখন আল্লাহ্‌তায়ালা অন্যান্য বস্তু সৃষ্টি করার মনস্থ করলেন–তখন আমার ঐ নূরকে চারভাগে বিভক্ত করে প্রথমভাগ দিয়ে কলম, দ্বিতীয়ভাগ দিয়ে লাওহে-মাহফুয এবং তৃতীয় ভাগ দিয়ে আরশ সৃষ্টি করলেন। অবশিষ্ট এক ভাগকে আবার চার ভাগে বিভক্ত করে প্রথম ভাগ দিয়ে আরশ বহনকারী ফিরিস্তা, দ্বিতীয় অংশ দিয়ে কুরসি এবং তৃতীয় অংশ দিয়ে অন্যান্য ফিরিস্তা সৃষ্টি করলেন। দ্বিতীয় চার ভাগের এক ভাগকে আবার চার ভাগে বিভক্ত করে প্রথমভাগ দিয়ে আকাশ, দ্বিতীয়ভাগ দিয়ে জমিন (পৃথিবী) এবং তৃতীয়ভাগ দিয়ে বেহেস্ত ও দোযখ সৃষ্টি করলেন। তৃতীয়বার অবশিষ্ট এক ভাগকে পুনরায় চার ভাগে বিভক্ত করে প্রথমভাগ দিয়ে মোমেনদের নয়নের নূর–(অন্তর্দৃষ্টি), দ্বিতীয়ভাগ দিয়ে মুমিনদের কলবের নূর- তথা আল্লাহ্‌র মা'রেফাত এবং তৃতীয়ভাগ দিয়ে মুমিনদের মহব্বতের নূর– তথা তাওহীদী কলেমা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' সৃষ্টি করেছেন।" (২৫৬ ভাগের এক ভাগ থেকে অন্যান্য সৃষ্টিজগত পয়দা করলেন)। –মাওয়াহেব লাদুন্নিয়া ও মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক- (আল জুয্‌উল মাফকুদ অংশ)।

ব্যাখ্যা ঃ উক্ত হাদীসে বর্ণিত مِنْ نُوْرِهٖ বা তাঁর "নিজ নূর" হতে শব্দটির ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) মিরকাত শরীফে লিখেছেন- 'আয়–মিন লামআতে নূরিহী'-অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা আপন যাতি নূরের জ্যোতি দিয়ে নবীজীর নূর পয়দা করেছেন।

মুজাদ্দেদ আলফেসানী (রহঃ) মকতুবাত শরীফের ৩য় খন্ড ১০০ নম্বর মকতুবে বলেছেন, "আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে স্বীয় খাস নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন"।
যারকানী (রহঃ) مِنْ نُوْرِهٖ ব্যাখ্যায় বলেছেন- "মিন নূরিন হুয়া যাতুহু" অর্থ্যাৎ "আল্লাহর যাত বা সত্বা হলো নূর–সেই যাতী নূরের জ্যোতি হতেই নূরে মোহাম্মাদী পয়দা" (যারকানী)। দেওবন্দী মৌঃ আশরাফ আলী থানবীও একই ব্যাখ্যা দিয়েছে তার নশরুত ত্বীব গ্রন্থের পঞ্চম পৃষ্ঠায়।

অন্য এক হাদীসে হযরত আলী ইবনে হোসাইন ইবনে আলী (রাঃ) তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে নবী করীম (দঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (দঃ) এরশাদ করেছেন– كُنْتُ نُوْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَبِّىْ قَبْلَ خَلْقِ اٰدَمَ بِاَرْبَعَةِ عَشَرَ اَلْفِ عَامٍ–

অর্থ–"আমি (নবী) আদম সৃষ্টির চৌদ্দ হাজার বৎসর পূর্বে আমার প্রতিপালকের নিকট নূর হিসেবে বিদ্যমান ছিলাম"। (ঐ জগতের একদিন পৃথিবীর এক হাজার

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

বৎসরের সমান। অংকের হিসাবে ৫১১,০০,০০০০০ (পাঁচ শত এগার কোটি) বৎসর হয়। বেদায়া ও নেহায়া এবং আন্ওয়ারে মোহাম্মাদীয়া গ্রন্থসূত্রে এই হাদীসখানা উদ্ধৃত করা হয়েছে।)

তাফসীরে রুহুল বয়ানে সুরা তাওবার আয়াত لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ

অর্থ– **"তোমাদের নিকট এক মহান রাসূলের আগমন হয়েছে"**

এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে নবী করিম (দঃ) কোথা হতে আসলেন- সে সম্পর্কে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَأَلَ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ

يَاجِبْرِيْلُ كَمْ عُمْرُكَ مِنَ السِّنِيْنَ– فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَسْتُ

اَعْلَمُ غَيْرَ اَنَّ فِى الْحِجَابِ الرَّابِعِ نَجْمًا يَّطْلَعُ فِىْ كُلِّ سَبْعِيْنَ اَلْفَ

سَنَةٍ مَرَّةً – رَأَيْتُهُ اِثْنَيْنِ وَسَبْعِيْنَ اَلْفَ مَرَّةٍ فَقَالَ يَاجِبْرِيْلُ وَعِزَّةِ

رَبِّىْ اَنَا ذٰلِكَ الْكَوْكَبُ–

অর্থ–"একদিন নবী করীম (দঃ) কথা প্রসঙ্গে হযরত জিব্রাইল (আঃ) কে তাঁর বয়স সম্পর্কে এভাবে জিজ্ঞাসা করলেন–হে জিব্রাইল! তোমার বয়স কত? তদুত্তরে হযরত জিব্রাইল (আঃ) বললেন– আমি শুধু এতটুকু জানি যে, নূরের চতুর্থ হিজাবে একটি উজ্জ্বল তারকা ৭০ হাজার বৎসর পর পর একবার উদিত হত। (অর্থাৎ সত্তর হাজার বৎসর উদিত অবস্থায় এবং সত্তর হাজার বৎসর অস্তমিত অবস্থায় ঐ তারকাটি বিরাজমান ছিল)। আমি ঐ তারকাটিকে ৭২ হাজার বার উদিত অবস্থায় দেখেছি। তখন নবী করীম (দঃ) বললেন- **"খোদার শপথ, আমিই ছিলাম ঐ তারকা"**। (তাফসীরে রুহুল বয়ান ৩য় খন্ড ৫৪৩ পৃঃ সূরা তওবা এবং সীরাতে হলবিয়া ১ম খন্ড ৩০ পৃষ্ঠা)

নবী করিম (দঃ)–এর এই অবস্থানের সময় ছিলো ঐ জগতের হিসাবে একহাজার আট কোটি বৎসর। পাঁচশত চার কোটি বৎসর ছিলেন উদীয়মান অবস্থায় এবং পাঁচশত চার কোটি বৎসর ছিলেন গায়েবী অবস্থায়। দুনিয়ার হিসাবে কত হাজার কোটি বৎসর হবে- তা আল্লাহ্-ই জানেন। হযরত জিব্রাইল (আঃ) শুধু দেখেছেন হুযুরের বাহ্যিক রূপ। বাতেনী দিকটি ছিল তাঁর অজানা।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

রাসুল করীম (দঃ)-এর সৃষ্টি রহস্য এত গভীর যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেহই প্রকৃত অবস্থা জানেনা। ওহাবী সম্প্রদায়ের নেতা দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা কাশেম নানুতবী সাহেব নবী করিম (দঃ)-এর বাহ্যিক আবরণের ভিতরে যে প্রকৃত নূরানী রূপটি লুক্কায়িত ও রহস্যাবৃত রয়েছে, তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন এভাবে–

رها جمال پہ تیرے حجاب بشریت–

ورنہ نہ جانا کسے نے تجھے بجز ستار–

অর্থ–"হে প্রিয় নবী (দঃ)! আপনার প্রকৃত রূপটি তো বশরিয়তের আবরনে ঢাকা পড়ে আছে। আপনাকে আপনার প্রভূ (ছাত্তার) ছাড়া অন্য কেহই চিন্তে পারেনি"।

এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, রাসূল করীম (দঃ)-এর রূপ বা অবস্থা তিনটি। যথা– ছুরতে বাশারী, ছুরতে মালাকী ও ছুরতে হককী। (তাফসীরে রূহুল বয়ান ও তাফসীরে কাদেরী)। সাধারণ মানুষ শুধু দেখতে পায় বশরী ছুরতটি। অন্য দুটি ছুরত বা অবস্থা খাস লোক ছাড়া দেখা ও অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

দ্বিতীয় অধ্যায়

হুযুরের দেহতত্ত্ব

প্রসঙ্গ ঃ নবী করিম (দঃ)-এর দেহ মোবারক নূর–নাকি মাটি ?

আমরা প্রথম সৃষ্টিতে প্রমাণ পেলাম– আল্লাহর যাত হতে, অর্থাৎ যাতি নূরের জ্যোতি হতে রাসুল (দঃ) পয়দা হয়েছেন। সাহাবী জাবের (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত মরফু হাদীস– অর্থাৎ স্বয়ং নবী করিম (দঃ)-এর জবানে বর্ণিত হাদীস দ্বারা হুযুর (দঃ) নূরের সৃষ্টি বলে প্রমাণিত হয়েছে। মাটি, পানি, আগুন, বায়ু– এই উপাদান চতুষ্টয় যখন পয়দাই হয়নি, তখন আমাদের প্রিয় নবী (দঃ) পয়দা হয়েছেন। সুতরাং তিনি যে মাটির সৃষ্টি নন এবং মাটি সৃষ্টির পূর্বেই পয়দা– একথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হলো।

কিন্তু আলমে নাছুত–অর্থাৎ পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশের সময় যে বশরী সুরত বা মানব শরীর ধারণ করেছেন, তা কিসের তৈরী– এ নিয়ে বিভিন্ন মতামত লক্ষ্য করা যায়। যেমন- তাবেয়ী হযরত কা'বে আহবার (রহঃ) এবং সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত কথিত দুটি হাদীস বা রেওয়ায়াতে দেখা যায় যে, নবী করিম (দঃ)-এর দেহ মোবারক মদিনা শরীফের রওযা মোবারকের খামিরা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

এ দুখানা রেওয়ায়াতকে পুঁজি করে একদল ওলামা বলেন– হুযুর (দঃ) মাটির তৈরী। বাতিলপন্থী কোন কোন আলেম আবার ঠাট্টা করে বলেন– তিনি তো সাদা মাটির তৈরী (নাউযুবিল্লাহ)। জনৈক মাওলানা মুহাম্মদ ফজুলল করিম রচিত 'তাওহীদ রিসালাত ও নূরে মোহাম্মদী সৃষ্টি রহস্য' নামক বইখানা দ্রষ্টব্য। উক্ত বইয়ে আল্লাহ্‌কেও নূর বলে অস্বীকার করা হয়েছে। (নাউযুবিল্লাহ)।

আবার সহি রেওয়ায়াতে দেখা যায় যে, হুযুর (দঃ) নূর হয়েই আদম (আঃ)- এর সাথে জগতে তাশরীফ এনেছেন এবং অল্লাহর কুদরতে বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঐ নূর এক দেহ হতে অন্য দেহে স্থানান্তরিত হতে হতে অবশেষে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)– এর পৃষ্ঠ হতে ঐ পবিত্র নূর সরাসরি হযরত আমেনা (রাঃ)– এর গর্ভে স্থান লাভ করেছেন এবং যথাসময়ে নূরের দেহ ধারণ করে মানব আকৃতি নিয়ে দুনিয়াতে তাশরীফ এনেছেন।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

পর্যালোচনা ঃ উক্ত দুই মতবাদের মধ্যে কোন্‌টি সঠিক– তা যাচাই বাছাই করলে দেখা যাবে যে, ইলমে হাদীসের নীতিমালার আলোকে দ্বিতীয় মতবাদটিই সঠিক ও নির্ভরযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়। তাই প্রথমে মাটির রেওয়ায়াত দুটি উসূলে হাদিসের নীতিমালার আলোকে পর্যালোচনা করা দরকার। **হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণিত কথিত হাদীসখানা নিম্নরূপ ঃ**

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ-قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَّوْلُوْدٍ اِلَّا وَفِيْ سُرَّتِهٖ مِنْ تُرْبَتِهِ الَّتِىْ خُلِقَ مِنْهَا حَتّٰى يُدْفَنَ فِيْهَا وَاَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ خُلِقْنَا مِنْ تُرْبَةٍ وَّاحِدَةٍ وَفِيْهَا نُدْفَنُ– (تَفْسِيْرِ مُظْهَرِىْ وَخَطِيْبِ بَغْدَادِىْ اَلْمُتَّفِقْ وَالْمُفْتَرِقْ)

অর্থ–"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলেন–"নবজাত প্রত্যেক শিশুর নাভিতে মাটির একটি অংশ রাখা হয়। সেখানেই সে সমাধিস্থ হয়"। তিনি আরো বলেন–"আমি, আবু বক্‌র ও ওমর একই মাটি হতে সৃজিত হয়েছি এবং সেখানেই সমাধিস্থ হবো"। (তাফসীরে মাযহারী ও খতীবে বাগদাদীর আল মুত্তাফিক ওয়াল মুফতারিক)।

উক্ত হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মোহাদ্দিসগণের মতামত

খতীবে বাগদাদী (রহঃ) এই রেওয়ায়াতটি তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করে বলেন- হাদীসটি গরীব। গরীব হাদীস বলা হয় প্রতি যুগে মাত্র একজন বর্ণনাকারীই উক্ত রেওয়ায়াতটি বর্ণনা করেছেন– দ্বিতীয় কোন বর্ণনাকারী নেই। গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে গরীব হাদিস দ্বারা কোন আইনী বিষয় প্রতিষ্ঠা করা যায়না। উসূলে হাদীস দ্রষ্টব্য।

হাদীস শাস্ত্র বিশারদ আল্লামা ইবনে জওযী বলেন– "এই হাদীসটি মওযু ও বানোয়াট"। এই দুটি মতামত স্বয়ং ওহাবী তাফসীর মাআরেফুল কোরআন-এর বাংলা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, সৌদী আরব ছাপা, পৃষ্ঠা ৮৫৬-এ উল্লেখ করা হয়েছে। রেওয়ায়াত হিসাবে প্রত্যেক লেখকের কিতাবেই এটি পাওয়া যায়। কিন্তু-এর নির্ভরযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করেন হাদীসের "জোরাহ ও তাদীল" বিষয়ক বিশেষজ্ঞগণ। ইবনে জওযীর মতামতের গুরুত্ব প্রত্যেক হাদীস বিশারদের নিকটই স্বীকৃত।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

সুতরাং একটি গরীব, জাল, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট রেওয়ায়াতের উপর নির্ভর করে রাসুলে পাকের (দঃ) দেহ মোবারককে মাটির দেহ বলা যে অসঙ্গত- তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। জাল হাদীস তৈরীতে রাফেযী ও বাতিল ফের্কাগুলি ঐ যুগে তৎপর ছিল। তারা সাহাবী ও তাবেয়ীগণের নাম ব্যবহার করে ভিত্তিহীন হাদীস তৈরী করতো।

কা'ব আহবারের রেওয়ায়াত বিশ্লেষণ ঃ

عَنْ كَعْبِ الْاَحْبَارِ قَالَ: لَمَّا اَرَادَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْ يَّخْلُقَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ جِبْرِيْلَ اَنْ يَّاْتِيَهُ بِالطِّيْنَةِ الَّتِىْ هِىَ قَلْبُ الْاَرْضِ وَبَهَاؤُهَا وَنُوْرُهَا قَالَ فَهَبَطَ جِبْرِيْلُ فِىْ مَلٰئِكَةِ الْفِرْدَوْسِ وَمَلٰئِكَةِ الرَّفِيْعِ الْاَعْلٰى فَقَبَضَ قَبْضَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَوْضِعِ قَبْرِهِ الشَّرِيْفِ وَهِىَ بَيْضَاءُ مُنِيْرَةٌ فَعُجِنَتْ بِمَاءِ التَّسْنِيْمِ فِىْ مَعِيْنِ اَنْهَارِ الْجَنَّةِ حَتّٰى صَارَتْ كَالدُّرَّةِ الْبَيْضَاءِ لَهَا شُعَاعٌ عَظِيْمٌ ثُمَّ طَافَتْ بِهَا الْمَلٰئِكَةُ حَوْلَ الْعَرْشِ وَالْكُرْسِىِّ وَفِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَالْبِحَارِ فَعَرَفَتِ الْمَلٰئِكَةُ وَجَمِيْعُ الْخَلْقِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا وَفَضْلَهُ قَبْلَ اَنْ تَعْرِفَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (اَلْمَوَاهِبُ اللَّدُنِّيَّةُ)

অর্থ-হযরত কা'ব আহবার (তাবেয়ী) বলেনঃ "যখন আল্লাহ পাক হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) কে (দেহকে) সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি জিবরাইল (আঃ) কে এমন একটি খামিরা নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ করলেন-যা ছিল পৃথিবীর "কলব, আলো ও নূর" (মাটি নয়)।

এই নির্দেশ পেয়ে জিবরাইল (আঃ) জান্নাতুল ফেরদাউস এবং সর্বোচ্চ আসমানের ফিরিস্তাদের নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করলেন। অতঃপর রাসুলে

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

পাকের রওযা শরীফের স্থান থেকে এক মুষ্ঠি খামিরা নিয়ে নিলেন। উহা ছিল সাদা আলোময় নূর। পরে উক্ত খামিরাকে বেহেস্তে প্রবাহিত নহর সমূহের মধ্যে তাছনীম নামক নহরের পানি দিয়ে গুলিয়ে সেটি এমন একটি শুভ্র মুক্তার আকার ধারণ করলো, যার মধ্যে ছিল বিরাট আলোশিখা। অতঃপর ফিরিস্তারা প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে উক্ত মুক্তা আকৃতির আলোময় খামিরা নিয়ে আরশ, কুরছি, আসমান-জমিন, পাহাড়-পর্বত ও সাগর-মহাসাগরের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করলেন। এভাবে ফিরিস্তাকুল ও অন্যান্য সকল মাখলুক **হযরত আদম (আঃ)-এর** পরিচয় পাওয়ার পূর্বেই আমাদের সর্দার ও মুনিব হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)-এর ফযিলত সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করলো"। (মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া)।

হাদীসখানার পর্যালোচনা

উপরোক্ত কা'ব আহবার (রাঃ)-এর রেওয়ায়াতখানার বিচার বিশ্লেষণ করলে নীচের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলো বের হয়ে আসে। যথা–

(১) কা'ব আহবার (রাঃ) পূর্বে একজন বড় ইহুদী পন্ডিত ছিলেন। রাসূলের (দঃ) যুগে তিনি মুসলমান হননি। সুতরাং সাহাবী নন। তিনি হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে মুসলমান হয়ে তাবেয়ীনদের মধ্যে গণ্য হন। সাহাবীর বর্ণিত হাদীস রাসুলের জবান থেকে শ্রুত হলে তাকে মারফু মোত্তাসিল বলা হয়। আর রাসুলের সূত্র উল্লেখ না থাকলে সাহাবীদের বর্ণিত হাদীসকে মাওকুফ বলা হয়। তাবেয়ীর বর্ণিত হাদীস -যার মধ্যে সাহাবী ও রাসূলের সূত্র উল্লেখ নেই, তাকে বলা হয় মাক্‌তু। উক্ত হাদীসখানা তাঁর নিজস্ব ভাষ্য। সাহাবী বা রাসুল বর্ণিত হাদীস নয়।

হাদীসের প্রত্যেক শিক্ষার্থীই এই সূত্র ভালভাবে জানেন যে, তাবেয়ীর মাকতু হাদীস যদি রাসূলের বর্ণিত মারফু হাদীসের সাথে গরমিল বা বিপরীত হয়, তাহলে রাসূলের বর্ণিত মারফু হাদীসই গ্রহণযোগ্য হবে। কা'ব আহবারের খামিরার হাদীসখানা তাঁর নিজস্ব ভাষ্য এবং তৃতীয় পর্যায়ের। পূর্বে হযরত জাবেরের বর্ণিত নূরের হাদীসখানা ১ম পর্যায়ের। গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে ১ম পর্যায়ের হাদীসই অগ্রগণ্য। সুতরাং উসুলের বিচারে কা'ব আহ্‌বারের হাদীসখানা মুনকাতে ও মোরসাল এবং সহী সনদেরও খেলাফ। সোজা কথায়– তাবেয়ীর বর্ণিত মাকতু হাদীস রাসূল বর্ণিত মারফু হাদীসের সমকক্ষ হতে পারে না।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

(২) আল্লামা যারকানী বলেন- কা'ব আহবার পূর্বে ইহুদী পন্ডিত ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি পূর্ববর্তী কোন গ্রন্থে ইসরাইলী বা ইহুদী বর্ণনার মাধ্যমে এই তথ্য পেয়ে থাকবেন। এই সম্ভাবনার কারণে ইসরাইলী বা ইহুদী বর্ণনা আমাদের শরীয়তে গ্রহণযোগ্য হবে না- যদি তা অন্য হাদীসের বিপরীত হয়। কা'ব আহ্বারের বর্ণিত হাদীসটি হযরত জাবেরের বর্ণিত হাদীসের পরিপন্থী। তাই ইহা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

(৩) তদুপরি "ত্বিনাত" (طِيْنَةٌ) শব্দটির অর্থ মাটি নয়-বরং খামিরা। এই খামিরার ব্যাখ্যা করা হয়েছে قَلْبُ الْاَرْضِ بَهَاءُ الْاَرْضِ نُوْرُ الْاَرْضِ দ্বারা অর্থাৎ উক্ত খামিরা ছিল পৃথিবীর কলব, আলো ও নূর- তথা নূরে মোহাম্মদী (যারকানী)। সুতরাং জিবরাইলের সংগৃহীত খামিরাটি মাটি ছিল না- বরং রওযার মাটিতে রক্ষিত নূরে মোহাম্মদীর খামিরা (যারকানী)। খামিরা সূরতের এই নূরে মোহাম্মদীকেই পরে বেহেস্তের তাছনীম ঝরনার পানি দিয়ে গুলিয়ে এটাকে আরো অনু-পরমাণুতে পরিণত করা হয়েছিল। যেমন পানি হতে বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয়। তাই বলে বিদ্যুৎকে পানি বলা যাবেনা। নবী করিম (দঃ)-এর দেহ মোবারক ছিল সৃষ্টি জগতের মধ্যে সবচেয়ে সুক্ষ্মতম। এ মর্মে একখানা হাদীস মিলাদে মোহাম্মদী ও হাকিকতে আহমদী নামক বাংলা গ্রন্থে উল্লেখ আছে। বইখানার লেখক ফুরফুরার খলিফা মেদিনীপুরের মরহুম মাওলানা বাশারাত আলী সাহেব। হাদীসখানা হচ্ছে-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ مَعَاشِرَ الْاَنْبِيَاءِ - اَجْسَادُنَا كَاَجْسَادِ الْمَلَائِكَةِ -

অর্থ-"**আমরা নবীগণের শরীর হলো ফিরিস্তাদের শরীরের মত নূরানী ও অতিসুক্ষ্ম**"। তাইতো নবী করিম (দঃ) সুক্ষ্মতম শরীর ধারণ পূর্বক আকাশ ও ফিরিস্তা জগত, এমন কি-আলমে আমর-তথা আরশ কুরছি ভেদ করে নিরাকারের দরবারে কাবা কাওছাইনে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন। মাটির দেহ ভারী এবং তা লক্ষ্যভেদী নয়। মাটির শরীর হলে ভস্ম হয়ে যেতো।

মোদ্দা কথায়- উপরের দুখানা হাদীস পর্যালোচনা করলে ইবনে মাসউদ (রাঃ)-বর্ণিত প্রথম হাদীসখানা জাল এবং কা'ব আহবারের ভাষ্যটি ইসরাইলী বা ইহুদী

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

সূত্রে প্রাপ্ত-যা সরাসরি হাদীসে মারফুর খেলাফ। তদুপরি- কা'ব আহবারের হাদীসখানায় বিভিন্ন তাবিল বা ব্যাখ্যা করার অবকাশ রয়েছে। ইহা মোহ্কাম বা সংবিধিবদ্ধ নয়। সুতরাং হযরত জাবের (রাঃ)-এর মারফু হাদীস ত্যাগ করে কা'বে আহবারের বর্ণিত মাকতু রেওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আবার নূর ও মাটির উভয় হাদীস গ্রহণ করে নবীজীর দেহ মোবারককে নূর ও মাটির সমন্বিত রূপও বলা যাবে না। যেমন- বলেছেন অনেক জ্ঞানপাপী মুফতী। হাদীসের বিশ্লেষণ না জানার কারণেই তারা এরূপ ফতোয়া দিয়েছেন। কা'ব আহবারা বর্ণিত খামিরাটি ছিল নূরে মোহাম্মদীর ঐ অংশ- যা দ্বারা দুনিয়া সৃষ্টি হয়েছে। ঐ অংশই রওযা মোবারকের স্থানে রক্ষিত ছিল-(যারকানী দেখুন)।

নূরের দেহ মোবারক ঃ ১০টি দলীল

এবার আমরা নূরের দেহের পক্ষের কিছু রেওয়ায়াত পেশ করে প্রমাণ করবো- নবী করিম (দঃ)-এর দেহ মোবারকও নূরের তৈরী ছিল। যথা-

(১) যারকানী শরীফ ৪র্থ খন্ড ২২০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে ঃ

لَمْ يَكُنْ لَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظِلٌّ فِيْ شَمْسٍ وَّلَا قَمَرٍ لِاَنَّهُ كَانَ نُوْرًا

অর্থ- "সূর্য চন্দ্রের আলোতে নবী করিম (দঃ)-এর দেহ মোবারকের ছায়া পড়তোনা। কেননা, তিনি ছিলেন আপাদমস্তক নূর"। (যারকানী)

(২) ইমাম কাযী আয়ায (রহঃ) শিফা শরীফের ১ম খন্ড ২৪২ পৃষ্ঠায় লিখেন ঃ

وَمَاذُكِرَ مِنْ اَنَّهُ كَانَ لَا ظِلَّ لِشَخْصِهٖ فِيْ شَمْسٍ وَّلَا قَمَرٍ لِاَنَّهُ كَانَ نُوْرًا

অর্থ- নূরের দলীল হিসাবে ছায়াহীন দেহের যে রেওয়ায়াতটি পেশ করা হয়, তা হচ্ছে-"দিনের সূর্যের আলো কিংবা রাত্রের চাঁদের আলো- কোনটিতেই হুযুরের (দঃ) দেহ মোবারকের ছায়া পড়তোনা। কারণ তিনি ছিলেন আপাদমস্তক নূর"। (শিফা শরীফ)

(৩) ওহাবীদের নেতা আশ্রাফ আলী থানবী সাহেব তার شُكْرُ النِّعْمَةِ بِذِكْرِ رَحْمَةِ الرَّحْمَةِ গ্রন্থের ৩৯ পৃষ্ঠায় স্বীকার করেছেন-

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

یہ بات مشہور ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا
سایہ نہیں تھا (اسلئے کہ) ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
سرتا پا نور ہی نور تھے-

অর্থ–**"একথা সর্বজন স্বীকৃত ও প্রসিদ্ধ যে, আমাদের হুযুর (দঃ)-এর দেহের ছায়া ছিল না। কেননা আমাদের হুযুর (দঃ) মাথা মোবারক হতে পা মোবারক পর্যন্ত শুধু নূর আর নূর ছিলেন"**। (শোক্‌রে নে'মত)

(৪) ইমাম ইবনে হাজর হায়তামী (রহঃ) আন-নে'মাতুল কোবরা গ্রন্থের ৪১ পৃষ্ঠায় হাদীস লিখেন ঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ اَخِيْطُ فِى السَّحْرِ ثَوْبًا
لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَفَا الْمِصْبَاحُ وَسُقِطَتِ
الْاِبْرَةُ مِنْ يَدِىْ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَاَضَاءَ الْبَيْتُ مِنْ نُوْرِ وَجْهِهٖ فَوَجَدْتُ الْاِبْرَةَ-

অর্থ–"হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত- তিনি বলেন, আমি রাত্রে বাতির আলোতে বসে নবী করিম (দঃ)-এর কাপড় মোবারক সেলাই করছিলাম। এমন সময় প্রদীপটি (কোন কারনে) নিভে গেল এবং আমি সুঁচটি হারিয়ে ফেললাম। এর পরপরই নবী করিম (দঃ) অন্ধকারে আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর চেহারা মোবারকের নূরের জ্যোতিতে আমার অন্ধকার ঘর আলোময় হয়ে গেল এবং আমি (ঐ আলোতেই) আমার হারানো সুঁইটি খুঁজে পেলাম"। সোবহানাল্লাহ। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন নূরের চেহারা–আর তারা বলে মাটির চেহারা। নাউযুবিল্লাহ্!

(৫) মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী সাহেব তাঁর عُمْدَةُ النُّقُول গ্রন্থে লিখেছেন–

وَالَّذِى يَدُلُّ عَلٰى اَنَّهٗ كَانَ نُوْرًا فِىْ بَطْنِ اُمِّهٖ اَيْضًا مَارَوِى زَكَرِيَّا

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

يَحْيَ ابْنُ عَائِذٍ اَنَّهُ بَقِى فِيْ بَطْنِ اُمِّه تِسْعَةَ اَشْهُرٍ فَلَا تَشْكُوْا وَجْعًا وَلَا مُغْضًا وَلَا رِيْحًا.

অর্থ-"নবী করিম (দঃ) মায়ের গর্ভেই যে নূর ছিলেন-এর দলীল হচ্ছে যাকারিয়ার বর্ণিত হাদীস"-নবী করিম (দঃ) নয় মাস মাতৃগর্ভে ছিলেন, এ সময়ে বিবি আমেনা (রাঃ) কোন ব্যথা বেদনা অনুভব করেননি বা বায়ু আক্রান্ত হননি এবং গর্ভবতী অন্যান্য মহিলাদের মত কোন আলামতও তাঁর ছিলনা। হুযুর (দঃ)-এর দেহ যে মাতৃগর্ভে নূর ছিল-ইহাই তার প্রমাণ।

(৬) মিশকাত শরীফে নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন-

وَاَنَا رُؤْيَا اُمِّيْ الَّتِيْ رَأَتْ اَنَّهُ خَرَجَ نُوْرٌ مِّنْ بَطْنِهَا وَاَضَائَتْ لَهَا قُصُوْرُ الشَّامِ-

অর্থ-"আমার জন্মের প্রাক্কালে তন্দ্রাবস্থায় আম্মাজান দেখেছিলেন-একটি নূর তাঁর গর্ভ হতে বের হয়ে সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ পর্যন্ত আলোকিত করেছে"। "আমি আমার মায়ের দেখা সেই নূর"। (মিশকাত শরীফ)

(৭) ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত শাহ আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহঃ) হাদায়েকে বখ্‌শিশ গ্রন্থের ২য় খন্ড ৭ পৃষ্ঠায় ছন্দে লিখেন ঃ

تو ہے سایہ نور کا ہر عضو ٹکڑا نور کا

سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا

অর্থ-**"হে প্রিয় রাসুল! আপনিতো আল্লাহর নূরের প্রতিচ্ছবি বা ছায়া। আপনার প্রতিটি অঙ্গই এক একটি নূরের টুকরা। নূরের যেমন ছায়া হয়না, তদ্রূপ ছায়ারও প্রতিচ্ছায়া হয়না"**। কাজেই আপনারও প্রতিচ্ছায়া নেই-কেননা আপনি নূর এবং আল্লাহর নূরের ছায়া।

(৮) মকতুবাতে ইমামে রাব্বানী ৩য় জিলদ মকতুব নং ১০০ তে হযরত মোজাদ্দেদ আলফেসানী (রহঃ) লিখেছেন- (অনুবাদ) **"হযরত রাসূল করিম**

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

(দঃ)-এর সৃষ্টি কোন মানুষের সৃষ্টির মত নয়। বরং নশ্বর জগতের কোন বস্তুই হযরত নবী করিম (দঃ)-এর সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। কারণ, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে স্বীয় নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন"।

(৯) আশ্রাফ আলী থানবী তার নশরুততীব গ্রন্থের ৫ম পৃষ্ঠায় হাদীস লিখেছেন- "হে জাবের! আল্লাহ্ তায়ালা আপন নূরের ফয়েয বা জ্যোতি হতে তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করেছেন।" (নশরুত ত্বীব ৫ পৃষ্ঠা)

(১০) তাফসীরে সাভী ছুরায়ে মায়েদার قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ -এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন- "আল্লাহপাক তাঁকে নূর বলে আখ্যায়িত করার কারণ হচ্ছে- তিনি সকল দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান নূর সমূহের মূল উৎস"।

এছাড়াও দেহ মোবারকের প্রতিটি অঙ্গ নূর হওয়ার বহু দলীল কিতাবে উল্লেখ আছে। সুতরাং সৃষ্টির আদিতেও তিনি নূর, মায়ের গর্ভেও নূর এবং দুনিয়াতেও দেহধারী নূর- এতে কোন সন্দেহ নেই। সে নূরকে বশরী সুরতে ও কভারে আবৃত করে রাখা হয়েছে মাত্র। যেমন, তারের কভারে বিদ্যুৎকে আবৃত করে রাখা হয়। এতসব প্রমাণ সত্ত্বেও যারা নবী করিম (দঃ) কে মাটির সৃষ্টি বলে- তাদেরকে বেদ্বীন ছাড়া আর কি-ই বলা যাবে?

নূরে মোহাম্মদীর (দঃ) স্থানান্তর ঃ আদম (আঃ) এর ললাটে

হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম-এর দেহ পৃথিবীর মাটি দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। বিবি হাওয়া (আঃ) হযরত আদম (আঃ)-এর বাম পাঁজরের হাঁড় দ্বারা পয়দা হয়েছেন। হযরত ঈসা (আঃ) শুধু রুহের দ্বারা পয়দা হয়েছেন। সাধারণ মানব সন্তান পিতা-মাতার মিলিত বীর্যের নির্যাস দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আমাদের প্রিয় নবী ও আল্লাহর প্রিয় হাবীব হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নূর হতে পয়দা হয়েছেন। কোরআন ও হাদীসের দ্বারাই এ সত্য প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং "সকল মানুষই মাটির সৃষ্টি"- এরূপ দাবী করা গোম্‌রাহী ছাড়া আর কিছুই নয়। "মিন্‌হা খালাক্‌নাকুম" আয়াতের ব্যাখ্যা দেখুন।

পৃথিবীর চল্লিশ হাজার বছরের সমান ঐ জগতের চল্লিশ দিনে হযরত আদম (আঃ)-এর খামিরা শুকানো হয়েছিল। তারপর হযরত আদমের (আঃ) দেহে রুহ্

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ফুঁকে দেয়া হয়েছে। বর্ণিত আছে- প্রথমে আদম (আঃ)-এর অন্ধকার দেহে রুহ প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি জানালে তাঁর ললাটে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)-এর নূর মোবারকের অংশবিশেষ স্থাপন করা হয় এবং এতে দেহের ভিতরে আলোর সৃষ্টি হয়। তখনই আদম (আঃ) মানবরূপ ধারণ করেন এবং হাঁচি দিয়ে আল্‌হামদুলিল্লাহ পাঠ করেন। আমাদের প্রিয় নবীও (দঃ) সৃষ্টি হয়েই প্রথমে পাঠ করেছিলেন আল্‌হামদুলিল্লাহ। তাই আল্লাহতায়ালা মানব জাতির প্রথম প্রতিনিধি হযরত আদম (আঃ) এবং বিশ্ব জগতের প্রতিনিধি হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)-এর প্রথম কালাম "আল্‌হামদুলিল্লাহ" দিয়ে কোরআন মজিদ শুরু করেছেন (তাফসীরে নঈমী)।

এভাবে ঐ জগতের একহাজার আট কোটি বৎসর পর মোহাম্মদী নূর হযরত আদম (আঃ)-এর দেহে স্থানান্তরিত হয়। প্রথমে ললাটে, তারপর ডান হাতের শাহাদত অঙ্গুলীতে এবং পরে পৃষ্ঠ দেশে সেই নূরে মোহাম্মদীকে (দঃ) স্থাপন করা হয়। এরপর জান্নাতে, তারপর দুনিয়াতে পাঠানো হয় সে নূরকে। ১০৬ মোকাম পাড়ি দিয়ে তিনি অবশেষে মা আমেনার উদর হতে মানব সূরতে ধরাধামে আত্মপ্রকাশ করেন। (১০৬ মাকামের বর্ণনা সুন্নীবার্তা মিলাদুন্নবী সংখ্যায় দেখুন)।

হযরত আদম (আঃ) কে বলা হয় প্রথম বশর অর্থাৎ প্রকাশ্য দেহধারী মানুষ। এর পূর্বে কোন বশর ছিলনা। আমাদের প্রিয় নবী (দঃ) তো হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির লক্ষ-কোটি বৎসর পূর্বেই পয়দা হয়েছিলেন। তখন তিনি বশরী সুরতে ছিলেন না এবং তাঁর নামও বশর ছিলনা। তাঁর বশরী সুরত প্রকাশ হয়েছে দুনিয়াতে এসে। এটা উপলব্ধি করা এবং হৃদয়ঙ্গম করা ঈমানদারের কাজ- (জাআল হক-বশর প্রসঙ্গ)। তাই তাঁকে "ইয়া বাশারু" বলে ডাকা হারাম (১৮ পারা)।

হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির পূর্বে নবীজী ছিলেন নূরে মোজাররাদ এবং নবী খেতাবে ভূষিত- (মাওয়াহেব ও মাদারেজ)। মৌলুদে বরজিঞ্জি নামক বিখ্যাত আরবী কিতাবের লেখক ইমাম ও মোজতাহেদ আল্লামা জাফর বরজিঞ্জি মাদানী

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

(রহঃ) লিখেন- "যখন আল্লাহ তায়ালা হাকিকতে মোহাম্মদী প্রকাশ করার ইচ্ছে করলেন– তখন হযরত আদম (আঃ) কে পয়দা করলেন এবং তাঁর ললাটে হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর পবিত্র নূর স্থাপন করলেন"। আহ্‌সানুল মাওয়ায়েয কিতাবে উল্লেখ আছে- একদিন আল্লাহর কাছে হযরত আদম (আঃ)- নূরে মোহাম্মদী (দঃ) দর্শনের জন্য প্রার্থনা করলেন। তখন আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আঃ)-এর ডান হাতের শাহাদত অঙ্গুলীর মাথায় নূরে মোহাম্মদী প্রদর্শন করালেন। মধ্যমা অঙ্গুলীতে হযরত আবুবকর, অনামিকায় হযরত ওমর, কনিষ্ঠায় হযরত ওসমান ও বৃদ্ধাঙ্গুলীতে হযরত আলী (রাঃ)– এই সাহাবী চতুষ্ঠয়ের দেদীপ্যমান নূরও প্রদর্শন করালেন। অতঃপর সেই নূর স্থাপন করলেন হযরত আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠদেশে- যাঁর দেদীপ্যমান ঝলক চমকাতো তাঁর ললাটে। আল্লামা ইউসুফ নাবহানীর আনওয়ারে মোহাম্মদী নামক জীবনী গ্রন্থের ১৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে।

لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ آدَمَ جَعَلَ ذٰلِكَ النُّوْرَ فِيْ ظَهْرِهٖ فَكَانَ يَلْمَعُ فِيْ جَبِيْنِهٖ

অর্থ– "যখন আল্লাহ তায়ালা হযরত আদমকে পয়দা করলেন, তখন ঐ নূরে মোহাম্মদী তাঁর পৃষ্ঠে স্থাপন করলেন। সে নূর তাঁর ললাটদেশে চমকাতো"।

বেদায়া ও নেহায়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) একদিন নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে আরয করলেন- **"ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ), হযরত আদম (আঃ) যখন জান্নাতে ছিলেন, তখন আপনি কোথায় ছিলেন"? হুযুর পুরনুর (দঃ) মুচকি হাসি দিয়ে বললেন- "আদমের ঔরসে। তারপর হযরত নূহ (আঃ) তাঁর ঔরসে আমাকে ধারণ করে নৌকায় আরোহন করেছিলেন। তারপর হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পৃষ্ঠদেশে। তারপর পবিত্র (ঈমানদার) পিতা মাতাগণের মাধ্যমে আমি পৃথিবীতে আগমন করি। আমার পূর্ব পুরুষগণের মধ্যে কেহই চরিত্রহীন ছিলেন না"** (বেদায়া-নেহায়া ২য় খন্ড ২৫ পৃষ্ঠা।) সুতরাং হযরত আদম (আঃ) ও তাঁর বংশধরগণ ছিলেন প্রিয় নবীর বাহন মাত্র।

এখানে একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। তা হচ্ছে- নিজের আদি বৃত্তান্ত বর্ণনা করা আল্লাহপ্রদত্ত ইলমে গায়েব ছাড়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, হুযুর

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

(দঃ)-এর আদি জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা করার প্রথা তিনি নিজেই চালু করেছেন। মিলাদ মাহফিলের মূল প্রতিপাদ্যই হলো নবী জীবনী আদি-অন্ত আলোচনা করে দাঁড়িয়ে সালাম পেশ করা। হযরত আদম (আঃ) থেকে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত সমস্ত নবীদের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব ছিল নবী করীম (দঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা। হযরত ইসা (আঃ) তো নবী করিম (দঃ)-এর বেলাদতের ৫৭০ বৎসর পূর্বেই মিলাদ মাহফিল করেছেন বনী ইসরাইলের লোকজন নিয়ে। কোরআন মজিদের ২৮ পারা সুরা সাফ-এর মধ্যে আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসা (আঃ)-এর এই সম্মিলিত মিলাদ মাহফিলের বর্ণনা দিয়েছেন। বেদায়া ও নেহায়া গ্রন্থের ২য় খন্ডে ২৬১ পৃষ্ঠায় ইবনে কাছির হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন **"হযরত ঈসা (আঃ) সে সময় কেয়াম অবস্থায় মিলাদ মাহফিল করেছিলেন"**।

সুতরাং মিলাদ মাহফিল নতুন কোন অনুষ্ঠান নয়। ফিরিস্তা এবং নবীগণের অনুকরণেই পরবর্তী যুগে বুযুর্গানেদ্বীন কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে বর্তমান মিলাদ মাহফিল প্রচলিত হয়েছে। মিলাদ কিয়াম ভিত্তিহীন নয়। যারা ভিত্তিহীন বলে–তাদের কথারই কোন ভিত্তি নেই। মিলাদ মাহফিলের বৈধতার উপর তিন শতের উপর কিতাব রচিত হয়েছে। তন্মধ্যে মওলুদে বরজিঞ্জি গ্রন্থখানী আরব আজমের সর্বত্র অধিক সমাদৃত হয়ে আসছে। পাক-ভারত উপমহাদেশে শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেছ দেহলভী (রঃ)-এর মাদারিজুন্নবুয়ত ও আল্লামা কাজী ফযলে আহমদ (লুধিয়ানা) লিখিত আনওয়ারে আফতাবে সাদাকাত গ্রন্থদ্বয় মিলাদ শরীফের বৈধতার প্রামাণিক দলীল। যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছা রইলো।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

তৃতীয় অধ্যায়

পৃথিবীতে আগমনের ধারা

প্রসঙ্গ ঃ নূরে মোহাম্মদী (দঃ)-এর পৃথিবীতে আগমন ও আত্মপ্রকাশ

নবীজীবনী গ্রন্থের নির্ভরযোগ্য কিতাব মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া, বেদায়া-নেহায়া, তারিখুল খোলাফা প্রভৃতি গ্রন্থে নূরে মোহাম্মদী (দঃ)-এর পৃথিবীতে আগমন এবং বংশ পরম্পরায় আবর্তন করার পর অবশেষে হযরত আবদুল্লাহর ঔরসে এবং বিবি আমেনার গর্ভে সে নূর স্থানান্তরিত হয়ে ৫৭০ খৃষ্টাব্দে রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার প্রত্যুষে সোব্‌হে সাদেকের সময় জগতকে উদ্ভাসিত করে আত্মপ্রকাশ করা- ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত বিশদ বর্ণনা রয়েছে। আমরা ধারাবাহিকতা রক্ষা করে সংক্ষেপে তা বর্ণনা করার চেষ্টা করবো।

কাজী আয়াযের শিফা নামক গ্রন্থে বর্ণিত একটি হাদীসে নবী করিম (দঃ) বলেছেন– إِنِّيْ اُهْبِطْتُ اِلَى الْاَرْضِ مَعَ آدَمَ ।

অর্থ– "আমি হযরত আদম (আঃ)-এর সাথেই পৃথিবীতে নেমে এসেছি"।

মাওয়াহেব গ্রন্থে উল্লেখ আছে- "হযরত আদম ও বিবি হাওয়া (আঃ)-এর জোড়ায় জোড়ায় সন্তান হতো। প্রতি প্রসবে এক ছেলে ও এক মেয়ে জন্ম গ্রহণ করতো। এভাবে বিশ জোড়া সন্তানের জন্ম হওয়ার কথা। কিন্তু যখন হযরত শিষ (আঃ) জন্ম গ্রহণ করেন, তখন তিনি একা জন্মগ্রহণ করেন। কেননা নবী করিম (দঃ)-এর নূর মোবারক হযরত আদম (আঃ) থেকে হযরত শিষ (আঃ)-এর মধ্যে স্থানান্তরিত হওয়ার কারণে শিষ (আঃ) একা জন্মগ্রহণ করেন। হযরত আদম (আঃ) নিজপুত্র শিষ (আঃ) কে অসিয়ত করেছিলেন যে, **"তিনি যেন ঐ নূরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন এবং বংশ পরম্পরায় যেন পবিত্র নর-নারীগণের মাধ্যমে ঐ নূর স্থানান্তরিত করা হয়"। হযরত আদম (আঃ) শিষ (আঃ) কে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন– "আমি বেহেস্তের প্রতিটি দরজায় এবং হুর ও ফিরিস্তাদের স্কন্ধদেশে আল্লাহর নামের সাথে মোহাম্মদ (দঃ)-এর নাম মোহরাঙ্কিত দেখেছি। সুতরাং তুমি যখনই আল্লাহর নাম উচ্চারণ করবে, তাঁর সাথে মোহাম্মদ (দঃ)-এর নামও উল্লেখ করবে"।**

এ ছিল আমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)-এর অসিয়ত নিজ সন্তানের প্রতি। কিন্তু আফসোস! আমরা আদমসন্তান হয়েও পিতার সে উপদেশ ভুলে গেছি। এখন শুধু আল্লাহর নাম নিচ্ছি ও বিভিন্ন জায়গায় লিখছি। কিন্তু মোহাম্মদ (দঃ)-এর নাম বাদ দিয়েছি।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

চতুর্থ অধ্যায়

হযরতের মূল পূর্বপুরুষগণ মোমেন

প্রসঙ্গ ঃ হযরত আদম (আঃ) থেকে হযরত আবদুল্লাহ ও বিবি আমেনা পর্যন্ত হুযুর (দঃ)-এর মূলধারার পূর্বপুরুষ ও নারীগণ সকলেই মোমেন ছিলেন

হুযুর আকরাম (দঃ)-এর উর্দ্ধতন মূলধারার পূর্বপুরুষ নর-নারী সকলেই মোমেন ছিলেন-এ বিষয়ে সংক্ষেপে কয়েকটি প্রমাণ পেশ করা হচ্ছে।

প্রথম প্রমাণ ঃ কোরআন মজিদের একটি আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন ঃ

وَتَقَلُّبَكَ فِى السَّاجِدِيْنَ -

অর্থ-**"হে রাসুল! সিজদাকারী মোমেনগণের মধ্যে আপনার আবর্তন আমি লক্ষ্য করেছি"**। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে- "আপনার পূর্ববর্তী সকল নর-নারী- যাদের মাধ্যমে আপনি আবর্তিত হয়ে এসেছেন- তাঁরা সকলেই ছিলেন সিজদাকারী মোমেন"। (তাফসীরে ইবনে আব্বাস)।

দ্বিতীয় প্রমাণ ঃ নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

لَمْ يَزَلِ اللّٰهُ يَنْقُلُنِىْ مِنَ الْاَصْلَابِ الطَّيِّبَةِ اِلَى الْاَرْحَامِ الطَّاهِرَةِ مُصَفًّى مُهَذَّبًا (عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ-مَوَاهِبُ)

অর্থ-**"আল্লাহ তায়ালা পর্যায়ক্রমে আমাকে পবিত্র ঔরস (মোমেন পুরুষ) হতে পবিত্র গর্ভের (মোমেন নারী) মাধ্যমে পাক-সাফ অবস্থায় স্থানান্তরিত করে পৃথিবীতে এনেছেন"**।

হাদীসখানা এত পরিষ্কার এবং এত শালীন ভাষায় উদ্ধৃত হয়েছে যে, যুগ যুগান্তরের শিরক ও কুফরীর অপবিত্রতা এবং চরিত্রগত ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে হুযুর (দঃ)-এর পূর্ব পুরুষগণের মুক্ত থাকার পরিষ্কার ইঙ্গিত তাতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কোরআনের পরিভাষায় পবিত্র নর-নারী বলতে ঈমানদারকেই বুঝান হয়েছে এবং খবীস বা অপবিত্র বলতে কাফের মোশরেকদেরকেই বুঝান হয়েছে। (সুরা মোমেনুন ১৮ পারা)।

তৃতীয় প্রমাণ ঃ ইবনে মোহাম্মদ কলবীর বর্ণনা সূত্রে তাঁর পিতা মোহাম্মদ কলবী

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

(রহঃ) বলেন-

كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم خمس مأة امهاته
فلم اجد فيهن سفا حا ولا شيأ من امر الجاهلية–

"আমি নবী করীম (দঃ)-এর বংশধারার পূর্ববর্তী পাঁচশত মায়ের তালিকা প্রস্তুত করেছি। তাঁদের মধ্যে আমি চরিত্রহীনতা এবং জাহেলিয়াতের কিছুই পাইনি" (বেদায়া নেহায়া)।

জাহেলিয়াত অর্থ কুফরী ও শেরেকী। চরিত্রহীনতা অর্থ যিনা। সুতরাং হুযুরের উর্দ্ধতন মহিলারা ছিলেন শিরিক, কুফর ও চরিত্রহীনতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত–অর্থাৎ মোমেনা ও সতী-সাধ্বী নারী। সুতরাং উপরোক্ত তিনটি অকাট্য দলীলের দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, নবী করিম (দঃ)-এর পিতা মাতা মোমেন ছিলেন এবং মিল্লাতে ইব্রাহীমীর উপর তাঁদের মৃত্যু হয়েছিল।

ইসলামের আবির্ভাবের পর দশম হিজরীতে যখন নবী করিম (দঃ) হজ্ব করতে মক্কা শরীফে আগমন করেন, তখন হাজুন নামক কবরস্থানে (বর্তমানে জান্নাতুল মায়াল্লা) আল্লাহ পাক তাঁর পিতা-মাতাকে এনে পুনর্জীবিত করে দ্বীনে মোহাম্মদী (দঃ) গ্রহণ করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। ইমাম সোহায়লী ও খতীবে বাগদাদী সূত্রে হযরত আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত এ সম্পর্কীত হাদীসখানা বেদায়া- নেহায়া গ্রন্থে ইবনে কাসির এবং মাওয়াহেব গ্রন্থে ইমাম কাস্‌তুলানী, ফতোয়া শামীতে আল্লামা ইবনে আবেদীন বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু ওহাবী আলেমগণ বলে থাকেন যে, এসব হাদীস নাকি জাল বা মওযু। একারণেই উপরে তিনটি নির্ভরযোগ্য সূত্র উল্লেখ করা হলো। ওহাবীদের মতে হযরত আবদুল্লাহ ও বিবি আমেনা (রাঃ) নাকি কুফরী হালাতে ইনতিকাল করেছেন। নাউযুবিল্লাহ্। তারা যুক্তি হিসেবে বলে থাকে যে, হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) রাসূল (দঃ)-এর জন্মের পূর্বে এবং বিবি আমেনা (রাঃ) হুযুরের ছয় বছর বয়সে ইনতিকাল করেছেন। তাই তাঁরা ইসলাম গ্রহণের যুগ পাননি। তাদের এই কুটযুক্তি উপরের তিনটি দলীলের দ্বারা অসার প্রমাণিত হয়েছে। তারা আর একটি যুক্তি দেখায় যে, বিবি আমেনার (রাঃ) কবর যিয়ারত করতে চাইলে আল্লাহ তায়ালা নবী করিম (দঃ) কে অনুমতি দেন। কিন্তু মাগফিরাতের দোয়ার অনুমতি চাইলে প্রত্যাখ্যান করেন। সুতরাং তাদের মতে তিনি মোমেন ছিলেন না।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

আল্লামা মানাভী এর জবাব এভাবে দিয়েছেন- **"কবর যিয়ারতের অনুমতি প্রদানই প্রমাণ করে যে, বিবি আমেনা (রাঃ) মোমেন ছিলেন। আর তিনি নেককার ছিলেন বলেই ঐ সময় মাগফিরাতের প্রার্থনা নামঞ্জুর করা হয়"**। তবে নবী করিম (দঃ) উম্মতের শিক্ষার জন্য সবসময় মাতাপিতার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতেন- যার বর্ণনা নিম্নে করা হবে।

বিঃ দ্রঃ এখানে সুন্নীদের পক্ষ হতেও একটি প্রশ্নের সৃষ্টি হতে পারে। তাহলো- মায়ের মাগফিরাত প্রার্থনা নামঞ্জুর করার কারণ হলো–তিনি ছিলেন নেককার। তাহলে পরবর্তী সময়ে দেখা যায়–নবী করিম (দঃ) সবসময় নিজের জন্য এবং পিতামাতার জন্য মাগফিরাত কামনা করতেন। তাহলে কি নবীজী এবং তাঁর পিতামাতা বদকার বা গুনাহ্গার ছিলেন? নাউযুবিল্লাহ!

এই বিষয়টির জবাব তাফসীরে রুহুল বয়ান ২৬ পারা সূরা আল-ফাতাহ্ ২য় আয়াতের ব্যাখ্যায় এভাবে বলা হয়েছে- "হে রাসুল, আপনার উছিলায় আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের গুনাহ্ আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন"- আল্লাহর এই বাণীর বিভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে। কেননা তিনি তো ছিলেন বেগুনাহ। সুতরাং আয়াতে "আপনার গুনাহ্"-এর অর্থ হবে "আপনার উম্মতের গুনাহ্"।

আর "মাগফিরাত"-এর তিনটি অর্থ রয়েছে। যথাঃ– (১) অপরাধ ক্ষমা করা (২) অপরাধ থেকে হেফাযত করা (৩) অপরাধের খেয়াল থেকে নিরাপদ রাখা। প্রথম অর্থ হবে সাধারণ গুনাহ্গারদের বেলায়। দ্বিতীয় অর্থ হবে নেককার ও আল্লাহর অলী এবং নবীজীর পিতামাতা সাহাবীগণের বেলায়। তৃতীয় অর্থ হবে নবীগণের বেলায়।

উক্ত ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা গেলো- নবী করিম (দঃ) নিজের জন্য যে মাগফিরাত কামনা করতেন- তার অর্থ হবে- "হে আল্লাহ, আমাকে সদাসর্বদা গুনাহ বা অপরাধের খেয়াল থেকে বাঁচিয়ে রাখিও। হুযুরের পিতা-মাতার জন্য মাগফিরাত কামনার অর্থ হবে- হে আল্লাহ, আমার পিতা মাতাকে গুনাহ্ থেকে হেফাযতে রাখিও। আর সাধারণ উম্মতের জন্য মাগফিরাত কামনার অর্থ–হে আল্লাহ্! তাদের গুনাহ ক্ষমা করে দিও"। (রুহুল বয়ান সূরা ফাত্হ আয়াত-২)।

এখন পরিস্কার হয়ে গেলো- হুযুরের পিতামাতা নেককার ছিলেন এবং নবীজী তাদের গুনাহ হতে হেফাযতের জন্যই দোয়া করতেন এবং গুনাহ ও যাবতীয় অপরাধের খেয়াল থেকে নিজেকে নিস্পাপ রাখার জন্য তিনি সর্বদা দোয়া করতেন" (তাফসীরে রুহুল বয়ান")। একই শব্দের একাধিক অর্থ ও তার

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

প্রয়োগ সম্পর্কে না জানার কারণে রহমানপুরী নামে জনৈক মুফতী সাহেব আমার "নূরনবী"র এই অংশটি নিয়ে অনেক লিফলেটিং করেছিল। কিন্তু কামিয়াব হতে পারেনি। আলহামদুলিল্লাহ! সর্বোপরি জওয়াব হলো- উম্মতকে শিখানোর জন্যই হুযুর (দঃ) ঐভাবে দোয়া করতেন।

নবী করিম (দঃ)-এর পিতা-মাতার পুনর্জীবন লাভ ও নূতন করে ইসলাম গ্রহণ ঃ নবী করিম (দঃ)-এর পিতা-মাতা হুযুরের নবুয়তের যুগ পাননি। কিন্তু তাঁরা ছিলেন মিল্লাতে ইব্রাহীমীর উপর প্রতিষ্ঠিত একেশ্বরবাদী হানিফ সম্প্রদায়ভুক্ত মোমেন। তাঁদের মত আরবে আরও কিছু লোক হানিফ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। যেমন- আবদুল মোত্তালেব, ওয়ারাকা ইবনে নওফেল, হযরত খাদিজা ও হযরত আবু বকর- প্রমুখ। যারা নবুয়তযুগের পূর্বে ইনতিকাল করেছেন, তাদেরকে আসহাবে ফাৎরাত বলা হয়। তাঁরা ছিলেন তৌহিদবাদী হানিফ। নবী করিম (দঃ)-এর পিতা হযরত আবদুল্লাহ এবং মাতা বিবি আমেনাও ছিলেন অনুরূপ তৌহিদপন্থী মোমেন।

যখন নবী করিম (দঃ) জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ১০ম হিজরীতে একলাখ চব্বিশ হাজার সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে মক্কা শরীফে হজ্ব করতে আসেন, তখন একদিন বিবি আয়েশা (রাঃ) কে সাথে নিয়ে জান্নাতুল মায়াল্লাতে বিবি খাদিজা (রাঃ)-এর মাযার যিয়ারত করতে গেলেন। (তখন নাম ছিল হাজুন)। হযরত আয়েশা (রাঃ) গাধার লাগাম ধরে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। নবী করিম (দঃ) যিয়ারতকালে প্রথমে খুব কাঁদলেন-- পরে হাসলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) কারণ জানতে চাইলে হুযুর আকরাম (দঃ) বললেন-- **"আমার পিতা-মাতাকে আল্লাহ্ পাক পুন:জীবিত করে আমার সামনে হাযির করেছেন। তাঁরা নতুন করে ইসলাম গ্রহণ করে পুনরায় মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি পিতা-মাতাকে দেখে খুশী হয়ে হেসেছি"**। (বেদায়া ও নেহায়া দ্রষ্টব্য) ইমাম সোহায়লীর বরাত দিয়ে ইবনে কাছির এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ফতোয়া শামীতে হাফেয নাসিরুদ্দীন বাগ্দাদীর বরাতে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে একখানা হাদীস উদ্ধৃত করে আল্লামা শামী লিখেছেন-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ: اِنَّ اللّٰهَ اَحْيٰى اَبَوَيْهِ اِكْرَامًا لَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَسْلَمَا ثُمَّ مَاتَا كَمَا كَانَا كَمَا اَحْيَ الْمَوْتٰى بِعِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ – (رَدُّ الْمُحْتَارِ مَطْلَبُ اِسْلَامِ اَبَوَيِ النَّبِيِّ)

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

অর্থ–**হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন- "আল্লাহ্‌তায়ালা নবী করিম (দঃ)-এর সম্মানে তাঁর পিতা-মাতাকে পুনর্জীবিত করেন। তাঁরা উভয়ে নূতন করে ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপরে তাঁরা পুনরায় পূর্বের ন্যায় মৃত্যুবরণ করেন। যেমন আল্লাহ্‌পাক হযরত ঈসা (আঃ)-এর মাধ্যমে মৃতকে জীবিত করতেন– তদ্রূপ নবীজীর খাতিরেও করেছেন"** । (শামী)

সুতরাং আমরা এখন থেকে মুক্তকণ্ঠে বলবো–হযরত আবদুল্লাহ্ ও হযরত আমেনা রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুমা। কেননা, তাঁরা সাহাবী হিসাবে গণ্য।

বিঃ দ্রঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাইল (আঃ) আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করেছিলেন- যেন তাঁদের বংশধরদের (আরব) মধ্যে প্রত্যেক যুগেই কিছু না কিছু মুসলিম বিদ্যমান থাকে। (সূরা বাক্বারাহ ১২৮ আয়াত)।

"রাব্বানা ওয়াজ আলনা মুসলিমাইনে লাকা ওয়া মিন জুররিয়্যাতিনা উম্মাতাম মুসলিমাতাল লাকা"। "হে প্রভু! -আমাদের উভয়কে তুমি তোমার অনুগত মুসলিম হিসেবে কবুল করো এবং আমাদের পরবর্তী বংশধরদের মধ্যেও (আরব দেশে) কিছু সংখ্যক লোককে অনুগত মুসলিম বানিয়ে রেখো"। এই দোয়ার বরকতেই পরবর্তী প্রত্যেক যুগেই আরবে কিছু সংখ্যক সত্যপন্থী হানিফ সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিলেন। নবী করিম (দঃ)-এর পিতা মাতা ও মূলপূর্ব পুরুষগণ এই হানিফ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাঁদেরকে কাফের মনে করা বেদ্বীনী কাজ। ইতিহাসেও হানিফ সম্প্রদায়ের উল্লেখ রয়েছে। বাতিলপন্থীরা ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে বে-খবর।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

পঞ্চম অধ্যায়

পিতা-মাতার বিবাহ

প্রসঙ্গ ঃ বিবি আমেনার গর্ভে নূরে মোহাম্মদীর সরাসরি গমন

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির চৌদ্দ হাজার বৎসর পূর্বে, (পৃথিবীর হিসাবে পাঁচশত এগার কোটি বৎসর পূর্বে) নবী করিম (দঃ) নূর হিসেবে আল্লাহর সান্নিধ্যে বিদ্যমান ছিলেন। তারপর হযরত আদম (আঃ)-এর সাথে সেই নূর পৃথিবীতে আগমন করেন এবং হযরত শিষ, হযরত ইদ্রিস, হযরত নূহ, হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাইল (আঃ) প্রমুখ পয়গাম্বর ও নেককারগণের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হতে হতে অবশেষে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর ললাটে স্থানলাভ করেন। হযরত ইসমাইল ও হযরত আবদুল্লাহ ছিলেন যবিহ্উল্লাহ্। নবী করিম (দঃ) স্বয়ং শুকরিয়া আদায় করে বলতেন- "আমি দুই যবিহ্উল্লাহর সন্তান"।

হযরত আবদুল্লাহর (রঃ) বয়স যখন চব্বিশ বৎসর, তখন পিতা তাঁকে বিবাহ করানোর উদ্দেশ্যে পাত্রীর অনুসন্ধানে বের হন। পথিমধ্যে ওয়ারাকা ইবনে নওফেল-এর বোন ফাতেমা-ওরফে উম্মে কিতাল হযরত আবদুল্লাহর ললাটে নূর লক্ষ্য করে স্বেচ্ছায় বিবাহের প্রস্তাব দেন। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ পিতার সম্মানে ঐ প্রস্তাব নাকচ করে দেন।

ঐ দিনই মদিনাবাসী এবং মক্কায় প্রবাসী ওহাব ইবনে আব্দে মুনাফ-এর ভাগ্যবতী কন্যা বিবি আমেনার সাথে হযরত আবদুল্লাহর বিবাহ্ সম্পন্ন হয়। উল্লেখ্য যে, মদিনার বনী আদি বংশের জাহ্রা গোত্রে আবদুল মোত্তালেবও বিবাহ্ করেছিলেন এবং সেই ঘরে আবু তালেব, হযরত হামজা, হযরত আব্বাছ ও নবী করিম (দঃ)-এর পিতা হযরত আবদুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন। সেই গোত্রেরই কন্যা ছিলেন বিবি আমেনা (রাঃ)। সুতরাং হযরত আবদুল্লাহ ও নবী করিম (দঃ)- উভয়েরই মাতুলালয় ছিল মদিনা।

রজব মাসের প্রারম্ভে এই শুভ বিবাহ্ সম্পন্ন হয় এবং ঐ দিনেই মিনার নিকটে শিয়াবে আবি তালেব নামক স্থানে স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাৎ হয়। ঐ দিনেই হযরত আবদুল্লাহর (রাঃ)-এর ললাট হতে নবুয়তের পবিত্র নূর মা আমেনার (রাঃ) গর্ভে সরাসরি স্থানান্তরিত হয় - (মাওয়াহেব ও বেদায়া নেহায়া) পহেলা রজব শুক্রবার

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

রাতে নবী করিম (দঃ)-এর পবিত্র নূর (মাটি নয়) মায়ের রেহেমে স্থানলাভ করেন বলে মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া ও আনওয়ারে মোহাম্মদীয়া গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। ইবনে ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বিবি আমেনার (রাঃ) সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঐ রাত্রেই বিবি আমেনাকে স্বপ্নযোগে জানিয়ে দেয়া হয়- **"তুমি এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ মানবকে ধারণ করেছ। সন্তান ভূমিষ্ট হলে তাঁর নাম রাখবে মোহাম্মদ (দঃ) বা বারংবার প্রশংসিত"**।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়াত করেন যে, "ঐ রাত্রেই কোরেশদের গৃহপালিত পশুগুলো নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল যে, আজ সমগ্র পৃথিবীর চেরাগ, আল্লাহর প্রিয় রাসুল (দঃ) মাতৃগর্ভে এসেছেন। আল্লাহর কুদরতে সমগ্র পৃথিবীর প্রাণীকুলের মধ্যে একটি নৈসর্গিক আনন্দের ঢেউ খেলে গিয়েছিল। কিন্তু খুশী হতে পারেনি সেদিন অভিশপ্ত শয়তান" (আনওয়ারে মোহাম্মদিয়া)।

আজও মানবরূপী কিছু শয়তান মিলাদুন্নবীর শুভদিনে খুশী হতে পারেনা। তারা এই আনন্দময় দিবসে মিলাদুন্নবীর বিরুদ্ধে নব আবিস্কৃত সিরাতুন্নবী নামে লোক দেখানো পৃথক মাহফিল করে, মিলাদুন্নবীর তাৎপর্য্যপূর্ণ ঘটনাবলীর সমালোচনা করে এবং মিলাদুন্নবী (দঃ) মাহফিল ও অনুষ্ঠানকে বেদাত বলে অপপ্রচার চালাতে থাকে। অথচ মিলাদুন্নবীর প্রথা সুন্নাতসম্মত একটি প্রথা। এই প্রথাকে উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে একটি ধর্মাশ্রয়ী রাজনৈতিক দল ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধীন ইসলামী ফাউন্ডেশনে পক্ষকালব্যাপী সিরাতুন্নবী নামে অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে। ইসলামী ফাউন্ডেশনের জেলা অফিসগুলোকেও সরকারী মিলাদুন্নবীর পরিবর্তে সিরাতুন্নবী অনুষ্ঠান পালন করতে বাধ্য করা হয়। এভাবে তারা বাংলাদেশে একটি ওহাবী নেটওয়ার্কের অধীন কাজ করে যাচ্ছে। তাদের এই গভীর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। আল্লাহর শোকর- আহলে সুন্নাত ও ইসলামী ফ্রন্টের আন্দোলনের ফলে ১৯৯৭ই হতে ঈদে মিলাদুন্নবী চালু হয়েছে–এখনও (২০০৭ইং) চালু আছে।

বিবি আমেনা (রাঃ)-এর সাথে পরিণয়ের পরদিন হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে পথে ফাতেমা-ওরফে উম্মে কিতালের সাথে সাক্ষাত হয়। এবার মহিলা হযরত আবদুল্লাহকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে সে জবাবে বলে–

قَدْ فَارَقَكَ النُّوْرُ الَّذِيْ كَانَ مَعَكَ بِالْاَمْسِ فَلَيْسَ لِيْ بِكَ الْيَوْمَ حَاجَةٌ
اِنَّمَا اَرَدْتُ اَنْ يَكُوْنَ النُّوْرُ فِيَّ فَاَبَى اللّٰهُ– (مَوَاهِبُ)

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

অর্থ–**"গতকাল তোমার ললাটে যে নূর ছিল–আজ সে নূর তোমার থেকে বিদায় নিয়েছে। সুতরাং আজ তোমাতে আমার আর কোন প্রয়োজন নেই। আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল–সেই নূর আমার মধ্যে স্থানান্তরিত হোক। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল না–তাই তিনি অন্যত্র স্থানান্তরিত করেছেন"**। (মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া)।

একজন সাধারণ মহিলা হয়েও উম্মে কিতাল নবী করিম (দঃ) কে নূর হিসেবে প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হলো। কিন্তু হতভাগা ওহাবীরা তাঁকে প্রত্যক্ষ করলো মাটির মানুষ হিসেবে। আবদুল কাহ্হার সিদ্দিকী নামে আওর মোহাম্মদীয়া বাতিল তরিকার জনৈক পীর তার অসিয়ত ও নছিহত নামায় নবী করিম (দঃ) কে সাধারণ মানুষ প্রমাণ করার জন্য লিখেছে–**"নবী পাক (দঃ) পিতার নাপাকী থেকে মায়ের নাপাকীর সাথে মিশে আবার নাপাক জায়গার ভিতর দিয়েই পৃথিবীতে এসেছেন"**। নাউযুবিল্লাহ!

এমন অশালীন ও অসভ্য উক্তি একজন কাফেরও কোনদিন করেনি। আল্লাহ এসব দুশমনে রাসুল–এর সংশ্রব থেকে মুসলমানকে রক্ষা করুন। উক্ত অর্বাচীন পীর নবী করিম (দঃ) কে মাটির মানুষ বলেও উল্লেখ করেছে। আমি ১৯৯৫ইং তে ইনকিলাবে বিজ্ঞাপন দিয়ে চ্যালেঞ্জ করেছিলাম–কিন্তু সে তাতে আসেনি।

পিতার ইন্তেকাল ঃ

হযরত বিবি আমেনা (রাঃ) নূরনবীকে গর্ভে ধারণ করার দুই মাস পরেই হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়া গমন করে সেখান হতে ফেরার পথে মদিনায় মাতুলালয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেখানেই ইনতিকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন! তাঁকে "দারুন নাবেগা" নামক মহল্লায় (বর্তমান মসজিদ নববীর ভিতরে) দাফন করা হয় (বেদায়া)। এভাবে শিশুনবী (দঃ) জন্মের পূর্বেই ইয়াতিমে পরিণত হন। গর্ভের প্রায় নয় মাস অতিক্রান্ত হবার পর রবিউল আউয়াল মাসের দ্বাদশ তারিখ সোমবার সোব্হে সাদেকের সময় দিবা-রাত্রির সন্ধিক্ষণে জগতকে আলোকিত করে ধরাধামে আগমন করেন আল্লাহর প্রিয় হাবীব শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

বেলাদতের তারিখ ও দিনের সমাধান

আজকাল এক শ্রেণীর লোক বলে বেড়ায়-নবী করিম (দঃ)-এর জন্ম তারিখ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নাকি মতভেদ রয়েছে। সুতরাং ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখটিই যে ঠিক–তা কি করে বলা যাবে?

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

এর জবাবে আমরা বলবো-যদি সহিহ্ বর্ণনায় এই তারিখটি সুপ্রমাণিত হয়, তাহলে কি তারা এই দিনটি মিলাদুন্নবী দিবস হিসেবে পালন করতে রাজী আছেন? না, কখনও আশা করা যায়না। আপনারা দিবস পালন করুন- আর নাই করুন, নবী করিম (দঃ) যে এই তারিখেই জন্ম গ্রহণ করেছেন- তার অকাট্য প্রমাণ নিন।

আপনাদের গুরু ইবনে কাছির তার বেদায়া ও নেহায়া গ্রন্থের ২য় খন্ডের ২৬০ পৃষ্ঠায় (পুরাতন) এবং হাফেয আবু বকর ইবনে আবি শায়বাহ (ওফাত ২৫৩ হিঃ) সহীহ সনদে হযরত জাবের ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিঃ) থেকে আফফান ও সায়ীদ ইবনে মীনা-এর সহী সনদ সূত্রে হুযুর আকরাম (দঃ)-এর জন্মতারিখ ও ইনতিকাল তারিখ সম্পর্কে নিম্নে উল্লেখিত হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন -

عَنْ عَفَّانٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مِيْنَا عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُمَا قَالَا وُلِدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفِيْلِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ الثَّانِيَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَبِيْعِ الْاَوَّلِ وَفِيْهِ بُعِثَ وَفِيْهِ هَاجَرَ وَفِيْهِ مَاتَ- وَهٰذَا هُوَ الْمَشْهُوْرُ (اَلْبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ ج ٢ صفحه ٢٦٠)

অর্থ-"**হযরত আফফান থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত সায়ীদ ইবনে মীনা থেকে, তিনি হযরত জাবের (রাঃ) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। জাবের ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন- "নবী করিম (দঃ) হস্তীবাহিনী বর্ষে সোমবার দিনে ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন, এই দিনেই তিনি নবুয়তের দায়িত্ব পেয়েছেন, এই দিনেই তিনি হিজরত করেছেন এবং এই দিনেই ওফাত পেয়েছেন**"।

"**ইবনে কাছির বলেন- ইহাই প্রসিদ্ধ ও মশহুর মত**" (বেদায়া ও নেহায়া ২য় খন্ড ২৬০ পৃষ্ঠা)। সুতরাং তাদের নেতার কথা মান্য করা তাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রসঙ্গ ঃ হুযুর (দঃ) ভূমিষ্ট হলেন কিভাবে?

আল্লাহর প্রিয় হাবীব (দঃ) পিতা-মাতার মাধ্যমে নূর হিসাবেই দুনিয়াতে আবির্ভূত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর আগমনের ধরন ছিল ভিন্ন রকম। সাধারণ মায়েরা গর্ভকালীন ব্যথা অনুভব করে থাকেন এবং প্রসবকালীন সময়ে প্রচন্ড কষ্ট ও ব্যাথা পেয়ে থাকেন। কিন্তু বিবি আমেনা (রাঃ) গর্ভকালীন ও প্রসবকালীন সময়ে কোন ওজন অথবা ব্যথা-বেদনা কিছুই অনুভব করেননি। অন্যান্য মায়েদের প্রসবকালীন সময়ে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। কিন্তু নবীজীর মায়ের এ অবস্থা ছিলনা- বরং বের হয়েছিল একটি নূর-যা মক্কাভূমি থেকে সিরিয়া পর্যন্ত আলোকিত করেছিল। সে নূর ছিল নবী করিম (দঃ)-এর নূর মোবারক।

অন্যান্য সন্তানগণ মায়ের নাভির মাধ্যমে গর্ভে খাদ্য গ্রহণ করে এবং ভূমিষ্ট হওয়ার পর নাভি কাটা হয়। কিন্তু নবী করিম (দঃ) মায়ের নাভির সাথে যুক্ত ছিলেন না-বরং নাভি কর্তিত অবস্থায় ভূমিষ্ট হয়েছেন। অন্যান্য সন্তানগণ রক্তমাখা অবস্থায় ভূমিষ্ট হয়-কিন্তু নবী করিম (দঃ) পবিত্র অবস্থায় ভূমিষ্ট হয়েছেন। অন্যান্য সন্তানগণ উলঙ্গ ও খতনাবিহীন অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে- কিন্তু নবী করিম (দঃ) বেহেস্তি লেবাছ পরিহিত, সুরমা মাখা চোখ ও খতনাকৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছেন। **নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন-** لَمْ يَرَى اَحَدٌ مِّنْ سَوْئَتِيْ

"জন্মকালে কেউ আমার ছতর দেখেনি।" বেদায়া নেহায়া ২য় খন্ড ২৬১ (পুরাতন) পৃষ্ঠা।

মাদারিজুন্নবুয়ত কিতাবে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। অন্যান্য সন্তানগণ ভূমিষ্ট হয়ে ওয়াঁ (হুয়া) করে চিৎকার দেয়। কিন্তু নবী করিম (দঃ) ভূমিষ্ট হয়েই প্রথমে সিজদা করেন এবং পরে শুদ্ধ আরবী ভাষায় "আশহাদু আল-লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্নী রাসুলুল্লাহ" কালেমা শরীফ পাঠ করেছিলেন (আল্লামা দিয়ার বিকরীর তারিখুল খামিছ ও সুয়ুতির খাছায়েছে কুবরা)। সুতরাং নবী করিম (দঃ)-এর ভূমিষ্ট হওয়ার প্রকৃতি ভিন্ন ধরনের হওয়াই স্বাভাবিক। আল্লাহ যাকে যেভাবে ইচ্ছা-সৃষ্টি করতে পারেন।

আল্লাহ তায়ালা আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়া (আঃ) কে পিতামাতা ছাড়াই সরাসরি পয়দা করেছেন- একজনকে মাটি দিয়ে, অন্যজনকে বাম পাঁজরের হাঁড় দিয়ে। হযরত ঈসা (আঃ) কে পিতার বীর্য ছাড়া শুধু রুহ দিয়ে বিবি মরিয়মের

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

গর্ভে পয়দা করেছেন। সাধারন মানুষ পয়দা হয় পিতা মাতার নুৎফা বা বীর্য থেকে- সরাসরি মাটি দিয়ে নয়। কিন্তু আমাদের প্রিয় নবী (দঃ) কে আল্লাহ পয়দা করেছেন নূরের দ্বারা। এই নূর কোন্ পদ্ধতিতে পিতার পৃষ্ঠ থেকে মায়ের গর্ভে গেলেন এবং কোন্ পদ্ধতিতে মায়ের গর্ভ হতে দুনিয়াতে পদার্পন করলেন- তা গবেষণার বিষয় নয়-বরং কুদরতের উপর বিশ্বাস স্থাপনই এর একমাত্র সমাধান।

মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরীর ফতোয়া ঃ

এবার আসুন, এব্যাপারে ওলামাগণের মতামত কী- তা আলোচনা করি। হাদীয়ে বাংগাল ও আসাম নামে পরিচিত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী সাহেবের সাহেবজাদা মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী সাহেব আরবীতে একখানা কিতাব রচনা করেছেন। উক্ত কিতাবের নাম

عُمْدَةُ النُّقُوْلِ فِيْ كَيْفِيَةِ وِلَادَةِ الرَّسُوْلِ -

অর্থ-**"নবী করিম (দঃ)-এর বেলাদত শরীফের ধরন সম্পর্কে উত্তম রেওয়ায়াত ও দলীল"**।

উক্ত কিতাবে তিনি কয়েকখানা বিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য কিতাবের এবারত উদ্ধৃত করে অবশেষে নিজের মতামত বা ফতোয়া প্রদান করেছেন। আমরা উক্ত কিতাবের ফতোয়ার এবারত হুবহু পাঠকের সামনে উপস্থাপন করছি। উক্ত কিতাবের ফটোকপি অধম লেখকের নিকট সংরক্ষিত আছে। কিতাবের এবারত নিম্নরূপ-

وَفِى "الْاَتْحَافِ بِحُبِّ الْاَشْرَافِ" لِلْعَلَّامَةِ عَبْدِ اللّٰهِ الشَّبْرَاوِيِّ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى- قَالَ فِيْ تَعْلِيْقِهِ عَلٰى قَوْلِهِ وَاِذْ كُنَّا نَحْكُمُ بِطَهَارَةِ فَضَلَاتِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَرِيْبَةِ- قَالَ الْعَلَّامَةُ التِّلِمْسَانِيُّ-كُلُّ مَوْلُوْدٍ غَيْرُ الْاَنْبِيَاءِ يُوْلَدُ مِنَ الْفَرْجِ- وَكُلُّ الْاَنْبِيَاءِ غَيْرُ نَبِيِّنَا مَوْلُوْدُوْنَ مِنْ فَوْقِ الْفَرْجِ وَتَحْتَ السُّرَّةِ- وَاَمَّا نَبِيُّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَوْلُوْدٌ مِّنَ الْخَاصِرَةِ الْيُسْرٰى تَحْتَ

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

الـضُّلُوْعِ ثُمَّ الْتَأَمَ لِوَقْتِهٖ خُصُوْصِيَّةٌ لَّهٗ وَلَمْ يَصِحَّ نَقْلُ أَنَّ نَبِيًّا مِّنَ

الْأَنْبِيَاءِ وُلِدَ مِنَ الْفَرْجِ وَلِهٰذَا أَفْتَى الْمَالِكِيَّةُ بِقَتْلِ مَنْ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُلِدَ مِنْ مَجْرَى الْبَوْلِ- اِنْتَهٰى-

অর্থ– "আল্লামা আবদুল্লাহ শাব্‌রাভী শাফেয়ী (রাঃ) স্বীয় 'আল আত্‌হাফ বিহুব্বিল আশরাফ'- গ্রন্থে নবী করিম (দঃ)-এর পবিত্র দেহ থেকে বহির্গত যাবতীয় বর্জ বস্তুর পবিত্রতা শীর্ষক আলোচনা প্রসঙ্গে আল্লামা তিলিমসানী কর্তৃক একটি ফতোয়ার উল্লেখ করে বলেন– উক্ত আল্লামা তিলিমসানী ফতোয়া দিয়েছেন যে, "আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) ব্যতিত প্রত্যেক মানব সন্তান মায়ের প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে ভূমিষ্ট হয়ে থাকে। অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামগণ (আঃ) ভূমিষ্ট হয়েছেন মায়ের নাভি ও প্রস্রাবের রাস্তার মধ্যবর্তীস্থান দিয়ে এবং আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (দঃ) ভূমিষ্ট হয়েছেন বিবি আমেনার (রাঃ) বাম উরুদেশ দিয়ে– যা বাম পাঁজরের হাঁড়ের নিচে অবস্থিত। তারপর উক্ত স্থান সাথে সাথেই জোড়া লেগে যায়। এই বিশেষ ব্যবস্থাধীনে ভূমিষ্ট হওয়া নবী করিম (দঃ)-এর একক বৈশিষ্ট্য। কোন নবী (আঃ) মায়ের প্রস্রাবের স্থান দিয়ে ভূমিষ্ট হওয়ার বর্ণনাটি সঠিক নয়। একারণেই মালেকী মাযহাবের মুফতী ও উলামাগণ ফতোয়া দিয়েছেন যে, "যে ব্যক্তি বলবে–নবী করিম (দঃ) মায়ের প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে ভূমিষ্ট হয়েছেন, তাকে কতল করা ওয়াজিব" (উদম্‌দাতুন নুকুল ফী কাইফিয়াতে বিলাদাতির রাসুল-মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী এবং মূল গ্রন্থ আল আত্‌হাফ-বি-হুব্বিল আশরাফ-আল্লামা শাবরাভী)।

(মূল কিতাব "আল-আতহাফ" লন্ডন থেকে ফটোকপি করে নিয়ে এসেছি)।

উক্ত ফতোয়া উল্লেখ করে মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী সাহেব নিজের মন্তব্য ও ফতোয়া এভাবে পেশ করেছেন -

اَقُوْلُ وَبِاللّٰهِ التَّوْفِيْقُ-اَنَّهٗ لَمَّا كَانَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُوْرًا-كَمَا

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

قَالَ اللّٰـهُ تَعَالٰى فِى الْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ قَدْ جَاءَ كُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ- وَكَمَا رُوِيَ عَنْ ذَكْوَانَ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظِلٌّ لَا فِيْ شَمْسٍ وَّلَا فِيْ قَمَرٍ رَوَاهُ الْحَاكِمُ التِّرْمِذِيُّ- وَكَمَا قَالَ اِبْنُ سَبْعٍ كَانَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُوْرًا فَكَانَ اِذَا مَشٰى فِى الشَّمْسِ اَوِ الْقَمَرِ لَا يُظْهَرُ لَهُ ظِلٌّ قَالَ غَيْرُهُ وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيْ دُعَائِهٖ- وَاجْعَلْنِيْ نُوْرًا كَذَا فِى الْمَوَاهِبِ- وَالَّذِيْ يَدُلُّ عَلٰى اَنَّهُ كَانَ نُوْرًا فِيْ بَطْنِ اُمِّهٖ اَيْضًا الخ.... فَاَيُّ اِسْتِبْعَادٍ خُرُوْجُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ مَخْرَجٍ مُّعْتَادٍ لِّلنَّاسِ- وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ لِخَلْقٍ يَخْلُقُ وَيَبْدَعُ كَيْفَ مَايَشَاءُ اِبْدَاعًا حَقِيْقِيًّا مِّنْ غَيْرِ مِثَالٍ سَبَقَ- الخ

অর্থ–"আল্লাহর নিকট তৌফিক চেয়ে আমি (আবদুল আউয়াল জৌনপুরী) বলছি– নবী করিম (দঃ) ছিলেন আপাদমস্তক দেহধারী নূর"। যেমন কোরআন মজিদে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন- "তোমাদের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ হতে একজন সম্মানীত নূর ও একটি স্পষ্ট কিতাব এসেছে"। পবিত্র হাদীসেও রাসুল (দঃ) কে নূর বলে প্রমাণ করা হয়েছে। যেমন- হযরত যাক্ওয়ান (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে–"চন্দ্র সূর্য্যের আলোতে নবী করিম (দঃ)-এর ছায়া পড়তনা" (কেননা নূরের ছায়া হয় না)। উক্ত হাদীস হাকিম তিরমিজী নিজ কিতাবে সংকলন করেছেন। হযরত ইবনে ছাব' বর্ণনা করেন- "নবী করিম (দঃ) ছিলেন আপাদমস্তক নূর। কেননা যখন তিনি দিবাকরের আলোতে কিংবা চন্দ্রিমা নিশিতে চলাফেরা করতেন, তখন তাঁর ছায়া দেখা যেতনা"। নূরের প্রমাণবহ আর একখানা হাদীস অন্য সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। নবী করিম (দঃ) উক্ত

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

হাদীসে এরশাদ করেছেন, "হে আল্লাহ! আমাকে নূর হিসাবে গণ্য কর" (মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া)। নবী করিম (দঃ) যে মায়ের গর্ভেও নূর হিসাবেই বিরাজমান ছিলেন– এ মর্মে আবু যাকারিয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া কর্তৃক বর্ণিত হাদীসও ইহার সত্যতা প্রমাণ করে। "সুতরাং নবী করিম (দঃ) অন্যান্য মানব সন্তানের জন্মের চিরাচরিত নিয়মের ব্যতিক্রমধর্মী স্থান দিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছেন–এটা কোন অসম্ভব ব্যাপারই নয়"। আল্লাহ যখন কিছু সৃষ্টির ইচ্ছা করেন, তখন পূর্ববর্তী চিরাচরিত যে কোন নিয়ম ও রীতি ভঙ্গ করে নূতন পন্থায় সম্পূর্ণ নূতন নিয়মে সৃষ্টি করতে পারেন। তোমরা কি জাননা- কিভাবে আদম হাওয়াকে চিরাচরিত নিয়মের ব্যতিক্রমধর্মী নিয়মে পয়দা করেছেন? হযরত ঈসা (আঃ) কেও চিরাচরিত নিয়মের বিপরীত ব্যবস্থায় শুধু মায়ের গর্ভে বীর্য ছাড়া পয়দা করেছেন"। সুতরাং নবী করিম (দঃ) কে ভিন্ন নিয়মে ভূমিষ্ট করানো অসম্ভব হবে কেন?। -আবদুল আউয়াল জৌনপুরী।

পাঠকবৃন্দ! জৌনপুরের মাওলানা আবদুল আউয়াল সাহেব নবী করিম (দঃ) কে আপাদমস্তক নূর বলেছেন এবং মায়ের নাভির বামপার্শ্ব দিয়ে ভূমিষ্ট হওয়ার প্রমাণ দিয়েছেন। অথচ জনৈক মাওলানা ফজলুল করিম তার "নূরে মোহাম্মদী" বইয়ে নবীকে মাটি বলে উল্লেখ করেছে। ঢাকার দারুস সালামের আবদুল কাহহার তার অসিয়ত ও নছিহত বইয়ে বলেছে, "রাসুলে পাক (দঃ) পিতার নাপাকী মায়ের নাপাকীর সাথে মিশে গর্ভে গিয়ে পুনরায় মায়ের নাপাক জায়গার ভিতর দিয়েই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন।" তার এই অশালীন ও অসভ্য উক্তি কুফরী পর্যায়ভূক্ত (তাহ্কীরুল আম্বিয়ায়ে কুফরুন-ফয়যুল বারী শরহে বোখারী)।

আমরা এখানে জৌনপুরের মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী ও দারুস সালামের আবদুল কাহহার গংদের মধ্যে তুলনা করলে দেখতে পাবো- একজনের কথা সুপ্রমাণিত ও নূরে ভরপুর এবং অন্যজনের কথা দূর্গন্ধময় ও কুফরীতে ভরপুর এবং প্রমাণবিহীন। মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী সাহেব ছিলেন বিজ্ঞ আলেম এবং কাহহার হচ্ছে নিরেট জাহেল ও মূর্খ। আওর মোহাম্মদীয়া তরীকার ছিলছিলার মধ্যে ফুরফুরার চেয়ে অনেক উপরে জৌনপুর। একথা যেকোন সমালোচকও স্বীকার করতে বাধ্য। মজার ব্যাপার হলো- মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী সাহেব যে পীরের ছিলছিলাভূক্ত অর্থ্যাৎ ছৈয়দ আহমদ বেরলবীর তরিকায়ে মোহাম্মদীয়া সে তরিকারই একজন অধঃস্তন

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

স্বঘোষিত পীর আবদুল কাহহার কিভাবে কোন প্রমাণ ছাড়াই নাপাক স্থান দিয়ে ভূমিষ্ট হওয়ার এমন কুৎসিত বিবরণ দিতে পারলো? তার মা সম্পর্কে যদি কেউ এমন অশ্লীল উক্তি করে, তাহলে তার মনে কি কষ্ট আসবেনা? নিশ্চয়ই আসবে। তাহলে নবী করিম (দঃ)-এর পিতামাতা সম্পর্কে আবদুল কাহহার যে মিথ্যা উক্তি করেছে, তাতে কি নবীজীর হৃদয়ে আঘাত লাগেনি? নিশ্চয়ই লেগেছে। কেননা, তিনি তো হায়াতুন্নবী! তিনি উম্মতের ভালমন্দ কর্ম ও চিন্তা-ধারণা সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। হাদীসে পাকে এসেছে-

إِنَّمَا أَعْمَالُكُمْ تُعْرَضُونَ عَلَيَّ -

অর্থ- **"তোমাদের ভালমন্দ সব আমলই আমার নজরে আনা হয়"**।

সুতরাং নবী করিম (দঃ)-এর ব্যতিক্রমধর্মী বেলাদাত শরীফ সম্পর্কে কোন ঈমানদারের মনে আর সন্দেহ থাকতে পারে না। কিতাবে প্রমাণ পাওয়া গেলে মানতে অসুবিধা কোথায়? আসলে এক ধরনের জ্ঞানপাপীরা সব সময়ই নবী করিম (দঃ) কে সাধারণ মানুষের সাথে তুলনা করতে আনন্দ বোধ করে- যেমন আনন্দবোধ করতো মক্কার কাফেরগণ। তারা বলতো **"মুহাম্মদ (দঃ) তো আমাদের মতই একজন মানুষ"**। এ ধরনের উক্তি কাফেররাই করে-কোন মোমেন করতে পারে না। নবীজী বিনয়মূলক বলতে পারেন-"আমি তোমাদের ন্যায় মানুষ"-কিন্তু উম্মত একথা বলতে পারবে না, "তিনি আমাদের মত মানুষ"।

সার কথা হলো-সাধারণ সন্তানগণের ভূমিষ্ট হওয়ার ধরন এক রকমের। অন্যান্য নবীগণের (আঃ) ভূমিষ্ট হওয়ার ধরন আরেক রকমের এবং আমাদের নবী করিম (দঃ)-এর ভূমিষ্ট হওয়ার ধরন অন্যান্য নবীগণ থেকেও ভিন্ন।

সাধারণ ডাক্তারগণ বর্তমানকালে নরমাল ও সিজারিয়ান-এই দুই পদ্ধতিতেই সন্তান ভূমিষ্ট করাতে সক্ষম। সৃষ্টিকর্তার কুদরত কি এতই অক্ষম হয়ে গেলো? (নাউযুবিল্লাহ!) নবীগণের জন্ম-মৃত্যু ও জীবন পদ্ধতি সাধারণ মানুষের চেয়ে উন্নত ধরনের হওয়াই যুক্তিযুক্ত। সব কিছুই যদি সাধারণ মানুষের ন্যায় হতো- তাহলে তাঁদেরকে মহামানব বলা হতোনা। আল্লামা শরফুদ্দীন বুছিরী-যিনি নবীজীর শানে কছিদায়ে বুরদা লিখে দূরারোগ্য প্যারালাইসিস থেকে

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

আশ্চর্যজনকভাবে মুক্তিলাভ করেছিলেন–তিনি তাঁর কাসিদায় বলেছেন–

مُحَمَّدٌ بَشَرٌ لَاكَالْبَشَرِ+يَاقُوتٌ حَجَرٌ لَاكَالْحَجَرِ–

"মোহাম্মদ (দঃ)" মানব জাতি হয়েও কোন মানুষের মতই নন। যেমন "ইয়াকুত" পাথর জাতীয় হয়েও কোন পাথরের মতই নয় (কাসিদা বুরদা শরীফ)।

নবীজীর হাকীকত পরিচয় দিয়ে জনৈক উর্দূ কবি বলেছেন ঃ

تو خدا نہیں جو خدا کہوں

توبتا تجھے کیا کہوں

نه فلك پہ تیرا جواب ہے

نه زمین پہ تیری مثال ہی

بلغ العلے

অর্থাৎ – **"হে প্রিয় রাসুল! আপনি তো খোদা নন যে– খোদা বলবো। আপনিই বলে দিন- আপনাকে কি নামে আখ্যায়িত করবো? কেননা, উর্দ্ধজগতেও আপনার মত কেউ নেই এবং জমিনেও আপনার মত কেউ নেই"**। অর্থাৎ আপনার উদাহরণ আপনিই। "নূরের ফেরেস্তা যে সীমায় গেলে জ্বলে পুড়ে যায়– সেখানে আপনি নিরাপদে বিচরণ করেছেন"। বুঝা গেল– তিনি মাটির দেহধারী ছিলেন না- বরং নূরানী মহামানব।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

সপ্তম অধ্যায়

প্রসঙ্গ ঃ ঈদে মিলাদুন্নবী ও জন্মবার্ষিকী পালন

১। হযরত আব্বাছ (রাঃ) নূর নবী (দঃ)-এর জন্ম প্রসঙ্গে ৯ম হিজরীতে একটি কবিতায় বলেছেন-

وَاَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ اَشْرَقَتِ الْاَرْضُ+وَضَائَتْ بِنُوْرِكَ الْاُفُقُ-

অর্থ-"হে প্রিয় রাসুল, আপনি যখন ভূমিষ্ট হন, তখন পৃথিবী উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল এবং আপনার নূরের ছটায় চতুর্দিক আলোময় হয়ে গিয়েছিল"।
(নশরুত ত্বীব, মাওয়াহিব, বেদায়া ও নেহায়া)

২। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হাসসান বিন সাবিত (রাঃ) মিলাদুন্নবী (দঃ) বর্ণনা প্রসঙ্গে একখানি কবিতাগ্রন্থ লিখেছিলেন এবং হুযুর (দঃ) কে শুনিয়েছিলেন- পরবর্তীতে যার নামকরণ করা হয়েছিল "দিওয়ানে হাসসান বিন সাবিত"। তিনি লিখেন-

اَنَّكَ وُلِدْتَ مُبَرَّاً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ+كَاَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ-

وَضَمَّ الْاِلٰهُ اِسْمَهُ اِلَى اِسْمِهِ+اِذَا قَالَ فِى الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ اَشْهَدُ-

وَشَقَّ لَهُ مِنْ اِسْمِهِ لِيُجِلَّهُ+فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُوْدٌ وَّهٰذَا مُحَمَّدٌ-

অর্থ-"হে প্রিয় রাসুল! আপনি সর্ব প্রকার ত্রুটিমুক্ত হয়েই মাসুম নবী হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছেন। মনে হয়- যেন আপনার ইচ্ছা অনুযায়ীই আপনার বর্তমান সুরত পয়দা করা হয়েছে"। "মহান আল্লাহ্ আযানের মধ্যে আপন নামের সাথে নবীর নাম সংযোজন করেছেন-যখন মোয়াযযিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আযানে উচ্চারন করেন "আশহাদু আল লাইলাহা ইল্লাল্লাহ; আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ (দঃ)"। "আর আল্লাহ আপন নামের অংশ দিয়ে তাঁর প্রিয় হাবীবের নাম রেখেছেন। আরশের অধিপতি হলেন 'মাহমুদ' এবং ইনি হলেন 'মোহাম্মদ' (দঃ)"। মাহমুদ থেকে মোহাম্মদ নামের সৃষ্টি হয়েছে এবং আহাদ থেকে আহমদ নামের সৃষ্টি হয়েছে (আল হাদীস)। মাহমুদ থেকে মোহাম্মদ গঠনে একটি ওয়াও (وَاوْ) অক্ষর বাদ দিতে হয় এবং আহাদ থেকে আহমদ গঠনে

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

একটি মিম (م) অক্ষর যোগ করতে হয়। যোগ বিয়োগের এই প্রক্রিয়াটি সুফী সাধকগণের নিকট অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থাৎ মাহ্মুদ ও মোহাম্মদ এবং আহাদ ও আহমদ অতি ঘনিষ্ট। আল্লাহ্ নামটি চার অক্ষর বিশিষ্ট এবং মোহাম্মদ ও আহমদ নামটিও চার অক্ষর বিশিষ্ট। প্রধান ফিরিস্তা, প্রধান আসমানী কিতাব, প্রধান সাহাবী, প্রধান মযহাব ও প্রধান তরিকার সংখ্যা চার চার এবং সৃষ্টির প্রধান উপাদানও চারটি- যথা-আব, আতিশ, খাক, বাদ (আগুন, পানি, মাটি, বায়ু)। কালেমা তাইয়েবায় তাওহীদের অংশ বার অক্ষর বিশিষ্ট এবং রিসালাতের অংশও বার অক্ষর বিশিষ্ট। নবী করিম (দঃ)-এর নামকরণ এবং কলেমাতে আল্লাহ্র সাথে মোহাম্মদ নাম সংযোজন- সবই আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। এতে মানুষের কোন হাত নেই। সুতরাং এই পরিকল্পনার তাৎপর্য্য পূর্ণভাবে উপলব্ধি করাও মানুষের সাধ্যাতীত ব্যাপার।

এখানে উপরোল্লেখিত হযরত আব্বাস ও হযরত হাসসান সাহাবীদ্বয়ের (রাঃ) কাব্য রচনার ঘটনাটি ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন ও স্মরণিকা প্রকাশের একটি উত্তম দলীল ও প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আল্লাহ্ তায়ালা কোরআন মজিদে ছুরা ইউনুছ ৫৮ আয়াতে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে প্রতি বৎসর ঈদ ও পবিত্র আনন্দানুষ্ঠান পালনের কথা উল্লেখ করেছেন। সুরা বাকারাতে মুছা (আঃ) ও বনী ইসরাইলগণের নীলনদ পার হওয়া এবং প্রতি বৎসর এ উপলক্ষে আশুরার রোযা ও ঈদ পালন করা এবং সুরা মায়েদায় ঈছা (আঃ) ও বনী ইস্রাইলের হাওয়ারীগণের জন্য আকাশ থেকে আল্লাহ কর্তৃক যিয়াফত হিসাবে মায়েদা অবতীর্ণ হওয়া উপলক্ষে প্রতি বৎসর ঐ দিনকে ঈদের দিন হিসেবে পালন করার কথা কোরআনে উল্লেখ আছে।

বনী ইস্রাইলদের উপর আল্লাহর রহমত নাযিলের স্মরণে যদি প্রতি বৎসর ঐ দিনে ঈদ পালন করা যায়, তাহলে আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম নেয়ামত- রাহমাতুল্লীল আলামীন (দঃ)-এর আগমন দিবস উপলক্ষে প্রতি বৎসর ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) পালন করা যাবেনা কেন? হুযুর করিম (দঃ) কে এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করেছিলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! প্রতি সোমবার আপনার রোযা রাখার কারণ কি? হুযুর (দঃ) বললেন– "এই দিনে আমি জন্ম গ্রহণ করেছি এবং এই দিনেই

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

(সোমবার) ২৭ শে রমযান আমার উপর কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে"। উক্ত প্রমানাদিই ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) পালনের স্বপক্ষে জোরালো দলীল।

উল্লেখ্য, ঈদ মোট ৯টি যথাঃ- (১) ঈদে রামাদ্বান (২) ঈদে কোরবান (৩) ঈদে আরাফা (৪) ঈদে জুমুয়া (৫) ঈদে শবে বারাআত (৬) ঈদে শবে ক্বদর (৭) ঈদে আশুরা (৮) ঈদে নুযুলে মায়েদা (৯) ঈদে মিলাদুন্নবী। সবগুলোই কোরআনে, হাদীসে ও বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

ইন্তেকাল দিবস পালন করা হয় না কেন?

আর একটি বিষয় প্রশ্ন সাপেক্ষ! তা হচ্ছে- নবী করিম (দঃ)-এর শুধু জন্ম তারিখ পালন করা হয় কেন? ইনতিকাল তো একই তারিখে এবং একই দিনে হয়েছিল। সুতরাং একসাথে জন্ম ও মৃত্যু দিবস পালন করাইতো যুক্তিযুক্ত। যেমন অন্যান্য মহামানব অলী-গাউসদের বেলায় মৃত্যু দিবসে ওরস পালন করা হয়ে থাকে?

প্রথম উত্তর হলো- আল্লাহ পাক কোরআন মজিদে নির্দেশ করেছেন নিয়ামত পেয়ে খুশী ও আনন্দ করার জন্য। নিয়ামত পাওয়া জন্ম উপলক্ষেই হয়। যেমন কোরআনে আছে ঃ قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا–

অর্থ–**"হে নবী! আপনি একথা ঘোষণা করে দিন-মুসলমানগণ খোদার ফযল ও রহমত পাওয়ার কারণে যেন নির্মল খুশী ও আনন্দ উৎসব করে। ইহা তাদের যাবতীয় সঞ্চিত সম্পদ থেকে উত্তম"**। তাফসীরে রুহুল মাআনী উক্ত আয়াতে 'ফযল ও রহমত' অর্থে মোহাম্মদ (দঃ)-এর নাম উল্লেখ করেছেন - ইহা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর ব্যাখ্যা। রাসূল (দঃ)-এর এক হাজার চারশত নামের মধ্যে ফযল, রহমত, বরকত, নেয়ামত, নূর–প্রভৃতি অন্যতম গুণবাচক নাম- যা গ্রন্থের শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং নেয়ামত প্রাপ্তি উপলক্ষে শুকরিয়া আদায়ের জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান করাই কোরআনের নির্দেশ। সূরা ইউনুসের উক্ত ৫৮নং আয়াতে নবীজীর জন্মোৎসব পালন করার স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। সুতরাং ঈদে মিলাদুন্নবী ও জশনে জুলুছ কোরআনের আলোকেই প্রমাণিত।

(দেখুন তাফসীরে রূহুল মাআনী সূরা ইউনুছ ৫৮ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা) মোদ্দাকথা– আল্লাহপাক হুযুর (দঃ)-এর আবির্ভাব উপলক্ষে আনন্দোৎসব করার

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

নির্দেশ করেছেন। কিন্তু ইনতিকাল উপলক্ষে শোক পালন করতে বলেননি। তাই আমরা আল্লাহর নির্দেশ মানি। ওরা কার নির্দেশ মানে?

দ্বিতীয় উত্তর- নবী করিম (দঃ) নিজে সোমবারের রোযা রাখার কারণ হিসেবে তাঁর পবিত্র বেলাদাত ও প্রথম অহী নাযেলের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ বা ইন্তিকাল উপলক্ষে শোক পালন করার কথা উল্লেখ করেননি। যদি করতেন, তাহলে আমরা তা পালন করতাম। সুতরাং একই দিনে ও একই তারিখে নবী করিম (দঃ)-এর জন্ম এবং ইন্তিকাল হলেও মৃত্যুদিবস পালন করা যাবেনা। এটাই কোরআন-হাদীসের শিক্ষা।

তৃতীয় উত্তর ঃ নবীজী তো স্বশরীরে হায়াতুন্নবী। হায়াতুন্নবীর আবার মৃত্যুদিবস হয় কি করে? কেউ কি জীবিত পিতার মৃত্যু দিবস পালন করে? আসলে ওরা কোনটাই পালন করার পক্ষে নয়। শুধু ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) পালনকারীদেরকে ঘায়েল করার লক্ষ্যেই এইসব শয়তানী কুটতর্কের অবতারণা করে থাকে। ওরা শয়তানের প্রতিনিধি। আমরা কোরআন নাযিলের আনন্দ উৎসব করি শবে ক্বদরে এবং নবীজীর আগমনের আনন্দ উৎসব পালন করি ১২ই রবিউল আউয়ালে। ওরা কোনটাই পালন করার পক্ষপাতি নয়। আমরা ছুরা ইউনুছের ৮৫নং আয়াতের নির্দেশ পালন করি।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

অষ্টম অধ্যায়

জশ্নে জুলুছ

প্রসঙ্গ ঃ ঈদে মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপন উপলক্ষে জুলুছ বা মিছিল বের করাঃ

নবী করিম (দঃ) যখন ভূমিষ্ট হন-তখন এমন কতিপয় আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছিল–যা সচরাচর দেখা যায়না। প্রথম ঘটনাটি স্বয়ং বিবি আমেনা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন এভাবে-

"যখন আমার প্রসব ব্যথা শুরু হয়, তখন ঘরে আমি প্রায় একা ছিলাম এবং আমার শ্বশুর আবদুল মোত্তালিব ছিলেন কা'বাঘরে তাওয়াফরত। আমি দেখতে পেলাম, একটি সাদা পাখীর ডানা আমার কলিজায় কি যেন মালিশ করে দিচ্ছে। এতে আমার ভয়ভীতি ও ব্যথা বেদনা দূরিভূত হয়ে গেল। এরপর দেখতে পেলাম এক গ্লাস শ্বেতশুভ্র শরবত আমার সামনে। আমি ঐ শরবতটুকু পান করে ফেললাম। অতঃপর একটি উর্দ্ধগামী নূর আমাকে আচ্ছাদিত করে ফেললো। এ অবস্থায় দেখতে পেলাম- আব্‌দে মোনাফ (কোরাইশ) বংশের মহিলাদের চেহারা বিশিষ্ট এবং খেজুর বৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘাঙ্গিনী অনেক মহিলা আমাকে বেষ্টন করে বসে আছেন। আমি সাহায্যের জন্য 'ওয়া গাওয়াছা' বলে তাদের উদ্দেশ্যে বললাম– আপনারা কোথা হতে আমার বিষয় অবগত হলেন? উত্তরে তাঁদের একজন বললেন-আমি ফেরাউনের স্ত্রী বিবি আছিয়া। আরেকজন বললেন– আমি ইমরান তনয়া বিবি মরিয়ম এবং আমাদের সঙ্গিনীগণ হচ্ছেন বেহেস্তী হুর। আমি আরও দেখতে পেলাম– অনেক পুরুষবেশী লোক শূন্যে দন্ডায়মান রয়েছেন। তাদের প্রত্যেকের হাতে রয়েছে রূপার পাত্র। আরও দেখতে পেলাম- একদল পাখী আমার ঘরের কোঠা ঢেকে ফেলেছে। আল্লাহ তায়ালা আমার চোখের সামনের সকল পর্দা অপসারণ করে দিলেন এবং আমি পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম সব দেখতে পেলাম। আরও দেখতে পেলাম– তিনটি পতাকা। একটি পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে স্থাপিত, অন্যটি পশ্চিম প্রান্তে এবং তৃতীয়টি স্থাপিত কাবাঘরের ছাদে। এমতাবস্থায় প্রসব বেদনার চূড়ান্ত পর্যায়ে আমার প্রিয় সন্তান হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ভূমিষ্ট হলেন"- (হযরত ইবনে আব্বাস সূত্রে মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া)।

খাছায়েছে কোব্‌রা ও তারিখুল খামীছ গ্রন্থে যথাক্রমে আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতি (রহঃ) এবং আল্লামা আবুবকর দিয়ারবিকরী (রহঃ) বিবি আমেনা (রাঃ)-এর

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

একটি বর্ণনা এভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ

বিবি আমেনা বলেন–"যখন আমার প্রিয় পুত্র ভূমিষ্ট হলেন, তখন আমি দেখতে পেলাম- তিনি সিজদায় পড়ে আছেন। তারপর মাথা উর্দ্ধগামী করে শাহাদাৎ অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করে বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় পাঠ করছেন "আশহাদু আললা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্নি রাসুলুল্লাহ" (যিকরে জামীল সূত্রে)।

উপরোক্ত বর্ণনায় কয়েকটি বিষয় প্রমানিত হলোঃ

(১) নবী করিম (দঃ)-এর পবিত্র বেলাদত উপলক্ষে বেহেস্ত ও আকাশ হতে পবিত্র নারী ও হুর ফিরিস্তাগণ জুলুছ করে বিবি আমেনার (রাঃ) কুটিরে আগমন করেছিলেন এবং নবীজীর সম্মানার্থে দন্ডায়মান হয়ে কিয়াম করেছিলেন। আর ফিরিস্তাদের হয়ে এই জুলুছ ছিল আকাশ ছোঁয়া জুলুছ। তাই আমরাও নবীজীর সম্মানে কিয়াম করি ও জুলুছ করি।

(২) নবী করিম (দঃ)-এর নূরের আলোতে বিবি আমেনা (রাঃ) পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত অবলোকন করেছিলেন। যাদের অন্তরে নবীজীর নূর বিদ্যমান, সেসব অলীগণেরও দিব্যদৃষ্টি খুলে যায়। তাঁরা লাওহে মাহফুযও দেখতে পান (মসনবী শরীফ)।

(৩) নবী করিম (দঃ)-এর জন্ম উপলক্ষে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণস্থান আলো ও পতাকা দ্বারা সজ্জিত করা উত্তম। ইহা আল্লাহ ও ফিরিস্তাদের সুন্নাত।

(৪) কোরআন নাযিলের ৪০ বৎসর পূর্বেই নবী করিম (দঃ) কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ দুটি আদর্শ- 'কলেমা ও নামায' বাস্তবায়ন করেছিলেন। মূলতঃ থিউরিটিক্যাল কোরআন নাযিলের পূর্বেই প্র্যাকটিক্যাল কোরআন (নবী) নাযিল হয়েছিলেন। কোরআন হলো হাদিয়া- আর নবী হলেন সেই হাদিয়ার মালিক। হাদিয়া ও তার মালিকের মধ্যে যে সম্পর্ক–তা সর্বজন বিদিত।

(৫) পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) উপলক্ষে জুলুছ এবং শুকরিয়ার আনন্দ মিছিল বের করা ফিরিস্তাদেরই অনুকরণ (আনওয়ারে আফতাবে সাদাকাত)। মাওয়াহেব গ্রন্থের বর্ণনায় আকাশ হতে জমীন পর্যন্ত ফেরেস্তাদের জুলুছ বা মিছিল পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহপাক বলেন– "তোমরা আল্লাহর ফযল ও রহমত স্বরূপ নবীকে পেয়ে আনন্দ-উল্লাস করো"। (সূরা ইউনুছ ৫৮ আয়াতের তাফসীর দেখুন- রুহুল মাআনীতে)। জালালুদ্দীন সুয়ুতি তাঁর আল

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

হাভী লিল ফাতাওয়া গ্রন্থে ঈদে মিলাদুন্নবীর দিনে সব রকমের আনন্দ-উল্লাসকে বৈধ বলে উল্লেখ করেছেন।

পূর্ব যুগের জুলুছ

প্রাচীনকালে ১০৯৫-১১২১ খৃষ্টাব্দে মিশরে ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) উপলক্ষে ধর্মীয় জুলুছ বের করা হতো। গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এতে অংশ নিতেন। উযির আফযলের যুগে এ আনন্দ মিছিল বের করা হতো। এ সময় রাজপথসমূহ লোকে লোকারণ্য হয়ে যেতো। পরবর্তীতে এ উৎসবের প্রসার ঘটে আফ্রিকার অন্যান্য শহরে, ইউরোপের স্পেনে এবং ভারতবর্ষে। (মাকরিজী, ইবনে খাল্লেকান)।

সুতরাং যারা জশনে জুলুছকে নূতন প্রথা, শিরক ও বিদআত বলে- তারা অতীত ইতিহাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং ইসলামী জ্ঞানের ক্ষেত্রে মূর্খ। নবীবিদ্বেষ তাদেরকে অন্ধ করে রেখেছে। (বিস্তারিত ইতিহাস জানার জন্যে দৈনিক জনকণ্ঠ ৩০শে আগস্ট '৯৬ 'মিলাদের ইতিকথা পড়ুন)। জশনে জুলুছ বের করা কোরআনী আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

নবম অধ্যায়

প্রসঙ্গ ঃ মিলাদুন্নবী উৎসব যুগে যুগে ঃ

নবী করিম (দঃ) নবুয়ত পরবর্তীকালে নিজেই সাহাবীদেরকে নিয়ে নিজের মিলাদ পড়েছেন এবং নিজ জীবনী আলোচনা করেছেন। যেমন- হযরত ইরবায ইবনে ছারিয়া (রাঃ) একদিন নবী করিম (দঃ) কে তাঁর আদি বৃত্তান্ত বর্ণনা করার জন্য আরয করলে নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেন–

"আমি তখনই নবী ছিলাম- যখন আদম (আঃ)-এর দেহের উপাদান-মাটি ও পানি পৃথক পৃথক অবস্থায় ছিল। অর্থাৎ আদম সৃষ্টির পূর্বেই আমি নবী হিসেবে মনোনীত ছিলাম। আমাকে হযরত ইবরাহীম (আঃ) দোয়া করে তাঁর বংশে এনেছেন- সুতরাং আমি তাঁর দোয়ার ফসল। হযরত ঈছা (আঃ) তাঁর উম্মতের নিকট আমার আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তাঁরা উভয়েই আমার সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত ছিলেন। আমার আম্মা বিবি আমেনা আমার প্রসবকালীন সময়ে যে নূর তাঁর গর্ভ হতে প্রকাশ পেয়ে সুদূর সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আলোকিত করতে দেখেছিলেন–আমিই সেই নূর" (মিশকাত)।

এভাবে হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) খলিফা চতুষ্টয় নিজ নিজ খেলাফতযুগেও পবিত্র বেলাদত শরীফ উপলক্ষে মিলাদ মাহফিল করতেন এবং মিলাদের ফযিলত বর্ণনা করতেন– বলে মক্কা শরীফের তৎকালীন (৯৭৪) বিজ্ঞ মুজতাহিদ আলেম আল্লামা ইবনে হাজার হায়তামী (রহঃ)- স্বীয় রচিত "আন-নি'মাতুল কোব্‌রা আলাল আলম" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

এছাড়াও অন্যান্য সাহাবীগণ নবীজীর জীবদ্দশায় মিলাদুন্নী মাহফিল করতেন। উদাহরণ স্বরূপ -

১) হযরত আবু আমের আনসারীর মিলাদ মাহফিলঃ

অনুবাদ ঃ হযরত আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে- তিনি বলেন, আমি একদিন নবী করিম (দঃ)-এর সাথে মদিনাবাসী আবু আমেরের (রাঃ) গৃহে গমন করে দেখতে পেলাম– তিনি তাঁর সন্তানাদি ও আত্মীয়স্বজনকে একত্রিত করে নবী করিম (দঃ)-এর পবিত্র বেলাদত সম্পর্কিত জন্ম বিবরণী শিক্ষা দিচ্ছেন এবং

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

বলেছেন যে "আজই সেই পবিত্র জন্ম তারিখ"। এই মাহফিল দেখে নবী-করিম (দঃ) খুশী হয়ে তাঁকে সুসংবাদ দিলেন- "নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমার জন্য (মিলাদের কারণে) রহমতের অসংখ্য দরজা খুলে দিয়েছেন এবং ফিরিস্তাগণ তোমাদের সকলের জন্য মাগফিরাত কামনা করছেন" (আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতির সাবিলুল হুদা ও আল্লামা ইবনে দাহ্ইয়ার আত-তানভীর-৬০৪ হিঃ)। আরবী হাদীসখানা প্রমাণ স্বরূপ হুবহু নিম্নে পেশ করা হলো-

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ مَرَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى بَيْتِ عَامِرِ الْاَنْصَارِيِّ وَهُوَ يُعَلِّمُ وَقَائِعَ وِلَادَتِهِ لِاَبْنَائِهِ وَعَشِيْرَتِهِ وَيَقُوْلُ هٰذَا الْيَوْمُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ فَتَحَ عَلَيْكَ اَبْوَابَ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَتُهُ يَسْتَغْفِرُوْنَ لَكُمْ (سُبُلُ الْهُدٰى لِجَلَالِ الدِّيْنِ السُّيُوْطِيِّ- وَالتَّنْوِيْر)

২। হযরত ইবনে আব্বাছ (রাঃ) কর্তৃক মিলাদ মাহফিলঃ

অনুবাদ ঃ একদিন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) নিজগৃহে মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছিলেন। তিনি উপস্থিত সাহাবীগণের নিকট নবী করিম (দঃ)-এর পবিত্র বেলাদত সম্পর্কিত ঘটনাবলী বয়ান করছিলেন। শ্রোতামন্ডলী শুনতে শুনতে মিলাদুন্নবীর আনন্দ উপভোগ করছিলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা ও নবীজীর দরূদ পড়ছিলেন। এমন সময় নবী করিম (দঃ) সেখানে উপস্থিত হয়ে এরশাদ করলেন- "তোমাদের সকলের প্রতি আমার সুপারিশ ও শাফাআত অবধারিত হয়ে গেল"। (আদ দোররুল মুনাযযাম) সোবহানাল্লাহ! হাদীস শরীফখানা নিম্নে দেওয়া হলো।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ يُحَدِّثُ ذَاتَ يَوْمٍ فِيْ بَيْتِهِ وَقَائِعَ وِلَادَتِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُبَشِّرُوْنَ وَيَحْمَدُوْنَ وَيُصَلُّوْنَ اِذْ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ حَلَّتْ لَكُمْ شَفَاعَتِيْ (اَلدُّرُّ الْمُنَظَّمُ)

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

৩। হযরত হাসসান (রাঃ) -এর কিয়ামসহ মিলাদঃ

সাহাবী কবি হযরত হাসসান বিন সাবিত (রাঃ) দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নবী করিম (দঃ)-এর উপস্থিতিতে তাঁর গৌরবগাঁথা পেশ করতেন এবং অন্যান্য সাহাবীগণ সমবেত হয়ে তা শ্রবন করতেন। (সপ্তম অধ্যায়ে দেখুন)।

কিয়াম করে মিলাদ মাহফিলে নবী করিম (দঃ)-এর প্রশংসামূলক কবিতা ও না'ত পাঠ করা এবং সালাম পেশ করার এটাই বড় দলীল। এরূপ করা সুন্নাত এবং উত্তম বলে মক্কা-মদিনার ৯০ জন উলামাগণ ১২৮৬ হিজরীতে নিম্নোক্ত ফতোয়া দিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রেরণ করেছেন।

إِعْلَمْ اَنَّ ذِكْرَ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَمِيْعَ مَنَاقِبِهِ وَحُضُوْرَ سَمَاعِهِ سُنَّةٌ رُوِيَ اَنَّ حَسَّانًا يُفَا خِرُ قِيَامًا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَضْرَتِهِ وَالنَّاسُ يَجْتَمِعُوْنَ لِسَمَاعِهِ-

অর্থ-"**হে মুসলমানগণ! আপনারা জেনে রাখুন যে, মিলাদুন্নবী (দঃ)-এর আলোচনা ও তাঁর শান মান বর্ণনা করা এবং ঐ মাহফিলে উপস্থিত হওয়া সবই সুন্নাত। বর্ণিত আছে যে, হযরত হাসসান বিন সাবিত (রাঃ) কিয়াম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর পক্ষে হুযুরের উপস্থিতিতে হুযুর (দঃ)-এর গৌরবগাথা পেশ করতেন, আর সাহাবীগণ তা শুনার জন্য একত্রিত হতেন**"। (ফতোয়ায়ে হারামাঈন) একজনের কিয়ামই সকলের জন্য দলীল স্বরূপ।

হযরত হাসসান বিন সাবিত (রাঃ)-এর কিয়ামের কাছিদার অংশবিশেষ ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ কাছিদায় তিনি রাসূল করীম (দঃ)-এর আজন্ম নির্দোষ ও নিষ্পাপ হওয়া এবং হুযুরের ইচ্ছানুযায়ী তাঁর আকৃতি বা সুরতে মোহাম্মাদী সৃষ্টির তত্ত্ব পেশ করেছেন। নবী করিম (দঃ) তাঁর এই কাছিদা শুনে দোয়া করতেন- **"হে আল্লাহ! তুমি জিব্রাইলের মাধ্যমে হাসসানকে সাহায্য কর।" অর্থাৎ আমার পক্ষে আমার প্রশংসা বাক্য সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলার তৌফিক দাও। এতে আমার দুশমনগণ ভালভাবে জব্দ হবে।**

৪। সুদূর অতীতে মিলাদুন্নবীর চিত্র ঃ মাওয়াহিবের বর্ণনা

সুদূর অতীতকালে কিভাবে মুসলমানগণ ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করতেন- তাঁর একটি বিস্তারিত বর্ণনা আল্লামা শাহাবুদ্দীন কাস্তুলানী (রহঃ) মাওয়াহেবে

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

লাদুন্নিয়া কিতাবে বিধৃত করেছেন। মিলাদুন্নবী (দঃ) সমর্থক বিজ্ঞ মোহাক্কেক ওলামায়ে কেরাম এবং ফকিহ্গণ নিজ নিজ গ্রন্থে দলীল স্বরূপ আল্লামা কাস্তুলানীর (রহঃ) এই দুর্লভ প্রমাণাদি লিপিবদ্ধ করেছেন। ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) পালনকারী এবং সমর্থক ওলামা ও নবীপ্রেমিক মুসলমানদের অবগতির জন্য উক্ত মন্তব্য কোটেশন আকারে অনুবাদসহ নিম্নে পেশ করা হলো।

وَلَا زَالَ اَهْلُ الْاِسْلَامِ يَحْتَفِلُوْنَ بِشَهْرِ مَوْلِدِهٖ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ وَيَعْمَلُوْنَ الْوَلَائِمَ وَيَتَصَدَّقُوْنَ فِيْ لَيَالِيْهِ بِاَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ وَيُظْهِرُوْنَ السُّرُوْرَ وَيَزِيْدُوْنَ فِى الْمَبَرَّاتِ وَيَعْتَنُوْنَ بِقِرَائَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيْمِ وَيَظْهَرُ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَرَكَاتِهٖ كُلُّ فَضْلٍ عَمِيْمٍ وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَوَاصِّهٖ اَنَّهٗ اَمَانٌ فِيْ ذٰلِكَ الْعَامِ وَبُشْرٰى عَاجِلَةٌ بِنَيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامِ فَرَحِمَ اللّٰهُ امْرَأً اتَّخَذَ لَيَالِيَ شَهْرِ مَوْلِدِهِ الْمُبَارَكَةِ اَعْيَادًا (مَوَاهِبُ اللَّدُنِّيَّةُ وَالْاَنْوَارُ الْمُحَمَّدِيَّةُ صفحة ١٩)

অর্থ-"সমগ্র মুসলিম উম্মাহ সুদূর অতীতকাল থেকে নবী করিম (দঃ)-এর পবিত্র বেলাদত উপলক্ষে মাসব্যাপী সর্বদা মিলাদ-মাহফিল উদযাপন করতেন। যিয়াফত প্রস্তুত করে তারা লোকদের খাওয়াতেন। মাসব্যাপী দিনগুলোতে বিভিন্ন রকমের সদকা খয়রাত করতেন এবং শরীয়তসম্মত আনন্দ উৎসব করতেন। উত্তম কাজ প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি করতেন। তাঁরা পূর্ণমাস শান শওকতের সাথে বিশেষ আয়োজনের মাধ্যমে মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠান করতেন- যার বরকতে বরাবরই তাদের উপর আল্লাহর অপার অনুগ্রহ প্রকাশ পেতো। মিলাদ মাহফিলের বৈশিষ্ট্য সমূহের মধ্যে এটা একটি পরীক্ষিত বিষয় যে, মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানের বরকতে ঐ বৎসর আল্লাহর পক্ষ হতে নিরাপত্তা কায়েম থাকে এবং তড়িৎগতিতে উহা মনোবাঞ্ছা পূরনের শুভ সংবাদ বহন করে নিয়ে আসে। অতএব- যিনি বা যারা মিলাদুন্নবী মাসের প্রতিটি রাত্রকে ঈদের রাত্রে পরিণত করে রাখবে- তাঁদের উপর আল্লাহর খাস রহমত বর্ষিত হবে" (মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া, মা ছাবাতা বিছছুন্নাহ্)।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

মিলাদ ও কিয়ামের বিস্তারিত আলোচনা এবং দলীল সমূহ সংশ্লিষ্ট প্রামাণিক কিতাবসমূহে অনুসন্ধান করে নিবেন। এছাড়াও মিলাদ কিয়ামের ১৮টি দলীল আরবী এবারতসহ "মাসিক সুন্নীবার্তা-৯৩" সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়েছে মার্চ '০৭-এ। বিজ্ঞ আলেমগণ সুন্নীবার্তাটি সংগ্রহ করে দলীলগুলো সংরক্ষণ করতে পারেন।

বিঃ দ্রঃ উপরের আলোচনায় প্রমাণিত হলো যে, যুগে যুগে মিলাদুন্নবীর চর্চা চলে আসছে- সীরাতুন্নবী মাহফিলের চর্চা কেহই করেননি। কারণ, **সীরাত শব্দের আভিধানিক অর্থ- ভালমন্দ চরিত্র। আর শরিয়তে সীরাতুন্নবীর অর্থ- কাফির ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে নবীজীর ৮ বছরের যুদ্ধজীবন। সুতরাং সীরাতুন্নবীতে শাব্দিক ও পারিভাষিক উভয় অর্থেই নবীজীর পুতঃপবিত্র চরিত্র ও সার্বিক জীবনী আলোচনা প্রমাণিত হয় না।** ঈদে মিলাদুন্নবীতে নূরে মুহাম্মদী তথা সৃষ্টির আদি থেকে ৬৩ বৎসর পর্যন্ত নবীজীর সার্বিক জীবনের আলোচনা স্থান পায়। সেজন্যই নবী, ওলী, গাউস-কুতুব- সবাই মিলাদুন্নবীর চর্চা করতেন, করছেন এবং করতে থাকবেন। মিলাদের মধ্যেই সীরাত অংশ আছে। যারা শুধু সীরাতুন্নবীর চর্চা করেন, তারা খন্ডিত ৮ বছরের যুদ্ধ জীবন ও নবীজীর ভালমন্দ জীবন আলোচনা করে থাকেন মাত্র। শুধু যুদ্ধ জীবন আলোচনা করতে করতে তারা বর্তমানে জেএমবি হয়ে গেছেন অথবা হরকাতুল জেহাদ করে মুফতী হান্নানের মত বোমাবাজ হয়ে গেছেন। মিলাদুন্নবী পালনকারীরা শান্তিকামী। মিলাদুন্নবী ও সীরাতুন্নবীর পার্থক্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে আমার লিখিত ঈদে মিলাদুন্নবী ও না'ত লহরী এবং মিলাদ-কিয়ামের বিধান গ্রন্থদ্বয়ে।

(মুফতী আমিমুল ইহছান লিখিত কাওয়া-ইদুল ফিক্হ ৩৩১ পৃষ্ঠায় সীরাতুন্নবীর সংগা দেখুন। তাতে বিভিন্ন গ্রন্থের হাওয়ালা দিয়ে লিখা হয়েছে-সীরাতুন্নবী বলতে নবীজীর ৮ বৎসরের যুদ্ধজীবন বুঝায় এবং ভাল ও মন্দ উভয় চরিত্র বুঝায়। হাবীবে খোদার মধ্যে মন্দ চরিত্র থাকতে পারে না। তাই সীরাতুন্নবী শব্দ ব্যবহার করা উচিৎ নয়। তদুপরি সীরাতুন্নবী মাহফিল নামে কোন অনুষ্ঠান অতীত যুগে ছিল না। তাই ইহা নূতন বিদআত।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

দশম অধ্যায়

মায়ের কোলে শিশু নবী

প্রসঙ্গ ঃ আবু লাহাবের খুশী ও তার শাস্তির বিরতি–চাঁদের সাথে কথা বলা ও খেলা করা

প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ছুয়াইবা নাম্নী এক দাসী তার মনিব আবু লাহাবকে এই সুসংবাদ জানায়। আবু লাহাব ভাতিজার জন্মসংবাদে খুশী হয়ে আপন দাসী ছোয়াইবাকে আযাদ করে দেয়। ৫৫ বৎসর পর বদরের যুদ্ধের ৭দিন পর প্লেগ রোগে আবুলাহাবের মৃত্যু হয়। আবু লাহাবের ভাই হযরত আব্বাস (রাঃ) স্বপ্নে আবুলাহাবকে দেখে নবী দুশমনির পরিণতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আবু লাহাব আফসোস করে বললো–

"নরকে আমার স্থান হয়েছে। তবে নবী করিম (দঃ)-এর জন্মসংবাদে খুশী হয়ে দাসীকে শাহাদৎ অঙ্গুলীর ইশারায় আযাদ করার কারণে প্রতি সোমবার আমার কবরের আযাব হালকা হয় এবং শাহাদৎ অঙ্গুলী চুষে কিছুটা তৃষ্ণা নিবারণ করি"। (বোখারী ও মাওয়াহেব)।

ইবনে জজ্‌রী (রহঃ) এ প্রসঙ্গে বলেন– "আবুলাহাব নবী করিম (দঃ)-এর একজন কট্টর দুশমন– যার বিরুদ্ধে সূরা লাহাব নাযেল হয়েছে। নবীজীর (দঃ) জন্মদিনের খুশীতে যদি তার এই পুরস্কার হয়, তাহলে যে মুসলমান মিলাদুন্নবী উপলক্ষে খুশী উদযাপন করবে এবং নবীর মহব্বতে সাধ্যমত খরচ করবে, তার পুরষ্কার কি হতে পারে? আমার জীবনের শপথ করে বলছি-নিশ্চয়ই আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু আপন অনুগ্রহে তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন (আনওয়ারে মোহাম্মদীয়া)"।

উঃ ছোয়াইবা নবী করিম (দঃ) কে কয়েক দিন দুধ পান করিয়েছিলেন। সেজন্য নবী করিম (দঃ) তাঁকে মা বলে সম্মান করতেন। জন্মের পর নবী করিম (দঃ) ১৬/১৭ দিন আপন মা ও ছুয়াইবার দুধ পান করেছিলেন।

চাঁদের সাথে খেলা করাঃ

এ সময়ের একটি ঘটনা দেখে নবীজীর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ) পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) একদিন কথা প্রসঙ্গে বললেন- **"ইয়া রাসুলাল্লাহ্! আপনি যখন শিশুকালে দোলনায় ছিলেন-সেই সময়ের একটি**

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

আশ্চর্যজনক ঘটনা আপনার নবুয়তের প্রমাণস্বরূপ আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম এবং এই ঘটনাই পরবর্তীকালে আমাকে আপনার ধর্মে দিক্ষীত হতে অনুপ্রাণিত করেছে বেশী। ঘটনাটি ছিল এই- "আপনি দোলনায় শুয়ে শুয়ে আকাশের চাঁদের সাথে খেলা করছিলেন। আপনি আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদকে যে দিকে হেলে যেতে বলতেন, চাঁদ সেদিকেই হেলে যেতো। এই ঘটনা আমাকে আকৃষ্ট করেছে"।

একথা শুনে একটু মুচকি হাসি হেসে হুযুর (দঃ) বললেন- "চাচাজান, শুধু তাই নয়। আমি সে সময় চাঁদের সাথে কথাও বলতাম এবং চাঁদও আমার সাথে কথা বলতো"। চাঁদ ছিল আমার খেলার নূরের পুতুল- (হযরত আব্বাস (রাঃ) এর রেওয়ায়াত সুত্রে-মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া)।

খাছায়েছে কুবরা ও তারিখে খামিছ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, নবী করিম (দঃ) ভূমিষ্ট হয়েই কলেমা শাহাদাত অর্থাৎ তৌহিদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দিয়েছিলেন-

أَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ -

অর্থ-"আমি চাক্ষুস সাক্ষ্য দিচ্ছি - আল্লাহ ছাড়া মাবুদ নেই এবং নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাসুল"। এটা ছিল হুযুরের দেখা সাক্ষ্য। তাই তিনি চাক্ষুস সাক্ষী।

প্রিয় নবী (দঃ) জন্মসূত্রেই নবী। ভূমিষ্ট হয়ে তৌহিদ ও আপন রিসালাতের সাক্ষ্যই প্রমাণ করে যে, নিজের নবুয়ত সম্পর্কে তিনি শিশুকালেই অবহিত ছিলেন। জনৈক অধ্যাপক (গোলাম আযম সাহেব) তার সিরাতুন্নবী সংকলনে লিখেছেন- "চল্লিশ বৎসরের পূর্বে তিনি জানতেননা যে, তিনি নবী হবেন। তবে তাঁর আচার আচরণ ছিল নবীসুলভ"।

এটা তার বেদ্বীনী উক্তি এবং প্রকৃত ঘটনার সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা, নবী (দঃ) না জেনে ও না বুঝে নিজের নবুয়তের সাক্ষ্য দেবেন- এটা কোন বিবেকবান লোক বলতে পারে না।

বুঝা গেলো- তিনি শিশুকাল থেকেই চাঁদের খবরও রাখতেন- হাতের খেলনাকে যেদিকে ঘুরায়-সেদিকেই খেলনা ঘুরে। আরো প্রমাণিত হলো- তিনি তাওহীদ ও রিসালাতের শিক্ষা নিয়েই আগমন করেছেন। তাওহীদ ও রিসালাত সম্বলিত কলেমা পরবর্তীতে উম্মতের জন্য নাযিল হয়েছিল। কোরআনের "তালিমপ্রাপ্ত" হয়েই তাঁর আগমন হয়েছিল। কোরআনের "তানযীল" বা নুযুল হয়েছে পরবর্তীকালে।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

একাদশ অধ্যায়

বিবি হালিমার কোলে

প্রসঙ্গ ঃ দুধবোনের সাথে বকরী চড়ানো- মেঘমালার ছায়াদান- বক্ষ বিদারন –

মক্কার শরীফ খান্দানের প্রথা অনুযায়ী প্রত্যেক শিশুকেই ধাত্রী মায়ের ঘরে দুধপান ও লালন পালন করানো হতো– পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। উদ্দেশ্য ছিল- শহরের কোলাহল এবং বহু লোকের সংমিশ্রণ থেকে দূরে রেখে একক বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় শিশুর প্রথম ভিত্তি স্থাপন করা। মক্কার অদূরে তায়েফের বনী ছকিফ ও বনি হাওয়াযেন গোত্র ছিল বিশুদ্ধ আরবী ভাষার অঞ্চল- যেমন আমাদের দেশের বিশুদ্ধ বাংলা ভাষার অঞ্চল হলো নদীয়া- শান্তিপুর। নবী করিম (দঃ)-এর বয়স যখন ১৬/১৭ দিন, তখন তায়েফের বনী ছকিফ গোত্রের হালিমা সা'দিয়া নাম্নী এক দরিদ্র মহিলা তাঁর দুধ মা হবার সৌভাগ্য লাভ করেন। কবিলার অন্যান্য মহিলাদের সাথে বিবি হালিমা পালক শিশু সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করেন। কিন্তু গরীব বলে কেউ তাকে সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব দিতে ইচ্ছুক ছিলনা। ইত্যবসরে অপেক্ষাকৃত সামর্থবান অন্যান্য সাথী মহিলাগণ ধনী ঘরের সন্তান সংগ্রহ করে ফেলেছে। ইয়াতিম ও গরীব বলে কেউ শিশুনবীকে গ্রহণ করলনা।

নবী মাতৃগর্ভে আসিয়া–পিতৃহারা হইয়া

এতিমরূপে আসিলেন ধরায়,

পবিত্র এই মুখে- দুধ খাইলেন যার বুকে

ধন্য হলেন বিবি হালিমায়।

ওগো নবীজী–কোন্ সাধনে পাইব তোমায়!!

এমতাবস্থায় স্বামীর সাথে পরামর্শ করে বিবি হালিমা ইয়াতীম শিশুনবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) কে পালিতপুত্র হিসাবে গ্রহণ করতে রাজী হলেন। বিবি হালিমা রেশমী বিছানায় ঘুমন্ত শিশুনবীর বুকে হাত স্থাপন করতেই মুচকি হাসির ঝলক ছড়িয়ে শিশুনবী জেগে উঠলেন এবং বিবি হালিমার দিকে আকর্ষণীয় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। **বিবি হালিমা বলেন, "আমি শিশুনবীর চোখ হতে একটি নূর বের হয়ে আকাশের মহাশূন্যে মিশে যেতে প্রত্যক্ষ করলাম। আমি তাঁর কপালে চুমু খেয়ে তাঁকে কোলে তুলে নিয়ে ডান স্তনের দুধ পান করতে দিলাম। শিশুনবী তৃপ্তি সহকারে দুধ পান করলেন। অতঃপর বাম স্তন থেকে**

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

দুধপান করানোর চেষ্টা করলে তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন। দুধপানকালীন পূর্ণ সময়ই শিশুনবীর এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয়নি। কেননা, আমার কোলে আমার আপন শিশু আবদুল্লাহ্ তাঁর দুধ শরীক ভাই ছিল। নবী করিম (দঃ)-এর এই ইনসাফপূর্ণ ব্যবস্থা দেখে আমি অভিভূত হয়ে যেতাম"।

অন্যদের ন্যায্য হক প্রদানের নির্দেশসহ ৪০ বৎসর পর কোরআন নাযিল হয়। কিন্তু শিশুনবী (দঃ) কোরআন নাযিলের বহু পূর্বেই কোরআনের ইনসাফপূর্ণ সম্পদ বন্টনের নীতি বাস্তবায়িত করে বিশ্বজগতকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। নবীগণ আরেফ বিল্লাহ হয়েই জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শিশুকাল থেকেই সকলের জন্য ইনসাফের আদর্শ স্থাপন করেছেন। তাঁর পূর্ণ জীবনই আমাদের জন্য আদর্শ। **কিন্তু মওদুদী পন্থী জনৈক অধ্যাপক তাঁর রচিত 'সিরাতুন্নবী' সংকলনে (!) মন্তব্য করেছেন যে, "নবুয়তের ২৩ বৎসর জিন্দেগীই কেবল আমাদের জন্য আদর্শ"**। এটা তার নিজস্ব আবিষ্কার ও ইসলামের অপব্যাখ্যা এবং ইসলামী আকিদার পরিপন্থী মতবাদ। পূর্ব পৃষ্ঠায় প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী করিম (দঃ) ভূমিষ্ট হয়েই আল্লাহর তৌহিদ ও আপন রিসালাতের সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। বুঝা গেলো- নিজের নবুয়ত সম্পর্কে তিনি পূর্ণ অবগত ছিলেন। এবং তাঁর পূর্ণ জীবনই আমাদের জন্য আদর্শ।

বিবি হালিমা বলেন, "আমাদের অঞ্চলে তখন দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছিল। কিন্তু আল্লাহর অসীম কুদরতে আমার পালিত পুত্রের বরকতে আমাদের কোন অভাব ছিলনা। অন্যান্য পরিবারের মেষ ও ছাগপালের দুধ শুকিয়ে গিয়েছিল খাদ্যের অভাবে। কিন্তু আমাদের ছাগ ও মেষপাল দিনের শেষে ঘরে ফিরে আসতো দুধভরা স্তন নিয়ে। আমরা ঐ দুধে সকলেই তৃপ্ত হতাম। এভাবেই আমাদের অভাব দূর হয়ে গেল। প্রতিবেশীরা অধিক খাদ্যের আশায় তাদের মেষরাশি আমাদের মেষপালের সাথে একইস্থানে পাঠাতো। কিন্তু তাদের মেষপালগুলো ফিরে আসতো খালিপেটে; আর আমাদের মেষপাল আসতো ভরাপেটে- স্তনভর্তি দুধ নিয়ে। **আমার স্বামী এ অবস্থা দেখে বলতেন, হালিমা! "আমাদের এ সন্তান ভবিষ্যতে অতি উঁচুদরের মানুষ হবে"**।

বিবি হালিমার মেয়ে শায়মা নবী করিম (দঃ) কে কোলে কাঁখে করে রাখতেন। সেজন্য নবী করিম (দঃ) তাঁকে আপন বোনের চেয়েও বেশী শ্রদ্ধা করতেন। ৮ম হিজরী সনে নবী করিম (দঃ) হোনায়েন-এর যুদ্ধে বনী ছকিফ ও বনী হাওয়াজেন গোত্রের প্রায় ছয় হাজার লোককে বন্দী করেন। এমতাবস্থায় শায়মা লাঠিতে ভর করে নিজের বংশের বন্দীদের জন্য সুপারিশ করতে নবীজীর খেদমতে হাযির হলে তাঁকে দেখেই নবী করিম (দঃ) সসম্মানে দাঁড়িয়ে যান এবং নিজের মাথা মোবারক হতে চাদর নামিয়ে তাঁর বসার জন্য বিছিয়ে দেন। শায়মা আপন

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

গোত্রের লোকজনদের মুক্তির জন্য আবেদন জানালে নবী করিম (দঃ) নিজ অংশের বন্দীদের মুক্তি দিয়ে দেন। সাথে সাথে সাহাবীগণও তাঁদের অংশের সকল বন্দীকে মুক্ত করে দেন। এ ছিল গুরুজনদের প্রতি নবীজীর ব্যবহারের উত্তম আদর্শ। এ আদর্শ মেনে চললে শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে বাধ্য।

মেঘমালার ছায়াদান

শায়মা বলেন– **"আমি আমার কোরেশী ভাইকে নিয়ে মেষ চড়াতে গেলে দেখতে পেতাম– মরুভূমির প্রখর রৌদ্রে একখন্ড মেঘমালা তাঁকে ছায়া দিত এবং তাঁর সাথে সাথে ঘুরে বেড়াতো। যতদিন তিনি আমাদের প্রতিপালনে ছিলেন– ততদিনই এরূপ অবস্থা ছিল"**।

বিবি হালিমা বলেন– "শিশু অবস্থায় নবী করিম (দঃ) কাঁদতেন না। আমি একবার তাঁকে কাঁদাবার ইচ্ছায় এবং কান্নার অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করার বাসনায় তাঁর দু'হাত রশি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দেই"। নবী করিম (দঃ) বলেন, "আমার হাতের বাঁধন শক্ত হয়ে যাওয়ায় ব্যথায় আমি কান্না করতে যাবো– এমন সময় আকাশের চাঁদ আমাকে শান্তনা দিয়ে বললো– "কাঁদবেন না"। চাঁদের একথা শুনে আমি হেসে ফেললাম"। মায়ের আশা আর পূরণ হলোনা (যিকরে জামিল-মুফতী শফি ওকাড়ভী)। বিবি হালিমার ঘরে নবীজী তেইশ মাস ১৩ দিন দুধপান করে দুধ খাওয়া বন্ধ করে দেন। এভাবে পূর্ণ ২৪ মাস বা দু'বৎসর দুধ পান করে তিনি দুধপান ছেড়ে দেন। ইহা কোরআনের বিধান। কিন্তু আমাদের প্রিয় নবী কোরআন নাযিলের বহু পূর্বেই কোরআনী বিধান বাস্তবায়ন করেছেন। তিনি কোরআনী বিধানের মুখাপেক্ষী নন। তিনি মুখাপেক্ষী শুধু আল্লাহ্‌র।

বক্ষ বিদারন ঃ

বিবি হালিমার গৃহে অবস্থানকালীন সময়ে দুই বৎসর পর দু'জন ফিরিস্তা এসে মাঠের মধ্যে নবী করিম (দঃ)-এর সিনা মোবারক বিদীর্ণ (চাক) করে নফছে আম্মারার স্থানটুকু সরিয়ে ফেলে দেন এবং নূর, হেকমত, ইসমত, আসরার- ইত্যাদি নেয়ামত তথায় স্থাপন করে দেন। **ইহাকে প্রথম শক্কে ছদর বলা হয়। অতঃপর চার বৎসর বয়সে তিনি আপন মায়ের কোলে ফিরে আসেন।**

একেবারে শিশু জীবনের ঘটনাবলী এভাবে বর্ণনা করা কার পক্ষে সম্ভব? আল্লাহ্ প্রদত্ত ইলমে লাদুন্নী বা ইলমে গায়েব ছাড়া এসব ঘটনা বলা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার। এতে বুঝা যায়– নবীগণের গায়েবী ইলম জন্মসূত্রে প্রাপ্ত। (সীরাতুন্নবী–সোলায়মান নদভী)।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

দ্বাদশ অধ্যায়

শিশুকালে মদিনায় গমন

প্রসঙ্গ ঃ মায়ের সাথে মদিনায় গমন ও পিতার কবর যিয়ারত এবং ফিরতি পথে মায়ের ইন্তিকাল, হুযুরের পিতামাতার পুনর্জীবন ও সাহাবীর মর্যাদা লাভ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন–যখন নবী করিম (দঃ)-এর বয়স ছয় বৎসর, তখন বিবি আমেনা (রাঃ) আপন দাসী উম্মে আয়মন (রাঃ) ও নিজ পুত্র মোহাম্মদ (দঃ) কে নিয়ে মদিনায় গমন করেন। উদ্দেশ্য ছিল স্বামীর কবর যিয়ারত করা ও নিজ পুত্রকে মাতুলালয়ে পরিচিত করা। মদিনার বনী আদী ইবনে নাজজার ছিল নবী করিম (দঃ)-এর মাতুলালয় এবং আবু আইউব আনসারী (রাঃ) ছিলেন সে বংশের লোক। 'দারুন নাবেগা' নামক স্থানে (বর্তমানে মসজিদে নববীর পশ্চিমাংশ) হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর কবর। সেখানে তাঁরা একমাস অবস্থান করেন। উম্মে আয়মন (বারাকাহ্) বলেন- আমরা যখন মদিনায়, তখন মদিনার প্রতিবেশী একদল ইহুদী পালাক্রমে এসে নবী করিম (দঃ)-এর দিকে বার বার দৃষ্টি দিতে থাকে। ইহুদীদের মধ্যে একদল বলে উঠলো– **"ইনিই বর্তমানকালের নবী এবং মদিনাতেই তিনি হিজরত করে চলে আসবেন। এখানে বহু হতাহত হবে এবং যুদ্ধবন্দীর ঘটনা ঘটবে"**।

তাদের একথা শুনে বিবি আমেনা নিজ পুত্র ও উম্মে আয়মনকে নিয়ে মক্কায় রওনা হয়ে যান। পথিমধ্যে 'আবওয়া' নামক গ্রামে পৌঁছলে হঠাৎ বিবি আমেনা (রাঃ) অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এখানেই ইনতিকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন (বেদায়া-নেহায়া)।

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতি (রহঃ) তারিখুল খোলাফা নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখেছেন– অসুস্থ অবস্থায় বিবি আমেনা (রাঃ) উম্মে আয়মনকে লক্ষ্য করে যে কয়টি হৃদয়বিদারক উপদেশ দিয়েছিলেন, তার মর্মার্থ এই– **"হে উম্মে আয়মন, আমি বিদায় নিচ্ছি। আমার পর তুমিই তাঁর মা। তাঁকে তুমি আদর-যত্ন করে রাখবে। আর শুন, তাঁর জন্মকাল থেকে যেসব ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করেছি, তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, তিনি হবেন শেষ যামানার নবী। এটাই আমার চূড়ান্ত স্বাক্ষ্য"!** একথা বলেই বিবি আমেনা (রাঃ) জান্নাতবাসিনী হয়ে যান।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, বিবি আমেনা (রাঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) মিল্লাতে ইব্রাহিমীর উপর ইনতিকাল করেছেন। সুতরাং তাঁরা মুমিন ও

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

জান্নাতবাসী। বিবি আমেনা (রাঃ)-এর মন্তব্যে বুঝা গেল-তিনি নবীজীর নবুয়তে বিশ্বাসী ছিলেন। পরবর্তীতে দশম হিজরী সনে বিদায় হজ্বের সময় তাঁদেরকে পুনরায় জীবিত করে নবী করিম (দঃ)-এর সামনে পেশ করা হয় এবং উভয়ে হানিফ হওয়া সত্ত্বেও পুনরায় ইসলাম ধর্মে দিক্ষীত হয়ে সাহাবী হন। আল্লামা সোহায়লী ও হাফেয নাসিরুদ্দীন খতীব বাগদাদী হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে এই হাদীসখানা রেওয়ায়াত করেন। ফতোয়া শামী সহ বেদায়া-নেহায়া, মাওয়াহেব, আনওয়ারে মোহাম্মদীয়া-প্রভৃতি নির্ভরযোগ্য কিতাবে এই রেওয়ায়াতখানা বর্ণিত হয়েছে। সনদের ক্ষেত্রে সামান্য দুর্বল হলেও অনেক বিখ্যাত মোহাদ্দেস কর্তৃক গৃহীত হওয়ার কারণে এটা সবল হয়ে হাসান পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। হাদীসের শিক্ষক ও মোহাদ্দেসগণ এই নীতিমালা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল রয়েছেন। সুতরাং যঈফ বলে হাদীসখানাকে উড়িয়ে দেয়ার মানসিকতা ওহাবীপন্থী আলেমগণের পরিত্যাগ করা উচিত।

এখানে অগ্রীম ঈমান আনয়ন প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, নবী করিম (দঃ)-এর আবির্ভাবের চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে ইয়েমেন-এর বাদশাহ তিববা আবি কুরাব মদিনা ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে এসে ইহুদী পন্ডিতদের নিকট আখেরী নবীর গুণাগুণ শুনে নবী করিম (দঃ)-এর রিসালাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন- **"তোমরা তিববাকে গালি দিওনা, কেননা সে আমার উপর পূর্বেই অগ্রীম ঈমান এনেছে এবং আমি তাকে মে'রাজ রাতে বেহেস্তে বিচরন করতে দেখেছি"** (ইবনে কাছির-বেদায়া ও নেহায়া)।

হযরত আবদুল্লাহ এবং বিবি আমেনার (রাঃ) ব্যাপারটিও অনুরূপ। পরবর্তীকালে নবী করিম (দঃ) সাহাবীগণসহ মায়ের কবরস্থান যিয়ারত করেন এবং ছোট শিশুর ন্যায় ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদেন। বেদায়া ও নেহায়া এবং মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসখানা প্রতিধানযোগ্য।

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ اِنْتَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى رَسْمِ قَبْرٍ فَجَلَسَ وَجَلَسَ النَّاسُ حَوْلَهُ فَجَعَلَ يُحَرِّكُ رَأْسَهُ كَالْمُخَاطِبِ ثُمَّ بَكَى فَاسْتَقْبَلَهُ عُمَرُ فَقَالَ مَا يُبْكِيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ هٰذَا قَبْرُ آمِنَةَ بِنْتِ وَهْبٍ اِسْتَأْذَنْتُ رَبِّيْ فِيْ

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

اَنْ اَزُوْرَ قَبْرَهَا فَاَذِنَ لِىْ وَاسْتَأْذَنْتُ فِى الْاِسْتِغْفَارِ لَهَا فَاَبٰى عَلَىَّ وَاَدْرَكَتْنِىْ رِقَّتُهَا فَبَكَيْتُ قَالَ فَمَا رُؤِيَتْ سَاعَةٌ اَكْثَرُ بَاكِيًا مِّنْ تِلْكَ السَّاعَةِ-

অর্থ- "হযরত সোলায়মান ইবনে বোরায়দা (রাঃ) তাঁর পিতা বোরায়দা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একদিন নবী করিম (দঃ) আবওয়ায় একটি পুরাতন কবরের পার্শ্বে গিয়ে বসলেন এবং তাঁর সঙ্গীগণও কবরের পার্শ্বে বসে পড়লেন। হুযুর পাক (দঃ) যেন কাউকে সম্বোধন করার মত মাথা নেড়ে নেড়ে কাঁদতে লাগলেন। হযরত ওমর (রাঃ) সামনে এসে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কেন কাঁদছেন? নবী করিম (দঃ) জবাব দিলেন- এটা আমার আম্মা বিবি আমেনা বিন্‌তে ওয়াহাব-এর কবর! আমি আমার রবের নিকট মায়ের কবর যিয়ারত করার অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে কবর যিয়ারতের অনুমতি দেন। পুনরায় মায়ের জন্য মাগফিরাত কামনার প্রার্থনা করতে গেলে আমাকে নিষেধ করেন। মায়ের অনাবিল স্নেহের কথা স্মরণ করে আমি কেঁদেছি। বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন, ঐ সময়ের চেয়ে এত দীর্ঘ সময় ধরে কাঁদতে রাসুল (দঃ) কে আর কোনদিন দেখা যায়নি।" (বেদায়া-নেহায়া-ইবনে কাছির)।

উপরে বর্ণিত হাদীসখানায় তিনটি বিষয় লক্ষণীয়-

(১) দীর্ঘদিন পর মায়ের কবর সনাক্ত করা।

(২) সাহাবীগণসহ কবরের পার্শ্বে বসে যিয়ারত করা ও কান্নাকাটি করা এবং আল্লাহ্ তায়ালা কর্তৃক যিয়ারত করার অনুমতি প্রদান।

(৩) মায়ের জন্য মাগফিরাত কামনার প্রার্থনা করতে বারন করা।

দীর্ঘ ৫০ বৎসর পর নবী করিম (দঃ) কর্তৃক মরুভূমির মধ্যে মায়ের কবর অনুসন্ধান করে বের করা খুবই দূরূহ ব্যাপার ছিল। ইলমে গায়েব না হলে এটা সম্ভব হতোনা।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো-সকলে সমবেত হয়ে কবরের পাশে বসে যিয়ারত করার অনুমতি দান। এটা বৈধ এবং নবী করিম (দঃ)-এর সুন্নাত। বিবি আমেনার (রাঃ) কবর যিয়ারত করার অনুমতিদানের ঘটনার দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হলো যে, তিনি মোমেন ছিলেন। কেননা, কাফেরের কবর যিয়ারত করা জায়েয নয়।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

তৃতীয় বিষয়টি হলো-মাগফিরাত পার্থনার অনুমতি না দেওয়ার কারণ কি? জবাব হলো- বিবি আমেনা (রাঃ) গুনাহ্গার ছিলেন না- সুতরাং মাগফিরাত কামনা করা নিরর্থক। উল্লেখ্য যে, নবী করিম (দঃ) নিজের জন্য এবং পিতা-মাতার মাগফিরাতের জন্য পরবর্তীতে যে দোয়া করতেন- তা ছিল উম্মতের শিক্ষার উদ্দেশ্যে। পরবর্তীতে মাগফিরাতের জন্য দোয়া করার দ্বারা আরো প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা মোমেন ছিলেন। মাগফিরাতের ৩টি অর্থ ৪র্থ অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তদুপরি- তিনি ছিলেন নবীজীর মা। তাঁর মর্যাদা অন্যান্য মায়ের মত নয়। আল্লামা মানাভী, শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেছ দেহলভী (রহঃ) প্রমুখ মোহাদ্দেসগণ বর্ণিত হাদীসের এই অর্থই গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু ওহাবীপন্থী আলেমগণ হাদীসে বর্ণিত "যিয়ারতের অনুমতি প্রদানের" অংশটির গুরুত্ব না দিয়ে দ্বিতীয় বিষয়টির অপব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, **"যেহেতু আল্লাহ্ তায়ালা মাগফিরাত প্রার্থনা করতে নিষেধ করেছেন, সেহেতু বুঝা যায় যে, নবী করিম (দঃ)'র মাতা-পিতা মোমেন ছিলেন না"**। নাউযু বিল্লাহ। হাদীসের প্রথম অংশটি পরিস্কার বলে দিচ্ছে যে, যার কবর যিয়ারত করা হয়, তিনি কখনও কাফের হতে পারেন না। কেননা, কাফেরের কবর যিয়ারত করা শরীয়তে নাজায়েয। এটাই আহ্লে সুন্নাতের আকিদা।

উপরে বর্ণিত হাদীসে বিশেষ কারণে ঐদিন নবীজীর মায়ের জন্য ইসতিগফারের অনুমতি না পাওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেলেও অন্য হাদীসে পরবর্তী সময়ে পিতা-মাতার জন্য এবং নিজের জন্য নবী করিম (দঃ) নিম্নরূপ দোয়া করতেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ -

"হে আল্লাহ! তুমি আমাকে, আমার পিতা মাতাকে এবং সকল মুমিনকে মাগফিরাত করে দিও"। (দোয়ায়ে মাছুরা)। ইহা ছিল উম্মতের তালিমের উদ্দেশ্যে। মাগফিরাতের ব্যাখ্যা ৪র্থ অধ্যায়ে দেখুন।

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে- নবীজী পরবর্তী সময়ে নিজের জন্য এবং পিতা-মাতার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করতেন। সুতরাং বিরুদ্ধবাদীদের ব্যাখ্যাটি সম্পূর্ণ ভুল এবং মনগড়া। তবে মাগফিরাত কামনা করা শুধু গুণাহের জন্য নয়- বরং দীনতা প্রকাশের জন্য এবং উচ্চ মর্তবা লাভের জন্যও হয়ে থাকে।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মক্কায় প্রত্যাবর্তন

প্রসঙ্গ ঃ দাদা আবদুল মোত্তালিব– এর প্রতিপালনে কিশোর নবী (দঃ)

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ছয় বৎসর বয়সেই নবী করিম (দঃ) মায়ের বুক হারান। বিবি আমেনাকে (রাঃ) আবৃওয়া নামক স্থানে দাফন করে উম্মে আয়মন (রাঃ) কিশোর নবীকে নিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। মায়ের অসিয়ত অনুয়াযী নবী করিম (দঃ) বিবি উম্মে আয়মনকে (বারাকাহ্) মা বলে সম্বোধন ও সম্মান করতেন এবং বলতেন– **"আমার মায়ের ইনতিকালের পর উম্মে আয়মনই আমার মা"**।

পরবর্তীকালে বিবি খাদিজার (রাঃ) সাথে হুযুরের বিবাহের পর উম্মে আয়মনকে আযাদ করে দিয়ে নবী করিম (দঃ) নিজ পালিত পুত্র (বিবি খাদিজা (রাঃ) কর্তৃক দানকৃত গোলাম) যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ)-এর সাথে তাঁকে দ্বিতীয়বার বিবাহ দেন। সে ঘরে উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) জন্ম গ্রহণ করেন। নবী করিম (দঃ) উসামা (রাঃ) কে আপন নাতিতুল্য আদর করতেন। মক্কা বিজয়ের দিনে তিনি আপন উটের পিছনে যুবক উসামাকে (রাঃ) বসিয়েছিলেন। নবী করিম (দঃ) ইনতিকালের পূর্বমূহুর্তে উসামা (রাঃ) কে সেনাপতি করে এক অভিযান প্রেরণ করেছিলেন–৮ম হিজরীতে সংঘটিত মুতার যুদ্ধের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য। কিন্তু হুযুর (দঃ)-এর শেষ অবস্থার সংবাদে পথিমধ্য হতে উসামা (রাঃ) মদিনায় ফিরে আসেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) খলিফা নিযুক্ত হয়ে রবিউল আউয়াল মাসের শেষের দিকে উসামার (রাঃ) নেতৃত্বে স্থগিত অভিযানটি পুনরায় প্রেরণ করেন। যুদ্ধে রোম বাহিনীকে পরাজিত করে মুতার যুদ্ধের প্রতিশোধ নিয়ে এবং বিপুল গনিমতের মাল নিয়ে তিনি মদিনায় ফিরে আসেন। এই বিজয়ে মুসলমানদের মধ্যে নূতন শক্তির সঞ্চয় হয়েছিল এবং পরবর্তী অভিযানসমূহে এই বিজয় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

যা হোক- মক্কায় ফিরে আসার পর নবী করিম (দঃ)-এর লালন পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন দাদা আবদুল মোত্তালিব। দুই বৎসর দাদার আপত্যস্নেহে লালিত পালিত হয়ে ৮ বৎসর বয়সে নবী করিম (দঃ) দাদার ছায়া থেকেও বঞ্চিত হন। আবদুল মোত্তালিব আপন নাতী কিশোর নবীকে কত ভালবাসতেন, তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন ইবনে কাছির তাঁর বেদায়া ও নেহায়া গ্রন্থে। খানায়ে কা'বার মোতাওয়াল্লী হিসেবে আবদুল মোত্তালিবের ছিল বিরাট প্রতাপ। হেরেম শরীফের চত্বরে আবদুল মোত্তালিবের জন্য ফরাশ বিছানো হতো এবং ঐ বিছানায় অন্য কেউ বস্‌তে পারতোনা। কিন্তু কিশোর নবী দাদার আগমনের পূর্বেই এসে ঐ ফরাশে বসে যেতেন। আবদুল মোত্তালিবের আগমন হলে হুযুরের চাচাগণ তাঁকে টেনে সরিয়ে আন্‌তে চেষ্টা করতো। কিন্তু আবদুল মোত্তালিব তাদেরকে বারন করতেন এবং নবী করিম (দঃ)-এর পিঠে হাত বুলিয়ে নিজের কাছে টেনে নিতেন আর বলতেন- **"মোহাম্মদ (দঃ)-এর মর্যাদা অনেক অনেক উচুঁ হবে"**। আবদুল মোত্তালিবের মৃত্যু ঘনিয়ে আসলে একদিন উম্মে আয়মনকে ডেকে বললেন- "হে বারাকাহ্‌, আমার এই সন্তানের যত্ন করতে তুমি ভুলে যেয়োনা। কেননা, আমি আহলে কিতাবদেরকে বলাবলি করতে শুনেছি যে, আমার এই সন্তান শেষ যামানার নবী হবেন"। (বেদায়া ও নেহায়া)

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

চতুর্দশ অধ্যায়

পিতৃব্য খাজা আবু তালিবের প্রতিপালনে

প্রসঙ্গ ঃ নবুয়ত প্রকাশের পূর্বাভাস-ব্যবস্যা শুরু

খাজা আবদুল মোত্তালিব তাঁর মৃত্যুকালে বড় পুত্র আবু তালেবকে ডেকে নবী করিম (দঃ)-এর লালন-পালনের দায়িত্ব তার হাতে অর্পণ করেন। সেসময় থেকে ২৫ বৎসর বয়সকাল পর্যন্ত নবী করিম (দঃ) ১৭ বছর আপন চাচার সরাসরি তত্ত্বাবধানে থাকেন। এ সময়ের মধ্যেই নবী করিম (দঃ)-এর মানবীয় ও সামাজিক গুণাবলী প্রকাশ পেতে শুরু করে এবং সামাজিক কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে তিনি সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও আমানতদারীর গুণাবলী প্রদর্শন করে **"আল-আমীন"** খেতাবে ভূষিত হন। আবু তালেব আপন ভাতিজাকে নিজের সন্তানের চেয়ে বেশী স্নেহ করতেন। নবী করিম (দঃ) কে ছাড়া তিনি কখনও আহার করতেননা। সকালের নাস্তা করার জন্য আবু তালেবের অন্যান্য সন্তানগণসহ একত্রে নাস্তা করতে বসলে বালকদের স্বভাব-সুলভ খানা নিয়ে কাড়াকাড়ি করার ঘটনা ঘটে যেত। নবী করিম (দঃ) তখন হাত গুটিয়ে বসে থাকতেন। কাড়াকাড়িতে অংশ নিতেন না। এই ছিল নবী করিম (দঃ)-এর আদর্শ আচরণ। এ অবস্থা দেখে চাচা তাঁর নাস্তা পৃথক করে দিতেন। নবী করিম (দঃ) যখন তাদের সাথে খানা খেতেন, তখন সকলেই তৃপ্ত হতেন। এটা ছিল নবী করিম (দঃ)-এর কিশোরকালের বরকত।

যখন নবী করিম (দঃ)-এর বয়স ১২/১৪ বৎসর-তখন তিনি পিতৃব্য আবু তালেবের সাথে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে বাণিজ্য কাফেলায় শরীক হওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে খাজা আবু তালেব তাঁকে সফরসঙ্গী করে নেন। পথিমধ্যে **বোছরা নামক স্থানে বোহায়রা** নামক এক খৃষ্টান পাদ্রীর গির্জার নিকট দিয়ে বাণিজ্য কাফেলা গমনকালে বোহায়রা পাদ্রী কিছু আশ্চর্য্যজনক ঘটনা প্রত্যক্ষ করে ঐ কাফেলার সকলকে তাঁর গির্জায় দাওয়াত করেন। তাদের জন্য তিনি খানাও তৈরী করেন। সবাই উক্ত যিয়াফতে যোগদান করে। কিন্তু নবী করিম (দঃ) কে মাল সামানার

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

পাহারায় রেখে যায়। বোহায়রা পাদ্রী রাসূলুল্লাহ (দঃ) কে উক্ত খানার মজলিসে শামিল করতে নির্দেশ দিলে হুযুর (দঃ) কে আনা হলো। বোহায়রা পাদ্রী নবী করিম (দঃ)-এর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললো- **"লাত ওজজার কসম দিয়ে আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই-সঠিক উত্তর দেবেন"**।

নবী করিম (দঃ) প্রতিবাদ করে বললেন- লাত উজজার শপথ করে আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। **তখন বোহায়রা পাদ্রী আল্লাহর শপথ দিয়ে নবী করিম (দঃ)-এর নিদ্রা, দৈনন্দিন কার্যাদি সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করেন। নবী করিম (দঃ) নিজ অবস্থা বর্ণনা করেন। তখন বোহায়রা পাদ্রী নবী করিম (দঃ)-এর হাত ধরে বলে উঠলেন, "ইনি সাইয়েদুল আলামীন, রাসুলু রাব্বিল আলামীন, রাহমাতুল্লীল আলামীন"** (বায়হাকী)।

তাঁর এই মন্তব্যের কারণ সম্পর্কে কোরেশগণ জিজ্ঞেস করলে পাদ্রী বললেন, "আপনারা যখন গিরিপথ পার হয়ে আসছিলেন, তখন আমি দেখতে পেলাম-প্রতিটি পাথর ও বৃক্ষ এই বালককে সম্মানসুচক সিজদা করছে। নবী ব্যতীত অন্য কাউকে পাথর ও বৃক্ষরাজি সিজদা করেনা"। আমি আরও লক্ষ্য করেছি-আপনাদের কাফেলার উপর একখন্ড মেঘমালা এই বালকের মাথার উপর ছায়া দিচ্ছে। এতেই আমি প্রমাণ পেয়েছি যে, ইনিই শেষ যুগের নবী"। আবু তালেবকে লক্ষ্য করে পাদ্রী বললেন, "আপনি এখান থেকেই বেচাকেনা সেরে আপন ভাতিজাকে নিয়ে মক্কায় ফিরে যান। কেননা, সামনে ইহুদী শত্রুরা তাঁকে শহীদ করে দিতে পারে- (বেদায়া ও নেহায়া)। এভাবেই নবুয়তের পূর্বাভাস প্রকাশ পেতে শুরু করলো। ইহাকে ইর্‌হাছাত বা পূর্বাভাস বলা হয়।

ফিজার যুদ্ধে যোগদান ও হিলফুল ফুযুল গঠন

ইবনে হিশামের বর্ণনামতে-চৌদ্দ বছর এবং ইবনে ইসহাকের বর্ণনামতে বিশ বছর বয়সের সময় নবী করিম (দঃ) আপন চাচাদের সাথে ফিজার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই যুদ্ধে অনেক লোক হতাহত হয়। অনেক নারী বিধবা হয় এবং অনেক শিশু ইয়াতিম হয়ে পড়ে। দেশে এক ভয়াবহ অরাজকতা দেখা দেয়। তখন নবী করিম (দঃ) সমমনা কিছু লোক নিয়ে মযলুমের

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

সাহায্যার্থে একটি সেবাসংঘ গঠন করেন। এই সেবা সংগঠনের নাম রাখা হয় "হিলফুল ফুযুল" বা ফযলদের সংঘ। ফযল, ফুযাইল ও আফযল নামে তিনজন লোক এই সংগঠনের ব্যাপারে বিশেষ অবদান রাখার কারণে তাদের নামে এই নামকরণ করা হয় (বেদায়া ও নেহায়া)। এই সংঘের মাধ্যমে নবী করিম (দঃ) সমাজ সেবার এক মহান আদর্শ স্থাপন করেন।

যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের বিধবা, শিশু ও নিরাশ্রয়ের পুনর্বাসনে হিলফুল ফুযুলের মাধ্যমে নবী করিম (দঃ) সমাজ সেবার এক উত্তম আদর্শ স্থাপন করেন। অন্যায়ের প্রতিরোধ করা ছিল এই সংঘের লক্ষ্য। সততা ও মানবসেবায় অল্পদিনের মধ্যেই এই সংগঠন গোটা আরবে পরিচিতি লাভ করে এবং সাংগঠনিক কার্যক্রমের মাধ্যমে নবী করিম (দঃ) মানুষের কাছে অতি প্রিয় হয়ে উঠেন। এভাবে হাবিবে কিবরিয়া (দঃ) যুবকদের জন্যে এক মহান আদর্শ স্থাপন করেন– যা বর্তমানে রেড ক্রিসেন্ট নামে পৃথিবীময় আদর্শ হিসেবে ছড়িয়ে পড়েছে।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

পঞ্চদশ অধ্যায়

বিবাহ জীবনে প্রবেশ

প্রসঙ্গ ঃ বিবি খাদিজা (রাঃ)-এর সাথে বিবাহ বন্ধন এবং ব্যবসায়ী জীবন যাপন ও সামাজিক সেবায় আত্মনিয়োগ

বিবি খাদিজা (রাঃ)-এর সাথে হুযুর আকরাম (দঃ)-এর বিবাহ বন্ধন তাঁর সততা, বিশ্বস্ততা ও আমনতদারীর এক উজ্জ্বল ফসল। বিবি খাদিজা (রাঃ) আরবের ধনাঢ্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে অন্যতমা ছিলেন। ইয়েমেন, সিরিয়া, মদিনা ও বোছরা শহরে ছিল তাঁর বাণিজ্য কুঠি। তিনি লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বের (মুদারাবা) ভিত্তিতে তাঁর ব্যবসায়ে লোক নিয়োগ করতেন। নবী করিম (দঃ)-এর সত্যবাদিতা, আমানতদারী ও চরিত্র মাধূর্যের কথা শুনে তাঁর ব্যবসার দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব পেশ করলে নবী করিম (দঃ) সানন্দচিত্তে তাতে রাজী হন। বিবি খাদিজার (রাঃ) বিশ্বস্ত গোলাম মাইছারাকে সাথে করে নবী করিম (দঃ) বিবি খাদিজার বাণিজ্যপণ্য নিয়ে সিরিয়ায় গমন করেন এবং প্রচুর লাভ করে মক্কায় ফিরে আসেন।

পথিমধ্যে মাইছারা দেখতে পায়- দু'জন ফিরিস্তা নবী করিম (দঃ) কে সূর্যের তাপ থেকে পাখা বিছিয়ে ছায়া দিচ্ছে। মক্কায় ফিরে মাইছারা আপন মনিব বিবিকে এ সংবাদ দিলে বিবি খাদিজা (রাঃ) শুনে মুগ্ধ হয়ে যান এবং মনে মনে নবীজীর চরণে আপন জীবন সমর্পণ করার সংকল্প করেন। তিনি ছিলেন একে একে দুই স্বামীহারা বিধবা- ৪০ বছর বয়স্কা মহিলা। চরিত্রমাধূর্যে লোকে তাঁকে তাহেরা (পবিত্রা) উপাধিতে ভূষিত করেছিল। তিনি আপন গোলামের মাধ্যমে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন। নবী করিম (দঃ) আপন চাচাদের মতামত নিয়ে জানাবেন বলে জবাব দিলেন। এই প্রস্তাবে আবু তালেব, হামযা ও আব্বাস সানন্দে রাজী হলেন এবং সামাজিক প্রথানুযায়ী বিবাহের কাজ সম্পন্ন হয়। তখন নবী করিম (দঃ)-এর বয়স ছিল পঁচিশ বৎসর।

এই বিবাহে খোত্‌বা পাঠ করেন আবু তালেব। খুতবার সারমর্ম ছিল এই-**"আমি ঐ আল্লাহর প্রশংসা করছি- যিনি আমাদেরকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশে এবং হযরত ইসমাইল (আঃ) কর্তৃক আবাদকৃত মক্কা ভূমিতে স্থাপিত করেছেন এবং বংশ পরম্পরায় মাআদ ও মুদার গোত্রের মূল শাখার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি আমাদেরকে তাঁর পবিত্র হেরেমের পরিচালক ও তাঁর ঘরের সেবক নিযুক্ত**

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

করেছেন এবং মক্কায় বসবাসকারী জনপদের উপর আমাদেরকে শাসক নিযুক্ত করেছেন। আমার এই ভাতিজা মোহাম্মদ ইব্‌নে আবদুল্লাহকে যেকোন লোকের সাথে তুলনা করা হলে তাঁর ওজনই ভারী হবে। যদিও আর্থিক স্বচ্ছলতা তাঁর নেই, অর্থসম্পদতো ঢলেপড়া ছায়ামাত্র,–তবুও তাঁর আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কে আপনারা সবাই অবগত রয়েছেন"।

খুতবা শেষে ১২ উকিয়া রৌপ্য বা ৪৮০ দিরহাম মোহরানার বিনিময়ে হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর নিকট বিবাহের প্রস্তাব প্রেরণ করেন। হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর পক্ষে তাঁর চাচা উকিল হয়ে এই বিবাহকার্য্য সম্পাদন করেন। "আল আমীন" (দঃ) ও "তাহেরা" (রাঃ) দম্পতির দাম্পত্য জীবন কেটেছিল ২৫ বৎসর। বিবি খাদিজা (রাঃ) আদর্শস্বামী পেয়ে জীবন ও অর্থ সম্পদ সব কিছু নবীজীর (দঃ) চরণতলে সঁপে দিলেন। তাঁদের পবিত্র সংসারে হযরত কাসেম, হযরত যয়নব, হযরত আবদুল্লাহ, হযরত রোকাইয়া, হযরত উম্মে কুলসুম ও হযরত বিবি ফাতেমা (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। অন্য রেওয়ায়াত মতে ইবনে হিশাম হযরত তৈয়ব ও হযরত তাহের নামে আরও দু'জন সাহেবজাদার নাম উল্লেখ করেছেন। এ হিসাবে বিবি খাদিজার ঘরে নবী করিম (দঃ)-এর চার সাহেবজাদা ও চার সাহেবজাদী- মোট আটজন সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। চার সাহেবজাদা শৈশবেই ইনতিকাল করেন। সাহেবজাদী সকলেই নবুয়ত যুগ পেয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন ও বিবাহিতা জীবন যাপন করেন। সবচেয়ে ছোট ও প্রিয় কন্যা বেহেস্তের নারীগণের সর্দার হযরত বিবি ফাতিমা (রাঃ)-এর সন্তানগণই কিয়ামত পর্যন্ত প্রকৃত সাইয়্যেদ খান্দান নামে অভিহিত। অন্য কেউ বংশ পরিচয়ের ক্ষেত্রে আইনগত সাইয়্যেদ হতে পারবেননা। তবে সম্মানসূচক "সাইয়্যিদ" শব্দ অন্যান্য সাহাবীদের বংশধরের নামের সাথেও যোগ করা যাবে। ইমাম হাসান-হোসাইন (রাঃ)-এর বংশ ছাড়া কেউ 'আওলাদে রাসূল' দাবী করলে তা মিথ্যা হবে। আজকাল সৈয়দ বা আওলাদে রাসুল নাম ধারণ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়– যার কারণে প্রকৃত সাইয়্যেদ বা আওলাদে রাসূল খুঁজে বের করা কষ্টকর হয়ে পড়েছে। ইমাম হাসান-হোসাইন (রাঃ) পর্যন্ত পুরুষ কুষ্ঠিনামা বা নসবনামা প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হলে তাঁকে প্রকৃত সাইয়্যেদ বা আওলাদে রাসুল বলা যাবে না। পিতা সাইয়েদ না হলে মায়ের কারণে সন্তানগণ সৈয়দ বলে গণ্য হবে না।

হযরত বিবি খাদিজা (রাঃ) হুযুরের নবুয়ত ঘোষণার পূর্বে ১৫ বৎসর এবং নবুয়ত ঘোষণার পর ১০ বৎসর হুযুর (দঃ)-এর ঘর-সংসার করেছেন। তাঁর অগাধ

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

সম্পদ নবীজীর চরণে সঁপে দিয়েছিলেন। নবী করিম (দঃ) গরীব, মিছকিন, ইয়াতীম, কাঙ্গাল, বিধবা ও সহায় সম্বলহীন জনগণের পুনর্বাসনে সব সম্পদ দান করে দেন। মক্কার কোরেশগণ কর্তৃক তিন বৎসরকাল 'বয়কট' সময়ে বিবি খাদিজা (রাঃ) নবী করিম (দঃ)-এর সাথে নির্বাসিত জীবন যাপন করেছিলেন এবং ক্ষুধার তাড়নায় গাছের ছাল বাকল পর্যন্ত খেয়েছিলেন। একজন ধনবতী মহিলার এই স্বামীপ্রেম ও আত্মত্যাগের আদর্শ একমাত্র আউয়ুব (আঃ)-এর বিবি ও ইউসুফ (আঃ)-এর কন্যা হযরত রহিমার সাথেই তুলনীয় হতে পারে। আমাদের নারীসমাজ আজ কোন্ পথে চলছেন? (তাফসীরে সাভী সূরা ইউসুফ ১৩ পারা)

নবী করিম (দঃ)-এর দাম্পত্য জীবনের প্রথম ১৫ বৎসরের বিস্তারিত দৈনন্দিন ঘটনাবলী জানা না গেলেও মোটামুটিভাবে নিম্নরূপ ছিল। ২৭ বৎসর বয়সে হুযুর আকরাম (দঃ)-এর প্রথম সন্তান হযরত কাশেম (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন এবং দুই বৎসর পর ইনতিকাল করেন। ৩০ বৎসর বয়সের সময় বিবি যয়নাব (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। এর পর পর অন্যান্য সাহেবজাদা ও সাহেবজাদীগণ জন্মগ্রহণ করেন ৪০ বৎসর বয়সের মধ্যেই।

যখন নবী করিম (দঃ)-এর বয়স ৩২ বৎসর, তখন আপন চাচাত ভাই হযরত আলী (রাঃ)-এর জন্ম হয়। জন্মের পর নবী করিম (দঃ) আপন চাচা আবু তালেবের নিকট থেকে হযরত আলীকে লালন-পালনের জন্য নিজের কাছে নিয়ে আসেন। বিবি খাদিজা (রাঃ) আপন সন্তানবৎ হযরত আলীকে লালন পালন করেন। এটা ছিল চাচার প্রতিপালনের বিনিময়ে প্রতিদানস্বরূপ। হযরত আলী (রাঃ) শিশুকাল থেকেই নবী করিম (দঃ)-এর বিশেষ যত্নে ও সান্নিধ্যে গড়ে উঠেন এবং পরবর্তীকালে বিবি ফাতেমা (রাঃ)-এর যোগ্য স্বামী হবার গৌরব অর্জন করেন। আল্লাহ তায়ালার নির্দেশেই হযরত আলীর (রাঃ) সাথে বিবি ফাতেমার (রাঃ) বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল।

বিবি খাদিজার (রাঃ) ব্যবসার দায়িত্ব গ্রহণকাল থেকে বিবাহোত্তর ১৫ বৎরের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়–

(১) নবী করিম (দঃ) যৌবনের প্রারম্ভেই "আল আমীন" খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন– যা ছিল দুর্লভ গৌরব।

(২) হুযুর আকরাম (দঃ) জীবিকা অর্জনের জন্য মেষ চড়ানো ও ব্যবসা বাণিজ্যের কাজ করতেন। হুযুর আকরাম (দঃ) এরশাদ করেন, "সকল নবীগণই

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

নিজ হাতে অর্জিত হালাল রুজী দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। আমানতদার সত্যবাদী ব্যবসায়ীগণ কিয়ামতের দিনে নবীগণ, ছিদ্দিকগণ ও শহীদগণের সাথে থাকবেন।" মিশকাত।

(৩) বিবি খাদিজার (রাঃ) সম্পদ লাভ করেও নবী করিম (দঃ) মনিকাঞ্চনে বিভোর ছিলেননা। সম্পদ ছিল তাঁর আয়ত্বাধীন। তিনি কখনও সম্পদের অধীন বা ভোগ-বিলাসী ছিলেন না। এখানেই দুনিয়া ও আখেরাতের পার্থক্য নির্ধারিত হয়।

(৪) অসহায়, ইয়াতীম, বিধবা, গরীব-মিছকিনদের সেবা করা নবীজীবনের প্রথম উত্তম সমাজ সেবামূলক কাজ ছিল।

(৫) কেউ উপকার করলে তার বিনিময়ে প্রতিদান দেয়া ও স্বীকৃতি প্রদান করা নবীজীর তরিক্বা। যেমন, তিনি করেছিলেন হযরত আলীর প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

(৬) চরিত্র মাধূর্য্য বড় সম্পদ। চরিত্রবান লোক সকলের নিকটই প্রশংসার পাত্র।

(৭) বিবাহবন্ধন একটি পবিত্র কাজ ও সভ্যতার মূলভিত্তি। একাজে অভিভাবকগণের সম্মতি জরুরী। বর্তমানকালের যুবক-যুবতীগণ এ আদর্শ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। নতুবা আদালতে জনসমক্ষে অপমানিত হতে হবে এবং পরবর্তী দাম্পত্যজীবনও বিষময় হয়ে উঠবে।

(৮) দাম্পত্য জীবনের উদ্দেশ্য হলো-সন্তানাদির দায়দায়িত্ব গ্রহণ করা- শুধু ভোগ বিলাস নয়।

(৯) বৈরাগী জীবন ইসলাম সম্মত নয়। 'লা রাহ্বানিয়াতা ফিল ইসলাম'।

(১০) নবী করিম (দঃ)-এর নবুয়তপূর্ব এবং নবুয়ত পরবর্তী সমগ্র জীবনই আমাদের জন্য আদর্শ। যারা শুধু ২৩ বৎসরকে মডেল ধরে ইসলামের নামে সংগ্রাম করে, তারা ভ্রান্ত।

(১১) শিশুকাল হতেই নবুয়তের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ এবং বাণিজ্য কাফেলায় ফিরিস্তাদ্বয়ের ছায়া প্রদান নবুয়ত প্রকাশের পূর্বাভাস।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ষোড়শ অধ্যায়

কা'বাগৃহ পুনঃনির্মাণ

প্রসঙ্গ ঃ হজরে আস্ওয়াদ স্থাপনে নবীজীর ভূমিকা ও প্রজ্ঞা

পবিত্র কা'বাগৃহ পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম মসজিদ। সপ্ত আকাশের উপরে ফিরিস্তাগণের মসজিদের নাম বাইতুল মা'মুর। তার সোজা নীচে জমিনের বুকে খানায়ে কা'বা নির্মিত হয়। এই পবিত্র কা'বাগৃহ সর্বপ্রথম ফিরিস্তাগণ নির্মাণ করেন। দ্বিতীয়বার নির্মাণ করেন হযরত আদম (আঃ)।

নূহ (আঃ)-এর তুফানের পর পুনঃনির্মাণ করেন হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাইল (আঃ)। কোরআন মজিদে এই নির্মাণের কথা অতি গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। সর্বপ্রথম হজ্বের আদেশ দেয়া হয় হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে। একারণেই এই নির্মাণ প্রসিদ্ধি লাভ করে। এরপর মেরামত করা হয় আমালেকা গোত্র কর্তৃক। এরপর মেরামত করে জুরহাম গোত্র। এরা ইয়েমেনের বাসিন্দা এবং মক্কায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী। এরপর কুশাই ইবনে কিলাব কর্তৃক মেরামত করা হয়। এরপর কাবাগৃহ পুনঃনির্মাণ করা হয় কোরেশগণ কর্তৃক। ৯ম বার হাতীমে কা'বাসহ পুনঃনির্মাণ করেন হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে যুবাইর (রাঃ) ৬৪ হিজরীতে এবং দশমবার ও শেষবারের মত হাতীমকে বাদ দিয়ে উমাইয়া শাসক আবদুল মালিকের নির্দেশে তাঁর পূর্বাঞ্চলীয় গভর্ণর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ পুনঃনির্মাণ করে। নবম ও দশমবার নির্মাণ এবং পুনঃনির্মাণের কারণ বিস্তারিতভাবে ইতিহাসে বর্ণিত আছে (রুহুল বয়ান)। এরপর শুধু মেরামত হয়েছে–পুনঃনির্মাণ হয়নি। শুধু মসজিদে হারাম বারবার বর্ধিতকরণ করা হয়েছে। আমরা উমাইয়া নির্মিত কা'বা ঘরের হজ্ব করছি। ইমাম মালেক (রঃ) আব্বাসীর খলীফা মনসুরের যুগে কা'বা ভাঙ্গার অনুমতি দেননি।

অষ্টমবার কাবাগৃহ পুনঃনির্মাণের সময় অর্থ ও সামগ্রী সংকট দেখা দিলে কোরেশগণ কিয়দাংশ বাদ রেখে কা'বাগৃহ পুনঃনির্মাণ করে। এই অংশটুকুকে হাতীমে কা'বা বলা হয়। যখন নবী করিম (দঃ)-এর বয়স ৩৫ বৎসর, তখন এই নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। অন্যদের সাথে নবী করিম (দঃ) নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করেন। তিনি পাথর বহন করে এনে যোগান দিতেন। ক[illegible]গৃহের

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ভিত উঁচু হলে হাজরে আসওয়াদ (কাল পাথর) স্থাপন নিয়ে কোরাইশ সর্দারগণের মধ্যে বিবাদ দেখা দেয়। প্রত্যেক গোত্রই নিজেরা হজরে আসওয়াদ স্বস্থানে স্থাপন করার জন্য জিদ ধরতে থাকে। এমনকি–এক পর্যায়ে দাঙ্গা হাঙ্গামারও উপক্রম হয়। তাদের মধ্যে কয়েকজন বুদ্ধিমান লোক পরামর্শ সভার আয়োজন করে। এ ব্যাপারে মীমাংসার পথ বের করার জন্য প্রস্তাব আহ্বান করলে সকলে মিলে এই প্রস্তাব পাশ করলো যে, আগামীকাল ভোরে যিনিই কা'বাগৃহে সর্বাগ্রে আগমন করবেন– তাঁর ফয়সালাই সকলে মেনে নেবে।

আল্লাহ্‌র অসীম কুদরতে পরদিন ভোরে সকলের আগে আল্লাহর হাবীব (দঃ) কা'বাগৃহে আগমন করেন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক হুযুর আকরাম (দঃ)-এর উপর হাজরে আসওয়াদ স্থাপনের মীমাংসার ভার ন্যাস্ত হয়। নবী করিম (দঃ) আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানে জ্ঞানী ছিলেন। তিনি একখানা চাদরের উপর পাথরখানা স্থাপন করে সকল সর্দারকে চাদরের কোণা ধরতে বললেন। সকলেই চাদরের কোণা ধরে নির্ধারিত স্থানে পাথরখানা নিয়ে যান। এরপর নবী করিম (দঃ) নিজ পবিত্র হাতে পাথরখানা তুলে যথাস্থানে স্থাপন করে দেন। সকল সর্দার এই কৌশলী ব্যবস্থায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন এবং নবীজীর প্রজ্ঞার প্রশংসা করতে লাগলেন। প্রকৃতপক্ষে সে দিনই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল–ভবিষ্যতে মক্কার সুযোগ্য নেতৃত্ব দেবার মত উপযুক্ত মহান ব্যক্তিত্ব কে হবেন। একদিকে আল্লাহর পবিত্র গৃহের পবিত্র পাথর স্থাপনে শরিক হয়ে বিরল গৌরব অর্জন করে কোরেশ সর্দারগণ ধন্য হলো, অন্যদিকে রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীনের পবিত্র হাতের পরশ পেয়ে হাজরে আসওয়াদও ধন্য হলো।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

সপ্তদশ অধ্যায়

আবির্ভাব

প্রসঙ্গ ঃ আত্মপ্রকাশের পূর্বাভাস– নির্জন সাধনা ও গিরিগুহায় চিল্লাকাশী

আল্লাহর প্রিয় হাবীব (দঃ)-এর বয়স যখন পঁয়ত্রিশ অতিক্রম করলো– তখন থেকেই তিনি নির্জনতা বেশী পছন্দ করতেন এবং কয়েক দিনের খাদ্য সাথে নিয়ে মক্কার ৩ মাইল পূর্বে হেরা পর্বতের চূড়ায় চলে যেতেন। তিনি পর্বতের সর্বোচ্চ চূড়া গীরিগুহায় একাকী বসে বসে ইবাদত বন্দেগী ও ধ্যান করতেন। উক্ত গুহায় নির্জন ইবাদতের কারণ ছিল এই–সেখান থেকে খানায়ে কা'বা দৃষ্টিগোচর হতো। উপরে আকাশের নিলীমা এবং সম্মুখে আল্লাহর ঘর, আর নির্জন নিথর প্রকৃতি-সব মিলিয়ে তিনি ধ্যানের রাজ্যে ডুবে যেতেন। এটা ছিল নবী করিম (দঃ)-এর পবিত্র চিল্লা।

[বর্তমানে এক ধরনের চিল্লাতে বের হয় তাবলীগ জামাত। তারা মসজিদে থাকে, বারান্দায় রান্না করে ও খায় এবং মানুষের ঘরে ঘরে গাশ্ত করে। এটাকে তারা নাম দিয়েছে চিল্লা। কোন নবী, কোন সাহাবী বা কোন অলী-গাউস এ ধরনের চিল্লা করেননি। সুতরাং এ নাম গ্রহণ করে তারা মানুষকে ধোকা দিচ্ছে। তাদের চিল্লার কোন ভিত্তি নেই।]

নবী করিম (দঃ)-এর খাদ্য ফুরিয়ে গেলে তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করে খাদ্য নিয়ে পুনরায় চলে যেতেন হেরা গুহায়। একাজে সহায়তা করতেন পতিপ্রাণা বিবি হযরত খাদিজা (রাঃ)। যতই দিন যেতে লাগলো, হুযুর আকরাম (দঃ)-এর ধ্যানের গভীরতাও ততই বাড়তে লাগলো। পূর্ণিমার চাঁদের আকর্ষণে সাগরের পানি যেভাবে উথ্‌লে উঠে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের প্রেমাকর্ষণে নবী করিম (দঃ)-এর হৃদয় সাগরেও তেমনিভাবে প্রেমের জোয়ার উথ্‌লে উঠতে থাকে। প্রেমিক আর প্রেমাস্পদ ছাড়া এ আকর্ষণ অন্য কেউ অনুভব করতে পারবেনা। এ যেন মহান দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বপ্রস্তুতি পর্ব। ৪০ বৎসর পূর্ণ হওয়া মাত্রই ১২ই রবিউল আউয়াল থেকে ওহীর সাতটি স্তরের প্রথম স্তর অবতীর্ণ হওয়া শুরু হলো– অর্থাৎ "সত্যস্বপ্ন দর্শন"। এভাবে ছয়মাস কেটে গেল। এই ৬ মাসকে নবী করিম (দঃ) নবুয়তের ৪৬ ভাগের এক ভাগ বলে হাদীসে উল্লেখ করেছেন–

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

অর্থাৎ ৪৬ ভাগের একভাগ ছিল ৬ মাস "সত্যস্বপ্ন দর্শন" (মিরকাত)। ৭ম মাসে অর্থাৎ রমযানের শবে ক্বদর সোমবার রাত্রে প্রথম প্রত্যক্ষ ওহী (কোরআন) নাযিল শুরু হয়। বোখারী শরীফের প্রারম্ভে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে দেখা যায়– ওহী নাযিলের সূচনা হয় সত্যস্বপ্ন দ্বারা। নবী করিম (দঃ) যে কোন স্বপ্ন দেখতেন, দিনের বেলার সূর্যালোকের ন্যায় তা বাস্তবে ঘটে যেত। এটা হলো ওহী নাযিলের সাতটি প্রক্রিয়ার মধ্যে একটি অন্যতম প্রক্রিয়া। এটা জিব্রাইলের মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি আল্লাহর পক্ষ হতে হতো। নবীগণের স্বপ্নও ওহী। এজন্য তাঁদের স্বপ্নের মাধ্যমে প্রাপ্ত নির্দেশ শরীয়তের অংশ হতো। অন্যকোন অলী বা গাউছের স্বপ্ন সত্য হলেও তা শরীয়ত বলে গণ্য হবে না এবং নবুয়তের অংশও হবেনা।

সুতরাং স্বপ্নে প্রাপ্ত তাবলীগের ৬ অছুল বা নিয়মকে শরীয়ত বলে প্রচার করা এবং স্বপ্নের এই ছয় অছুলকে 'পূর্ণাঙ্গ ইসলামের রূপ' বলে প্রচার করা হারাম। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ছয় অছুলী তাবলীগ জামাত তাদের ছয় অছুলকে ইসলামের পূর্ণরূপ বলে "দাওয়াতে তাবলীগ" নামক পুস্তকে উল্লেখ করেছে। মূলতঃ তাবলীগ জামাতের ছয় অছুল স্বপ্নে প্রাপ্ত। মৌলভী ইলিয়াছ (প্রতিষ্ঠাতা তাবলীগ জামাত) নিজেই বলেছেন যে, "তাবলীগের পূর্ণাঙ্গ তরিকাটি আমার স্বপ্নে প্রাপ্ত"। (মলফুযাত ৫০নং)। স্বপ্নপ্রাপ্ত জিনিসকে দ্বীন নাম দিয়ে প্রচার করা বেদ্বীনী কাজ এবং মসজিদ ব্যবহার করা অবৈধ।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর তরফ থেকে অবতীর্ণ হুকুম আহকামের তাবলীগ করার জন্য নবী করিম (দঃ) কে নির্দেশ করেছেন। (সূরা মায়েদা) সুতরাং তাবলীগ করতে হলে ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত ইসলামের ৫ অছুলের তাবলীগ করতে হবে–দিল্লীর স্বপ্নেপ্রাপ্ত তাবলীগ নয়। কেননা, এটা আসমান থেকে অবতীর্ণ নয়। কারও ব্যক্তিগত নীতিমালা বা অছুলকে তাবলীগ নাম দেওয়া হারাম। **নবী করিম (দঃ) ও সাহাবাগণের তাবলীগ ছিল কাফেরদের নিকট ওহীপ্রাপ্ত দ্বীনের দাওয়াত। এ ধরনের তাবলীগের হুকুমই কোরআনে দেয়া হয়েছে।** দিল্লীর তাবলীগ জামাত মুসলমানকে কাফের মনে করেই তাদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত দেয়। দ্বীনের দাওয়াত হয় কাফেরের কাছে। তাবলীগ জামাতের ৪২নং মলফুয মোতাবেক **"তাবলীগ জামাত ও তাদের সাহায্যকারী ব্যতিত অন্য**

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

কোন তৃতীয় মুসলমান নেই" (দেখুন মলফুজাতে ইলিয়াছ-৪২নং)। তারা সুন্নী মুসলমানকে অমুসলিম জ্ঞান করে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছায়। প্রমাণ হলো ৪২ নং মলফুজ।

মূলতঃ চিল্লা হচ্ছে তরিকতপন্থীদের নির্জন সাধনার নাম। হযরত বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ) চিল্লা করেছেন নির্জন জঙ্গলে ও বিরান মরুভূমিতে। হযরত খাজা গরীব নওয়ায (রাঃ) চিল্লা দিয়েছিলেন হযরত দাতাগঞ্জ বখশ (রাঃ)-এর মাযারে একাধারে ৪০ দিন। হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রহঃ) চিল্লা করেছিলেন যমুনা নদীর তীরে– দিল্লীর অদূরে। হযরত মুছা (আঃ) চিল্লা করেছিলেন ৪০ দিনের জন্যে তুর পর্বতে নির্জনে। আমাদের প্রিয় নবী (দঃ) চিল্লা করেছেন গারে হেরায়। লোকালয় থেকে দূরে একাকী নির্জন সাধনাকেই তরিকতের ভাষায় চিল্লা বলা হয়। আজকাল চিল্লা দিচ্ছে দলবেধে মসজিদে মসজিদে। এটা চিল্লার অবমাননা ও প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাবলীগ জামাত কর্তৃক মসজিদে মসজিদে গাঠুরী বোঝা নিয়ে ঘুরা ফেরা করতে চৌদ্দশত বৎসর পূর্বেই নবী করিম (দঃ) নিষেধ করেছেনঃ

لَا تُشَدُّ وا الرِّحَالُ اِلَّا اِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ ـ اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَالْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى وَمَسْجِدِ يْ هٰذَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ـ

অর্থ–**"তোমরা মক্কা, মদিনা ও বাইতুল মোকাদ্দাস–এই তিন মসজিদ ব্যতিত অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে গাঠুরী বোঝা নিয়ে সফর করোনা"** (বুখারী)।
[সেই ভবিষ্যৎবাণী ১৩৩৩ হিজরীতে বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছে। ওহাবীরা তাবলীগ জামাতের মাধ্যমে মসজিদগুলো সফর করে তা দখল করে এলাকায় ওহাবী আক্বিদা প্রতিষ্ঠিত করার গোপন স্কীম হাতে নিয়েছে। এই স্কীম বাস্তবায়ন করতে প্রথমে ৬ অছুলের বয়ান করে। পরে তাদেরকে কেন্দ্রে নিয়ে ওহাবী আক্বিদা শিক্ষা দেয়।]

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

অষ্টাদশ অধ্যায়

নবুয়্যতের অভিষেক বা দায়িত্ব অর্পণ

প্রসঙ্গ ঃ কুরআন নাযিলের প্রথম সূচনা ঃ

নবী করিম (দঃ)-এর বয়স যখন ৪০ বৎসর ৬ মাস ১৫ দিন, তখনই পবিত্র রমযানের শবে ক্বদর সোমবার রাত্রে কোরআন মজিদ নাযিলের ধারা সূচিত হয়। গভীর রাত-ঘন অন্ধকার, কৃষ্ণা তিথীর শেষাংশ। নবী করিম (দঃ) গভীর ধ্যানে মগ্ন। হযরত জিব্রাইল (আঃ) গারে হেরার চূড়ায় নবীজীর (দঃ) খেদমতে এসে উপস্থিত। তিনি কোরআন নাযিলের সূচনা করলেন এভাবে "ইকরা"– আপনি পাঠ করুন। শুধু একটি শব্দ। তিনবার উচ্চারণ করলেন জিব্রাইল (আঃ)। তিনবারই নবী করিম (দঃ) বললেন– মা আনা-বি-কারিয়ীন- "আমি পাঠক নই- বরং পাঠদানকারী"। হযরত জিব্রাইল (আঃ) তিনবার নবী করিম (দঃ) কে জোরে আলিঙ্গন করলেন। এতে জিব্রাইলের (আঃ) পরিশ্রম হলো। নবী করিম (দঃ) বলেন– **"আমার পক্ষ হতে জিব্রাইলের নিকট জহুদ বা কষ্ট পৌঁছলো"। এই আলিঙ্গন ছিল যাতে বশরী ও যাতে মালাকীর মধ্যে সমন্বয় সাধন। পরস্পর দুই যাতের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল, তা আলীঙ্গনের মাধ্যমে দূরীভূত হয়ে গেল। এখানে হুযুর (দঃ)-এর মালাকী ছুরত প্রকাশ পেল এবং জিব্রাইলও জাহেরী বশরী ছুরতের আধ্যাত্মিক পরশে ধন্য হলেন। আলিঙ্গনের এই অনুষ্ঠান ছিল ফয়েয আদান-প্রদানের আলিঙ্গন**। এক সীনা হতে অন্য সীনায় যে প্রবাহ গমন করে- তাকে ফয়েয বলা হয়। ইহা স্ফুলিঙ্গ সদৃশ। কারেন্ট যেভাবে প্রবাহিত হয়- ফয়েযও সেভাবে প্রবাহিত হয়। এজন্যই ইলমে মা'রেফাতকে ইলমে সীনা বলা হয় এবং শরীয়তের কিতাবী বিদ্যাকে বলা হয় ইলমে ছফীনা বা জাহাজী বিদ্যা।

হাদীস বিশারদগণের এটা আংশিক মতামত। তিনবার এই আনুষ্ঠানিকতা শেষে জিব্রাইল (আঃ) কোরআনের সুরা আলাক-এর প্রথম পাঁচটি আয়াত তিলাওয়াত করে শুনালেন। নবীজী পরে পাঠ করলেন। এভাবেই প্রত্যক্ষ অহী নাযিলের ধারা শুরু হলো।

এই পাঁচটি আয়াতই প্রথম প্রত্যক্ষ ওহী। সুতরাং এই পাঁচটি আয়াতের গুরুত্বও অপরিসীম। জ্ঞানের প্রথম সোপানই হলো পাঠ করা বা পড়া। কিন্তু মুসলমানরাই আজ জ্ঞানার্জনে সবচেয়ে অনগ্রসর। আমরা কোরআন সুন্নাহ

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ভিত্তিক জ্ঞান চর্চা করছিনা। তাই এই অধঃপতন। উক্ত পাঁচটি আয়াতে মানব সৃষ্টির দ্বিতীয় স্তর "আলাক" বা রক্তপিন্ড উপাদানের উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে– কলমের সাহায্যে আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন এবং মানুষের অজানা তত্ত্ব কামেল মানুষকে (নবীজীকে) শিখিয়েছেন। বৈজ্ঞানিকদের সৃষ্টি সম্পর্কে গবেষণার মূল সূত্র এই পাঁচটি আয়াত। এভাবেই সমস্ত সৃষ্টিতত্ত্ব ও জ্ঞানের উৎস নবী করিম (দঃ)-এর নিকট প্রকাশ করা হলো।

অতঃপর জিব্রাইল (আঃ) অদৃশ্য হয়ে গেলেন। নবী করিম (দঃ) গারে হেরা থেকে নেমে নীচে আসলেন। এমন সময় জিব্রাইল (আঃ) শূন্যলোক থেকে আপন মূল ছুরতে দেখা দিলেন এবং বললেন–**"আন্তা রাসুলুল্লাহ** ওয়া **আনা জিব্রাইল"**– "আপনি আল্লাহর মনোনীত রাসুল এবং আমি জিব্রাইল ফিরিস্তা"। মাওয়াহিব ল্যাদুন্নিয়া গ্রন্থে আল্লামা শাহাবুদ্দীন কাস্‌তুলানী (রাঃ) লিখেন– ঐ সময়ই হযরত জিব্রাইল (আঃ) জমিনে পদাঘাত করে পানি বের করে নিজে অযু করলেন এবং নবী করিম (দঃ) কে ওযু করার পদ্ধতি দেখিয়ে দিলেন। অযু শেষে হযরত জিব্রাইল (আঃ) দু'রাকাত নামায আদায় করলেন এবং হুযুর আকরাম (দঃ) কে দু'রাকাত নামায আদায় করতে বললেন। সেই সময় থেকে নবী করিম (দঃ) সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে সকালে ও সন্ধ্যায় দু'রাকাত করে ফজর ও মাগরিব নামায আদায় করতেন। এর ১১ বৎসর পাঁচ মাস পর যখন মে'রাজ শরীফে গমন করেন, তখন পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয় এবং মূল দু'রাকাআতের সাথে মাগরিবে এক রাকাত, যোহর, আছর ও এশাতে দু'রাকআত করে যোগ করা হয়।

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রঃ) কর্তৃক বর্ণিত নবুয়ত ধারার এই হাদীসখানা বোখারী শরীফে উল্লেখিত হয়েছে। হেরা গুহায় নবী করিম (দঃ) কে নবুয়তের দায়িত্বে অভিষিক্ত করা হয়। আরবীতে এই অভিষেককেই বি'ছাত বা মাব্‌আছ বলা হয়। প্রিয় নবী (দঃ) আদম সৃষ্টির পূর্বেই নবী হিসাবে মনোনীত ছিলেন। দায়িত্ব প্রদান করা হয় হেরা গুহাতে। এদিনেই "আউয়াল ও আখের নবী" উপাধীর রহস্য প্রকাশ পায়। আউয়াল, আখের, যাহের, বাতেন যেমন আল্লাহর সিফাতি নাম, তেমনিভাবে নবী করিম (দঃ)-এরও সিফাতি নাম (বেদায়া-নেহায়া ও মাওয়াহিব)।

[নবী করিম (দঃ) যখন আকাশে তারকা হিসাবে বিরাজমান ছিলেন, তখন ঐ জগতের পাঁচশত চার কোটি বৎসর যাহের এবং পাঁচশত চার কোটি বৎসর

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

বাতেন হিসাবে বিদ্যমান ছিলেন- বলে হযরত জিব্রাইল (আঃ) নবী করিম (দঃ)-এর দরবারে স্বীকার করেছেন। জিব্রাইলের মুখের এই স্বীকৃতি শুনে নবী করিম (দঃ) বললেন, " আল্লাহর কসম, আমিই সেই তারকা-হে জিব্রাইল"! ঐ সময়েও তিনি নবীই ছিলেন।

যাহের-বাতেন মিলিয়ে ঐ জগতের এক হাজার আট কোটি বৎসর পূর্বের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেয়া নবী করিম (দঃ) ব্যতীত অন্য কারও পক্ষে সম্ভব কি? এটাই তো গায়েবের এক বড় সংবাদ। নবী শব্দের মূল ধাতু নাবাউন। এর অর্থ "গোপন সংবাদ প্রদান"। প্রত্যেক নবীর তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকে। এক নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো- আল্লাহ প্রদত্ত গায়েবী এলেম, দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য- ফিরিস্তা দর্শন এবং তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো- আল্লাহ্ প্রদত্ত সরাসরি জ্ঞান বা ইলমে বদিহী। (ওহাবী লেখক সোলায়মান নদভীর সিরাতুন্নবী গ্রন্থের ৩য় খন্ড ১৬ ও ১৭ পৃষ্ঠা-উর্দ্দু)। সুতরাং নেতার কথা মেনে নেয়া তাদের উচিৎ।]

হেরাপর্বত থেকে অবতরণ করে নবী করিম (দঃ) সোজা বিবি খাদিজার (দঃ) নিকট চলে আসলেন এবং বললেন, "তোমরা আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও"। আকস্মিক ঘটনার স্বাভাবিক বিহবলতা কেটে যাওয়ার পর নবী করিম (দঃ) বিবি খাদিজার নিকট হেরা গুহার সব ঘটনা খুলে বললেন। বিবি খাদিজা (রাঃ) শান্ত্বনা দিয়ে নবী করিম (দঃ)-এর বিগত ১৫ বছরের চরিত্র মাধূর্য বর্ণনা করে বললেন, "আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন, আল্লাহ্র শপথ, নিশ্চয়ই আপনাকে আল্লাহ অপদস্ত করবেন না। কেননা, আপনি আত্নীয়-স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক রেখেছেন, কথায় সততার প্রমাণ দিয়েছেন, মানুষের দুঃখ লাঘব করেছেন, অতিথিদের সেবা করেছেন, সত্যপথে বিপদগ্রস্থদের সহযোগিতা করেছেন"। একথা বলে বিবি খাদিজা সর্বপ্রথম নবী করিম (দঃ)-এর উপর ঈমান আনয়ন করলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে নিজ স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর মহত্ত্বের প্রথম স্বীকৃতি প্রদান এক বিরল ঘটনা। ইংরেজ লেখক ওয়ার্ডস ওয়ার্থ বলেছেন, "কোন মানুষই নিজ স্ত্রীর কাছে হিরো বা সাধু সাজতে পারে না। কিন্তু মোহাম্মদ (দঃ)-এর বেলায় এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়"। (NO MAN IS HERO TO HIS VALET EXCEPT MOHAMMAD.)

প্রিয় নবীর (দঃ) চরিত্র মাধূর্য সম্পর্কে ১৫ বৎসর একান্ত সান্নিধ্যে থেকে অবলোকন করার সুযোগ বিবি খাদিজার (রাঃ) হয়েছিল। সামান্য ত্রুটিও যদি পরিলক্ষিত হতো-তাহলে তিনি এভাবে স্বীকৃতি প্রদান করতেননা। নবী করিম

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

(দঃ) বিবি খাদিজাকে অযু করার পদ্ধতি শিক্ষা দিলেন এবং তাঁকে নিয়ে দু'রাকআত নামায আদায় করলেন। এ অবস্থা দেখে ৮/১০ বৎসরের বালক হযরত আলী (রাঃ) ঈমান এনে নামাযে শরিক হয়ে গেলেন। বালকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী হচ্ছেন হযরত আলী (রাঃ), এরপর পুরুষগণের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ), আশ্রিত লোকদের মধ্যে পালিতপুত্র যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ), ক্রীতদাসগণের মধ্যে হযরত বেলাল (রাঃ), মহিলাদের মধ্যে বিবি খাদিজার (রাঃ) পর আবদুর রহমান ইবনে আউফ-এর মাতা হযরত শিফা (রাঃ) প্রথম ইসলাম কবুল করেন। এরপর নবীজীর চাচী উম্মুল ফযল (রাঃ), হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কন্যা আসমা (রাঃ) প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। (আনওয়ারে মোহাম্মদীয়া)।

ফাত্‌রাত বা ওহী বিরতি ঃ

জিব্রাইল (আঃ)-এর বিদায় গ্রহণের পর তিন বৎসর পর্যন্ত কোরআন নাযিল বন্ধ ছিল। বিষয়টি ছিল খুবই অসহনীয়। ইমাম বায়হাকী ইমাম শাবী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন—এই তিন বৎসর সময়ে হযরত ইস্রাফিল (আঃ) নবীজীর খেদমতেঁ বিভিন্ন দোয়া ও বিষয় নিয়ে নাযিল হতেন। তিন বৎসর পর পুনঃ কোরআন নাযিল শুরু হয় এবং পরবর্তী বিশ বৎসরে তা সম্পন্ন হয়। এই মধ্যবর্তী তিন বৎসর সময়কে ফাত্‌রাতুল ওহী বা ওহী বিরতি সময় বলা হয়। এই সময়ে কোরাইশদের পক্ষ থেকে কোন বাধা আসেনি। তিন বৎসর পর যখন জিব্রাইল (আঃ) নিম্নোক্ত আয়াত নিয়ে পুনঃ আগমন করেন—

يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ الخ

অর্থ—**"হে প্রিয় কম্বলধারী নবী! প্রস্তুত হোন এবং লোকদেরকে শতর্ক করুন"**

তখন থেকেই নবী করিম (দঃ) দাওয়াতী কাজ শুরু করেন এবং প্রথমে নিজ পরিবার পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনদেন নিকট ইসলামের বানী পৌঁছাতে থাকেন। প্রিয় নবীর (দঃ) চাচা আবু লাহাব ইসলাম গ্রহণের পরিবর্তে প্রকাশ্যে শত্রুতা করতে আরম্ভ করে। তাঁর স্ত্রী উম্মে জামিল নবীজীর যাতায়াতের পথে কাটা বিছিয়ে রাখতো। আপন ঘরেই প্রথম শত্রু পয়দা হলো।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

উনবিংশ অধ্যায়

কোরাইশদের শত্রুতা

প্রসঙ্গ ঃ আবু লাহাব ও উম্মে জামিলের পরিণতি

যখন কোরআন মজিদের -وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ আয়াত নাযিল হলো তখন একদিন নবী করিম (দঃ) কোরাইশদেরকে ডেকে মূর্তিপূজা ত্যাগ করে এক লা-শরীক আল্লাহর ইবাদত করার আহবান জানালেন। সকলে চুপ রইলো। কিন্তু চাচা আবু লাহাব অগ্রসর হয়ে দুই হাত নেড়ে বললো ঃ

تَبًّا لَكَ أَلِهٰذَا دَعَوْتَنَا يَامُحَمَّدُ!

অর্থ–**"হে মুহাম্মদ! তোমার সর্বনাশ হোক! এজন্যই কি তুমি আমাদেরকে ডেকেছো"?**

তার এই বেয়াদবীপূর্ণ উক্তি আল্লাহর সহ্য হলোনা। তার বিরুদ্ধে ছুরা লাহাব নাযিল হলো। তার স্ত্রী নবীজীকে গালাগাল দিত এবং নবীজীর যাতায়াত পথে কাঁটা গেড়ে রাখতো। ছুরা লাহাবে আল্লাহ তায়ালা উভয়ের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত শাস্তি ঘোষণা করলেন,

"আবু লাহাবের উভয় হাত ধ্বংস হোক এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক। তার মালদৌলত ও জনবল কোন উপকারে আসবেনা। সে লেলিহান অগ্নিশিখায় অচিরেই পৌঁছে যাবে এবং তার স্ত্রীও তার সহগামিনী হবে। লাকড়ী বহন কালে তার গলায় রশি পড়বে" (সুরা লাহাব)।

মূলতঃ নবী করিম (দঃ)-এর সাথে বেয়াদবী করে কেউ রক্ষা পায়নি। আবু লাহাবের দুই ছেলে ওতবা ও ওতাইবা-এর নিকট নবীজীর (দঃ) দু'কন্যা রোকাইয়া ও উম্মে কুলসুম (রাঃ)-এর বাল্য বিবাহ হয়েছিল ছোটকালে। ছুরা লাহাব নাযিল হওয়ার পর তারা পিতার নির্দেশে দু'বোনকে বিবাহ বাসরের পূর্বেই তালাক প্রদান করে। এক পর্যায়ে ওতায়বা নবী করিম (দঃ)-এর জামা ছিড়ে ফেলে। নবী করিম (দঃ) এতে মনে বড় আঘাত পেলেন এবং বদদোয়া করলেন, **"হে আল্লাহ! তুমি ওতায়বার ওপর তোমার পক্ষ থেকে একটি কুকুর লেলিয়ে দাও"**।

নবীজীর বদদোয়া অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেলো। কোন এক বাণিজ্য সফরে (সিরিয়া) একটি বাঘ এসে বহুলোকের মধ্যখান থেকে ঘুমন্ত অবস্থায় ওতায়বার ঘাড় মটকে রক্ত চুষে চলে গেলো।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

নবীজীর সাথে বেয়াদবী করে আপন চাচা-চাচী ও চাচাত ভাইয়েরা বাঁচতে পারেনি। আল্লাহর গযবে পতিত হতে হয়েছে তাদের। যারা রাসূলের আত্মীয় নয়– তারা বেয়াদবী করলে আল্লাহ কি তাদেরকে ছেড়ে দেবেন? কখনই নয়। রশীদ আহমদ, খলীল আহমদ, আশ্রাফ আলী, কাশেম, ইলিয়াছ ও ইসমাইল– গংরা তাদের কিতাবে নবীজীর শানে বেয়াদবীমূলক যেসব উক্তি করেছে, তার সাজা তারা দুনিয়াতেই পেয়েছে এবং পরকালেও পাবে। তাদের কেউ অন্ধ হয়েছে, কেউ লেংড়া হয়েছে, কেউ মৃত্যুর পূর্বে নিজের পায়খানা নিজে ভক্ষন করেছে, বড় নেতা ইসমাঈল দেহলভী নিকৃষ্টভাবে বালাকোটে সুন্নী মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছে। এটা পৃথিবীর অপমান। আখেরাতে আরও জঘন্য অপমান তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। কবি বলেছেন ঃ

خدا جسکو پکڑے چھوڑالے محمد

محمدجو پکڑے چھوڑاکوئ نهين سکتا —

"খোদা কাউকে পাকড়াও করলে মুহাম্মদ (দঃ) শাফাআত করে তাকে ছাড়িয়ে আনবেন বলে প্রমাণ আছে। কিন্তু মুহাম্মদ (দঃ) কাউকে পাকড়াও করলে তাকে ছাড়িয়ে নেয়ার কেউ নেই"।

এজন্যই ফতোয়া শামীতে উল্লেখ আছে-নবীজীর সাথে কেউ বেয়াদবী করলে তার ক্ষমা নেই–তাকে কতল করা ওয়াজিব। অন্য কেউ ক্ষমা করার অধিকারী নয়। যার কাছে অপরাধী–তিনি ছাড়া অন্য কেউ ক্ষমা করতে পারে না। এ ব্যাপারে অনেক কাহিনী কিতাবে উল্লেখ আছে। হযরত ওমর (রাঃ) জনৈক বেয়াদব হাফেয ইমামকে কতল করে ফেলেছিলেন–সে ফজরের নামাযে সব সময় ছুরা আবাছা পাঠ করতো নবীজীকে হেয় করার উদ্দেশ্যে।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

বিংশ অধ্যায়

প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার

প্রসঙ্গ ঃ কোরাইশদের অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি

নবী করিম (দঃ) তিন বৎসর পর প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের অনুমতিপ্রাপ্ত হন। আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ মোতাবেক তিনি দাওয়াতী কাজের প্রোগ্রাম ও পরিকল্পনা তৈরী করেন। আল্লাহ তায়ালা প্রথমে নির্দেশ দিলেন নিকটাত্মীয়দেরকে দাওয়াত দেয়ার জন্য– وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ –

–"আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করুন"

তারপর নির্দেশ দিলেন ঃ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ–

–"আপনাকে যা নির্দেশ করা হয়েছে, তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন এবং এ কাজে মুশরিকদের পরওয়া না করে কাজে ঝাপিয়ে পড়ুন" ।

[আহ্‌লে সুন্নাত সংগঠনের নিবেদিত কর্মীদের এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। বিরুদ্ধবাদীদের প্রতিবন্ধকতা ও বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে ধৈর্য্যের সাথে অগ্রসর হলে আল্লাহর নুসরত ও সাহায্য অনিবার্য্য ।]

নবী করিম (দঃ) ধৈর্য্যের সাথে ইসলাম প্রচারের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। কোরাইশদের মধ্য থেকে দু'একজন করে মুসলমান হতে লাগলেন। কোরাইশগণ প্রবলভাবে বাধা দিতে লাগলো। তাদের একাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতো নবীজীর আপন চাচা আবু লাহাব। সে ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা দিয়ে লোকদেরকে নিষেধ করতো। কিন্তু বড় চাচা আবু তালেব নবীজীকে রক্ষা করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত রাখেন এবং তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত এ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকে। এজন্য একাজের পুরস্কার স্বরূপ তিনি পরকালে নবীজীর একটি সুপারিশ লাভ করবেন- তাঁকে দোযখের ভিতরে না নিয়ে বহির্দেশে রেখে সবচেয়ে হালকা শাস্তি প্রদান করা হবে। নবীজীর সাথে শুধু মহব্বৎ পোষণ করে যদি একজন অমুসলিমও বিরাট উপকার পেতে পারে- তাহলে একজন আমলধারী আশেকে রাসূলের পুরস্কার কি হবে– তা কোরআন হাদীসে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তারা নবীজীর শাফাআতে বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

কোরাইশদের অত্যাচার এক পর্যায়ে চরমে পৌছে। ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা নবীজীকে যাদুকর বলতো। অন্যরা পাগল ও শায়ের বলে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে লাগল। ওকবা নামে এক দুষ্টলোক নবীজীর গলা চেপে ধরতো- যখন তিনি খানায়ে কা'বায় নামাযে সিজদারত থাকতেন। বোখারী শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী আবু জাহলের নির্দেশে একদল দুষ্টমতি লোক সিজদারত অবস্থায় নবীজীর পিঠে উটের নাড়িভূঁড়ি এনে চাপিয়ে দিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়তো। বিবি ফাতেমা (রাঃ) তখন ছোট কিশোরী। তিনি আব্বার এ অবস্থা দেখে দুশমনদেরকে গালাগাল দিয়ে অতিকষ্টে পশুর নাড়িভূঁড়ি সরিয়ে দিতেন। নামায শেষে নবী করিম (দঃ) দুহাত তুলে বল্লতেন- **"হে আল্লাহ! তুমি আমর ইবনে হিশাম, ওত্‌বা ইবনে রবিয়া, শায়বা ইব্‌নে রবিয়া, ওয়ালিদ ইবনে ওত্‌বা, উমাইয়া ইব্‌নে খাল্‌ফ, ওক্‌বা ইবনে মুয়ীত, উমারা ইবনে ওয়ালিদ- এদের সকলের বিচার কর"**। পরবর্তীকালে বদরের যুদ্ধে এদের মধ্যে অধিকাংশ নেতাই নিহত হয়।

এর পরপরই মক্কায় আপন চাচা হযরত হামযা (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বীরপুরুষ। তাঁর প্রভাবে এবং শক্তি মত্তার কারণে কুরাইশদের অত্যাচারের মাত্রা কিছুটা কমে আসে।

এবার কোরাইশরা নূতন চাল শুরু করলো। তারা ধন দৌলত, রাজত্ব ও নারীর টোপ ফেলে নবীজীকে আয়ত্ব করতে চাইলো। নবী করিম (দঃ) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে জবাব দিলেন- **"তোমাদের প্রস্তাবিত তিনটি সুযোগ-সুবিধার কোনটিতেই আমার প্রয়োজন নেই। এমনকি- আমার এক হাতে চন্দ্র, আর এক হাতে সূর্য্য এনে দিলেও আমাকে আমার মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুৎ করা যাবেনা"**।

[হায় আফসোস! আমরা নবীর উম্মত হয়ে সামান্য প্রলোভনে পড়ে সত্যিকারের আদর্শ থেকে সরে দাঁড়াতে একটুও ইতস্ততঃ করিনা। পেট্রোডলারের প্রলোভনে পড়ে আমরা ওহাবীদের সাথে, মউদূদীদের সাথে এবং শিয়াদের সাথে গাঁটছড়া বেধে ফেলি।]

যাক, এবার শুরু হলো অত্যাচারের দ্বিতীয় পালা। কোরাইশরা ইসলামে নবদিক্ষীত ক্রীতদাসদের উপর অত্যাচার শুরু করলো। আবু জাহল হযরত

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

আম্মার ইব্‌নে ইয়াছির (রাঃ)-এর মা হযরত ছুমাইয়া (রাঃ) কে বর্শা দিয়ে লজ্জাস্থানে আঘাত করে শহীদ করে ফেললো। তিনিই ইসলামে প্রথম শহীদ মহিলা। আম্মার (রাঃ) কে শহীদ করার চেষ্টা করে কোরাইশরা ব্যর্থ হয়। নবী করিম (দঃ) ইলমে গায়েবের সাহায্যে বলে দিলেন, **"তোমাকে কোরাইশরা শহীদ করতে পারবে না। তুমি শহীদ হবে মুসলিম বিদ্রোহী দলের হাতে"।**

[তিনি সিফফিনের যুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ)-এর পক্ষে যুদ্ধ করে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) বাহিনীর হাতে শহীদ হন। আমির মুয়াবিয়া (রাঃ) প্রাদেশিক গভর্ণর হয়ে কেন্দ্রীয় খলিফা হযরত আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। হযরত আম্মার (রাঃ)-এর শাহাদত দ্বারা প্রমাণিত হলো, হযরত আলীর (রাঃ) পক্ষই ছিল হক্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) ছিলেন মুসলিম বিদ্রোহী। তিনি কাফের বা মুনাফিক ছিলেন না।] (কোরআন ছুরা হুজুরাত)।

এরপর উমাইয়া ইবনে খলফ তার ক্রীতদাস হযরত বেলাল (রাঃ)-এর উপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু করলো। তপ্ত পাথরের উপর শোয়ায়ে বুকে পাথর চাপা দিয়ে হযরত বেলাল (রাঃ) কে ইসলাম ও ইসলামের নবীকে ত্যাগ করতে বাধ্য করার চেষ্টা করা হলো। কিন্তু হযরত বেলাল (রাঃ) এই অগ্নি পরীক্ষায়ও টিকে গেলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) চল্লিশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে হযরত বেলাল (রাঃ) কে খরিদ করে নবীজীর খেদমতে উভয়ে হাযির হয়ে আরয করলেন-

گفت ماوبندگان کوئے تو+ کردمش آزاد هم برروئے تو (مثنوی)

অর্থ-"হে আল্লাহর প্রিয় রাসুল (দঃ)! আমি (আবু বকর) ও বেলাল- উভয়েই আপনার দরবারের বান্দা বা গোলাম। আমি বান্দা আপনার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আপনার অন্য এক বান্দাকে আযাদ করে দিলাম"। (মসনবী)

[নবীপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিল এটি। হযরত আবু বকর (রাঃ) নিজেকে নবীর বান্দা বলে প্রকাশ করেছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) নিজেকে নবীর বান্দা বলে প্রকাশ করেছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) নিজেকে নবীজীর বান্দা বলে স্বীকার করেছেন এভাবে-

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ عَبْدَهُ وَخَادِمَهُ -

অর্থ–"আমি (ওমর) রাসুল করিম (দঃ)-এর একজন বান্দা ও খাদেম হিসেবে তাঁর সাথে ছিলাম।" (মোস্তাদরাক)

আজকাল এক শ্রেণীর বাতিল আক্বিদাপন্থী ওহাবী আলেম আবদুন্নবী, গোলাম নবী ইত্যাদি- নামকরণকে তাদের কিতাবে শিরক বলে লিখেছে। (বেহেস্তী জেওর ও ফতোয়া রশিদিয়া দ্রষ্টব্য।]

হযরত আবুযর গিফারী (রাঃ) বর্ণনা করেন–সর্বপ্রথম সাতজন নিজেদের ইসলাম প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন। তন্মধ্যে হযরত নবী করিম (দঃ), হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ), হযরত আম্মার (রাঃ), হযরত বিবি ছুমাইয়া (রাঃ), হযরত বেলাল (রাঃ), হযরত ছোহায়ব (রাঃ) ও হযরত মেকদাদ (রাঃ)। এই ঘটনা নবুয়ত ও ইসলাম প্রচারের ৫ম সালের।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

একুশতম অধ্যায়

চন্দ্র বিদারন বা শক্কুল ক্কামার

প্রসঙ্গ ঃ উর্দ্ধ জগতে নবীজীর কর্তৃত্ব

হযরত মুছা (আঃ) লাঠির আঘাতে নীলনদ বিদীর্ণ করেছিলেন। লাঠির আঘাতে একটি পাথরে ১২টি পানির ফোয়ারা প্রবাহিত করার প্রমাণ কোরআনে পাওয়া যায়। কিন্তু নবী করিম (দঃ) আঙ্গুলের ইশারায় আকাশের চাঁদকে দ্বিখন্ডিত করেছেন বলে কোরআন ও হাদীসে প্রমাণ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) বলেনঃ "মুছা (আঃ)-এর মো'জেযা ছিল জমিনে, কিন্তু আমাদের প্রিয় নবীর (দঃ) মো'জেযা ছিল জমিনে, আসমানে এবং বেহেস্তে। মুছা (আঃ)-এর মো'জেযা ছিল অন্য বস্তুর সহায়তায়। কিন্তু নবী করিম (দঃ)-এর মো'জেযা ছিল বিনা সহায়তায়। মুছা (আঃ)-এর মো'জেযা ছিল বাইরের বস্তুর সাহায্যে। কিন্তু নবী করিম (দঃ)-এর মো'জেযা ছিল স্বয়ং তাঁর নিজের দ্বারা। মূলতঃ তিনি নিজেই ছিলেন আপাদমস্তক মো'জেযা"। অন্যান্য নবীগণকে বাহ্যিক মো'জেযা দান করা হয়েছিল। কিন্তু স্বয়ং নবী করিম (দঃ) ছিলেন আপাদমস্তক মো'জেযা। নবী করিম (দঃ)-এর ৬৫ হাজার মো'জেযা মোহাদ্দেসীন কেরাম লিপিবদ্ধ করেছেন– (পয়গামে মোহাম্মদী– সোলায়মান নদভী)।

আল্লামা শরফুদ্দিন বোছেরী (রঃ) একজন খ্যাতনামা মোহাদ্দেছ, ঐতিহাসিক ও সুফীসাধক ছিলেন। তাঁর রচিত কসিদায়ে বোরদা বা নবী প্রশস্তি কাব্যগ্রন্থখানী মুসলিম জাহানে এবং আলেম সমাজে উচ্চ প্রশংসিত কিতাব হিসেবে বিবেচিত ও পরিচিত। উক্ত গ্রন্থের বিভিন্ন ভাষ্য বা শরাহ লিখিত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থে শাক্কুল কামার বা চন্দ্র বিদারনের ঘটনাটি অতি চমৎকারভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত তরজুমানুস্ সুন্নাহ গ্রন্থেও চন্দ্র বিদারনের মো'জেযা লিপিবদ্ধ আছে।

আবু জাহল কর্তৃক অনেক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল নবী করিম (দঃ) কে। আল্লাহর অসীম কুদরতে নবী করিম (দঃ) আবু জাহলের হাতের মুঠায় লুকায়িত পাথর-কঙ্কর থেকে কলেমা শাহাদাত পাঠ করিয়েছিলেন এবং দূরের পাথরকে পানিতে সন্তরণ করিয়ে নিজের কাছে এনেছিলেন। আবু জাহল এত কিছু দেখেও এগুলোকে যাদু বলে উড়িয়ে দিতে

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

অবশেষে সে ইয়েমেন দেশের শাসক হাবীব ইবনে মালেকের সাহায্য প্রার্থনা করলো। হাবীব দলবলসহ মক্কায় এসে উপস্থিত হলো। আবু জাহল নবী করিম (দঃ) কে তলব করলো। হযরত আবু বকর (রাঃ)সহ নবী করিম (দঃ) উপস্থিত হলেন।

আবু জাহ্লের ইঙ্গিতে হাবীব ইবনে মালেক বললো– যারা পূর্বে নবী বলে দাবী করেছিলেন, তাঁরা অনেক মো'জেযা দেখিয়েছেন। তাদের সবগুলো ছিল জমিনে। আপনি সত্য নবী হলে আকাশের চাঁদকে দ্বিখন্ডিত করে দেখান। নবী করিম (দঃ) দু'রাকাত নামায আদায় করে আঙ্গুল দিয়ে চাঁদকে ইশারা করতেই চাঁদ দু'টুকরো হয়ে আবু কোবায়েছ পর্বতের দু'দিকে অবস্থান করলো। সোব্হানাল্লাহ! আমেরিকার চন্দ্রবিজয়ী নীল আর্মস্ট্রং চাঁদে গিয়ে চাঁদ দ্বিখন্ডিত হওয়ার প্রমাণ পেয়ে পৃথিবিতে ফিরে এসে কোরআনের সত্যতা স্বীকার করে মুসলমান হয়ে যায়।

হাবীব ইবনে মালেক পুনরায় পরীক্ষা করলো। সে বললো– আমি দেশ থেকে আসার সময় মনে মনে একটি নিয়ত করে এসেছি। আপনি আমার মনের সে গোপন কথাটি বলতে পারলে বুঝে নেব– আপনি সত্য নবী। নবী করিম (দঃ) বললেন- "তোমার একমাত্র মেয়ে আজন্ম পঙ্গু। তুমি মনে মনে নিয়ত করেছিলে আমি সত্য নবী হলে তুমি আমার কাছে মেয়ের রোগমুক্তির জন্য দোয়া চাইবে। যাও! তোমার মেয়ে আরোগ্য লাভ করেছে এবং মুসলমানও হয়ে গেছে"।

একথা শুনেই হাবীব ইয়ামেনী কলেমা তাইয়্যেবা পাঠ করে মুসলমান হয়ে যায়। কিন্তু আবু জাহল আবু জাহলই রয়ে গেলো। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রাঃ) বলেছেন ঃ

سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاق

اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی–

কাব্যানুবাদ ঃ

যার ইশারায় চন্দ্র খন্ড-সূর্য উল্টোপথে,
হয়নি এক্বীন অন্ধ নজদী–নবীজীর কুদরতে?

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

অর্থ–"সূর্য্য উলটো পায়ে ফিরে এলো; চাঁদ আঙ্গুলের ইশারায় দু'টুকরো হলো। হে অন্ধ নজদীরা, তোমরা রাসূলুল্লাহর কুদরত ও কর্তৃত্ত্ব দেখে যাও"। (আ'লা হযরতের হাদায়েকে বখশিষ)

হাবীব ইবনে মালেক ইয়েমেনে ফিরে গিয়ে রাত্রি বেলায় ঘরে পৌঁছে দেখলো– মেয়ে সুস্থ হয়ে পিতার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

চন্দ্র বিদারনের ঘটনাটি সংক্ষিপ্ত আকারে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। জীবনী গ্রন্থসমূহে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে (শানে হাবীব)। আহ্‌লে হাদীস এবং ওহাবীরা চন্দ্র বিদারনের হাদীসকে যয়ীফ ও দুর্বল বলে উড়িয়ে দেয়। (মোস্তফা চরিত কৃত আকরাম খাঁ-দেখুন)। অর্থ্যাৎ– তারা চন্দ্র বিদারণে বিশ্বাসী নয়। আরবের অনেক বাণিজ্য কাফেলার লোকেরা চাঁদকে দু'টুকরো হতে দেখেছে। ভারতের জনৈক জ্যোতিষ রাজাও উক্ত চন্দ্র বিদারন প্রত্যক্ষ করেছে। (মাওয়াহিব ও বিশ্বনবী)।

ওহাবীরা নবীজীর শানমান দেখলেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে এবং তা অস্বীকার করার অপকৌশল অবলম্বন করে। দুশমনেরা সর্বস্বীকৃত নিম্নোক্ত নীতিমালা জেনেও মানে না– "ফাযায়েল বা মর্যাদার ক্ষেত্রে দুর্বল ও সবল – সব হাদীসই গ্রহণযোগ্য"। একটি দুর্বল সনদে বর্ণিত যয়ীফ হাদিস যদি পরবর্তীতে বহু হাদীস বিশারদ গ্রহণ করেন- তখন আর যয়ীফ থাকে না। তখন এটি হাসান পর্যায়ে উন্নীত হয়ে যায়"।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

বাইশতম অধ্যায়

দ্বীনের জন্য দেশ ত্যাগ-প্রথম হিজরত

প্রসঙ্গ ঃ আবিসিনিয়ায় মুসলমানদের প্রথম হিজরত, আসহামা নাজ্জাশীর ইসলাম প্রীতি, (৭ম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ, ৯ম হিজরীতে মৃত্যু) মদিনায় জানাযা-নবীজী হাযির ও নাযির হওয়ার প্রমাণ

কোরাইশদের অত্যাচার যখন চরমে, তখন নবী করিম (দঃ) সাহাবায়ে কেরামকে আফ্রিকার আবিসিনিয়ায় হিজরত করার অনুমতি প্রদান করেন। নবুয়তের পঞ্চম সালে ১১ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলা– এই পনেরজন সাহাবীর একটি কাফেলা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। এটা ছিল ইসলামের প্রথম হিজরত। জিদ্দা থেকে মাথা পিছু তখনকার আট দিরহাম ভাড়ায় নৌকাযোগে তাঁরা আবিসিনিয়ায় পৌছেন এবং খ্রীষ্টান বাদ্‌শাহ্ নাজ্জাশীর (আস্‌হামা) দরবারে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভ করেন। উক্ত দলে নবী করিম (দঃ)-এর দ্বিতীয়া কন্যা বিবি রোকাইয়া ও তাঁর স্বামী হযরত ওসমানও (রাঃ) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

কোরাইশরা নাজ্জাশীর দরবারে প্রচুর উপঢৌকন পাঠিয়ে মুসলমানদের ফেরত পাঠানোর অনুরোধ করে। কিন্তু নাজ্জাশী এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। মুসলমানদের এই হিজরত এবং বিদেশে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণের মধ্য দিয়ে ইসলামের কূটনৈতিক বিজয় সূচিত হয়। পরবর্তীতে আরও ৮৩ জন পুরুষ সাহাবী ও ১৮ জন মহিলা সাহাবী– সর্বমোট ১০১ জন আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। এটা ছিল দ্বিতীয়বার হিজরত। এই হিজরতে আবু সুফিয়ানের কন্যা বিবি উম্মে হাবীবা (রাঃ) তাঁর স্বামী ওবায়দুল্লাহ ইবনে জাহাশ সহ অংশগ্রহণ করেছিলেন। বিবি উম্মে হাবীবা (রাঃ) কে পরে নবী করিম (দঃ) বিবাহ করেন। নাজ্জাশীর মাধ্যমে এই বিবাহ কার্য সম্পন্ন হয়। কিন্তু ওবায়দুল্লাহ সেখানে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে মৃত্যু বরণ করে।

দীর্ঘদিন (১৫ বছর) আবিসিনিয়ায় অবস্থান করার পর ৭ম হিজরী সনে সাহাবায়ে কিরাম সরাসরি মদিনা শরীফে এসে নবীজীর (দঃ) সাথে মিলিত হন। আবিসিনিয়ায় মুসলমানদের অবস্থান সেদেশে ইসলাম প্রচারে সহায়ক হয়েছিল। বর্তমানে ইরিত্রিয়া বা হাবসা শায়ত্বশাসন লাভ করেছে। মুসলমানদের আদব ও আখলাক দেখে বাদ্‌শাহ আসহামা নাজ্জাশী ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়েন।

৭ম হিজরীতে নবী করিম (দঃ) রোম, পারশ্য, মিশর, বাহ্‌রাইন ও আবিসিনিয়ার বাদশাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্র প্রেরণ করেছিলেন। নবী করিম (দঃ)-এর পত্র পাঠ করে বাদশাহ্ নাজ্জাশী (আসহামা) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

করেন। বিদেশের একজন বাদশাহ্ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় খৃষ্টান জগতে হৈ চৈ পড়ে যায়। বিনা যুদ্ধে বিনা তলোয়ারে এভাবে ইসলাম প্রসার লাভ করে। এবার ইসলাম এশিয়ার বাইরে আফ্রিকায়ও প্রবেশ করলো।

বাদ্‌শাহ নাজ্জাশী (আস্‌হামা) ৯ম হিজরী সনের রমযান মাসে ইন্‌তিকাল করেন। নবী করিম (দঃ) তাবুকের যুদ্ধ হতে মাত্র মদিনায় ফিরেছেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে ডেকে বললেন– "তোমাদের ভাই নাজ্জাশী আজ আবিসিনিয়ায় ইন্‌তিকাল করেছেন। সুতরাং আমরা তাঁর জানাযা পড়বো"। কারণ, এখন পর্যন্ত আবিসিনিয়ার জনগণ ইসলাম গ্রহণ করেনি–তাই আসহামার জানাযা মদিনা থেকে নবীজী আদায় করেছিলেন (মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া–৩০৪ পৃষ্ঠা)। সাহাবাগণ এই কথা শুনে নবীজীর ইলমে গায়েব দেখে হতবাক হয়ে যান। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মদিনা হতে আবিসিনিয়া পর্যন্ত মধ্যবর্তী সমস্ত পর্দা (প্রতিবন্ধকতা) সরিয়ে দেন। নবী করিম (দঃ) নাজ্জাশীর লাশ দেখে দেখে জানাযার নামাযে ইমামতি করেন। এই জন্যই হানাফী মাযহাবে গায়েবী জানাযা দুরস্ত নেই। জানাযার নামায দুরস্ত হবার জন্য ছয়টি শর্তের মধ্যে অন্যতম এবং প্রথম শর্তই হলো– লাশ ইমামের দৃষ্টির সামনে জমীনে থাকতে হবে। নাজ্জাশীর লাশও হুযুর (দঃ)-এর দৃষ্টির সামনে উপস্থিত ছিলেন। বস্তুতঃ হুযুর (দঃ) মদিনা শরীফ হতে বেহেস্ত পর্যন্ত অবলোকন করতেন। আবিসিনিয়া বা বাংলাদেশ তো অতি কাছে।

[উল্লেখ্য, ৮ম হিজরীতে মূতার যুদ্ধে একে একে তিনজন মুসলিম সেনাপতি শহীদ হয়েছিলেন। নবী করিম (দঃ) মদিনা হতে তা দেখতে পেয়ে সাহাবীদেরকে তাঁদের শাহাদাতের সংবাদ দিয়েছিলেন। ঐ যুদ্ধে হযরত আলীর (রাঃ) ভাই হযরত জাফর (রাঃ) শহীদ হয়েছিলেন। আল্লাহর ফিরিস্তাগণ তাঁর পবিত্র রুহ মোবারক নিয়ে আকাশে ভ্রমণকালে নবী করিম (দঃ) তাঁকে আকাশে উড়ন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলেন। হুযুর (দঃ) 'ওয়া আলাইকুম ছালাম' বলে তাঁর ছালামের জবাব দিলে উপস্থিত সাহাবীগণ তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে নবী করিম (দঃ) বললেন– **"জাফর আমাকে বিদায়কালীন ছালাম দিয়েছে আকাশ থেকে। আমি তাঁর ছালামের জবাব দিয়েছি। তোমরা যাহা জান না– আমি তাহা জানি; তোমরা যাহা দেখনা– আমি তাহা দেখি"** (বোখারী)। নাজ্জাশীর জানাযা ও জাফর তাইয়ার (রাঃ)-এর এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, নবী করিম (দঃ)-এর ইলমে গায়েব আছে এবং তিনি হাযির ও নাযির। পরে যথাস্থানে বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে। পৃথিবীর কোন বস্তুই তাঁর দৃষ্টির বাইরে নয়। যিকরে জামিল ও জা'আল হক]।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

তেইশতম অধ্যায়

সামাজিক বয়কট

প্রসঙ্গ ঃ তিন বৎসর শিয়াবে আবি তালেব নামক গিরি গুহায় অবস্থান-ইলমে গায়েবের প্রকাশ ও নিরাপদে প্রত্যাবর্তন

ছয় বৎসর চেষ্টা করেও কোরাইশরা যখন ইসলামের প্রসার বন্ধ করতে পারল না, তখন তারা নবীজীকে কতল করার জন্য মনস্থ করলো। এতদ্দর্শনে আবু তালেবসহ বনী হাশেম ও বনী আবদুল মোত্তালেব-এর লোকজন নিয়ে নবী করিম (দঃ) এবং মুসলমানগণ মক্কার অদূরে শিয়াবে আবি তালেব নামক গিরিকন্দরে আশ্রয় নেন। কিন্তু চাচা আবু লাহাব কোরাইশদের সাথেই রয়ে গেল। তারা এক চুক্তিনামা তৈরী করলো। তাতে লেখা ছিল- লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিবাহ-শাদীসহ যাবতীয় সামাজিক বিষয়ে বনী হাশেম ও বনী আবদুল মোত্তালেবকে বয়কট করা হলো। কোরাইশদের সব সর্দার এতে স্বাক্ষর করলো। উক্ত চুক্তিনামাটি বাক্সে তালাবদ্ধ ও সীলগালা করে খানায়ে কা'বায় সংরক্ষিত করলো। একাধারে তিন বৎসর নির্বাসন জীবনে খাদ্যের অভাবে মুসলমান ও বিবি খাদিজা (রাঃ) সহ নবী পরিবারের দুর্দশা চরম সীমায় পৌঁছলো। একদিন নবী করিম (দঃ) চাচা আবু তালেবকে বললেন- চাচাজান, কোরাইশদের চুক্তিনামার কার্য্যকারিতা আর নেই। **"কেননা, ঐ চুক্তিনামায় আল্লাহর নাম ছাড়া বাকী সব কিছু উঁই পোকা খেয়ে ফেলেছে"**।

আবু তালেব আবু জাহলের নিকট গিয়ে বললেন, আমার ভাতিজা একটি গায়েবী সংবাদ দিয়েছেন। তোমাদের চুক্তিনামার সব শর্তাবলী নাকি উঁই পোকায় খেয়ে ফেলেছে- কেবলমাত্র আল্লাহর নামটুকুই অক্ষত রয়েছে। যদি আমার ভাতিজার কথা সত্য না হয়-তাহলে আমি নিজে তাঁকে তোমাদের হাতে সোপর্দ করে দেবো। আর যদি সত্য হয়-তাহলে খামাখা তাঁকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি? একথা শুনে আবু জাহল আনন্দে লাফিয়ে উঠলো- এইতো সুযোগ! সকল সর্দারকে ডেকে এনে আবু জাহল বাক্স খুলে ফেললো। একি! নবীজীর কথা যে অক্ষরে

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

অক্ষরে সত্য! তখনই তাদের পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেলো। ফলে তিন বৎসর পর দশম সালে সামাজিক বয়কট প্রত্যাহার করতে কোরাইশরা বাধ্য হলো। নবুয়তের দশম বৎসরে নবী করিম (দঃ) নির্বাসন থেকে মুক্তি পেয়ে মক্কায় ফিরে আসলেন। চতুর্দিকে নবীজীর (দঃ) মো'জেযা ও ইলমে গায়েবের কথা বিদ্যুৎবেগে ছড়িয়ে পড়লো। দলে দলে লোকেরা ইসলাম কবুল করতে লাগলো। ইল্‌মে গায়েবের মাধ্যমেই ইসলামের সত্যতা প্রমাণিত হলো। কুরাইশরা নবীজীর ইলমে গায়েব স্বীকার করেছে- কিন্তু একশ্রেণীর মুসলমান তা স্বীকার করে না। এরা কাফেরের চেয়েও নিকৃষ্ট।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

চব্বিশতম অধ্যায়

শোকের বছর

প্রসঙ্গ ঃ চাচা আবু তালেব ও বিবি খাদিজা (রাঃ)-এর ইন্‌তিকাল, ঐ বৎসরকে শোকের বৎসর ঘোষণা

নবী করিম (দঃ)-এর বয়স যখন ৪৯ বৎসর আট মাস এগার দিন, তখন ছিল রমযান মাসের ২৩ তারিখ। ঐ তারিখেই নবী করিম (দঃ)-এর প্রতিপালনকারী চাচা আবু তালেব ইনতিকাল করেন। এর পাঁচ দিন পর অর্থাৎ রমযানের ২৮ তারিখে হুযুর (দঃ)-এর সুখ-দুঃখের জীবনসঙ্গিনী বিবি খাদিজাও (রাঃ) জান্নাতবাসিনী হয়ে যান। জীবনের সবচেয়ে আপনজন হিসাবে বিবি খাদিজা (রাঃ) ও চাচা আবু তালেবের ইনতিকালে নবী করিম (দঃ) এতই শোকাভিভূত হয়ে পড়েন যে, তিনি ঐ সনের পূর্ণ বছরকে শোকের বছর বলে ঘোষণা করেন। কোন প্রিয়জনের বিয়োগে তিনদিন শোকপালন করার এটাই প্রকৃষ্ট দলীল। নবীজীর ক্ষেত্রে এক বৎসর।

বিবি খাদিজা (রাঃ) মাল, দৌলত ও শান্তনা দিয়ে নবী করিম (দঃ) কে সবসময় চাঙ্গা করে রাখতেন। আবু তালেবের সমর্থনের কারণে কুরাইশরা নবী করিম (দঃ) কে চরম আঘাত করতে এতদিন সাহস পায়নি। তাঁদেরকে হারিয়ে নবী করিম (দঃ) শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়েন। কাফেরদের অত্যাচারের সকল বাধাই এবার দূর হয়ে গেলো।

বিবি খাদিজার (রাঃ) ইন্‌তিকালের পর নবী করিম (দঃ) হযরত বিবি সওদা বিনতে জামআ (রাঃ) কে তাঁর বৃদ্ধা বয়সে বিবাহ করেন। এর কিছুদিন পর তিনি আল্লাহর নির্দেশে হযরত আবু বকরের ৬ বৎসরের শিশুকন্যা হযরত আয়েশা (রাঃ) কে বিবাহ করেন। ৫১ বছর বয়সে ৬ বৎসরের কিশোরীকে বিবাহ করার মধ্যে নিশ্চয়ই জৈবিক কোন কারণ ছিলনা। হুযুর (দঃ)-এর বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল খোদায়ী নির্দেশের বাস্তবায়ন। হযরত দাউদ (আঃ)-এর একশত বিবাহ ও হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর এক হাজার বিবাহের তুলনায় আমাদের প্রিয় নবীর (দঃ) ১১ বিবাহ ছিল খুবই সীমিত। সুতরাং ইহুদী ও খৃষ্টান লেখকদের অপবাদ আমাদের নবীর উপরে নয়– বরং তাদের নবীদের উপরেই প্রথমে বর্তায়। কিন্তু মুসলমানদের বিশ্বাস– নবীগণ আল্লাহর নির্দেশেই সবকিছু করেন।

এর কিছুদিন পরেই তিনি ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আপন পালিত পুত্র যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ) কে সাথে নিয়ে দুধ মাতার দেশ তায়েফ গমন করেন।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

পঁচিশতম অধ্যায়

তায়েফ গমন

প্রসঙ্গ ঃ চরম অত্যাচারের বিনিময়ে হেদায়াতের দোয়া– নূহ (আঃ)-এর সাথে তুলনা– জ্বীনদের ইসলাম গ্রহণ

হযরত খাদিজা (রাঃ) ও চাচা আবু তালেবের ইনতিকালের পর কোরাইশদের অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে যায়। এমতাবস্থায় নবী করিম (দঃ) ধাত্রীমা বিবি হালিমা সা'দিয়া (রাঃ)-এর দেশ তায়েফে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে গমন করেন। সাথে ছিলেন পালিত পুত্র হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ)। উদ্দেশ্য ছিল– তায়েফ যেহেতু দুধ মাতার দেশ, হয়তো তারা নবীজীর প্রতি কিছুটা নমনীয় হবে। কিন্তু তাদের অমানুষিক ব্যবহার ও অত্যাচার কোরাইশদের অত্যাচারকেও ছাড়িয়ে যায়। নবী করিম (দঃ) বনী ছকিফের নেতৃস্থানীয় লোকদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। কিন্তু তারা অভদ্রভাবে নবীজীর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে।

শুধু তাই নয়– তারা তাদের দুষ্ট ছেলেদেরকে এবং দাসশ্রেণীর লোকদেরকে নবীজীর পিছনে লেলিয়ে দিল। ঐসব দুষ্ট ছেলের দল নবীজীকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে লাগলো এবং নবীজীর বদন মোবারকে পাথর নিক্ষেপ করতে লাগলো। নবীজীর পবিত্র দেহ থেকে রক্তের ধারা বইতে লাগলো। প্রবাহিত পবিত্র রক্ত জুতা মোবারকে ঢুকে কদম মোবারকের সাথে লেগে যেতো। পাথর নিক্ষেপের ফলে শরীর মোবারক নিস্তেজ হয়ে আসলে তিনি মাটিতে বসে পড়তেন। বদ্‌মাইশ ছেলের দল পুনরায় তাঁকে দুই বাহু ধরে তুলে দিত। যখন তিনি চলতে শুরু করতেন, তখন পুনরায় তারা পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করতো এবং অট্টহাসিতে ফেটে পড়তো। পালিত পুত্র যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ) নবীজীকে রক্ষা করতে গিয়ে পাথরের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে যান। মক্কায় হযরত ফাতেমা (রাঃ) পিতার চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠেন।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লেখ আছে– "ওহোদের যুদ্ধের পর হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) নবী করিম (দঃ)-এর খেদমতে আরয করলেন-ইয়া রাসুলাল্লাহ্! ওহোদের চেয়েও অধিক কষ্টকর কোন ঘটনা কি আপনার জীবনের উপর দিয়ে

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

বয়ে গিয়েছিল? উত্তরে নবী করিম (দঃ) বললেন- **"আয়েশা, তায়েফবাসীদের অত্যাচার ছিল আমার জীবনের কঠিনতম বিপদ। আমি অত্যাচারিত হয়ে যখন তায়েফ থেকে ফেরত আসছিলাম এবং মক্কা থেকে একদিনের রাস্তার মাথায় 'করনুছ ছা'লিব' নামক স্থানে (ইয়েমেন ও নজদবাসী হাজীদের মীকাত) পৌঁছলাম, তখন দেখি- আমার মাথার উপর মেঘের ছায়া এবং হযরত জিব্রাইল (আঃ) ঐ মেঘমালা থেকে আমাকে ডেকে বলছেন, আল্লাহ তায়ালা তায়েফবাসীদের অত্যাচার সম্পর্কে অবগত আছেন। আপনার খেদমতে পর্বতের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেস্তা ইসমাঈলকে আপনার নির্দেশ পালনের জন্য পাঠিয়েছেন। নবীজী বলেন- পর্বতের দায়িত্বে নিয়োজিত উক্ত ফেরেস্তা আমাকে ছালাম দিয়ে আরয করলো- "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি নির্দেশ করলে এখনই আমি তায়েফের 'আখশাবাইন' নামক দুটি পর্বতকে তাদের উপর নিক্ষেপ করে তাদেরকে ধ্বংস করে দেবো। এটাই আল্লাহর পক্ষ হতে আমার প্রতি নির্দেশ"। শত্রুকে ধ্বংস করার এমন সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও নবী করিম (দঃ) বললেন- "না, বরং আমার একান্ত ইচ্ছা- তাদের বংশধরেরা অন্ততঃ ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহর ইবাদত করুক এবং শিরক থেকে বেঁচে থাকুক"।**

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নূহ (আঃ) তাঁর গোটা কওমকে বদদোয়া করে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। আল্লাহ পাক নবীদের আব্দার রক্ষা করেন। তাই তিনি নূহ নবীর কথায় মহা প্লাবন দিয়ে দুনিয়া ধ্বংস করেছিলেন। কিন্তু আমাদের নবীজীর শত্রুদেরকে স্বয়ং আল্লাহ ধ্বংস করার প্রস্তাব পাঠালেন-কিন্তু রাহমাতুল্লিল আলামীন এতে রাজী হলেন না। সোব্হানাল্লাহ! অবশেষে গযবের ফেরেস্তা ইসমাঈল (আঃ) ফিরে যান। এভাবেই নবীগণের মধ্যে মর্যাদার তারতম্য হয়।

তায়েফে দশদিন অবস্থান করে ফিরতি পথে ওত্বা ও শায়বা নামক দুই কোরেশের সাথে তাদের দেয়ালঘেরা আঙ্গুরের বাগানে হুযুর (দঃ)-এর সাক্ষাৎ হয়। নবী করিম (দঃ)-এর এই অবস্থা দেখে তাদের মায়া হলো। তারা আপন খৃষ্টান গোলাম আদ্দাছের মাধ্যমে কিছু আঙ্গুর নবীজীর খেদমতে পাঠিয়ে দেয়। হুযুর (দঃ) 'বিছমিল্লাহ' বলে আঙ্গুর ভক্ষন করতে লাগলেন। আদ্দাছ নবী করিম (দঃ)-এর চেহারা মোবারকের দিকে দৃষ্টি করে বলে উঠলো- এধরনের কালাম

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

তো এদেশে কারো মুখে এতদিন শুনিনি। নবী করিম (দঃ) তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে জানলেন, সে ইরাকের মুছেল শহরের নাইনিওয়া অঞ্চলের একজন খৃষ্টান অধিবাসী। নবী করিম (দঃ) তার দেশের পরিচয় জেনে বললেন, ও! তুমি হযরত ইউনুছ (আঃ)-এর দেশের লোক? আদ্দাছ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো- কিভাবে আপনি হযরত ইউনুছ (আঃ) কে চিনেন? হুযুর (দঃ) বললেন- তিনিও আমার মত একজন নবী ছিলেন। একথা শুনে আদ্দাছ নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলোনা। সাথে সাথে কলেমা শরীফ পড়ে সে মুসলমান হয়ে গেল এবং নবী করিম (দঃ)-এর হাত ও কদম চুম্বন করলো। আপন জাতি তায়েফবাসীগণ নবীজীকে প্রত্যাখ্যান করলো- অথচ অপরিচিত একজন বিদেশী লোক নবীজীকে চিনে মুসলমান হয়ে গেল। একেই বলে "বাতির নীচে অন্ধকার"!

এ সময়ই নাখলা নামক স্থানে রাত্রিবেলা নামাযের মধ্যে নবী করিম (দঃ)-এর কোরআন তিলাওয়াত শুনে নাসিবাইনের সাতজন জ্বীন মুসলমান হয়ে গেলো। তায়েফ সফরে মাত্র একজন মানুষ ও সাতজন জ্বীন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো। তায়েফের ঘটনা থেকে এই শিক্ষাই গ্রহণ করতে হবে যে, সত্য প্রচারের জন্য চরম বিরোধিতার মুখেও অসীম ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে এবং সফলতার জন্য আল্লাহর দরবারে সাহায্য চাইতে হবে। আল্লাহ অন্য কৌশলে সফলতা দান করবেন।

এই সফর থেকে ফিরে আসার কিছুদিন পরেই নবুয়তের দ্বাদশ সালে রজব মাসের ২৭ তারিখ সোমবার পবিত্র মি'রাজের ঘটনা সংঘটিত হয়। মনে হয়- ভবিষ্যতের কর্ম পদ্ধতি সম্পর্কে একান্তে গোপন আলোচনার জন্যই আল্লাহ তায়ালা আপন হাবীব (দঃ) কে নিজেই নিভৃতে ডেকে নিয়েছিলেন। আল্লাহ বলেন ঃ **"আল্লাহপাক তাঁর প্রিয় হাবীবকে স্বশরীরে মি'রাজে নিয়ে গেলেন রাত্রির কিয়দাংশে- তাঁর কুদরতি নিদর্শনসমূহ দেখাবার জন্য"। (সূরা বনী ইসরাঈল ১ম আয়াত)।** আরও এরশাদ করেন- **"তাঁর সাথে গোপন আলাপ করেছেন" (সূরা নজম)।** এই গোপন আলাপের কতটুকুই বা আমরা জানি? ঐ গোপন আলাপের নামই ইলমে গায়েব, ইলমে আছরার ও ইলমে হাক্বায়িক।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ছাব্বিশতম অধ্যায়

মি'রাজ বা উর্ধ্বগমন

প্রসঙ্গ ঃ সচক্ষে আল্লাহর দীদার লাভ ও নবীজীর সূরতে হাক্কী-র আত্মপ্রকাশ

নবী করিম (দঃ)-এর উর্দ্ধজগতের মো'জেযা সমূহের মধ্যে মি'রাজ গমন একটি বিস্ময়কর মো'জেযা। এজন্যই মি'রাজের আয়াতের শুরুতেই আল্লাহ্ পাক 'সোব্হানাল্লাহ্' শব্দটি ব্যবহার করেছেন–যা কেবল আশ্চর্য্যজনক ঘটনার ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সশরীরে মি'রাজ গমনের প্রমাণ স্বরূপ কোরআনের 'বিআব্দিহী' শব্দটি তাৎপর্য্যপূর্ণ। কেননা, 'আবদুন' শব্দটি দ্বারা রুহ ও দেহের সমষ্টিকে বুঝান হয়েছে। তদুপরি– বোরাক প্রেরণ ও বোরাক কর্তৃক নবী করিম (দঃ) কে বহন করে নিয়ে যাওয়ার মধ্যেও সশরীরে মি'রাজ গমনের প্রমাণ পাওয়া যায়। সর্বোপরি–স্বপ্নে বা রুহানীভাবে মি'রাজের দাবী করা হলে কোরাইশদের মধ্যে এত হৈ চৈ হতোনা। আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সকল ইমামগণই সশরীরে মি'রাজ গমনের কথা স্বীকার করেছেন।

মি'রাজের ঘটনাটি নবীজীর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে, এর সাথে গতির সম্পর্ক এবং সময় ও স্থানের সঙ্কোচনের তত্ত্ব জড়িত রয়েছে। সূর্য্যের আলোর গতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। পৃথিবীতে সূর্যের আলো পৌঁছতে লাগে আট মিনিট বিশ সেকেন্ড। এ হিসেবে পৃথিবী হতে সূর্যের দূরত্ব- নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল। অথচ নবী করিম (দঃ) মূহুর্তের মধ্যে চন্দ্র, সূর্য, সিদ্‌রাতুল মোন্তাহা, আরশ-কুরছি ভ্রমণ করে লা-মকানে আল্লাহর দীদার লাভ করে নব্বই হাজার কালাম করে পুনরায় মক্কা শরীফে ফিরে আসেন। এসে দেখেন, বিছানা এখনও গরম রয়েছে। এর চেয়ে আশ্চর্য আর কি হতে পারে? নবী করিম (দঃ)-এর নূরের গতি কত ছিল– এ থেকেই অনুমান করা যায়। কেননা, তিনি ছিলেন নূর। যাওয়ার সময় বোরাক ছিল-কিন্তু ফেরার সময় বোরাক ছিলনা (রুহুল বয়ান)।

মি'রাজের মধ্যে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো– অন্যান্য নবীগণের সমস্ত মো'জেযা নবী করিম (দঃ)-এর মধ্যে একত্রিত হয়েছিল। হযরত মুছা (আঃ) তূর পর্বতে আল্লাহর সাথে কালাম করেছেন। হযরত ঈছা (আঃ) সশরীরে আকাশে অবস্থান করছেন এবং হযরত ইদ্রিছ (আঃ) সশরীরে বেহেস্তে অবস্থান করছেন।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

তাঁদের চেয়েও উন্নত মাকামে ও উচ্চমর্যাদায় আল্লাহ পাক নবী করিম (দঃ) কে নিয়ে সবার উপরে তাঁকে মর্যাদা প্রদান করেছেন। মুছা (আঃ) নিজে গিয়েছিলেন তূর পর্বতে। কিন্তু আমাদের প্রিয় নবী (দঃ) কে আল্লাহ্‌তায়ালা দাওয়াত করে বোরাকে চড়িয়ে ফেরেস্তাদের মিছিলসহকারে প্রথমে বায়তুল মোকাদ্দাছে নিয়েছিলেন। সেখানে সব নবীগণকে সশরীরে উপস্থিত করে হুযুর করিম (দঃ)-এর মোক্তাদী বানিয়েছিলেন। সেদিনই সমস্ত নবীগণের ইমাম হয়ে নবী করিম (দঃ) 'নবীগণেরও নবী'রূপে বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছিলেন। সমস্ত নবীগণ অষ্ট অঙ্গ (দুই হাত, দুই পা, দুই হাঁটু, নাক ও কপাল) দিয়ে সশরীরে নামায আদায় করেছিলেন সেদিন। সমস্ত নবীগণ যে সশরীরে জীবিত, তারই বাস্তব প্রমাণ মিলেছিল মি'রাজের রাত্রে। সমস্ত নবীগণ আপন আপন রওযায় জীবিত আছেন (হাদীস)।

মি'রাজের রাত্রে নবী করিম (দঃ) কে প্রথম সম্বর্ধনা দেয়া হয়েছিলো জিব্রাইল, মিকাইল ও ইস্রাফিল ফেরেস্তাসহ তাঁদের অধীনে সত্তর হাজার ফেরেস্তা দ্বারা। দ্বিতীয় সম্বর্ধনা দেয়া হয়েছিল বাইতুল মোকাদ্দছে নবীগণের (আঃ) দ্বারা। তৃতীয় সম্বর্ধনা দেয়া হয়েছিল আকাশের ফেরেস্তা, হুর ও নবীগণের দ্বারা এবং চতুর্থ ও শেষ সম্বর্ধনা দিয়েছিলেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। সিদ্‌রাতুল মোন্তাহা এবং আরশ মোয়াল্লা অতিক্রম করার পর স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা একশত বার সম্বর্ধনামূলক বাক্য - اُدْنُ مِنِّيْ يَا مُحَمَّدُ অর্থাৎ 'হে প্রিয় বন্ধু মোহাম্মদ, আপনি আমার অতি নিকটে আসুন'- একথা বলে নবী করিম (দঃ) কে সম্মানিত করেছিলেন। কোরআন মজিদে ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى আয়াতটি এদিকেই ইঙ্গিতবহ- বলে 'তাফসীরে মুগ্‌নী' ও 'মিরছাদুল ইবাদ' নামক গ্রন্থদ্বয়ের বরাত দিয়ে 'রিয়াজুন্নাছেহীন' কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত কিতাবখানা সাত শত বৎসর পূর্বে ফারসি ভাষায় লিখিত। লেখকের নিকট কিতাবখানা সংরক্ষিত আছে।

মি'রাজের ঘটনা ঘটেছিল নবুয়্যত প্রকাশের ১১ বৎসর ৫ মাস ১৫ দিনের মাথায়। অর্থাৎ প্রকাশ্য নবুয়্যতের ২৩ বৎসরের দায়িত্ব পালনের মাঝামাঝি সময়ে। সে সময় হুযুর (দঃ)-এর বয়স হয়েছিল ৫১ বৎসর ৫ মাস ১৫ দিন। সন ছিল নবুয়তের দ্বাদশ সাল। তিনটি পর্যায়ে মি'রাজকে ভাগ করা হয়েছে। মক্কা শরীফ থেকে বায়তুল মোকাদ্দাছ পর্যন্ত মি'রাজের অংশকে বলা হয় ইস্‌রা বা রাত্রি ভ্রমণ। বায়তুল মোকাদ্দাছ থেকে সিদরাতুল মোন্তাহা পর্যন্ত অংশকে

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

বলা হয় মি'রাজ। সিদ্‌রাতুল মোন্তাহা থেকে আরশ ও লা-মকান পর্যন্ত অংশকে বলা হয় ই'রাজ। কিন্তু সাধারণভাবে পূর্ণ ভ্রমণকেই এক নামে মি'রাজ বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কোরআন, হাদীসে মোতাওয়াতির এবং খবরে ওয়াহেদ দ্বারা যথাক্রমে এই তিনটি পর্যায়ের মি'রাজ প্রমাণিত।

মি'রাজের প্রথম পর্যায় ঃ

রজব চাঁদের ২৭শে তারিখ সোমবার পূর্ব রাত্রের শেষাংশে নবী করিম (দঃ) বায়তুল্লায় অবস্থিত বিবি উম্মেহানী (রাঃ)-এর ঘরে অবস্থান করছিলেন। বিবি উম্মেহানী (রাঃ) ছিলেন আবু তালেবের কন্যা এবং নবী করিম (দঃ)-এর দুধবোন। উক্ত গৃহটি ছিল বর্তমান হেরেম শরীফের ভিতরে পশ্চিম দিকে। হযরত জিব্রাইল (আঃ) ঘরের ছাদ দিয়ে প্রবেশ করে নূরের পাখা দিয়ে, অন্য রেওয়ায়াত মোতাবেক-গন্ডদেশ দিয়ে নবী করিম (দঃ)-এর কদম মোবারকের তালুতে স্পর্শ করতেই হুযুরের তন্দ্রা টুটে যায়। জিব্রাইল (আঃ) আল্লাহর পক্ষ হতে দাওয়াত জানালেন এবং নবীজীকে যমযমের কাছে নিয়ে গেলেন। সিনা মোবারক বিদীর্ণ করে যমযমের পানি দিয়ে ধৌত করে নূর এবং হেকমত দিয়ে পরিপূর্ণ করলেন। এভাবে মহাশূন্যে ভ্রমণের প্রস্তুতিপর্ব শেষ করলেন।

নিকটেই বোরাক দন্ডায়মান ছিল। বোরাকের আকৃতি ছিল অদ্ভুত ধরনের। গাধার চেয়ে উঁচু, খচ্চরের চেয়ে নীচু, মুখমন্ডল মানুষের চেহারাসদৃশ, পা উটের পায়ের মত এবং পিঠের কেশর ঘোড়ার মত (রুহুল বয়ান-সুরা ইস্‌রা)। মূলতঃ বোরাক ছিল বেহেস্তী বাহন- যার গতি ছিল দৃষ্টি সীমান্তে মাত্র এক কদম। নবী করিম (দঃ) বোরাকে সওয়ার হওয়ার চেষ্টা করতেই বোরাক নড়াচড়া শুরু করলো। জিব্রাইল (আঃ) বললেন- "তোমার পিঠে সৃষ্টির সেরা মহামানব সওয়ার হচ্ছেন- সুতরাং তুমি স্থির হয়ে যাও"। বোরাক বললো, কাল হাশরের দিনে নবী করিম (দঃ) আমার জন্য আল্লাহর দরবারে শাফাআত করবেন বলে ওয়াদা করলে আমি স্থির হবো। নবী করিম (দঃ) ওয়াদা করলেন। বোরাক স্থির হলো। তিনি বোরাকে সওয়ার হলেন। জিব্রাইল (আঃ) সামনে লাগাম ধরে, মিকাইল (আঃ) রিকাব ধরে এবং ইস্রাফিল (আঃ) পিছনে পিছনে অগ্রসর হলেন। পিছনে সত্তর হাজার ফেরেস্তার মিছিল। এ যেন দুল্‌হার সাথে বরযাত্রী। প্রকৃতপক্ষে নবী করিম (দঃ) ছিলেন আরশের দুল্‌হা (তাফসীরে রুহুল বয়ান)।

মক্কা শরীফ থেকে রওনা দিয়ে পথিমধ্যে মদিনার রওযা মোবারকের স্থানে গিয়ে বোরাক থামলো। জিব্রাইলের ইশারায় তথায় তিনি দু'রাকাত নামায আদায়

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

করলেন। এভাবে ঈছা আলাইহিস সালামের জন্মস্থান বাইতুল লাহাম এবং মাদ্ইয়ান নামক স্থানে হযরত শুয়াইব (আঃ)-এর গৃহের কাছে বোরাক থেকে নেমে নবী করিম (দঃ) দু'রাকাত করে নামায আদায় করলেন। এজন্যই বরকতময় স্থানে নামায আদায় করা ছুন্নত। এই শিক্ষাই এখানে রয়েছে। নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেন, আমি বোরাক থেকে দেখতে পেলাম- হযরত মুছা (আঃ) তাঁর মাযারে (জর্দানে) দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন।

অতঃপর জিব্রাইল (আঃ) বায়তুল মোকাদ্দাছ মসজিদের সামনে বোরাক থামালেন। সমস্ত নবীগণ পূর্ব হতেই সেখানে স্বশরীরে উপস্থিত ছিলেন। জিব্রাইল (আঃ) বোরাককে রশি দিয়ে বায়তুল মোকাদ্দাছের ছাখ্রা নামক পবিত্র পাথরের সাথে বাঁধলেন এবং আযান দিলেন। সমস্ত নবীগণ (আঃ) নামাযের জন্য দাঁড়ালেন। হযরত জিব্রাইল (আঃ) নবী করিম (দঃ) কে মোসল্লাতে দাঁড় করিয়ে ইমামতি করার জন্য অনুরোধ করলেন। হুযুর (দঃ) সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম ও সত্তর হাজার ফেরেস্তাকে নিয়ে দু'রাকাত নামায আদায় করলেন।

তখনও কিন্তু নামায ফরয হয়নি। প্রশ্ন জাগে-নামাযের আদেশ নাযিল হওয়ার পূর্বে হুযুর (দঃ) কিভাবে ইমামতি করলেন? বুঝা গেল- তিনি নামাযের নিয়ম কানুন পূর্বেই জানতেন। নামাযের তা'লীম তিনি পূর্বেই পেয়েছিলেন-তানযীল বা নাযিল হয়েছে পরে। আজকে প্রমাণিত হলো- নবী করিম (দঃ) হলেন ইমামুল মোরছালীন ও নবীউল আম্বিয়া (আঃ)। নামায শেষে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত সভায় নবীগণ নিজেদের পরিচয় দিয়ে বক্তব্য পেশ করলেন। সর্বশেষ সভাপতি (মীর মজলিস) হিসাবে ভাষণ রাখলেন নবী করিম (দঃ)। তাঁর ভাষণে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করে তিনি বললেন- **"আল্লাহ পাক আমাকে আদম সন্তানগণের মধ্যে সর্দার, আখেরী নবী ও রাহ্মাতুল্লিল আলামীন বানিয়ে প্রেরণ করেছেন"**।

[এখানে একটি আক্বিদার প্রশ্ন জড়িত আছে। তা হলো- আম্বিয়ায়ে কেরামগণের মধ্যে চারজন ব্যতিত আর সকলেই ইতিপূর্বে ইনতিকাল করেছেন এবং তাঁদের রওযা মোবারকও বিভিন্ন জায়গায় অবস্থিত। যে চারজন নবী জীবিত, তাঁরা হচ্ছেন- হযরত ইদ্রিছ (আঃ) বেহেশতে, হযরত ইছা (আঃ) আকাশে, হযরত খিযির (আঃ) জলভাগের দায়িত্বে এবং হযরত ইলিয়াছ (আঃ) স্থলভাগের দায়িত্বে। জীবিত ও ইনতিকালপ্রাপ্ত সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) বিভিন্ন স্থান থেকে মুহূর্তের মধ্যে কিভাবে সশরীরে বায়তুল মোকাদ্দাছে উপস্থিত হলেন?

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

তাফসীরে রুহুল বয়ানে এ প্রশ্নের উত্তর এভাবে দেয়া হয়েছে– "জীবিত চারজন নবীকে আল্লাহ তায়ালা স্বশরীরে এবং ইন্‌তিকাল প্রাপ্ত আম্বিয়ায়ে কেরামগণকে মেছালী শরীরে বায়তুল মোকাদ্দাছে উপস্থিত করেছিলেন।" কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থে স্বশরীরে উপস্থিতির কথা উল্লেখ আছে। কেননা, নবীগণ অষ্ট অঙ্গ দ্বারা সিজদা করেছিলেন। **নবীগণ ও অলীগণ মেছালী শরীর ধারণ করে মূহুর্তের মধ্যে আসমান জমিন ভ্রমণ করতে পারেন এবং জীবিত লোকদের মতই সব কিছু শুনতে ও দেখতে পারেন (মিরকাত ও তাঁইছির গ্রন্থ)। আধুনিক থিউসোফীতেও (আধ্যাত্মবাদ) একথা স্বীকৃত। ফিজিক্যাল বডি, ইথিক্যাল বডি, কস্যাল বডি, এস্ট্রাল বডি– ইত্যাদি রূপ ধারণ করা একই দেহের পক্ষে সম্ভব এবং বাস্তব বলেও আধুনিক থিউসোফীর বিজ্ঞানীগণ স্বীকার করেছেন।** আমরা মুসলমান। আল্লাহর কুদরত ও প্রদত্ত ক্ষমতার উপর আমাদের ঈমান নির্ভরশীল। এ বিষয়ে কবি গোলাম মোস্তফার বিশ্বনবী বইখানায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

মি'রাজের দ্বিতীয় পর্যায়

মি'রাজের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় বায়তুল মোকাদ্দাছ থেকে এবং শেষ হয় সিদ্‌রাতুল মোন্তাহাতে গিয়ে। প্রথম আকাশে গিয়ে জিব্রাইল (আঃ) ডাক দিলেন প্রথম আকাশের ভারপ্রাপ্ত ফেরেস্তাকে এবং দরজা খুলে দিতে বললেন। উক্ত ফেরেস্তা পরিচয় নিয়ে হুযুর (দঃ)-এর নাম শুনেই দরজা খুলে দিলেন। প্রথমেই সাক্ষাত হলো হযরত আদম (আঃ)-এর সাথে। হুযুর (দঃ) তাঁকে ছালাম দিলেন। কেননা ভ্রমণকারীকেই প্রথমে সালাম দিতে হয়। হযরত আদম (আঃ) নবীগণের আদি পিতা। তাই তাঁকে দিয়েই প্রথম অভ্যর্থনা শুরু করা হলো। হযরত আদম (আঃ)-এর নেতৃত্বে অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং প্রথম আকাশের ফেরেস্তারা উক্ত অভ্যর্থনায় যোগদান করেন। এমনিভাবে দ্বিতীয় আকাশে হযরত ঈছা, হযরত যাকারিয়া ও হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আঃ) এবং অন্যান্য নবী ও ফেরেস্তারা অভ্যর্থনা জানালেন।

হযরত যাকারিয়াও উক্ত অভ্যর্থনায় শরীক ছিলেন। নবী করিম (দঃ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন- "যখন আপনাকে করাত দ্বারা দ্বিখন্ডিত করা হচ্ছিল- তখন আপনার কেমন অনুভব হয়েছিল? উত্তরে যাকারিয়া (আঃ) বললেন– তখন আল্লাহ তায়ালা আমাকে ডাক দিয়ে বলেছিলেন– "আমি তোমার সাথে আছি। এতদশ্রবণে আমি মউতের কষ্ট ভুলে গিয়েছিলাম"। প্রকৃত আশেকগণের মউতের সময় নবীজীর দিদার নছিব হয়। তাই তাঁদের মউতের কষ্ট অনুভূত হয় না (আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া ঃ যাকারিয়া অধ্যায়)।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

তৃতীয় আকাশে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নেতৃত্বে অন্যান্য নবী ও ফেরেস্তাগণ নবী করিম (দঃ) কে অভ্যর্থনা জানান এবং ছালাম কালাম বিনিময় করেন। চতুর্থ আকাশে হযরত ইদ্রিছ (আঃ), পঞ্চম আকাশে হযরত হারুন (আঃ) ফেরেস্তাগণসহ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। ৬ষ্ঠ আকাশে হযরত মুছা (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাত হয়। তিনি অভ্যর্থনা জানিয়ে বিদায়কালে আশ্চর্য হয়ে বললেন– "এই যুবক নবী শেষকালে এসেও আমার পূর্বে বেহেস্তে যাবেন এবং তাঁর উম্মতগণ আমার উম্মতের পূর্বে বেহেস্তে প্রবেশ করবে"। হযরত মুছা (আঃ) নবী করিম (দঃ) ও তাঁর উম্মতের বিশেষ মর্যাদা দেখে আনন্দাশ্রুর কান্না কেঁদেছিলেন। যেমন মা সন্তানের কোন সুসংবাদ শুনতে পেলে আনন্দে কেঁদে ফেলেন। তাঁর এই আফ্‌সোস ছিল আনন্দসূচক ও স্বীকৃতিমূলক– বিদ্বেষমূলক নয়, এটাকে ঈর্ষা বলে। গিব্‌তা বা ঈর্ষা করা শরিয়তে জায়েয–কিন্তু হাছাদ বা হিংসা করা জায়েয নয় (মিশকাত)।

হযরত মুছা (আঃ) সে সময় নবী করিম (দঃ)-এর নিকট একটি হাদীসের ব্যাখ্যা জান্‌তে চেয়েছিলেন। হাদীসটি হলো–নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন–

عُلَمَاءُ أُمَّتِىْ كَاَنْبِيَاءِ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ -

অর্থ–**"আমার উম্মতের যাহেরী-বাতেনী এলেম সম্পন্ন আলেমগণ বনী ইসরাইলের নবীগণের ন্যায় (এলেমের ক্ষেত্রে)**। নবী করিম (দঃ) উক্ত হাদীসের যথার্থতা প্রমানের জন্য রুহানী জগত থেকে ইমাম গাযালী (রঃ) কে হযরত মুছা (আঃ)-এর সামনে হাযির করালেন। হযরত মুছা (আঃ) বললেন– "আপনার নাম কি? উত্তরে ইমাম গাযালী (রঃ) নিজের নাম, পিতার নাম, দাদার নাম, পরদাদার নাম সহ ছয় পুরুষের নাম বললেন। হযরত মুছা (আঃ) বললেন, আমি শুধু আপনার নাম জিজ্ঞেস করেছি। আপনি এত দীর্ঘ তালিকা পেশ করলেন কেন? ইমাম গাযালী (রঃ) আদবের সাথে জবাব দিলেন– "আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে আপনিও তো আল্লাহ তায়ালার ছোট্ট একটি প্রশ্নের দীর্ঘ উত্তর দিয়েছিলেন"। ইমাম গাযালীর (রঃ) এলেম ও প্রজ্ঞা দেখে হযরত মুছা (আঃ) মুগ্ধ হয়ে গেলেন এবং হুযুর (দঃ)-এর হাদীসখানার তাৎপর্য্য স্বীকার করে নিলেন। (রুহুল বয়ান তৃতীয় পারা ২৪৮ পৃষ্ঠা)।

[এখানে একটি বিষয় তাৎপর্য্যপূর্ণ। হযরত মুছা (আঃ)-এর ইন্‌তিকালের আড়াই হাজার বৎসর পরে মক্কার জমিনে প্রদত্ত হুযুর (দঃ)-এর ভাষণ তিনি শুনতে

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

পেয়েছিলেন-আপন রওযা থেকে। অপরদিকে দুনিয়াতে আসার পূর্বে আলমে আরওয়াহ্ থেকে ইমাম গাযালী (রঃ)-এর মত একজন বিজ্ঞ অলী আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে তুর পর্বতে ঘটে যাওয়া মুছা (আঃ)-এর ঘটনা সম্পর্কেও অবগত ছিলেন। এতে প্রমাণিত হলো- আল্লাহর নবী ও অলীগণকে আল্লাহ্ তায়ালা বাতেনী প্রজ্ঞা দান করেছেন- যাকে নূরে নযর বা ফিরাছাত বলা হয়। আল্লাহর অলীগণ আল্লাহ্ প্রদত্ত কাশ্ফ দ্বারা অনেক সময় মানুষের মনের গোপন কথাও বলে দিতে পারেন। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) কুফার এক মসজিদে জনৈক মুছল্লিকে অযু করতে দেখে বলেছিলেন-

"তুমি যিনা করে এসেছো। লোকটি অবাক হয়ে বললো, আপনি কিভাবে জানলেন? ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বললেন- তোমার অযুর পানির সাথে যিনার গুনাহ্ ঝরে পড়ছিল।"

হাদীসেও অযুর পানির সাথে গুনাহ্ ঝরে পড়ার কথা উল্লেখ আছে। লোকটি ইমাম সাহেবের বাতেনী এলেম দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলো এবং সাথে সাথে ইমাম সাহেবের হাতে তওবা করলো। বড়পীর হযরত গাউছুল আ'যম আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) বাহ্জাতুল আসরার কিতাবে বলেন ঃ

إِنَّ السُّعَدَاءَ وَالْاَشْقِيَاءَ لَيُعْرَضُوْنَ عَلٰى عَيْنَيَّ فِى اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ

অর্থ-"দুনিয়ার নেককার ও বদকার- সকলকেই আমার দৃষ্টিতে পেশ করা হয় লওহে মাহ্ফুযে"। লওহে মাহ্ফুযে নেককার-বদকার সকলের তালিকা রয়েছে। হযরত বড়পীর (রঃ)-এর নযরও দুনিয়া থেকে লওহে মাহ্ফুযে নিবদ্ধ। এজন্যই মাওলানা জালালুদ্দিন রুমী (রঃ) মসনবী শরীফে বলেছেনঃ

لوح محفوظ است پیش اولیاء+آنچه محفوظ ست محفوظ از خطا

অর্থ-**"লওহে মাহফুয অলী-আল্লাহগণের নযরের সামনে। একারণেই তাঁদের দিব্যদৃষ্টি সমস্ত ত্রুটি থেকে মুক্ত"**।

হযরত মুছা (আঃ) থেকে বিদায় নিয়ে নবী করিম (দঃ) জিব্রাইল (আঃ) সহ সপ্তম আকাশে গেলেন। সেখানে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ফেরেস্তাগণসহ নবী করিম (দঃ) কে অভ্যর্থনা জানালেন। নবী করিম (দঃ) ইরশাদ করেন- **"আমি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে একটি কুরছিতে বসে বাইতুল মামুর মসজিদের গায়ে হেলান দিয়ে বসা অবস্থায় দেখতে পেয়েছি"** (রুহুল বয়ান)।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) দুনিয়াতে আল্লাহর ঘর কা'বা শরীফ তৈরী করেছিলেন। তার বিনিময়ে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে সপ্তাকাশের বাইতুল মামুর মসজিদের

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

মোতাওয়াল্লীর সম্মান দান করেছেন। দীর্ঘ এক হাদীসে এসেছে- বাইতুল মামুরে হুযুর (দঃ)-এর সাথে নামায আদায় করেছিলেন সাদা পোষাকধারী একদল উম্মত- যাদের মধ্যে গাউসুল আযমও ছিলেন। (আ'লা হযরতের ইরফানে শরিয়ত তৃতীয় খন্ড)।

আসমানে ভ্রমণের সময়ই নবী করিম (দঃ) বেহেস্ত ও দোযখ প্রত্যক্ষ করেন। পরকালে বিভিন্ন পাপের কি রকম শাস্তি হবে, তার কিছু নমুনা তিনি মেছালী ছুরতে প্রত্যক্ষ করেছেন। সুদ, ঘুষ, অত্যাচার, নামায বর্জন, ইয়াতিমের মাল ভক্ষণ, প্রতিবেশীর উপর যুলুম, স্বামীর অবাধ্যতা, বেপর্দা ও অন্য পুরুষকে নিজের রূপ প্রদর্শন, যিনা, ব্যাভিচার ইত্যাদির শাস্তি নবী করিম (দঃ) স্বচক্ষে দেখেছেন।

বেহেস্তে হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর জন্য সংরক্ষিত প্রাসাদ, হযরত ওমরের (রাঃ) প্রাসাদ, হযরত বেলালের (রাঃ) পাদুকার আওয়ায- এসব দেখেছেন এবং শুনেছেন। বেহেস্তের চারটি নহরের উৎসস্থল নবী করিম (দঃ) কে দেখান হয়েছে। বিছমিল্লাহর চারটি শব্দের শেষ চারটি হরফ থেকে (م-ه-ن-م) চারটি নহর প্রবাহিত হয়ে হাউযে কাউছারে পতিত হতে দেখেছেন। দুধ, পানি, শরবত ও মধু- এই চার প্রকারের পানীয় বেহেস্তবাসীকে পান করানো হবে। যারা ভক্তি ও ঈমানের সাথে প্রত্যেক ভাল কাজ বিছমিল্লাহ বলে শুরু করবে, তাদের জন্য এই নেয়ামত রাখা হয়েছে। (তাফসীরে রুহুল বয়ানে বিছমিল্লাহর ব্যাখ্যায় এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে)।

সপ্ত আকাশ ভ্রমণের পর জিব্রাইল (আঃ) খাদেম হিসাবে বা প্রটোকল হিসাবে নবী করিম (দঃ) কে সিদ্‌রাতুল মোন্তাহা বা সীমান্তের কুলবৃক্ষের নিকট নিয়ে যান। হাদীসে এসেছে- **"এ বৃক্ষের পাতা হাতীর কানের মত বড় এবং ফল ওহোদ পাহাড়ের ন্যায় বড়। শহীদগণের রূহ মোবারক সবুজ পাখীর ছুরতে উক্ত বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করছেন।"** নবী করিম (দঃ) স্বচক্ষে তা দর্শন করেছেন। সিদরা বৃক্ষ পৃথিবীর সপ্ত তবক নীচ থেকে চৌদ্দ হাজার বছরের রাস্তার উপরে অবস্থিত। সিদ্‌রা থেকে আরশের দূরত্ব ছত্রিশ হাজার বৎসরের রাস্তা। সর্বমোট পঞ্চাশ হাজার বৎসরের দূরত্বে আরশে মোয়াল্লা। (ইবনে আব্বাস)। আরশে মোয়াল্লা থেকেই আল্লাহ তায়ালার যাবতীয় নির্দেশ ফিরিস্তাগণের নিকট আসে। হযরত জিব্রাইল (আঃ) সিদ্‌রাতুল মোন্তাহা থেকেই আল্লাহ তায়ালার যাবতীয় নির্দেশ গ্রহণ করে থাকেন। এখানে এসেই জিবরাঈলের গতি শেষ হয়ে যায়।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

মি'রাজের তৃতীয় পর্যায় ঃ সিদ্রা হতে আরশে আযীম পর্যন্ত

সিদ্রাতুল মোন্তাহায় পৌছে জিব্রাইল (আঃ) নবী করিম (দঃ) থেকে বিদায় নিলেন এবং বললেন- لَوْدَنَوْتُ مِنْهَا اَنْمُلَةً لَاَحْرَقْتُ وَفِيْ رِوَايَةٍ شَعْرَةً

অর্থ-**"সিদ্রাতুল মোন্তাহা থেকে এক আঙ্গুল-অন্য রেওয়ায়তে চুল পরিমাণ অগ্রসর হলে আমার ছয়শত নূরের পাখা নূরের তাজাল্লীতে জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে যাবে"**। সোব্হানাল্লাহ!

যেখানে নূরের ফেরেস্তা জিব্রাইল (আঃ) জ্বলে যায়, সেখানে আমাদের প্রিয় নবী (দঃ) সশরীরে স্বচ্ছন্দে সামনে অগ্রসরমান। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গ্রন্থের প্রারম্ভে হযরত জাবের (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত নূরে মোহাম্মদী সৃষ্টির হাদীসখানা আর একবার পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি- "তিনি আল্লাহর যাতী নূরের জ্যোতি হতে পয়দা হয়েছেন"। বুঝা গেল- তিনি মাটি নন। মাটি হলে তথায় জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যেতেন। জিব্রাইল (আঃ) আমাদের নবীজীর (দঃ) নূরের সামান্যতম অংশের তাজাল্লী দিয়ে সৃষ্টি। যেখানে জিব্রাইলের গতি শেষ, সেখান থেকে আমাদের নবীজীর (দঃ) যাত্রা শুরু। হাকিকতে মোহাম্মদী (দঃ) সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে হলে হযরত জিব্রাইল (আঃ) কে জিজ্ঞাসা করতে হবে- সিদ্রাতুল মোন্তাহার পরে জিব্রাইল (আঃ) নবীজীকে কেমন দেখেছিলেন। জিব্রাইলও বলতে পারবেনা-তার পরের ঘটনা কি ঘটেছিল। ফিরতি পথে হুযুর (দঃ)-এর স্বরূপ কেমন ছিল-তা জানতে হবে মুছা (আঃ)-এর কাছে। সেদিন তিনি প্রকৃতপক্ষে কাকে দেখেছিলেন?

বিদায়ের সময় জিব্রাইল (আঃ) নবী করিম (দঃ)-এর কাছে একটি আরয পেশ করেছিলেন- "আল্লাহ যেন হাশরের দিনে জিব্রাইলকে পুলছিরাতের উপর তার ছয়শত নূরের পাখা বিছিয়ে দেয়ার অনুমতি দান করেন"। উম্মতে মোহাম্মদী যেন উক্ত পাখার উপর দিয়ে পুলসিরাত পার হয়ে যেতে পারে। নবী করিম (দঃ) আল্লাহর দরবারে জিব্রাইলের এই ফরিয়াদ পেশ করলে আল্লাহ তায়ালা ছাহাবায়ে কেরাম ও আহ্লে মহব্বতের লোকদের জন্য তার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। আল্লাহ্ পাক বলেছিলেন- هٰذَا لِمَنْ صَحِبَكَ وَاَهْلِ مَحَبَّتِكَ (মাওয়াহেব লাদুন্নিয়া)। অর্থ-**"জিব্রাইলের পাখার ওপর দিয়ে পুলছিরাত অতিক্রম করার**

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

আরজি মঞ্জুর করা হলো–আপনার সাহাবী এবং আশেকানদের জন্য"। এই দুই শ্রেণীর লোক জিব্রাইলের পাখার উপর দিয়ে পুলছিরাত পার হয়ে যাবে।

জিব্রাইল (আঃ) থেকে বিদায় হওয়ার পর রফরফ নামে এক বাহন এসে নবী করিম (দঃ) কে আরশে আযিমে পৌঁছিয়ে দেয়। এ পথে নবী করিম (দঃ) সত্তরটি নূরের পর্দা ভেদ করেন। এক এক পর্দার ঘনত্ব ছিল পাঁচশত বৎসরের রাস্তা। এ হিসাবে ৩৬ হাজার বৎসরের রাস্তা অতিক্রম করে নবী করিম (দঃ) আরশে মোয়াল্লায় পৌঁছলেন। এ পথে যখন তিনি একাকীত্ব অনুভব করছিলেন, তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর আওয়ায শুনতে পেয়ে শান্ত হয়েছিলেন। আর একটি আওয়াজও তিনি শুনতে পেয়েছিলেন ঃ

قِفْ يَا مُحَمَّدُ فَاِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّىْ

অর্থ–"হে প্রিয় মোহাম্মদ (দঃ), আপনি একটু থামুন, আপনার রব সালাত পাঠ করছেন"। আল্লাহর সাথে দীদারের সময় নবী করিম (দঃ) এ দু'টি বিষয়ের রহস্য জানতে চাইলেন। আল্লাহ তায়ালা বললেন, আমার সালাত অর্থ আপনার উপর দরূদ পাঠ করা। আর আবু বকরের সুরতে এক ফেরেস্তা সৃষ্টি করে আবু বকরের আওয়াজ নকল করা হয়েছিল- যেন আপনি শান্ত হন। মহিউদ্দিন ইবনে আরবী (রঃ)-এর তাফসীরে বলা হয়েছে- হযরত আবু বকর সিদ্দিকই (রাঃ) রুহানীভাবে ফিরিস্তার সূরতে তথায় উপস্থিত ছিলেন। এটা ছিল তাঁর কারামত। কেননা, তিনি ছিলেন রাসুলে পাকের নিত্যসঙ্গী। তিনি দুনিয়াতে, মাযারে, হাশরের ময়দানে এবং জান্নাতেও নবী করিম (দঃ)-এর সঙ্গী থাকবেন। সুতরাং মি'রাজে রূহানীভাবে উপস্থিত থাকা খুবই স্বাভাবিক (দেখুন ইরফানে শরিয়ত)।

আরশে পৌঁছার পর লাওহে মাহফুয অবলোকনকালে নবী করিম (দঃ) দেখতে পেলেন, তথায় শেষ বাক্যটি লেখা ছিল এরূপ ঃ

قَدْ سَبَقَتْ رَحْمَتِىْ عَلٰى غَضَبِىْ

অর্থ–"আমার গযবের উপর আমার রহমত প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে"

উক্ত হাদীসে কুদসীর মধ্যে উম্মতের জন্য একটি গোপন ইশারা নিহিত রয়েছে। তা হলো- কিছু শাস্তি ভোগ করার পর সমস্ত হকপন্থী উম্মতই আল্লাহর রহমতে নাজাত পাবে।

নবী করিম (দঃ) আরশকে জিজ্ঞেস করলেন- আমি সমগ্র জাহানের জন্য রহমত- তোমার জন্য কিরূপে রহমত? আরশ তখন আরয করলো- আল্লাহ

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

তায়ালা যখন আমার মধ্যে কলেমার প্রথম অংশ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' লিখলেন, তখন আল্লাহর জালালী শানে আমার মধ্যে কম্পন সৃষ্টি হয়েছিল। মনে হয়েছিল- যেন আমি টুকরো টুকরো হয়ে যাব। তারপর যখন তার পার্শ্বে আপনার জামালী নামের অংশটুকু- 'মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' লিখে দিলেন- তখন আমার কম্পন বন্ধ হয়ে গেল (শানে হাবীব)! সুতরাং আপনি আমার জন্য বিরাট রহমত।

লা মাকানের উদ্দেশ্যে রওনা

আরশ মোয়াল্লা হতে এবার লা-মাকানের দিকে-অজানার পথে রওনা দিলেন নবী করিম (দঃ)-যেখানে স্থান, কাল বলতে কিছুই নেই। সমগ্র সৃষ্টিজগতই তখন নবীজীর কদমের নীচে। আসমান, জমিন, চন্দ্র-সূর্য্য আরশ কুর্ছি-সবকিছু, এমন কি-আলমে খালক (সৃষ্টি জগত) ও আলমে আমর (নির্দেশ জগত) সবকিছুই তখন নবী করিম (দঃ)-এর পদতলে রয়ে গেল। তিনি সমস্ত কিছু অতিক্রম করে আল্লাহর এত নিকটবর্তী হলেন যে, দুই ধনুকের চার মাথার ব্যবধান বা তার চেয়েও কম ব্যবধান রয়ে গেল। এটা রহস্য জগত। এ অবস্থাকে মুতাশাবিহাত বা দুর্বোধ্য অবস্থা বলা হয়। কোরআন মজিদে এই মাকামকে قاب قوسين বলা হয়েছে। শারিরীক সান্নিধ্য এখানে উদ্দেশ্য নয়। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য ও ঘনিষ্ট সান্নিধ্য বুঝানো।

তাফসীরে রুহুল বয়ান ৩য় পারা প্রথম আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে যে, **"নবী করিম (দঃ)-এর নূরানী সুরতের বহিঃপ্রকাশ হয়েছিল সে সময়। তাঁর বাশারিয়াত সে সময় উন্নত হতে হতে নূরে ওয়াহ্দানিয়াতের মধ্যে মিশে গিয়েছিল"** যেমন মিশে যায় পানিতে চিনি। এই মকামকে তাছাওফের ভাষায় 'ফানা' বলা হয়। রুহুল বয়ানের এবারতটুকু নিয়ে পাঠকদের জন্য উদ্ধৃত করা হল।

أنه عليه السلام مابقى فى مكان ولا فى الأمكان فى ليلة المعراج لأنه كان فانيا عن ظلمة وجوده باقيا بنور وجوده - ولهذا سماه الله نورا فى قوله تعالى قد جاء كم من الله نور و كتاب مبين (صفحه ٣٧٥ پاره تلك الرسل)

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

অর্থ–**"নবী করিম (দঃ) লাইলাতুল মি'রাজে কোন স্থানে বা সৃষ্টি জগতে সীমাবদ্ধ ছিলেননা। কেননা, তখন তিনি তাঁর জড় অস্তিত্বের অন্ধকার ভেদ করে ফানা হয়ে আল্লাহর নূরের অস্তিত্বে অস্তিত্ববান হয়েছিলেন। এ কারণেই কোরআন মজিদে (সুরা মায়েদা-১৫ আয়াত) আল্লাহ তায়ালা তাঁকে 'নূর' বলে আখ্যায়িত করে এরশাদ করেছেন, হে জগতবাসী, তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ হতে প্রথমে এক মহান নূর ও পরে একটি স্পষ্ট কিতাব এসেছে"**।

বুঝা গেল– তিনি দুনিয়াতে আগমনকালেই নূর ছিলেন– মাটি নয়। যারা মাটি বলে–তারা ভ্রান্ত। (তাফসীরে রূহুল বয়ান পৃঃ ৩৯৫ তৃতীয় পারা ১ম আয়াত)। উক্ত আয়াতের পূর্ণ বিকাশ হয়েছিল "ক্বাবা কাওছাইন" মাকামে।

আল্লাহর সাথে কালাম

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে নবী করিম (দঃ)-এর কি কি কথোপকথন হয়েছিল, তা কোরআনে গোপন রাখা হয়েছে। শুধু ইরশাদ হয়েছেঃ فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى -

অর্থ–**'যা গোপনে বলার- আল্লাহ তায়ালা তা আপন প্রিয় বান্দার কাছে গোপনেই বলে দিয়েছেন'**। নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

اُوْتِيْتُ الْعُلُوْمَ وَاُمِرْتُ بِكِتْمَانِ بَعْضِهَا

অর্থ–**"আমাকে অনেক প্রকারের গুপ্ত-সুপ্ত এলেম দান করা হয়েছে এবং সাথে সাথে ঐ এলেমের কোন কোন বিষয় গোপন রাখতেও আমাকে নির্দেশ করা হয়েছে"**।

কাসাসুল আম্বিয়া নামক উর্দ্দূ কিতাবে নব্বই হাজার কালামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ত্রিশ হাজার কালাম হাদীসের আকারে সকলের জন্য এবং ত্রিশ হাজার কালাম খাছ খাছ লোকদের নিকট প্রকাশ করার জন্য এবং অবশিষ্ট ত্রিশ হাজার সম্পূর্ণ নিজের কাছে গোপন রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। (তাফসীরে ছাভী দেখুন সূরা নিছা-১১৩ আয়াত)

তাফসীরে রুহুল বয়ানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবী করিম (দঃ) এক পর্যায়ে আল্লাহর দরবারে আরয করেছিলেন– **"আমার উম্মতকে সর্বশেষে এবং কিয়ামতের নিকটবর্তী করে কেন পাঠান হলো এবং তাদের হায়াত পূর্বের তুলনায় কম রাখা হলো কেন"? উত্তরে আল্লাহ তায়ালা বলেছিলেন, "আপনার**

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

উম্মতগণ যেন গুনাহ্ করার সময় কম পায়, সেজন্য তাদের হায়াত সংকীর্ণ করেছি এবং আপনার উম্মত যেন কম সময় কবরে থাকে– তাই তাদেরকে কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে সর্বশেষে প্রেরণ করেছি"। সুব্হানাল্লাহ! এই সময়ের সদ্ব্যবহার করা প্রত্যেক জ্ঞানী লোকেরই উচিত। নবীজীর উম্মত হওয়ার কারণেই আমাদেরকে এ সুযোগ দেয়া হয়েছে।

প্রত্যক্ষ দর্শন ঃ

আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছার পর প্রথমে নবী করিম (দঃ) আল্লাহর প্রশংসা করলেন এভাবে– اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰاتُ وَالطَّيِّبَاتُ -

অর্থ–"আমার জবান, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও ধন-সম্পদ দ্বারা যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য হাদিয়া স্বরূপ পেশ করছি"।

এর উত্তরে আল্লাহ তায়ালা নবীজীকে ছালাম দিয়ে বললেন-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ

অর্থ–"হে আমার প্রিয় নবী, আপনার প্রতি আমার ছালাম, রহমত ও বরকতসমূহ বর্ষিত হোক"। উক্ত ছালামের জবাবে নবী করিম (দঃ) আরয করলেন– اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ -

অর্থ–"হে আল্লাহ! তোমার ছালাম এবং আমি আমার গুনাহ্গার উম্মতের উপর এবং তোমার অন্যান্য নেককার বান্দাদের উপরও বর্ষিত হোক"! আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের এই ছালাম বিনিময়ের কৌশলপূর্ণ উক্তি ও ভালবাসার নমুনা এবং উম্মতের প্রতি নবীজীর স্নেহ মমতা দেখে ও শুনে জিব্রাইল সহ আকাশের মোকাররাবীন ফেরেস্তাগণ সমস্বরে বলে উঠলেন–

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

অর্থ–"আমি (প্রত্যেকে) সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) আল্লাহর অতি প্রিয় বান্দা এবং তাঁর প্রিয় রাসুল"। "আল্লাহর কাছে তিনি প্রিয় বান্দা– কিন্তু বিশ্ব জগতের কাছে তিনি প্রিয় রাসুল"। কি যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক এখানে বর্ণনা করা হয়েছে–তা কেবল মহাজ্ঞানীরাই অনুধাবন করতে পারবেন।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

আল্লাহ তায়ালা নিজের ও হাবীবের মধ্যে ভাব বিনিময়ের এই তাশাহ্হুদ আমাদের নামাযের একটি ওয়াজিব অংশ করে দিয়েছেন। এর প্রতিটি শব্দ নামাযের বৈঠকে ওয়াজিব করে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালার দরবারে নবী করিম (দঃ) যেভাবে সম্মোধনমূলক তাহিয়্যাত পাঠ করেছিলেন এবং আল্লাহ তায়ালাও যেভাবে সম্বোধন করে নবীজীকে ছালাম দিয়েছিলেন, অনুরূপভাবেই তাশাহ্হুদ পড়ার সময় প্রত্যেক মুছল্লিকে আল্লাহকে সম্বোধন করে তাহিয়্যাত অংশটুকু পাঠ করতে হবে এবং নবী করিম (দঃ)-কেও সম্বোধন করে ছালাম পেশ করতে হবে। ফতোয়া শামীর এবারত দেখুন-

وَيَقْصُدُ بِهَا الْاِ نْشَاءُ لَا الْاِخْبَارُ -

অর্থ-**"আল্লাহর তাহিয়্যাত এবং রাছুলের প্রতি ছালাম পাঠকালীন সময়ে খেতাব বা সম্বোধন করতে হবে। শুধু মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়"।** (ফতোয়ায়ে শামী, ফতোয়ায়ে আলমগীরী ও বাহারে শরীয়ত দ্রষ্টব্য)।

যেহেতু মুমিনদের জন্য নামায মি'রাজ স্বরূপ- সুতরাং মি'রাজের মতই আল্লাহ ও রাসুলকে সম্বোধন করতে হবে। সম্বোধন করা হয় হাযির নাযির ব্যক্তিকে। সুতরাং নবীজী হাযির ও নাযির। (ইমাম গাযালীর ইহ্ইয়া)

উম্মতের জন্য মাগফিরাতের সুপারিশ ঃ

রিয়াজুন্নাছেহীন কিতাবে তাফসীরে মুগনী ও মিরছাদুল ইবাদ নামক দুটি গ্রন্থের সুত্রে বর্ণিত আছে- নবী করিম (দঃ) কে আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি আমার কাছে কি প্রার্থনা করেন"? নবী করিম (দঃ) বললেন- "হে আল্লাহ, আপনি রাব্বুল আলামীন, আর আমাকে বানিয়েছেন রাহমাতুল্লিল আলামীন। আমার উম্মত বেশুমার গুনাহগার মুযনেবীন। আমার খাতিরে আমার গুনাহগার উম্মতকে মাফ করে দিন"। আল্লাহ তায়ালা বললেন- "আপনার খাতিরে আপনার উম্মতের মধ্য হতে সত্তর হাজারকে ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি"। এরপর আর কি প্রার্থনা আছে? নবী করিম (দঃ) পুনরায় গুনাহগার উম্মতের কথা উল্লেখ করলেন। এভাবে ৭০০ (সাতশত) বার প্রার্থনা করলেন। প্রত্যেকবার সত্তর হাজার করে গুনাহগার উম্মতের ক্ষমার কথা ঘোষণা করলেন পাক পরওয়ারদেগার। এভাবে চার কোটি নব্বই লক্ষ উম্মতকে ঐ দিন ক্ষমার আওতায় আনা হলো।

নবী করিম (দঃ) উম্মতের মায়ায় আবারও আরয পেশ করলেন। আল্লাহ তায়ালা এবার বললেন- "এখন আপনি ও আমি একা। হাশরের ময়দানে ফেরেস্তা,

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

আম্বিয়া, আউলিয়া ও হাশরবাসীদের সবার সামনে অবশিষ্টকে ক্ষমা করবো। আপনি চাইবেন– আমি দেবো। সবাই সাক্ষী থাকবে এবং আপনার মর্তবা তখন সকলেই উপলব্ধি করবে"। সোব্‌হানাল্লাহ! এমন শাহী দরবারে গিয়েও নবী করিম (দঃ) নিজের ও পরিবারের জন্য কিছুই না চেয়ে শুধু গুনাহ্‌গার উম্মতের নাজাত প্রার্থনা করেছেন। সত্যিই তিনি ঈমানদারদের জন্য রাউফ ও রাহীম। সুরা তওবার শেষাংশে এরশাদ হয়েছে ঃ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ

অর্থাৎ– **"নবী করিম (দঃ) মোমেনদের জন্য স্নেহময় ও দয়াশীল"**। এই স্নেহ ও দয়ার বহিঃপ্রকাশ হয়েছিল মি'রাজের রাত্রিতে এবং ভবিষ্যতে হবে হাশরের ময়দানে। যখন আল্লাহর ভয়ে কেউ সুপারিশের জন্য অগ্রসর হবে না– তখন নবী করিম (দঃ) হতাশ হাশরবাসীদেরকে অভয় দিয়ে বলবেন, اَنَا لَهَا **"তোমাদের শাফাআতের জন্য আমি আছি"** –(বোখারী ও মুসলিম)। সুব্‌হানাল্লাহ!

মি'রাজ হতে ষষ্ঠ আকাশে প্রত্যাবর্তন ও পুনঃ গমন

অনেক রায় ও নেয়াযের কথার পর আল্লাহ্ তায়ালা উম্মতে মোহাম্মদীর উপর দিনে রাত্রে ৫০ পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করলেন এবং নবী করিম (দঃ) কে বিদায় দিলেন। নবী করিম (দঃ) যখন ৬ষ্ঠ আকাশে আসলেন, তখন মুছা (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাত হলো। সিদ্‌রাতুল মোন্তাহাতে জিব্রাইল (আঃ), কিংবা সপ্তম আকাশে হযরত ইব্রাহীম (আঃ), কিংবা অন্য কোন আকাশে অন্যান্য নবীগণের সাথে সাক্ষাতের উল্লেখ কোন হাদীসগ্রন্থে দেখা যায়না। শুধু মুছা (আঃ)-এর উল্লেখ রয়েছে– (বোখারী মুসলিম, মিশকাত প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থ)।

হযরত মুছা (আঃ) আরয করলেন– **"কত ওয়াক্ত নামায ফরয করা হলো আপনার উম্মতের উপর"? হুযুর (দঃ) বললেন– পঞ্চাশ ওয়াক্ত। মূছা (আঃ) বললেন, আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি – আপনার উম্মত তা আদায় করতে পারবে না। কেননা, আমার উম্মতের উপর আরও কম হওয়া সত্ত্বেও তারা তা আদায় করতে পারেনি। সুতরাং আপনি আপনার রবের কাছে আবার ফিরে যান এবং হাল্কা করার প্রার্থনা করুন**। হাদীসের এবারত নিম্নরূপ–

اِرْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ وَاسْئَلْ التَّخْفِيْفَ ـ

অর্থ–**"আপনার রবের কাছে ফিরে যান এবং হাল্কা করার দরখাস্ত পেশ করুন"**। হুযুর (দঃ) এরশাদ করেন- **"অতঃপর আমি ফিরে গেলাম। আল্লাহ্ তায়ালা**

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

এবার পাঁচ ওয়াক্ত কমালেন। আমি পুনঃ ৬ষ্ঠ আকাশে ফিরে আসলাম। এবারও মুছা (আঃ) পুনরায় আমার রবের কাছে ফিরে যেতে আরয করলেন"। এভাবে নয় বার ৬ষ্ঠ আকাশ থেকে নবী করিম (দঃ) আল্লাহর দরবারে যাওয়া-আসা করলেন। আল্লাহ তায়ালা প্রতিবার পাঁচ ওয়াক্ত করে নামায কমাতে থাকলেন এবং পঞ্চাশের মধ্যে পঁয়তাল্লিশ ওয়াক্ত কমিয়ে মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত বহাল রাখলেন। এবারও হযরত মুছা (আঃ) পুনরায় আল্লাহর দরবারে ফিরে যাওয়ার জন্য আরয পেশ করলেন। নবী করিম (দঃ) বললেন- **"আমি পাঁচ ওয়াক্তেই রাজী হলাম। পুনরায় ফিরে যেতে লজ্জা লাগে"**। আল্লাহ্ পাক সাথে সাথে ওহী নাযেল করলেন ঃ - لاتبديل لكلمات الله

অর্থাৎ- **"আল্লাহর ফায়সালার আর কোন পরিবর্তন হবে না"। তবে আল্লাহ তায়ালা শান্তনা দিয়ে নবী করিম (দঃ) কে বললেন, "আপনার উম্মত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করলে আমার এখানে পঞ্চাশ ওয়াক্তই লিখা হবে। সুতরাং আপনার উম্মতকে পাঁচ ওয়াক্ত দেয়া যেমন ঠিক, তেমনিভাবে আমার পঞ্চাশ ওয়াক্তের নির্দেশও ঠিক**। পার্থক্য শুধু সংখ্যায়- "গুণে নয়"। সুব্হানাল্লাহ! আল্লাহর কি অসীম দয়া! বান্দা পাঁচ ওয়াক্ত আদায় করবে, আর আল্লাহ তায়ালা তার দশগুন করে রেকর্ড করবেন-এমন নযির কোথাও আছে কি?।

পাঁচ ওয়াক্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার হেকমত তাফসীরে রুহুল বয়ান, ইতকান, বেদায়া নেহায়া- প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। ফজর নামায হযরত আদম (আঃ) আদায় করতেন। যোহরের নামায হযরত ইব্রাহীম (আঃ), আসরের নামায হযরত ইউনুছ (আঃ), মাগরিবের নামায হযরত ঈছা (আঃ) এবং এশার নামায হযরত মুছা (আঃ) আদায় করতেন। আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করে পাঁচজন পয়গাম্বরের পাঁচ ওয়াক্ত নামায একত্রিত করে উম্মতে মোহাম্মদীকে দান করলেন। সুতরাং নামাযের ইবাদতটি নবীগণের স্মৃতি বহনকারীও বটে।

[মূলতঃ প্রত্যেক ইবাদতের মধ্যেই, এমনকি- প্রত্যেক তসবিহ্-এর মধ্যেও কোন না কোন নবী, অলী অথবা ফেরেস্তার ইবাদতের স্মৃতি বিজড়িত আছে। যেমন- হজ্বের মধ্যে হযরত ইব্রাহীম, কোরবানীর মধ্যে হযরত ইসমাইল (আঃ), সাঈ-এর মধ্যে বিবি হাজেরা এবং আরাফাতে অবস্থানের মধ্যে হযরত আদম (আঃ)-এর স্মৃতি জড়িত। নামাযের মধ্যে কিয়াম, রুকু, সিজদা, তছবিহ্-ইত্যাদি ফেরেস্তাদের ইবাদতের স্মৃতি-যা নবী করিম (দঃ) মি'রাজে প্রত্যক্ষ করে

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

এসেছেন। নবী করিম (দঃ) প্রথমে নিজে আমল করেছেন। পরে আমাদেরকে হুকুম করেছেন-- হুযুর (দঃ) কে দেখে দেখে অনুসরণ করার জন্য। সুতরাং নবী করিম (দঃ)-এর অনুকরণ ও অনুসরণের নামই ইবাদত– যার মধ্যে রয়েছে অন্যদের স্মৃতি বিজড়িত। (জালালুদ্দীন সূয়ুতি কৃত শরহে সুদূর)।

এখানে প্রশ্ন জাগে- মি'রাজ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে শুধু মুছা (আঃ)-এর সাথে হুযুর (দঃ)-এর সাক্ষাৎ এবং তাঁর অনুরোধে বার বার আল্লাহ্‌র দরবারে নবী করিম (দঃ)-এর যাতায়াত কি আল্লাহর ইচ্ছায় এবং পরিকল্পনা মোতাবেক হয়েছিল–না কি দুই নবীর ইচ্ছায় হয়েছিল? এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। সাথে সাথে আর একটি প্রশ্নও এসে যায়। তাহলো– নবী করিম (দঃ) বার বার আল্লাহর দরবারে গেলেন কিসে করে এবং দুনিয়াতে ফেরত আসলেন কেমন করে? আরও একটি প্রশ্ন জাগে–মুছা (আঃ) কি উদ্দেশ্যে উম্মতে মোহাম্মাদীর জন্য সুপারিশ করেছিলেন? অন্য কোনও উদ্দেশ্য এর ভিতরে নিহিত ছিল কিনা? বিভিন্ন কিতাবে এসবের উত্তর দেয়া আছে। নিম্নে ক্রমান্বয়ে বর্ণনা করা হলো।

১। **প্রথম প্রশ্নের উত্তর হলো ঃ** আল্লাহ তায়ালার পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেকই হযরত মুছা (আঃ) ৬ষ্ঠ আকাশে অপেক্ষমান ছিলেন। আল্লাহর ইচ্ছা ছিল– তাঁর প্রিয় হাবীব বারবার তাঁর দরবারে ফিরে যাক এবং দশবার তাঁর সাথে হাবীবের দীদার নসিব হোক। (তাফসীরে সাভী)

২। **দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব হচ্ছে ঃ** ষষ্ঠ আকাশ থেকে আল্লাহর দরবারে যাতায়াতের ক্ষেত্রে বা দুনিয়াতে ফেরত আসার ক্ষেত্রে রফরফ বা বোরাক ব্যবহারের উল্লেখ হাদীসের কিতাবে সরাসরি পাওয়া যায় না। তাফসীরে রুহুল মাআনীতে বলা হয়েছে ঃ যেভাবে বোরাকে করে নবী করিম (দঃ) মি'রাজ গমন করেছেন, সেভাবেই আবার ফেরত এসেছেন। এটাই স্বাভাবিক ধারণা। তাফসীরে রুহুল বয়ান তাফসীরে রুহুল মাআনীরও পূর্বে রচিত– তাই এর মতামত অধিক শক্তিশালী। উক্ত তাফসীরে রুহুল বয়ানের গ্রন্থকার সুরা নাজম-এর প্রথম তিনটি আয়াত-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ

وَالنَّجْمِ + اِذَا هَوٰى + مَاضَلَّ صَا حِبُكُمْ وَمَا غَوٰى +

অর্থ–"**নিম্নগামী তারকার শপথ। তোমাদের সাথী মোহাম্মদ (দঃ) কখনও পথ ভুলেননি বা পথভ্রষ্ট হননি এবং টেরা বাঁকাও হননি**"।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

তাফসীরকারক বলেন– উক্ত আয়াত মি'রাজের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। সাধারণ অর্থে অস্তমিত তারকা হলেও ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ) -এর মতে 'নাজম দ্বারা উক্ত আয়াতে নবী করিম (দঃ) কেই বুঝান হয়েছে। কেননা হুযুর (দঃ)-এর এক হাজার নামের মধ্যে আন-নাজম একটি নাম"। আর هوى অর্থ নিম্নগামী। তাহলে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়– "আল্লাহর দরবার থেকে নিম্নগামী তারকা মুহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)-এর শপথ"। আর 'পথ ভুলেননি বা টেরা বাঁকা হননি'– এই মন্তব্যের অর্থ ঃ "যে পথে তিনি এসেছিলেন, সেপথেই ফিরত গিয়েছেন"।

বোরাক বা রফরফের মাধ্যমে প্রত্যাবর্তন করলে একথার প্রয়োজন হতো না। কেননা, তখন তো বোরাক বা রফরফই তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতো। সুতরাং নবী করিম (দঃ) মি'রাজ থেকে আসাকালীন সময়ে আল্লাহর কুদরতে একা একা যাতায়াত করেছেন– এটাই সুস্পষ্ট। কেননা, তিনি তো নূর। নূর ও আলো সব কিছু ভেদ করে সোজা গতিতে ধাবিত হয়, এটাই বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত (তাফসীরে ইবনে আব্বাস রুহুল বয়ান-সুরা আন নাজম)। শুধু বাইতুল মোকাদ্দাছে এসে বোরাকে আরোহন করে তিনি মক্কায় পৌঁছেন। ৭০০ বৎসর পূর্বের ফারছী গ্রন্থ "রিয়াযুন নাসিহীন"-এ ইমাম জা'ফর সাদেক (রাঃ) হতে বর্ণনা করা হয়েছে- **"মি'রাজ হতে ফিরে আসার পথে রফরফ, বোরাক বা ফিরিস্তা-কিছুই সাথে ছিলনা"**।

৩। **তৃতীয় প্রশ্নের জবাব হলো ঃ** একজন নবী ইন্তিকালের আড়াই হাজার বৎসর পরও অন্যের উপকার করতে পারেন। যেমন উপকার করেছিলেন মুছা (আঃ) উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য। এভাবেই আল্লাহর নবী এবং অলীদের উছিলায় সাধারণ মানুষের অনেক উপকার হয়। এ সম্পর্কে অসংখ্য প্রমাণ ও দলীল বিদ্যমান আছে।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয়- হযরত মুছা (আঃ) আমাদের উপকারের জন্য ৬ষ্ঠ আকাশে দাঁড়িয়ে থেকে নবী করিম (দঃ) কে বারবার আল্লাহর দরবারে যাতায়াত করতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অন্য একটি উদ্দেশ্যও এর মধ্যে নিহিত ছিল। তাহলো–তাফসীরে সাভীতে উল্লেখ আছে, তিনি তূর পর্বতে আল্লাহর দীদার চেয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এমন কি– আল্লাহর যে তাজাল্লী তূর পর্বতে আপতিত হয়েছিল–মুছা (আঃ) ঐ তাজাল্লীতে বেহুঁশ হওয়ার কারণে তাও দর্শন করতে পারেননি। কিন্তু মি'রাজের রাত্রিতে নবী করিম (দঃ) আল্লাহর সান্নিধ্যে ফানা হয়ে আল্লাহর যে তাজাল্লী নিয়ে এসেছিলেন– তা দেখে হযরত মুছা

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

(আঃ)-এর তূর পর্বতের সেই সাধ পুনরায় জেগে উঠে। তাই তিনি বারবার আল্লাহর তাজাল্লী দর্শনের জন্যই উম্মতে মোহাম্মদীর বাহানা করে নবী করিম (দঃ) কে আল্লাহর দরবারে বার বার ফিরে যেতে অনুরোধ করেন। আমাদের জন্য সুপারিশ করা ছিল উপলক্ষ মাত্র। সুব্হানাল্লাহ! (তাফসীরে সাভী ২য় খন্ড ৪১৯ পৃঃ) একটি কাজে কয়েকটি উদ্দেশ্য থাকা খুবই স্বাভাবিক। সুতরাং উভয়বিধ উদ্দেশ্যের মধ্যে (উম্মতের কল্যাণ ও খোদা দর্শন) কোন বিরোধ নেই। আ'লা হযরত শাহ আহ্মদ রেযা (রাঃ) বলেন–

کس کو دیکھا یہ موسی سے پوچھے کوئی

آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام — مصطفے

অর্থ–"মুছা (আঃ) সেদিন কাকে দেখেছিলেন এবং তাঁর মাধ্যমে কার প্রতিচ্ছবি দেখেছিলেন– তা মুছা (আঃ) কেই জিজ্ঞেস করো"। দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের দিব্য জ্ঞানের উপর শত সহস্র ছালাম"। (হাদায়েকে বখশিষ– আ'লা হযরত)। রাসুলে খোদা (দঃ) হলেন আল্লাহ দর্শনের আয়না স্বরূপ (মসনবী)।

مصطفے آئنۂ ظل خدا ست + منعکس درو ے ہمہ خوۓ خداست —

আল্লাহর দীদার সম্ভব কিনা?

হাবীবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বচক্ষে আল্লাহকে দেখেছেন। আল্লাহর দীদার বা দর্শন সম্ভব কিনা এবং সম্ভব হলে কিভাবে এবং কোথায় সম্ভব? এ প্রশ্নটি মি'রাজের সাথে সম্পৃক্ত বলে এ সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করতে চাই।

প্রথমতঃ নীতিগতভাবে আল্লাহর দর্শন লাভ করা সম্ভব। নবী করিম (দঃ) মি'রাজ গমন করে জাগ্রত অবস্থায় স্বচক্ষে আল্লাহর দীদার লাভ করেছিলেন। মাথার চক্ষু মোবারক দিয়ে এবং হৃদয় দিয়েও তিনি আল্লাহকে দেখেছিলেন। নবী করিম (দঃ)-এর চোখ এবং কলব উভয়ের দর্শনই সমান গুরুত্ববহ। আল্লাহপাক এরশাদ করেন–**"তিনি চোখে যা দেখেছেন–হৃদয় তা অস্বীকার করেনি"**।

হযরত মুছা (আঃ) আল্লাহর নূরের তাজাল্লী এই চোখে সহ্য করতে পারেননি বলেই বেহুঁশ হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। বুঝা গেল- সহ্য করতে পারলে তিনি দেখতেন। দুনিয়ার চোখে আল্লাহ্কে দেখার আরয করার কারণে আল্লাহ তায়ালা বলেছিলেন لن ترانی অর্থাৎ– এই চোখে কখনও দেখতে পাবে না।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

কিন্তু নবী করিম (দঃ) কে সচক্ষে দর্শন দিয়েছেন মি'রাজে। একবার নয়- দশবার; আর ৩৩ বার দর্শন দিয়েছেন দুনিয়াতে স্বপ্নে। (বোখারীর হাশিয়া- আহম্মদ আলী সাহারানপুরী- নামায অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। মহিউদ্দিন ইবনে আরবী (রাঃ) স্বীয় তাফসীরে উল্লেখ করেছেন যে, নবী করিম (দঃ)-এর মি'রাজ হয়েছিল ৩৪ বার। তন্মধ্যে ১ বার জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে ও সচক্ষে এবং ৩৩ বার হয়েছিল স্বপ্নযোগে এবং রুহানীভাবে। সে সময় তিনি মদিনায় বিবি আয়েশা (রাঃ)-এর ঘরে অবস্থান করছিলেন। ঐ স্বপ্নের মি'রাজের ব্যাপারেই হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) বলেছেন যে, "আমি মি'রাজের রাত্রে নবী করিম (দঃ)-এর দেহ মোবারককে আমার বিছানা হতে হারিয়ে ফেলিনি- বরং তিনি আমার বিছানায় শুয়েই মি'রাজ করেছেন"-অর্থাৎ স্বপ্নে আল্লাহ্‌কে দেখেছেন। বাতিলপন্থীরা এই হাদীসকে মক্কার মি'রাজের সাথে একত্রিত করে বলছে- হুযুরের সশরীরে মি'রাজ হয়নি। হাদীসের প্রেক্ষাপট জানা না থাকলে এরকমই হয়ে থাকে।

আল্লাহ্ তায়ালা মদিনায় ৩৩বার রূহানী সাক্ষাৎ দিয়েছেন নবীজীর সাথে। সশরীরের মি'রাজ হয়েছিল মক্কা শরীফ থেকে, যে সময় হযরত আয়েশা (রাঃ) স্বামীগৃহে গমনই করেননি। হযরত আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক হুযুর (দঃ)-এর সশরীরে মি'রাজ গমনের অস্বীকৃতিসূচক বর্ণনা বা হাদীসখানা মদিনায় সংঘটিত রুহানী মি'রাজের সাথে সম্পর্কিত। মক্কা হতে মি'রাজে গমনের সাথে এর কোনই সম্পর্ক নেই। এটাই আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সলফে সালেহীন ও অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামের মত।

আউলিয়ায়ে কেরামগণ স্বপ্নে বা মোশাহাদার মাধ্যমে আল্লাহর দীদার লাভ করেছেন বলে আকায়েদের কিতাবে উল্লেখ আছে। ইমাম আবু হানিফা (রঃ), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ) এবং ক্বেরাতের সপ্ত ইমামের অন্যতম ইমাম হযরত ক্বারী হামযা (রঃ) প্রমুখ অলীগণের আল্লাহ দর্শন এই শ্রেণীভূক্ত। আর পরকালে সকল মোমেনই আল্লাহকে চাক্ষুস দেখতে পাবে বলে ২৩ জন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত মোতাওয়াতের হাদীসে প্রমাণ পাওয়া যায় (নিবরাছ)।

কিন্তু কিছু কিছু জ্ঞানপাপী আলেম- যারা নিজেকে বড় আলেম বা শাইখুল হাদীস বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে- তারা নবী করিম (দঃ)-এর স্বপ্নে আল্লাহর দীদার লাভ করাকে অবাস্তব বলে এক ফতোয়ায় উল্লেখ করেছে। "তারা এও দাবী করেছে যে, কোন সাহাবী- এমনকি নবী করিম (দঃ)ও স্বপ্নে আল্লাহর দীদার লাভ করার দাবী করেননি। বাস্তবে বা স্বপ্নে আল্লাহর দীদারের ঘটনা

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

নাকি গাজাখুরী কথা। হযরত বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) রচিত সিররুল আসরার কিতাবে বর্ণিত এ সম্পর্কিত হাদীসকে এই পাপীরা সনদবিহীন হাদীস বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল"।

অধম লেখক (জলিল) ১৯৯৩ইং সনে ২৭ পৃষ্ঠা ব্যাপী এক ফতোয়ায় তাঁদের দাবীকে ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন বলে প্রমাণ করেছি- তাদেরই দেওবন্দ মাদ্রাসার কিতাব তালিকুছ ছবিহ্ ও ফয়যুল বারী শরহে বোখারী দিয়ে এবং হাটহাজারী থেকে প্রকাশিত তাদের কিতাব তানজিমুল আশতাত ফি হাল্লিল মিশকাত থেকে সনদসহ হাদীস পেশ করে। এছাড়াও মোল্লা আলী ক্বারীর মিরকাত গ্রন্থের মধ্যেও উক্ত হাদীসখানা সনদসহ লিপিবদ্ধ আছে। নবী করিম (দঃ) উক্ত হাদীসে এরশাদ করেছেন, **"আমি আমার প্রভু আল্লাহতায়ালাকে গোফবিহীন যুবকের ন্যায় (নিখুঁত) দেখেছি"**। এই হাদীসখানা মোতাশাবিহি বা দুর্বোধ্য- যার প্রকৃত অবস্থা রহস্যাবৃত। কেননা, হানাফী মাযহাব মতে আল্লাহ্র কোন আকৃতি নেই। তাই বলে এ হাদীস সনদ বিহীন নয়। আমার উক্ত ফতোয়ায় সনদ উল্লেখ করেছি।

মোদ্দাকথা হলো– আল্লাহতায়ালা বিভিন্ন অবস্থায় নিজেকে প্রকাশ করে থাকেন। হাশরের ময়দানে মুমিনগণ দেখবে রহমানী অবস্থায়, আর কাফেররা দেখবে গযবী ও কাহহারী অবস্থায়। নবী করিম (দঃ) ছাড়া অন্য কোন সৃষ্টি আল্লাহকে প্রত্যক্ষভাবে সচক্ষে দেখেনি। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল হযরত ইবনে আব্বাছ (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে জোর দিয়ে বলেছেন যে, **"নবী করিম (দঃ) আল্লাহ্ তায়ালাকে সচক্ষে দেখেছেন"। এভাবে বার বার বলতে বলতে তার (ইবনে হাম্বল) নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এসেছিল**।

তাফসীরে রুহুল বয়ানে উল্লেখ আছে, হিজরতের সাত মাস পূর্বে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল। নবী করিম (দঃ) কে আল্লাহ তায়ালা যে-সব এলেম দান করেছেন, তা উর্দ্ধজগতের যাবতীয় গায়েবী বিষয়ের এলেমের সমষ্টি বা ইলমে মুহীত। আরবী এবারত দেখুন ঃ

صَارَ عِلْمُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُحِيْطًا لِّجَمِيْعِ الْمَعْلُوْمَاتِ الْغَيْبِيَّةِ الْمَلَكُوْتِيَّةِ -

অর্থ–**"হুযুর** (দঃ)-এর এলেম **উর্দ্ধজগতের** যাবতীয় গায়েবী বিষয়ের **বেষ্টনকারী"**। সুতরাং নবী করিম (দঃ)-এর "ইলমে গায়েব মুহীত" অস্বীকারকারীদের দাবী মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। ওহাবী সম্প্রদায় ইলমে গায়েব মূহীত অস্বীকার করে।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ইমামে রাব্বানী (রহঃ) বলেছেন ঃ "আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর খাছ ইলমে গায়ব বিশেষ বিশেষ নবীগণকে দান করেছেন। মকতুব নং ৩১০ প্রথম খন্ড। (আল্লাহর খাছ এলেম পাঁচটি। যথাঃ (১) কিয়ামতের বিষয় (২) বৃষ্টি বর্ষন (৩) মাতৃগর্ভের সন্তান ছেলে-না মেয়ে (৪) আগামীদিনের রিযিক (৫) কোথায় কে মৃত্যু বরণ করবে। এগুলোর ইলম বিশেষ বিশেষ নবীকে দান করেছেন। (মকতুবাত শরীফ প্রথমখন্ড মকতুব নং ৩১০)। বুঝা যাচ্ছে–পঞ্চ গায়েবের এলেমও আল্লাহ্পাক তাঁকে দান করেছেন।

মি'রাজের রাত্রিতে আল্লাহ তায়ালা নবী করিম (দঃ) কে যেভাবে সম্মানিত করেছেন, তাতেই বুঝা যায়– তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, অতিমানব এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু জনৈক দেলোয়ার হোসেন সাঈদী মওদুদীর মতবাদ গ্রহণ করে নবী করিম (দঃ) কে আল্লাহর 'দাস' বলে বিভিন্ন মাহফিলে তাফসীরের নামে অপপ্রচার চালাচ্ছে। সে বলতে চায়– عبده শব্দের অর্থ নাকি আল্লাহর দাস। নাউযুবিল্লাহ! আমি বলতে চাই– তার দাবী অনুযায়ী–দাসের জন্য কি এত অভ্যর্থনা ও এত শাহী এন্তেজাম করা হয়? দাস হলো নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোক। হিন্দুদের মধ্যে দাশ হলো চতুর্থ শ্রেণীর বা সর্বনিম্ন শ্রেণীর শুদ্র জাত। عَبْدُهٗ শব্দটি সাতাইশ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে– "যার মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় হয় এবং যার জন্য স্বয়ং আল্লাহ প্রতীক্ষমান"।

আল্লামা ইকবাল عَبْدُهٗ শব্দটির তাৎপর্য্য সুন্দরভাবে তার কাব্যে ফুটিয়ে তুলেছেন এভাবে-

عبد دیگر عبده چیزے دیگر + اوسراپا انتظار این مُنْتَظَرْ

অর্থ–'আবদ' এক জিনিস, আর 'আবদুহু' অন্য জিনিস। আবদ অর্থ আল্লাহর জন্য এন্তেজারকারী এবং আবদুহু অর্থ- যার জন্য স্বয়ং আল্লাহ্ এন্তেজারী করেন।

যাক–মি'রাজ থেকে নবী করিম (দঃ) ফিরে এসে দেখতে পেলেন–বিছানা এখনও গরম রয়েছে। ভোরে তিনি কাবাগৃহে তশরীফ নিয়ে সকলের কাছে এ ঘটনা বললেন। আবু জাহল প্রমুখ কোরাইশ দলপতিরা একথা শুনে পরীক্ষার ছলে বাইতুল মোকাদ্দাসের দরজা-জানালা ইত্যাদির বিবরণ জান্তে চাইল। তারা জান্ত যে, নবী করিম (দঃ) কোনদিন বাইতুল মোকাদ্দাস যান নি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সাথে সাথে জিব্রাইলের মারফতে বাইতুল মোকাদ্দাসের পূর্ণ

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ছবি তাঁর চোখের সামনে তুলে ধরলেন- যেন বর্ণনা দিতে হুযুরের তকলীফ না হয়। নবী করিম (দঃ) দেখে দেখে সব বলে দিলেন। এতেও তারা ক্ষান্ত হলনা। পুনরায় জিজ্ঞেস করলো- আপনি কি আমাদের কোন বাণিজ্য কাফেলা দেখেছেন? নবী করিম (দঃ) বললেন- **"হ্যাঁ, তারা মক্কার অতি নিকটে পৌঁছেছে এবং বুধবার সূর্য উঠার পূর্বেই তারা মক্কায় প্রবেশ করবে"**। (বেদায়া)।

আবু জাহল প্রমুখ ঐদিন খুব ভোরে ঘরের ছাদে উঠে কাফেলার আগমন পরীক্ষা করতে লাগলো। এদিকে সূর্য উঠে উঠে অবস্থা-অথচ কাফেলা এখনও দৃষ্টি গোচর হচ্ছে না। আবু জাহল বললো- এবার পরীক্ষা হয়ে গেছে- নবীর মি'রাজ মিথ্যা। কেননা, তিনি বলেছেন- বুধবার সূর্য উঠার পূর্বে কাফেলা মক্কায় প্রবেশ করবে- অথচ আমরা আমাদের দৃষ্টিপথে কাফেলার কোন চিহ্নই দেখছিনা। আল্লাহ তায়ালা নবী করিম (দঃ)-এর কথা ও সম্মান ঠিক রাখার জন্য সেদিন রাত্রিকে আরও দীর্ঘায়িত করে দিলেন-সূর্যের গতি থামিয়ে দিয়ে। পরে দেখা গেল, সূর্য উঠার পূর্বেই কাফেলা মক্কায় পৌঁছে গেছে। সুবহানাল্লাহ! (বেদয়া নেহায়া)।

এভাবে আল্লাহ তায়ালা নবী করিম (দঃ)-এর মি'রাজের ঘটনা সত্য প্রমাণিত করলেন। কিন্তু চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনী। আবু জাহল নবীজীর মি'রাজ গমনকে অসম্ভব বলে প্রমাণ করার জন্য হৈ চৈ শুরু করে দিল। সে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) কে বাড়ী হতে আসতে দেখে মি'রাজ বিষয়ে ধোকা দেয়ার চেষ্টা করলো। তার কথা শুনে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন-একথা কে বলেছেন? আবু জাহল উপহাস করে বললো, কে আর বলবে? তুমি যাঁর পিছনে এতদিন ঘুরছো, তিনি ছাড়া এমন অসম্ভব কথা আর কে বলতে পারে? তখন আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) বললেন- "নবী করিম (দঃ) বলে থাকলে সত্যই বলেছেন"। এ কথা শুনে আবু জাহল দমে গেল। আবু বকর (রাঃ) নবীজীর খেদমতে গিয়ে মি'রাজ ঘটনার প্রকৃত অবস্থা জানতে চাইলেন। নবী করিম (দঃ) ঘটনা স্বীকার করে এরশাদ করলেন-তুমি কিভাবে অন্ধভাবে বিশ্বাস করলে? আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) বললেন- এটা বিশ্বাস করা তো অতি সহজ। এর চেয়ে কঠিন বিষয় ছিল আল্লাহ্‌কে না দেখে বিশ্বাস করা- এখন তাঁর কাছে যাওয়া তো অতি সহজ ব্যাপার। আবু বকর (রাঃ)-এর উত্তর শুনে নবী করিম (দঃ) এত প্রীত হলেন যে, **'সিদ্দিকে আকবর'** খেতাব দিয়ে তাঁকে ভূষিত করলেন। নবী করিম (দঃ)-এর সব কথা এভাবে বিশ্বাস করা সিদ্দি নেরই পরিচায়ক।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

সেযুগে বিজ্ঞানের জ্ঞান এত প্রসারিত ছিলনা। তাই তারা সময়ের সংকোচন এবং স্থানের সংকোচন সম্পর্কে ছিল সন্দিহান। গতিবেগ সম্পর্কেও তখনকার দিনে ধারনা ছিলনা। বর্তমানে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এবং চাঁদের দেশে মানুষের গমনের ফলে মি'রাজের ঘটনা সহজেই অনুধাবন করা যায়। আল্লাহর অসীম কুদরতের কোন সীমা নেই। তিনি আপন কুদরতে এবং নিজ ব্যবস্থাপনায় নবী করিম (দঃ) কে উর্দ্ধজগতে এবং লা-মাকানে নিয়ে তাঁর কুদরতের নিদর্শনাবলী, তাঁর যাত ও সিফাত দর্শন এবং তাঁর গোপন রহস্যরাজী সম্পর্কে অবহিত করেছেন– ঈমানদারদের জন্য নবীজীর কথাই সত্যতার মূলভিত্তি। এটাই মুমিনদের জন্য যথেষ্ঠ। "আল্লাহ সর্ববিষয়ে আপন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সর্বশক্তিমান" (ছুরা বাক্বারা)।

হুযুর (দঃ)-এর দেহতত্ত্ব ঃ

পবিত্র মি'রাজ প্রসঙ্গে নবী করিম (দঃ)-এর দেহতত্ত্ব সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করা দরকার। হুযুর পাক (দঃ) নিজেকে **'খোদার নূর হতে সৃষ্ট নূর'** বলে হাদীসে এরশাদ করেছেন। মানুষের প্রয়োজনেই তাঁকে মানবাকৃতি দান করা হয়েছে। আকৃতিতে বশর হলেও গুণাবলী এবং প্রকৃতিতে তিনি ছিলেন ফেরেস্তাদের চেয়েও অনেক উর্দ্ধে। তাঁর চালচলন, খাওয়া-দাওয়া, উঠা-বসা, স্বভাব ও চরিত্র ছিল অনুকরণীয়। আমরা হলাম অনুসরণকারী মাত্র। তাঁর হুবহু অনুকরণকারী হওয়া সম্ভব নয়। কেননা অনুকরণ বলা হয় সর্ববিষয়ে হুবহু সামঞ্জস্য রক্ষা করে অনুসরণ করা। এটা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। হুযুর (দঃ)-এর নামায, রোযা ও অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগী এবং দুনিয়াবী কাজ-কর্মের গুণাগুণ এবং আমাদের নামায-রোযার গুণাগুণ এক হতে পারে না।

আমাদের শরীরে মশা-মাছি বসে– কিন্তু হুযুর (দঃ)-এর পবিত্র বদনে কোনদিন নাপাক মশা-মাছি বসেনি। আমাদের শরীরের ছায়া আছে– কিন্তু হুযুর (দঃ)-এর ছায়া ছিলনা। কেননা তিনি ছিলেন আপাদমস্তক নূর (কাজী আয়ায-শেফা শরীফ)। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত-এর আকিদা– যা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে।

আম্বিয়াগণের দেহ মোবারক সম্পর্কে নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

نَحْنُ مَعَاشِرَ الْاَنْبِيَاءِ اَجْسَادُنَا كَاَجْسَادِ الْمَلَائِكَةِ -

অর্থ–"আমরা আম্বিয়ায়ে কেরামের দেহ মোবারক ফেরেস্তাদের দেহের ন্যায় সূক্ষ্ম"। অর্থাৎ নূরানী ও সূক্ষ্মতায় আমরা ফেরেস্তাদের ন্যায়"। এরপরও কেহ হুযুর (দঃ)-এর দেহ মাটি বা সাদা মাটি দ্বারা গঠিত বলে অপপ্রচার চালালে এটাকে হাদীসের অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

হুযুর (দঃ)-এর সুরত বা হাল তিনটি। সুরতে বশরী, সুরতে মালাকী ও সুরতে হাক্বী। মি'রাজের রাত্রে তাঁর সুরতে মালাকী ও সুরতে হাক্বীর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। এটা বিশ্বাসের বিষয়, দেখার বিষয় নয়। ওহাবী মৌলভী ফজলুল করিম তার 'নূরে মোহাম্মদীর হাকিকত' বইয়ে একটি মৌযু হাদীস দ্বারা নবী করিম (দঃ)-এর দেহ মোবারক মাটির তৈরী বলে প্রমাণ করতে চেয়েছে। ইবনে জওযীর মতে উক্ত হাদিসটি বানোয়াট ও জাল বলে বাংলা মাআরিফুল কোরআন ৮৫৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে- যা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। শুধু বশরী ছুরত স্বীকার করলে বাকী ২টি সুরতকে অস্বীকার করা হয়।

বিঃ দ্রঃ নবী করিম (দঃ)-এর তিন সুরতের অর্থ ঃ মানুষের কাছে মানুষের মত, ফেরেস্তাদের কাছে ফেরেস্তার মত এবং আল্লাহর কাছে আল্লাহর গুনে গুণান্বিত অবস্থা।

১। সুরতে বাশারীর প্রমাণঃ

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ -

"আমি শুধু সুরতে বা আকৃতিতে তোমাদের মত মানুষ"।

২। সুরতে মালাকীর প্রমাণ ঃ

لِيْ مَعَ اللّٰهِ وَقْتٌ لَا يَسَعُنِيْ فِيْهِ نَبِيٌّ مُّرْسَلٌ وَلَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ -

"আল্লাহর সাথে আমার এমন ঘনিষ্ট সময় আসে-যেখানে কোন প্রেরিত নবী অথবা নিকটবর্তী কোন ফেরেস্তাও আমার সমকক্ষ হতে পারে না"।

৩। সুরতে হাক্বী সম্পর্কে হাদীসে বর্নিত হয়েছে- - مَنْ رَاٰنِيْ فَقَدْ رَاَى الْحَقَّ

"যে ব্যক্তি আমাকে দেখেছে, সে হক্ক-কেই দেখেছে"।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

সাতাইশতম অধ্যায়

হিজরত ও হিজরী সন

প্রসঙ্গ ঃ বিভিন্ন মো'জেযা প্রদর্শন- পাহাড়, জমিন ও বেহেস্তের উপর নবীজীর কর্তৃত্ব

ইসলামের ইতিহাসে হিজরত একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে কোরাইশদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা গেলেও আল্লাহর পরিকল্পনা অনুযায়ী হুযুর (দঃ)-এর দেশত্যাগ বা হিজরত ছিল বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের প্রথম সোপান। কোরাইশদের পতন প্রকৃতপক্ষে হিজরতের ঘটনা থেকেই শুরু হয়। হিজরতের সময় ২২/২৩ বছরের যুবক হযরত আলী (রাঃ) কে আপন বিছানায় শোয়ায়ে একদিকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর জন্য তৈরী করা, পরক্ষণেই আবার আমানতের মালামাল ফেরত দেয়ার জিম্মাদারী প্রদান করার মধ্য দিয়ে হযরত আলীর দীর্ঘ হায়াতের ইঙ্গিত প্রদান করা হয়।

একশত ঘেরাওকারীর চোখে ধূলা নিক্ষেপ করে নিরাপদে ঘর থেকে তাদের সামনে দিয়ে বের হয়ে যাওয়া, হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কাঁধে চড়ে ওজন শূন্য হওয়া, ছাওর গুহায় মাকড়সার জাল বুনানী, কবুতরের ডিম পাড়া, গুহার মুখে বৃক্ষের ছত্রছায়া প্রদান, গুহার ভিতরে আবু বকর (রাঃ) কে সর্পে দংশন, হুযুর (দঃ)-এর পবিত্র থুথু মোবারক দিয়ে সর্পবিষ নিবারন, পিপাসার্ত আবু বকরের জন্য বেহেস্ত হতে পানির নহর পৃথিবীতে আনয়ন, শত্রুদের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য কুদরতি গোপন রাস্তা তৈরী এবং সাগরকূলে কুদরতি নৌকা প্রস্তুত থাকা, পশ্চাদধাবনকারী সুরাকা ইবনে মালেকের ঘোড়ার পা সাতবার জমিনে ঢুকে যাওয়া ও জমিন কর্তৃক গ্রাস করানোর ক্ষমতা নবী করিম (দঃ) কে প্রদান করা–ইত্যাদি মো'জেযা প্রদর্শন নবীপ্রেমিক ঈমানদারদের জন্য এক শিক্ষামূলক বিষয়। পাঠকদের পিপাসা নিবারনের লক্ষ্যে এক এক করে নিম্নে বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো।

হিজরতের পটভূমিকা ঃ

মি'রাজ থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর নবী করিম (দঃ)-এর উপর কোরাইশদের অত্যাচার আর এক মাত্রা বৃদ্ধি পেল। ঐ বছরই (দ্বাদশ বর্ষ) হজ্ব উপলক্ষে আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকেরা হজ্বে আগমন করলো। ইয়াছরিব (মদিনা) থেকে ৭০ জন পুরুষ এবং ২ জন মহিলা মোট ৭২ জনের একটি

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

কাফেলা হজ্বে আগমন করলো। এর পূর্বেও একাদশ বর্ষে ১২ জন ১০ম বর্ষে ৬ জন করে দুটি দল বিগত দু'বৎসরে হজ্ব মৌসুমে এসে ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় ফিরে গিয়েছিলেন।

এবারের (দ্বাদশ বর্ষ) ৭২ জনের তৃতীয় দলটি মিনাতে রাতের অন্ধকারে অতি গোপনে নবী করিম (দঃ)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং নবী করিম (দঃ) কে মদিনায় চলে যেতে আমন্ত্রণ জানালেন। জান-মাল দিয়ে তাঁরা নবী করিম (দঃ) ও মোহাজির মোসলমানদেরকে রক্ষা করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করলেন। নবুয়তের দ্বাদশ বর্ষের জিলহজ্ব মাসের প্রারম্ভে এ চুক্তি হয়। এই বায়আতকে বাইয়াতে আকাবা বলা হয়। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কেননা, এই বায়আতের মাধ্যমেই নবী করিম (দঃ) এবং মক্কার সাহাবাগণের জন্য বিদেশভূমিতে বিকল্প বাসস্থান ও রাষ্ট্র নির্ধারিত হলো। নবী করিম (দঃ) সাহাবাগণকে মদিনায় হিজরত করার নির্দেশ দিলেন। সাহাবাগণ পরবর্তী ২ মাসে একা একা ও দলে দলে মদিনায় গমন করতে লাগলেন।

মদিনায় ইসলামের প্রসার দেখে আবু জাহল প্রমুখ কোরেশগন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো। নবী করিম (দঃ) জিলহজ্ব চাঁদের শেষ তারিখে হযরত আবু বকর (রাঃ) কে ডেকে ইঙ্গিতে বললেন- "হে আবু বকর, তুমি হিজরতের জন্য প্রস্তুত থাকবে। যেকোন মুহূর্তে আল্লাহর পক্ষ হতে মক্কাভূমি ত্যাগ করার নির্দেশ আসতে পারে। আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) খুশীতে বলে উঠলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি কি আপনার সঙ্গী হবো? নবী করিম (দঃ) বললেন, **"তুমি আমার জীবনের সাথী, হিজরতের সাথী, কবরের সাথী, হাশরের সাথী এবং বেহেস্তেরও সাথী। আমি প্রথম, তুমি দ্বিতীয়।"** এটাই হুযুরের ইলমে গায়েব আতায়ীর প্রমাণ। হুযুর (দঃ)-এর একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছে এবং হবে।

এই গোপন ইঙ্গিত পেয়ে হযরত আবু বকর (রাঃ) পরদিন পহেলা মহররম তারিখে ওকাজ বাজার থেকে আটশত দেরহাম দিয়ে দুটি উট ক্রয় করে নবী করিম (দঃ)-এর খেদমতে পেশ করলেন। একটির নাম রাখা হলো কাস্ওয়া এবং অপরটির নাম রাখা হলো আদ্‌বা। হাশরের দিনে নবী করিম (দঃ) কাস্ওয়ায় আরোহন করে হাশরের ময়দানে যাবেন এবং আদ্‌বায় আরোহন করে বিবি ফাতেমা (রাঃ) হাশরের ময়দানে উঠবেন (রুহুল বয়ান)।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

প্রিয় নবীর দরবারে যে দান কবুল হয়– তাই শ্রেষ্ঠ দান। নবী করিম (দঃ) উক্ত কাস্ওয়া নামক উটে জীবদ্দশায় আরোহন করতেন। হুযুরের ইনতিকালের পর উক্ত কাস্ওয়া শোকে অল্পদিনের মধ্যেই একটি কুয়ায় ঝাঁপ দিয়ে ইনতিকাল করে। দ্বিতীয় উট আদ্বা হযরত ওমরের খিলাফতকালে ইন্তিকাল করে। হুযুর পাক (দঃ)-এর ব্যবহৃত যাবতীয় বস্তুর বিশদ তালিকা আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া এবং মাওয়াহিব গ্রন্থে উল্লেখিত রয়েছে।

দুটি উট খরিদের মাধ্যমে হিজরতের প্রাথমিক প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয়। সে জন্যই মুহররমের পহেলা তারিখ (হিজরতের প্রস্তুতি দিবস) থেকে হিজরী সন গণনা শুরু করা হয়। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ এরূপ করা হয়েছে। সুতরাং যতদিন হিজরী সন থাক্‌বে– ততদিন হযরত আবু বকরের স্মৃতিও অটুট থাকবে।

মুহররম ও সফর মাসে কোরাইশ সর্দারগণ মুসলমানদের ব্যাপক হারে মদিনায় যেতে দেখে নানা চিন্তা-ভাবনা করে অবশেষে সফর মাসের শেষ শনিবারে দারুন নাদ্ওয়া নামক মিলনায়তনে এক পরামর্শ সভা আহবান করে। কোরাইশদের বিভিন্ন গোত্র ছাড়াও অন্যান্য গোত্রের সর্দারগণ উক্ত মিলনায়তনে বা পরামর্শগৃহে একত্রিত হলো। নবী করিম (দঃ)-এর এই ইসলামী মিশনের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া যায়, সে সম্পর্কে তিনটি প্রস্তাব উত্থাপিত হলো। একটি হলো- হুযুর (দঃ) কে আটক করে রাখা। দ্বিতীয় প্রস্তাব হলো– দেশ থেকে বহিষ্কার করা এবং তৃতীয় প্রস্তাব হলো– জীবনে শেষ করে দেয়া। এমন সময় শয়তান নজদ দেশের এক বৃদ্ধের সুরত ধারণ করে উক্ত সভায় হাযির হলো। একারণে শয়তানের এক উপাধী হয় **শেখে নজদী**।

নজদ দেশ থেকেই পরবর্তীকালে মোহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদী ওহাবী আন্দোলন শুরু করে। পরবর্তীকালে তার বংশধরগণ ইংরেজদের সাথে আঁতাত করে ১৯২৪ইং সালে মক্কা ও মদিনাসহ গোটা আরবে ওহাবী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমান শাসকগণ ওহাবী শাসক। তারা আরবের সমস্ত ধর্মীয় স্মৃতি ও মাযার ধ্বংস করে ফেলেছে। বিবি খাদিজার মাযার, বিবি ফাতিমার মাযার ও ইমাম হাসানের মাযারসহ জান্নাতুল বাকী ও জান্নাতুল মায়াল্লার সমস্ত মাযার ও গম্বুজ নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে। এরা সারা পৃথিবীতে ওহাবী মতবাদ চালু করার লক্ষ্যে 'রাবেতা আলমে ইসলাম' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন মুসলিম দেশে ইবনেসিনা, ইবনে তাইমিয়া, কিং খালেদ, বাদশাহ ফয়সল– ইত্যাদি

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে এবং এগুলোর মাধ্যমে মানুষকে ওহাবী মতবাদে দিক্ষিত করছে। যেসব সংগঠন ওহাবী ও মউদুদী মতবাদ প্রচার করে, উক্ত প্রতিষ্ঠান তাদেরকে প্রচুর আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকে। নবী করিম (দঃ) চৌদ্দশত বৎসর পূর্বেই এই শয়তানী ওহাবী ফিৎনার ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। আল্লামা ইবনে আবেদীন তাঁর ফতোয়া শামী গ্রন্থে ওহাবী ফিৎনার বিশদ আলোচনা করেছেন।]

নবী করিম (দঃ)-এর খেদমতে জনৈক সাহাবী ঐ শনিবার সম্পর্কে জিজ্ঞাস করলে নবী করিম (দঃ) এরশাদ করলেন ঃ

يَوْمُ مَكْرٍ وَخَدِيْعَةٍ اِنَّ قُرَيْشًا اَرَادُوْا اَنْ يَّمْكُرُوْا فِيْهِ -

অর্থ–"শনিবার হচ্ছে মক্কর ও ধোকাবাজীর দিন। এই দিনে কুরাইশগণ (আমার বিরুদ্ধে) ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা তৈরী করেছে"। (নিহায়া)।

যাক, শয়তান শেখে নজদীর সুরতে সভায় হাযির হয়ে আবু জাহলকে লক্ষ্য করে বললো–"আবুজাহল কর্তৃক শেষ প্রস্তাব– অর্থাৎ নবীকে জীবনে শেষ করে দেয়াই মঙ্গলজনক এবং বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তবে প্রত্যেক গোত্রকেই একাজে অংশ নিতে হবে"। আবু জাহল সহ উপস্থিত সবাই শেখে নজদীর পরামর্শ মোতাবেক ঐ রাত্রেই নবী করিম (দঃ)-এর গৃহে অভিযান পরিচালনা করার প্রস্তাব পাশ করে সভা ভঙ্গ করলো। কোরআন মজিদের সুরা আনফালে তাদের এই কু-পরামর্শের কথা এভাবে উল্লেখিত হয়েছে ঃ

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ - وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ - وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ -

অর্থ–"হে রাসুল! ঐ সময়ের কথা স্মরণ করুন, যখন কাফেররা আপনার ব্যাপারে এই দূরভিসন্ধি এঁটেছিল যে, হয় আপনাকে বন্দী করে রাখা হবে, অথবা শহীদ করা হবে অথবা দেশান্তর করে দেয়া হবে। তারা একদিকে দূরভিসন্ধি আঁটছিল, অপর দিকে আল্লাহ্ তায়ালা কৌশলপূর্ণ পরিকল্পনা করছিলেন। আল্লাহ্ই (দূরভিসন্ধির বিরুদ্ধে) উত্তম পরিকল্পনাকারী"। (আনফাল)।

দারুন নাদ্ওয়া আজও কাফেরদের দূরভিসন্ধির এসেম্বলী ও শয়তানের আস্তানার প্রতীকরূপে চিহ্নিত হয়ে আছে। লাখনো শহরে ওহাবীদের নাদ্ওয়াতুল উলামা নামক মাদরাসাটি আবুজাহেলের দারুন নাদওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

দারুন নাদ্ওয়ার সভা ভঙ্গ হওয়ার পরপরই হযরত জিব্রাইল (আঃ) নবী করিম (দঃ)-এর খেদমতে কোরাইশদের দূরভিসন্ধি ও পরিকল্পনার সংবাদ দিলেন এবং বললেন– আজ আপনি নিজ বিছানায় শুবেন না– অর্থাৎ হিজরত করুন।

নবী করিম (দঃ) হযরত আলীকে ডেকে এনে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়তে বললেন এবং নিজের চাদরখানা গায়ে চড়িয়ে দিলেন। হযরত আলী নির্ঘাত মৃত্যু জেনেও বিনাদ্বিধায় হুযুর (দঃ)-এর বিছানায় শুয়ে পড়লেন এবং গায়ের উপর চাদর টেনে দিলেন। পরক্ষণেই নবী করিম (দঃ) বললেন–আমার কাছে মানুষের গচ্ছিত আমানতের মাল তিনদিনের মধ্যে ফেরত দিয়ে তুমি মদিনাতে চলে যাবে। আমি এক্ষণই বের হয়ে যাচ্ছি। কেননা কোরাইশদের একশজন, মতান্তরে সত্তরজন যুবক নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে আমার ঘর ঘেরাও করে রেখেছে- নিদ্রা যাওয়া মাত্র তারা ঘরে ঢুকে আমাকে শহীদ করে ফেলার ফন্দি এঁটেছে। হযরত আলী (রাঃ) একদিকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত– অপরদিকে নবী করিম (দঃ)-এর ইঙ্গিতে বুঝে নিলেন, আপাততঃ আজ তিনি শহীদ হবেন না। কেননা আমানতের মাল ফেরত দেয়ার মধ্যে তিনদিনের জন্য তাঁর বেঁচে থাকার ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন ছিল। নবী করিম (দঃ) এবার এরশাদ করলেনঃ

يَا عَلِيُّ إِنَّكَ لَنْ تَمُوتَ حَتَّى إِحْمَرَّتْ لِحْيَتُكَ الْبَيَاضُ بِالدَّمِ (الْبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ)

“হে আলী, তুমি সাধারনভাবে মৃত্যুবরন করবেনা– যে পর্যন্ত না তোমার সাদা দাঁড়ি রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাবে” (বেদায়া)।

দেখা গেছে– হযরত আলী ৬৩ বৎসর বয়সে আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম নামক এক খারেজী মুসলমানের (?) হাতে কুফার জামে মসজিদে ফজরের নামাযে গমনের পথে শহীদ হন। হযরত আলী যে বৃদ্ধ হয়ে শহীদ হবেন– এ সংবাদ নবী করিম (দঃ) আল্লাহ প্রদত্ত এলমে গায়েবের মাধ্যমেই দিয়েছিলেন। কে কখন মারা যাবে-নবী করিম (দঃ) পূর্বেই তা বলে গেছেন। আল্লাহ প্রদত্ত এলমে গায়েব অস্বীকারকারীদের এ ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু তারা তাদের ওহাবী মুরুব্বীদের কথার উপরই অটুট। তারা বলেছে-নবীজী গায়েব জানেন না। অথচ ইলমে গায়েব জানা নবুয়তের জন্য শর্ত।

গৃহত্যাগ ও ছাওর পর্বত গুহায় আশ্রয় গ্রহণঃ

এবার হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রাঃ) ঈমানের পরীক্ষা শুরু হলো। নবী করিম (দঃ) হযরত আলীকে বিছানায় শোয়ায়ে এক মুষ্টি ধূলা হাতে নিয়ে সুরায়ে ইয়াসিনের “ওয়া জাআলনা” পূর্ণ আয়াতটি তিলাওয়াত করে তাতে ফুঁক দিয়ে

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

শত্রুদের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে নিক্ষেপ করলেন। আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেকটি শত্রুর মাথায় ও চোখে সে ধূলা পৌঁছিয়ে দিলেন। তারা চক্ষু রগড়াতে লাগলো। এ সুযোগে নবী করিম (দঃ) তাদের সামনে দিয়েই বের হয়ে গেলেন- অথচ তাদের কেউ নবী করিম (দঃ) কে দেখতে পেলোনা। আল্লাহ রাখে তো-মারে কে? নবীজীর কাজে স্বয়ং আল্লাহ্ শরীক হয়ে গেলেন।

নিজ ঘর থেকে বের হয়ে নবী করিম (দঃ) সোজা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর বাড়ীতে গিয়ে দরজার কড়া নাড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে 'লাব্বাইকা ওয়া ছা'দাইকা'- বলে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) দরজা খুলে দিলেন। নবী করিম (দঃ) বললেন, তুমি কি নিদ্রা যাওনি হে আবু বকর? হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) আরয করলেন-

"ইয়া রাসুলাল্লাহ! যেদিন আপনি আমাকে প্রস্তুত থাকতে ইঙ্গিত করেছিলেন- সেদিন থেকেই প্রতিরাত্রে আমি আপনার এন্তেজারে দরজায় দন্ডায়মান ছিলাম। একদিনের জন্যও আমি রাত্রিতে বিছানায় পিঠ লাগাইনি"।

অন্তরে মহব্বতের আগুন একবার জ্বলে উঠলে এমনিভাবেই চোখের ঘুম হারাম হয়ে যায়। অন্ধকারে প্রয়োজনীয় টাকা পয়সা ও আসবাবপত্র তৈরী করে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর দুই মেয়ে-হযরত আসমা ও হযরত আয়েশা (রাঃ) ঐগুলি বেঁধে দিচ্ছিলেন। হযরত আসমা (রাঃ) নিজের দোপাট্টা ছিঁড়ে এক অংশ দিয়ে বোঝা বেঁধে দিলেন। তাঁর এই ত্যাগে মুগ্ধ হয়ে নবী করিম (দঃ) তাঁকে "জাতুন নাতাকাইন" বা দুই দোপাট্টার অধিকারিনী উপাধীতে ভূষিত করলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) পরবর্তী সময়ে "সিদ্দিকা" উপাধীতে ভূষিতা হয়েছিলেন- যখন তাঁর পবিত্র চরিত্রের আয়াত নাযিল হয়েছিল। একই ঘরে পিতা হলেন সিদ্দিকে আকবর, এক মেয়ে হলেন সিদ্দিকা এবং অন্য মেয়ে আসমা (রাঃ) হলেন জাতুন নাতাকাইন।

হযরত আবু বকরের (রাঃ) বংশের চার পুরুষ সাহাবী ছিলেন। এই গৌরব অন্য কোন সাহাবীর নসিব হয়নি। হযরত আবু বকর (রাঃ), তাঁর পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে এবং জামাই যোবাইর ও নাতী আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর- সকলেই সাহাবী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন। 'সাহাবী ইব্‌নে সাহাবী ইবনে সাহাবী ইবনে সাহাবী'- অর্থ্যাৎ আবদুল্লাহ ইবনে আস্‌মা বিন্‌তে আবুবকর ইবনে আবু কোহাফা (রাঃ)- সকলেই সাহাবী ছিলেন। এই দুর্লভ সৌভাগ্য হযরত ইব্রাহীম

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

(আঃ)-এর বংশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নবী করিম (দঃ) যখনই হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কথা উল্লেখ করতেন, তখনই বলতেন- ইউসুফু নবীউন, ইব্নু নাবীয়্যিন, ইবনে নাবীয়্যিন, ইবনে নাবীয়্যিন- অর্থাৎ "ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম আলাইহিমুস সালাম"।

রাত্রির ঘন অন্ধকার ভেদ করে নবী করিম (দঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ) মক্কা শহর ত্যাগ করে দক্ষিণে অবস্থিত ছাওর পর্বতের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। নবী করিম (দঃ) পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে পথ চলছিলেন- যেন পাছে পদচিহ্ন বিশেষজ্ঞরা চিনে না ফেলে। কিছুদূর যাওয়ার পর কদম মোবারক পাথরের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে রক্ত ঝরে পড়তে লাগলো। এ অবস্থা দেখে হযরত আবু বকর (রাঃ) নবী করিম (দঃ)কে নিজ কাঁধে তুলে নিলেন। কিন্তু তিনি কোন ওজন অনুভব করলেন না। নবী করিম (দঃ) একটু মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, "আবু বকর! নূরের কোন ওজন হয়না"। সুব্হানাল্লাহ!

ছাওর পর্বতের চূড়ায় পৌঁছে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) নিজে প্রথমে একটি গুহায় নামলেন। গুহা পরিষ্কার করে চারিদিকের ছিদ্র কাপড় ছিঁড়ে বন্ধ করলেন। একটি ছিদ্র বন্ধ করার মত কিছু ছিলনা। তিনি নিজ পা দিয়ে সে ছিদ্রটি বন্ধ করলেন। নবী করিম (দঃ) তাঁর কোলে মাথা মোবারক রেখে শুয়ে পড়লেন এবং চোখ মোবারক বন্ধ করে আবু বকরকে যিক্রে খফীর তাওয়াজ্জুহ দিতে লাগলেন। "আল-হাদিকাতুন নাদিয়া ফিত্ তারিকাতিন নক্শবন্দিয়া" নামক আরবী গ্রন্থে উল্লেখ আছে-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاصَبَّ اللّٰهُ شَيْأً فِيْ صَدْرِىْ -
اِلَّا صَبَبْتُهٗ فِيْ صَدْرِ اَبِىْ بَكْرٍ -

অর্থ-"**আমার অন্তরে আল্লাহ যে বাতেনী নেয়ামত ঢেলে দিয়েছেন- আমি তা আবু বকরের অন্তরে ঢেলে দিলাম**"। সে কারণেই তাঁর থেকে দু'টি মশহুর তরিকা বের হয়েছে। একটি হচ্ছে তরিকায়ে নকশবন্দীয়া- অন্যটি তরিকায়ে মোজাদ্দেদীয়া। অপরদিকে হযরত আলী (রাঃ) নবীজীর চাঁদর গায়ে দিয়ে নবীজীর বিছানায় শুয়ে মৃত্যু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। সেজন্যে তিনিও নবী করিম (দঃ)-এর ইলমে মারেফাতের প্রধান নেয়ামত লাভ করেছিলেন এবং তাঁর থেকেও দুটি প্রধান তরিকা- কাদেরিয়া ও চিশতিয়া বের হয়েছে। তাঁর শানে

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন- - انا مدينة العلم وعلىٌّ بابها

অর্থ-“আমি হচ্ছি যাবতীয় ইলেমের শহর, আর আলী হলো সেই শহরের প্রধান দরজা”। (মিশকাত)।

“সেজন্যেই হযরত আলীর (রাঃ) মা'রেফাত বিদ্যা প্রাধান্য পেয়েছে। তবে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ইলমে বাতেনকেও অস্বীকার করা যাবে না। যেমন শিয়া সম্প্রদায় এককভাবে হযরত আলী (রাঃ) কে ইলমে বাতেনের একমাত্র দরজা বলে আকিদা পোষণ করে থাকে। এটা গলদ। আহ্‌লে সুন্নাতের কেহই হযরত আলী (রাঃ) কে ইল্‌মে বাতেনের একক উৎস বলে দাবী করেনা- বরং প্রধান উৎস বলেন। কেউ একক উৎস বা দরজা দাবী করলে সেও শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত হবে এবং হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা করা হবে। বেদায়া ও নেহায়া গ্রন্থে উক্ত হাদীসের (بابها) শব্দটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে “বিশেষ ও প্রধান দরজা হিসেবে”- একক হিসেবে নয়। কেননা; তাহলে অন্য সাহাবীদের এলমে বাতেনকে অস্বীকার করা হয়। এটা আহ্‌লে সুন্নাতের আকিদার পরিপন্থী ও বাস্তবের বিপরীত। (মিরকাত এবং মিশকাত হাশিয়া)

যা হোক- হযরত আবু বকর (রাঃ) নবী করিম (দঃ) কে নিয়ে গুহায় প্রবেশ করার সাথে সাথে 'উম্মে গায়লান' নামক এক লতা বৃক্ষ অন্যস্থান থেকে এসে গুহার মুখ ঢেকে ফেললো। মাকড়সা এসে জাল বুনলো এবং এক জোড়া কবুতর এসে বাসা বাঁধলো- ডিম পাড়ল। হযরত আবু বকর (রাঃ) যে ছিদ্রে পা রেখেছিলেন, তার ভিতরে ছিল একটি সাপ। এই সাপটি এক হাজার বছর ধরে নবীজীর দীদারের আশায় এই গুহায় অবস্থান করছিল। সাপটি ছিল আশেকে রাসুল! সাপটি তিনবার ফোঁস ফোঁস করে হযরত আবুবকর (রাঃ) কে পা সরিয়ে নিতে হুশিয়ারী দিচ্ছিল। অবশেষে সাপটি হযরত আবু বকরের পায়ে দংশন করলো। সর্পবিষ সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়লো। এমতাবস্থায়ও তিনি নড়াচড়া করলেন না- নবী করিম (দঃ)-এর আরামের ব্যাঘাত হবে মনে করে। হঠাৎ করে তাঁর দুফোটা তপ্তঅশ্রু নবী করিম (দঃ)-এর পবিত্র চেহারায় ঝড়ে পড়লো। অমনি নবী করিম (দঃ)-এর ধ্যান ভঙ্গ হলো। জিজ্ঞেস করলেন- আবু বকর! কি হয়েছে? আবু বকর বললেন, সাপে দংশন করেছে। নবী করিম (দঃ) একটু থুথু মোবারক দংশিত স্থানে মালিশ করে দিলেন। সাথে সাথে বিষের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেলো। আশেকের বিচার করা কি সম্ভব? সাড়ে বার বৎসর পর যখন হযরত

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

আবু বকর (রাঃ)-এর ইনতিকালের অসুখ দেখা দিল, তখন সাপের পুরানো বিষ পুনরায় ক্রিয়াশীল হলো। এভাবে তিনি শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করলেন। আল্লামা আবদুল গনি নাবলুসী (রঃ) 'হাদিকা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আবু বকরের মৃত্যু সাওর গুহায় অবধারিত ছিল, নবী করিম (দঃ) তাকে সাড়ে বার বৎসর পিছিয়ে দিলেন। এটা নবী করিম (দঃ)-এর বিশেষ মো'জেযা ও ইখতিয়ার। শিফা শরীফে কাযী আয়ায (রহঃ) উল্লেখ করেছেন– "আল্লাহ পাক নবী করিম (দঃ) কে মউতের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন"। আমরা মউতের নিয়ন্ত্রণাধীন, কিন্তু মউত হচ্ছে নবী করিম (দঃ)-এর ইখতিয়ারাধীন। "পাহাড়-পর্বত, আসমান-জমিন, বেহেস্ত-দোযখ, চন্দ্র-সূর্যকে নবী করিম (দঃ)-এর নিয়ন্ত্রণাধীন করে রেখেছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা"।

إِنَّ اللّٰهَ جَعَلَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالسَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَالْجِبَالَ مُطِيْعًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (شِفَاءُ قَاضِىْ عَيَاضٍ)

অর্থ–"আল্লাহ তায়ালা সূর্য, চন্দ্র, আসমান, জমীন, পাহাড়-পর্বত নবী করিম (দঃ)-এর অধীন ও অনুগত করে দিয়েছেন"। (শেফা কাযী আয়ায)

এদিকে নবী করিম (দঃ)-এর ঘরে ঢুকে কোরাইশ যুবকরা বিছানায় হযরত আলী (রাঃ) কে শায়িত দেখে নবী করিম (দঃ) কোথায় গিয়েছেন– তা জিজ্ঞেস করলো। হযরত আলী (রাঃ) নির্ভিকভাবে উত্তর দিলেন– কোথায় গিয়েছেন, তা জানিনা। তবে ঘর থেকে বের হয়ে গেছেন। কোরাইশরা চতুর্দিকে অনুসন্ধানের জন্য লোক পাঠালো। উমাইয়া ইবনে খালফ একদল যুবক ও পদরেখা বিশেষজ্ঞ নিয়ে পদচিহ্ন ধরে সাওর পর্বতে এসে উপস্থিত হলো। এখানে এসে পদচিহ্ন মুছে গেছে। সবাই অনুমান করলো নিশ্চয়ই এই গুহাতেই নবী করিম (দঃ) আশ্রয় নিয়েছেন। উমাইয়া ইবনে খাল্‌ফ বললো– গুহার মুখে লতা, মাকড়সার জাল আর কবুতরের বাসা দেখা যাচ্ছে। এখানে প্রবেশ করলে তো এসব থাকার কথা নয়। এ বলে সে দলবলসহ অন্যদিকে ছুটে গেল। এভাবে আল্লাহ তায়ালা আপন হাবীবকে রক্ষা করলেন।

ঐসময়ে হযরত আবু বকর (রাঃ) নবীজীর জীবনের আশংকায় সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। হুযুর পুরনূর (দঃ) অটল ও শান্তস্বরে জবাব দিলেন **"চিন্তাগ্রস্ত হয়োনা– আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন"** (সুরা তওবা)

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

[তাফসীরে নঈমীতে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, 'আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন'- বাক্যটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা, এই বাক্যটিতে কোন কাল বা সময়ের উল্লেখ নেই। এটি জুমলায়ে ইছমিয়া। সর্বকাল অর্থে এটি ব্যবহৃত হয়। সুতরাং আল্লাহ সব সময়ই তাঁর রাসুল ও হযরত আবু বকরের সাথে আছেন এবং থাকবেন। (তাফসীরে নাঈমী)]

সাওর গুহায় আরও দুটি মো'জেযা

১) শত্রুরা চলে যাওয়ার পর হযরত আবু বকর (রাঃ) আরয করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! যদি তারা তাদের পায়ের গোঁড়ালীর দিকে নজর করতো, তা হলে তো আমাদেরকে দেখতে পেতো এবং ধরে ফেলতো। নবী করিম (দঃ) বললেন- لَوْجَاؤُوْنَا مِنْ هٰنَا لَذَهَبْنَا اِلٰى هٰهُنَا -

অর্থাৎ- **"তারা এখান দিয়ে আসলে আমরা ওখান দিয়ে চলে যেতাম"**। একথা বলেই গুহার একদিকে ইশারা করলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) সেখানে গিয়ে দেখেন- বিরাট এক সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। তার তীরে একটি সাজান নৌকা বাঁধা আছে। এই মো'জেযা দেখে হযরত আবু বকর (রাঃ) হতবাক হয়ে গেলেন। (বর্ণনা অনেক বিরাট)

২) আর একটি আশ্চর্য্য মো'জেযা তিনি প্রত্যক্ষ করলেন। সাপের বিষে তাঁর পানির পিপাসা লাগলো। নবী করিম (দঃ)-এর কাছে পানির দরখাস্ত পেশ করলেন। নবী করিম (দঃ) গুহার ভিতরে এক দিকে ইশারা করে বললেন- ওখানে গিয়ে পানি পান করে এস। হযরত আবু বকর (রাঃ) গিয়ে দেখলেন- একটি পানির নহর প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি প্রাণভরে পানি পান করলেন- যা ছিল মধুর চেয়ে মিষ্ট, দুধের চেয়ে সাদা এবং বরফের চেয়েও ঠান্ডা। কোথা হতে এ নহর প্রবাহিত হলো- জিজ্ঞাসা করলে নবী করিম (দঃ) এরশাদ করলেন-

اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَ الْمَلَكَ الْمُوَكَّلَ بِاَنْهَارِ الْجَنَّةِ اَنْ يَّخْرِقَ نَهْرًا مِّنْ جَنَّتِ الْفِرْدَوْسِ اِلٰى صَدْرِ الْغَارِ لِتَشْرَبَ يَا اَبَابَكْرٍ -

অর্থ-**"আল্লাহ তায়ালা বেহেস্তের নহরের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেস্তাকে নির্দেশ করেছেন- যেন জান্নাতুল ফেরদাউস থেকে একটি নহর গুহার মাথায় প্রবাহিত করে দেয়। হে আবু বকর! তোমাকে পানি পান করানোর উদ্দেশ্যেই এরূপ করা হয়েছে"**। (তাফসীরে রুহুল বয়ান-সুরা তওবা)।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

উক্ত ঘটনা দুটি শুনে ঈমানদারের ঈমান আরও চাঙ্গা হয়ে উঠবে এবং বক্রহৃদয়ের লোকদের হৃদয় আরও বাঁকা হবে-এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। ইবনে কাছির তাঁর তাফসীরে এই ঘটনা ও রেওয়ায়াতকে মোন্‌কার বলেননি। তরিকতে সিদ্দিকিয়াতের মরতবাধারীগণের জন্য নবী করিম (দঃ)-এর মাধ্যমে গায়েবী নেয়ামত এভাবেই পৌঁছে থাকে। আ'লা হযরত (রাঃ) বলেনঃ

خالق کل نے آپ کو مالک کل بنادیا
دونوں جہاں ہیں آپکے قبضہ واختیار میں-

"কুল জাহানের সৃষ্টিকর্তা আপনাকে সব কিছুর মালিকানাস্বত্ব দান করেছেন। সত্যিই উভয় জাহানই আপনার ইখতেয়ারাধীন"। আপনি যাকে যেভাবে ইচ্ছা-দান করতে পারেন। তাফসীরে রুহুল মাআনী সূরা মায়েদার ১৫নং আয়াত "ক্বাদ জাআকুম"- আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন- "নবী করিম (দঃ) হলেন মোখতার বা ইখতিয়ার প্রাপ্ত নবী"। যারা নবীজীকে মুখতার মানবেনা তারা পথভ্রষ্ট।

ঐ মদিনার পথে রে আমার-ঐ মদিনার পথে

তিন রাত্র এভাবে সওর পর্বতের গুহায় অবস্থান করে নবী করিম (দঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ) কে সাথে নিয়ে মদিনা শরীফের পথে রওনা হলেন। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী নবী করিম (দঃ) কাসওয়া নামক উটে সওয়ার হলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) আরোহন করলেন আদবা নামক উটে। সাথে নিলেন পথপ্রদর্শক হিসাবে আবদুল্লাহ ইব্‌নে আরিকত নামক জনৈক অমুসলিম ব্যক্তিকে। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর আশ্রিত গোলাম আমের ইবনে ফোহায়রা পূর্ব নির্দেশ মোতাবেক দুটি উট নিয়ে গারে সাওরে এলেন এবং দ্বিতীয় উটের পিঠে পেছনে আরোহন করলেন। লোহিত সাগরের উপকূল ধরে তিনজনের এই কাফেলা মদিনার পথে চললো। বিদায়ের বেলায় নবী করিম (দঃ) বাইতুল্লাহর দিকে নযর করে বলে উঠলেন-

وَاللّٰهِ اِنَّكِ اَحَبُّ اَرْضِ اللّٰهِ اِلَيَّ وَاِلَى اللّٰهِ وَلَوْلَا اَنَّ اَهْلَكِ اَخْرَجُوْنِيْ مِنْكِ مَاخَرَجْتُ-

অর্থ্যাৎ- "হে পবিত্র মক্কা, খোদার শপথ! তুমি আমার কাছে এবং আল্লাহর কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় ভূমি। তোমার স্বদেশবাসী যদি আমাকে বাধ্য না করতো, তাহলে আমি তোমায় ছেড়ে যেতাম না"। কত করুণ এ আবেদন!

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

[যতদিন নবী করিম (দঃ) মক্কায় অবস্থান করছিলেন– ততদিন মক্কা ভূমিই সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল। হিজরত করার পর মদিনা শরীফের রওযা মোবারকের যে অংশটুকু নবী করিম (দঃ)-এর দেহ মোবারকের সাথে মিশে আছে– তা বাইতুল্লাহ্ শরীফ, এমন কি–আরশে আযীম থেকেও উত্তম। চার মযহাবের ইমামগণ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন। সুতরাং এটা সর্বসম্মত ইজমা (ফতোয়ায়ে শামী-যিয়ারত অধ্যায়)। তিবরানী শরীফের একটি হাদীসে নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন– - اَلْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ مِّنْ مَكَّةَ "এখন থেকে মদিনা শরীফ মক্কার চেয়ে উত্তম" (জযবুল কুলুব শেখ আবদুল হক দেহ্‌লভী রহঃ)।

বকরীর শুকনো বাঁটে দুধের নহর ঃ

মদিনা শরীফ গমনকালে পথে তিনটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটলো। সাওর পর্বত থেকে বের হয়ে নবী করিম (দঃ) সকাল বেলা সাগরকুল ধরে রওনা দিলেন। পথিমধ্যে কোদাইদ্ নামক স্থানে উম্মে মা'বাদ আতিকা নাম্নী জনৈকা বেদুইন মহিলার বাড়ীতে পৌঁছে নবী করিম (দঃ) কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেন। মহিলার বাড়ীতে দুধ বা গোস্ত বিক্রি হয় কিনা- তা জানতে চাইলেন। কিন্তু কিছুই পাওয়া গেলনা। নবী করিম (দঃ) তাঁবুতে একটি ক্ষীণকায় ছাগী দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন–এটা দুধ দেয় কিনা? মহিলা বললেন, না। নবী করিম (দঃ) উক্ত ছাগী দোহন করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে মহিলা বললেন, চেষ্টা করে দেখতে পারেন। নবী করিম (দঃ) পাত্র নিয়ে ছাগীর দুধের বাঁটে পবিত্র হাত লাগানো মাত্র দুধের নহর বইতে শুরু করলো। উপস্থিত লোকজন তৃপ্তি সহকারে উক্ত দুধ পান করলো। অতঃপর নবী করিম (দঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ) সহ পূর্ণ কাফেলা এ দুধ পান করে তৃপ্ত হলেন। নবী করিম (দঃ)-এর পবিত্র হাতের বরকতে পরবর্তীকালে উক্ত ছাগী সব সময় এভাবে দুধ দিতে থাকে। এভাবে আতিকা ও তার স্বামীর ঘরের অভাব দূর হয়ে গেলো। উক্ত ছাগী হযরত ওমর (রাঃ)-এর খিলাফতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিল এবং একইভাবে দুধ দিত। নবী করিম (দঃ) যার কাছ থেকেই কিছু চেয়ে খেতেন, তাঁর ঘরে বরকতের ঢল নেমে আসতো। প্রকৃতপক্ষে নবী করিম (দঃ) কারও ঘরে খেতে যান না– বরং দিতে যান– এটাই প্রকৃত সত্য ঘটনা।

পথিমধ্যে আর একজন রাখালের কাছে এমনিভাবে দুধ চাইলে সে বললো, আমার পালে বাচ্চাওয়ালা কোন ছাগী নেই। নবী করিম (দঃ) বাচ্চাবিহীন একটি

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ছাগী এনে দুধ দোহন করে নিজেরা পান করলেন এবং রাখালকেও দুধ পান করালেন। রাখাল এ মো'জেযা দেখে সাথে সাথে মুসলমান হয়ে গেল। সম্ভবতঃ উক্ত সাহাবী ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)। (বেদায়া-নেহায়া ৭ম খন্ড ১৫৩ পৃঃ)

জমিন কর্তৃক সুরাকার ঘোড়ার পা গ্রাস ঃ

কুদাইদ নামক স্থানে আর একটি ঘটনা সবচেয়ে আশ্চর্যজনকভাবে ঘটে গেলো। সুরাকা ইবনে মালেক কেনানী নামক জনৈক ব্যক্তি একশত উট পুরস্কারের লোভে নবী করিম (দঃ)-এর তালাশে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরতে লাগলো। আবু জাহল নবী করিম (দঃ) কে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় ধরে আনতে পারলে উক্ত পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা দিয়েছিল। সুরাকা নবী করিম (দঃ) কে দেখে চিৎকার করে বলে উঠলো- হে মুহাম্মদ (দঃ), এবার তোমায় কে রক্ষা করবে? নবী করিম (দঃ) প্রশান্তভাবে উত্তর দিলেন- يَمْنَعُنِىَ الْجَبَّارُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ- অর্থাৎ- **"শক্তি প্রয়োগকারী ও চরম শাস্তি প্রদানকারী আল্লাহ আমাকে রক্ষা করবেন"**। হযরত জিব্রাইল (আঃ) এসে সংবাদ দিলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহ তায়ালা জমিনকে আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন। আপনি জমিনকে যা ইচ্ছা- নির্দেশ করুন। নবী করিম (দঃ) জমিনকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ يَا اَرْضُ خُذِيْهِ -

অর্থাৎ- **"হে জমিন, তাকে গ্রাস করো"**। সাথে সাথে জমিন সুরাকার ঘোড়ার হাঁটু পর্যন্ত গ্রাস করে ফেললো। সুরাকা কাতরস্বরে বললো, আল-আমান অর্থাৎ- আমাকে রক্ষা করুন! নবী করিম (দঃ) পুনরায় জমিনকে নির্দেশ করলেন ঃ

يَا اَرْضُ اِطْلِقِيْهِ -

"হে জমিন, তাকে ছেড়ে দাও"। জমিন তাকে ছেড়ে দিল। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে নবী করিম (দঃ) কে আবার ধরতে উদ্যত হলে পুনরায় নবী করিম (দঃ) জমিনকে নির্দেশ দিলেন তাকে গ্রাস করতে। এভাবে সাত বার জমিন তাকে গ্রাস করলো এবং ছাড়লো। এবার সে তৌবা করলো এবং অন্য অনুসন্ধানকারীকে নবী করিম (দঃ) থেকে ফিরিয়ে রাখার শর্তে মুক্তি লাভ করে মক্কায় ফিরে আসলো।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

উক্ত তিনটি ঘটনায় দুটি আকিদার প্রমাণ পাওয়া যায় ঃ

এক ঃ নবী করিম (দঃ) কে আল্লাহ্ তায়ালা গায়েবী ধন ভান্ডারের মালিক বানিয়েছেন। স্রষ্টার সম্মানে নবী করিম (দঃ) উপাদান ছাড়া কোন কিছু করতেন না। কোন সামান্য বস্তু বা দ্রব্যকে উপলক্ষ করে তিনি তাতে গায়েবীভাবে প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ্ করতেন। যেমন হযরত জাবের (রাঃ)-এর সামান্য খাসি ও রুটি দিয়ে তিনি দেড় হাজার সাহাবীকে পেট ভর্তি করে খানা খাওয়ায়ে জাবেরের মূল বকরী ও রুটি ফেরত দিয়েছিলেন। হযরত সালমান ফারছি (রাঃ) ৪০ উকিয়া স্বর্ণমুদ্রা আদায় করার শর্তে তাঁর মনিবের সাথে মুক্তিপণ নির্ধারণ করেছিলেন। নবী করিম (দঃ) কবুতরের ডিমের ন্যায় ছোট একখন্ড স্বর্ণ সংগ্রহ করে উক্ত ৪০ উকিয়া বা ১৬০০ (ষোল শত) দীনার আদায় করে দিলেন। উক্ত সামান্য পরিমাণ স্বর্ণ ওজন করা হলে ষোলশত স্বর্ণমুদ্রার সমান হয়ে গেলো। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) কর্তৃক জঙ্গে তাবুকের সময় সংগৃহীত ২১টি খুরমা দিয়ে নবী করিম (দঃ) তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ত্রিশ হাজার লোককে খাওয়ানোর পর উক্ত ২১টি খুরমা আবু হোরায়রা (রাঃ) কে ফেরত দিয়ে বললেন– "থলের মুখ না খুলে দু-হাত দিয়ে প্রয়োজনীয় খুরমা বের করে খাবে এবং বন্ধু-বান্ধব ও ফকির-মিছকিনকে খাওয়াবে"। নবীজীর কথামত হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) উক্ত খুরমা ৯ হিজরী থেকে ৩৫ হিজরী পর্যন্ত নিজে খেয়েছেন এবং বন্ধু-বান্ধব ও ফকির-মিছকিনকে বিলিয়েছেন। হযরত ওসমান (রাঃ) যেদিন শহীদ হন, সেদিন উক্ত থলেটি লুট হয়ে যায়। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি উক্ত ২৬ বৎসরে আনুমানিক বারশত মন খুরমা নিজে খেয়েছি এবং তিনশত মন আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করেছি"। এই যে খুরমা তিনি খেলেন এবং খাওয়ালেন– এগুলো কোন্ বৃক্ষের খেজুর? নবী করিম (দঃ)-এর পবিত্র হাতের ছোঁয়ায়ই আল্লাহ্ তায়ালা গায়েবীভাবে উক্ত খেজুরে বরকত দিয়েছেন। (তরজুমানুস সুন্নাহ ও যিকরে জামিল গ্রন্থদ্বয় দ্রষ্টব্য)। উম্মে মা'বাদ-এর ছাগী ও রাখালের ছাগ-পালের শুক্নো বাঁটে দুধের নহর প্রবাহিত হওয়াও অনুরূপ মো'জেযা। নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

أُوْتِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الْاَرْضِ -

"আমাকে জমিনের যাবতীয় ধন ভান্ডারের চাবি প্রদান করা হয়েছে"। (মিশকাত)

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত আ'লা হযরত আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহঃ) লিখেছেন–

ها تھ جس طرف اٹھا غنی کر دیا + موج بحر سخاوت پہ لا کھوں سلام

অর্থ–**"হুযুর (দঃ) -এর পবিত্র হাত যে দিকেই উঠেছে– তাকে ধনী বানিয়ে দিয়েছে। বদান্যতা সমুদ্রের তরঙ্গ সদৃশ এমন হাতের প্রতি লক্ষ লক্ষ সালাম"**। (হাদায়েকে বখশিষ) ।]

[সুরাকার ঘটনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহর এই জমিন নবী করিম (দঃ)-এর নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি জমিনকে যখন যে হুকুম করেন, জমিন তা পালন করে। শুধু জমিন কেন– আকাশের চাঁদ হুযুরের ইশারায় এদিক-সেদিক হেলে দুলে তাঁর সাথে খেলাধূলা করতো এবং কথা বলতো। গ্রন্থের শুরুতে হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর এ সম্পর্কীত রেওয়ায়াত বর্ণনা করা হয়েছে। মক্কায় আবু জাহ্‌ল কর্তৃক আকাশের চাঁদ বিদীর্ণ করার চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় নবী করিম (দঃ) চাঁদকে দু'টুকরো করে দেখিয়েছেন। ৭ম হিজরীতে খায়বরের যুদ্ধ হতে ফেরত আসার সময় পথিমধ্যে সাহ্‌বা নামক স্থানে আকাশের ডুবন্ত সূর্য্যকে পুনরায় ফিরিয়ে এনে হযরত আলী (রাঃ) কে আসরের নামায আদায় করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ), হযরত আনাছ (রাঃ) ও হযরত আস্‌মা বিন্‌তে ওমায়েছ (রাঃ) কর্তৃক উক্ত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে! সালতানাতে মোস্তফা নামক গ্রন্থে মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রঃ) বিস্তারিতভাবে নবীজীর বিভিন্ন কর্তৃত্বের ঘটনা লিখেছেন।]

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

আটাইশতম অধ্যায়

মদিনায় আনন্দ মিছিল

প্রসঙ্গ ঃ মদিনাবাসীর প্রতীক্ষা অভ্যর্থনা–আনন্দের ঢল–"ইয়া রাসুলাল্লাহ" ধ্বনী দেয়া সাহাবীগণের সুন্নাত ও মুসলমানদের বিশেষ প্রতীক ঃ

"হুযুর আকরাম (দঃ) মদিনায় হিজরত করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছেন"- এই সংবাদ মদিনার আউছ ও খাযরাজ গোত্রের নিকট বিদ্যুৎবেগে যথাসময়ে পৌঁছে গিয়েছিল। তাঁরা প্রতিদিন সকালে মদিনা হতে বের হয়ে দক্ষিণে অবস্থিত হাররা নামক স্থানে এসে নবী করিম (দঃ)-এর জন্য প্রতীক্ষায় থাকতো। আবার দুপুরে মদিনায় ফিরে যেতো। এমনিভাবে ১২ দিন পর্যন্ত মদিনার ঘরে ঘরে হুযুর (দঃ)-এর আগমনের সংবাদে খুশী ও আনন্দের ঢেউ খেলতে লাগলো। এ সময়ে বৃদ্ধ, যুবা, নারী-পুরুষ সবারই প্রধান কাজ ছিল–নবীজীকে কিভাবে অভ্যর্থনা দেয়া যায়। ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে, কিশোর-কিশোরীরা সম্বর্ধনা দেয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলো। তাদের কত সৌভাগ্য যে, আল্লাহর প্রিয় হাবীব তাঁদের মধ্যে মেহমান হয়ে আস্ছেন।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে তাঁদের সৌভাগ্য রবি উদিত হলো। তাঁরা পূর্বাহ্নে হাররা থেকে সবেমাত্র মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেছেন–এমন সময় একজন ইয়াহুদী ঘরের ছাঁদের উপর থেকে দূরে নবী করিম (দঃ)-এর কাফেলা দেখতে পেয়ে চিৎকার করে বলতে লাগলো–হে আউছ ও খাযরাজ গোত্র। তোমাদের প্রতীক্ষিত মেহমান এসে গেছেন। ঐ দেখ দূরে কাফেলা দেখা যাচ্ছে। মদিনাবাসীগণ অস্ত্রসজ্জিত হয়ে দৌড়ে এসে নবী করিম (দঃ) কে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন। হুযুর (দঃ) ১২ দিন সফর করার পর ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার পূর্বাহ্নে মদিনার দক্ষিণে কোবা শহরতলীতে এসে পৌঁছলেন। বনী আমর গোত্রে তিনি সাময়িকভাবে অবস্থান করলেন। সেখানে প্রথম মসজিদ–মসজিদে কোবা তৈরী হলো। এখানে ৫ দিন, মতান্তরে ১২ দিন বা বাইশ দিন অবস্থান করার পর নবী করিম (দঃ) জুমার দিন মদিনার দিকে রওনা হলেন। পথিমধ্যে বনী সালেম মহল্লায় পৌছলে জুমুয়া নামাযের সময় হয়। তিনি একশ' সাহাবী নিয়ে প্রথম জুমা আদায় করলেন। তারপর কাস্ওয়া নামক উটে আরোহন করে মদিনায়

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

প্রবেশ করেন। সেদিন মদিনায় আনন্দ মিছিল বা জশনে জুলুছ বের হয়েছিল। যুবক ও কিশোরের দল মদিনার অলি-গলিতে মিছিল বের করেছিল। তাদের শ্লোগান ছিল– جَاءَ مُحَمَّدٌ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ–يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ
"মোহাম্মদ এসেছেন–আল্লাহর রাসুল এসেছেন"। মুসলিম শরীফের ২য় খন্ডে আরো বর্ণিত আছে যে, মদীনাবাসিরা **"ইয়া মুহাম্মদ ইয়া রাসুলাল্লাহ"** বলে শ্লোগান দিয়েছিলেন। বুঝা গেলো–"ইয়া রাসুলাল্লাহ্" বলে শ্লোগান দেয়া মদিনাবাসী সাহাবীদের সুন্নাত। আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া ৫ম খন্ডে উল্লেখ আছে–"ইয়া মুহাম্মাদা" শ্লোগান ছিল তৎকালীন মুসলমানদের বিশেষ প্রতীক চিহ্ন। যারা এই প্রতিকী শ্লোগান অস্বীকার করে–তারা কি মুসলমান?

আর গৃহিনীরা ঘরের ছাদে উঠে নিম্নোক্ত কাসিদা গেয়েছিলেনঃ

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا + مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ
وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا + مَادَعَا لِلّٰهِ دَاعٍ -

অর্থ–**"ছানিয়াতুলবেদা পর্বতমালা হতে আমাদের উপর পূর্ণিমার চাঁদ উদিত হয়েছে। যতদিন আল্লাহর বান্দারা আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকবে– ততদিন নবী করিম (দঃ)-এর আগমনের শুকরিয়া আদায় করা আমাদের উপর ফরয হয়ে গেল।"** (মহিলাদের এই কবিতা বোখারী শরীফে স্থান পেয়েছে)।

মিলাদ শরীফের কিয়ামে সুন্নী মুসলমানরা মদিনাবাসী মহিলাদের এই কাসিদা পাঠ করে থাকেন। একদিনের ঘটনার শুকরিয়া কেয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে। মিলাদুন্নবীর আনন্দ মিছিলও কেয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে–যেমন চালু আছে আশুরা।

হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ)-এর গৃহে নবী করিম (দঃ) অবস্থান গ্রহণ করলে বনী নাজ্জার গোত্রের (হুযুরের নানার বংশ) একদল কিশোরী দফ বাজিয়ে গযল গাইতে গাইতে প্রবেশ করলো। তাঁরা-গেয়েছিল–

نَحْنُ جَوَارٍ مِّنْ بَنِي النَّجَّارِ–يَا حَبَّذَا مُحَمَّدٌ مِنْ جَارٍ–

অর্থ–**"আমরা বনী নাজ্জারের কিশোরী। হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) আমাদের কতইনা উত্তম প্রতিবেশী"**।

তাদের দরদমাখা না'ত ও গান শুনে নবী করিম (দঃ) বললেন, **"তোমরা কি সত্যিই আমাকে ভালবাস"?** তারা বললো, হাঁ। নবী করিম (দঃ) বললেন –

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

اَللّٰهُ يَعْلَمُ اَنَّ قَلْبِيْ يُحِبُّكُمْ

"আল্লাহ্ অবগত আছেন– আমার অন্তরও তোমাদেরকে কত ভালবাসে"

মদিনাবাসী নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোরদের প্রাণঢালা অভ্যর্থনায় নবী করিম (দঃ) মুগ্ধ হয়ে গেলেন। পথের সমস্ত ক্লান্তি তিনি ভুলে গেলেন। এখনও প্রেমিকজনেরা নবী করিম (দঃ)-এর শানে মিলাদ পাঠ করলে বা তাঁর শানে নাতিয়া কালাম পেশ করলে হায়াতুন্নবী (দঃ) খুশী হন। যেমন ঃ নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেন ঃ

اِنَّمَا اَعْمَالُكُمْ تُعْرَضُوْنَ عَلَيَّ فَاِنْ رَاَيْتُ فِيْهَا خَيْرًا حَمِدْتُ اللّٰهَ–

অর্থ–"তোমাদের যাবতীয় আমল ও কার্যক্রম আমার কাছে পেশ করা হয়। তাতে যদি আমি ভাল কিছু প্রত্যক্ষ করি, তাহলে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করি"। *

[একারণেই আনুষ্ঠানিকভাবে নবীজীর ভক্তিমূলক মিলাদ মাহফিলের প্রচলন করা হয়েছে। হুযুরের শুভাগমন উপলক্ষে জুলুছ বের করার এটি একটি অন্যতম দলীল। নেদায়ে "ইয়া রাসুলাল্লাহ" বা ইয়া রাসুলাল্লাহ বলে শ্লোগান দেয়া সাহাবীগণের সুন্নাত ও মুসলমানদের বিশেষ প্রতীক চিহ্ন। নবীজীর ইনতিকালের পরেও সাহাবাগণ ইয়ামামার যুদ্ধক্ষেত্র হতে 'ইয়া মুহাম্মাদা' বলে শ্লোগান দিয়েছিলেন (বেদায়া ও নেহায়া ৫ম খন্ড দেখুন)। উক্ত গ্রন্থে একথাও সাথে সাথে উল্লেখ করা হয়েছে– وَكَانَ شِعَارُ الْمُسْلِمِيْنَ -

অর্থ–"ইয়া মুহাম্মাদা" বা "ইয়া রাসুলাল্লাহ বলে শ্লোগান দেওয়া তৎকালীন মুসলমানদের প্রতিক চিহ্ন হিসাবে গণ্য হতো" অর্থাৎ "ইয়া রাসুলাল্লাহ" বললেই তাঁকে তৎকালে মুসলমান বলে মনে করা হতো।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

উনত্রিশতম অধ্যায়

১৪০০ বৎসর পূর্বে নির্মিত নিজগৃহে হুযুরের অবস্থান

প্রসঙ্গ ঃ হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ)-এর গৃহে অবস্থান–ইলমে গায়েবের প্রকাশ

নবী করিম (দঃ) মদিনায় প্রবেশ করলে আউছ ও খাযরাজ বংশের প্রত্যেকেই তাঁদের গৃহে মেহমান হওয়ার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন। নবী করিম (দঃ) এরশাদ করলেন, **"আমার কাসুওয়া উট আল্লাহ্ কর্তৃক নির্দেশিত। সে নিজেই ঠিক করে নেবে– আমি কার গৃহের মেহমান হবো"**।

উট চলতে চলতে বনী নাজ্জার গোত্রের দুই ইয়াতিম শিশু সাহল ও সোহায়ল-এর খেজুরের আড়তে এসে বসে পড়লো। এখানেই বর্তমানে মসজিদে নববী অবস্থিত। পুনরায় উঠে উট চলে গেল হযরত আবু আইউব আনসারীর (রাঃ) গৃহে। সেখানে উট বসে পড়লো। নবী করিম (দঃ) এরশাদ করলেন, 'এখানেই আমার অবস্থান নির্ধারিত হয়েছে'। আবু আইউব আনসারী (রাঃ) মাল সামানা নিজ গৃহে তুলে নিলেন। তিনি নবী করিম (দঃ)-এর নানার বংশ বনু নাজ্জারের লোক ছিলেন। মদিনাবাসীদের মধ্যে তাঁর মর্যাদাই ছিল আলাদা। এভাবে উট হুযুরের বাসস্থান ও মসজিদে নববীর স্থান নির্ধারিত করে দিল। হুযুরের পরশে উটও আল্লাহর এলহামপ্রাপ্ত হয়।

এই গৃহ সম্পর্কে আল বেদায়া গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হুযুরের (দঃ) ১৪০০ বৎসর পূর্বে ইয়েমেন-এর বাদশাহ আবু কোরাব তিব্বা ইয়াছরিব (মদিনা) শহর ধ্বংস করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। তথাকার ইয়াহুদী আলেমগণ তাঁকে বলেছিল– আপনি এই শহর ধ্বংস করতে পারবেন না। কেননা, শেষ যুগের নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) হিজরত করে এখানে স্থায়ীভাবে বাসস্থান বানাবেন। একথা শুনে তিব্বা বাদ্শাহ সাথে সাথে নবীজীর উপর গায়েবী ঈমান আনেন। তাঁর এই না দেখা অগ্রীম ঈমান আল্লাহর দরবারে কবুল হয়। তিব্বা বাদশাহ নবী করিম (দঃ)-এর শানে একটি কবিতা লিখে হযরত আবু আইউব আনসারীর পূর্বপুরুষগণের কাছে হস্তান্তর করেন এবং বলেন–

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

আমার এই কবিতা বা পত্রখানা তোমরা ঐ নবীজীর খেদমতে পৌছিয়ে দিও। ঐ কাব্যপত্রখানা হযরত আবু আইউব আনসারীর পূর্বপুরুষগণ সযত্নে সংরক্ষণ করতে থাকেন। হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ) উত্তরাধিকার সূত্রে ঐ কাব্যপত্রের মালিক হন। নবী করিম (দঃ) হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ)-এর গৃহে অবস্থান করে ঐ কাব্যপত্রখানি তলব করেন। ঐ পত্র সম্পর্কে হযরত আবু আইউব আনসারীর কিছু জানা ছিলনা। নবী করিম (দঃ) নিজে পুরাতন কাগজপত্রের মধ্য হতে উক্ত পত্রখানা বের করলেন। সকলে নবী করিম (দঃ)-এর ইলমে গায়েব দেখে হতবাক হয়ে গেলো। হযরত আবু আইউব আনসারীর (রাঃ) দোতলা বাসভবনটি ১৪০০ বৎসর পূর্বে তিব্বা বাদশাহ তৈরী করে নবী করিম (দঃ)-এর জন্য উৎসর্গ করে যান। নবী করিম (দঃ)-এর উট সেই ঘরের সন্ধান করে এখানে এসে বসে পড়লো। নবীজীর সংশ্রবে এসে উটের যে বিদ্যা অর্জিত হলো– তাঁর খানিকটুকু আমাদের নসিব হলে জীবন ধন্য হতো।

তিব্বা বাদশাহ্ কর্তৃক লিখিত কাব্যপত্রের কিয়দাংশ বেদায়া গ্রন্থে উদ্ধৃত করা হয়েছে। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে এখানে তা উদ্ধৃত করা হলো–

شَهِدْتُ عَلٰى اَحْمَدَ اَنَّهٗ + رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ بَارِئِ النَّسَمِ -

فَلَوْ مُدَّ عُمْرِىْ اِلٰى عُمْرِهٖ + لَكُنْتُ وَزِيْرًا لَّهٗ وَابْنَ عَمٍّ -

وَجَاهَدْتُ بِالسَّيْفِ اَعْدَائَهٗ + وَفَرَّجْتُ عَنْ صَدْرِهٖ كُلَّ هَمٍّ -

অর্থ–"আমি (তিব্বা) একথার উপর সাক্ষ্য দিচ্ছি এবং ঈমান আনছি যে, আহমদ মুজতবা (দঃ) মানবজাতির স্রষ্টা আল্লাহর পক্ষ হতে নির্বাচিত রাসুল। আমার হায়াত যদি তিনির যুগ পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হতো– তাহলে আমি অবশ্যই তাঁর পরামর্শক হতাম ও জ্ঞাতি ভাইয়ের ন্যায় তাঁর সাহায্যকারী হতাম। আমি তাঁর দুশমনদের বিরুদ্ধে তরবারী দ্বারা যুদ্ধ করতাম এবং তাঁর মনের ব্যথা দূর করে দিতে চেষ্টা করতাম"। (বেদায়া ও নেহায়া ২য় খন্ড ১৬ পৃষ্ঠা পুরাতন সংস্করণ)

নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন ঃ - لَا تَسُبُّوْا تُبَّعًا فَاِنَّهٗ كَانَ قَدْ اَسْلَمَ

"তোমরা তিব্বা বাদশাহকে মন্দ বলোনা। কেননা, সে পূর্বেই আমার উপর ঈমান এনে মুসলমান হয়েছে"। নবী করিম (দঃ) আরও এরশাদ করেছেন–

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

لَاتَسُبُّوْا اَسْعَدَ الْحِمْيَرِيَّ فَاِنَّهٗ اَوَّلُ مَنْ كَسٰى الْكَعْبَةَ

অর্থ– "তোমরা আছআদ হিমইয়ারী (তিব্বা) কে মন্দ বলোনা। কেননা, সে-ই সর্বপ্রথম কা'বা ঘরকে উত্তম চাদর দ্বারা আবৃত করেছে"।

যাক–নবী করিম (দঃ) যে বৎসর মদিনায় হিজরত করেন, সে বৎসরের মুহররম থেকেই হিজরী সন গননা করা হয়। কেননা, সে তারিখ হতেই হিজরতের প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল। হযরত আবু বকর (রাঃ) মুহররমের পহেলা তারিখে ৮০০ দিরহাম দিয়ে দুটি উট কিনে নবীজীর খেদমতে পেশ করেছিলেন। ১৭ বৎসর পর হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতযুগে মুহররম মাস থেকে হিজরী সন প্রবর্তন করা হয়। এটি মুসলমানদের নিজস্ব সন। ইংরেজী সন খৃস্টানদের জন্য। বাংলা সন বাঙ্গালীদের জন্য। নওরোয অগ্নি উপাসক ইরানীদের জন্য। কিন্তু হিজরী সন সব মুসলমানদের জন্য। ধর্মীয় যাবতীয় আচার অনুষ্ঠান চান্দ্রমাসকে ঘিরেই পালিত হয়। চাঁদের তারিখ ধরা হয়- পূর্ব রাত হতে পরদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত। সুতরাং মুসলমানের মূল ক্যালেন্ডার হলো হিজরীসন।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ত্রিশতম অধ্যায়

মসজিদে নববী নির্মাণ

প্রসঙ্গ ঃ ইসলামের সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান মসজিদে নববী নির্মাণ, উস্তুনে হান্নানার জীবন লাভ ও নবী বিচ্ছেদে ক্রন্দন

নবী করিম (দঃ) সাত মাস পর্যন্ত হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ)-এর গৃহের নীচ তলায় অবস্থান করেন। কেননা, লোকজনদের সাথে দেখা সাক্ষাত ও সামাজিক কাজের জন্য এটাই সুবিধাজনক ছিল। এসময়ের মধ্যেই তিনি মসজিদে নববীর কাজ সমাপ্ত করেন। মসজিদের জায়গাটুকু দশ দীনার দিয়ে খরিদ করা হয়। হযরত আবু বকর (রাঃ) এই জমিনের মূল্য পরিশোধ করেন। হিজরতের যাবতীয় খরচও হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) একা বহন করেন। জান-মাল দিয়ে নবীজীকে সাহায্য করার এই কৃতিত্ব এককভাবে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর।

তিন দরজা বিশিষ্ট এই মসজিদ দৈর্ঘ্য-প্রস্থে একশত হাত ছিল। দেওয়াল ছিল কাঁচা ইটের। খুঁটি ছিল খেজুর গাছের এবং ছাদ ছিল খেজুরপাতার ছাউনি। ভিটি ছিল পাথরকুচির, কেব্লা ছিল ১৭ মাস পর্যন্ত উত্তর পশ্চিমে বাইতুল মোকাদ্দাসের দিকে। কেবলা পরিবর্তনের পর মিম্বার ও মেহরাবের স্থান দক্ষিণ দিকে এনে দক্ষিণ মুখী করা হয়। মসজিদ সংলগ্ন দক্ষিণ পূর্ব কোণে কয়েকটি হুজরা তৈরী করা হয়–হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত সওদা (রাঃ), প্রমূখ উম্মুল মোমেনীনগণের জন্য। অতঃপর মক্কা শরীফ থেকে হযরত ফাতেমা (রাঃ), হযরত উম্মে কুলছুম (রাঃ), উম্মুল মোমেনীন হযরত সওদা (রাঃ), হযরত উম্মে আয়মন (রাঃ), উছামা ইবনে যায়েদ (রাঃ)–প্রমুখ হুযুরের পরিবারবর্গকে মদিনায় আনা হয়। হযরত যয়নব (রাঃ) স্বামীগৃহে মক্কায় অবস্থান করেন। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর সাহেবজাদা হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) মক্কায় গিয়ে তাঁর পরিবারবর্গকে মদিনায় নিয়ে আসেন।

মসজিদে নববীতে প্রথমে মিম্বর ও মেহরাব কিছুই ছিল না। একটি মৃত খেজুর গাছের খুটিতে হেলান দিয়ে নবী করিম (দঃ) শুক্রবারে খুৎবা দিতেন। পরে ৮ম হিজরীতে তিন তাক বিশিষ্ট কাঠের মিম্বার তৈরী হলে খেজুরের খুঁটিটি মসজিদের

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

মেহরাবের পার্শ্বে সরিয়ে রাখা হয়। জুমার নামাযে খুৎবা দেয়ার জন্য নবী করিম (দঃ) মিম্বারে দন্ডায়মান হলে উক্ত খুঁটিটি শিশুর ন্যায় করুণ সুরে কেঁদে উঠে। সর্বশেষ কাতারে দন্ডায়মান হযরত আনাছ (রাঃ) খুঁটির উক্ত কান্না শুনতে পান। সমবেত সাহাবীগণ এতে স্তম্ভিত হয়ে যান। নবী করিম (দঃ) খুত্বা বন্ধ করে নেমে এসে খুঁটিটি কোলে তুলে নেন এবং তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে থাকেন। অবশেষে বেহেস্তে তাঁকে লাগানো হবে এবং বেহেস্তবাসীগণ তাঁর তাজা ফল ভক্ষণ করবেন- নবী করিম (দঃ)-এর এই আশ্বাসবানীতে সে শান্ত হয়ে যায়। নবীজীর পরশে উস্তুনে হান্নানার মধ্যে মানুষের হায়াত এসেছিল। তাই মানব শিশুর মত কেঁদেছিল।

[হযরত ঈছা (আঃ) মৃত মানুষকে জীবিত করে কথা বলায়েছেন। আর আমাদের প্রিয় নবীর সান্নিধ্য পেয়ে মৃত খেজুর গাছ জীবিত হয়ে মানুষের মত কেঁদেছিল। ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) বলেন, ঈছা (আঃ)-এর তুলনায় নবী করিম (দঃ)-এর এই মো'জেযা ছিল উন্নত এবং সুক্ষ্মতর। একাধিক সাহাবী কর্তৃক এই মো'জেযা বর্ণিত হয়েছে। তাই খবরে মোতাওয়াতের দ্বারা ইহা প্রমাণিত। উক্ত উস্তুনে হান্নানাকে পরে মানুষের মতই দাফন করা হয়। হাজী সাহেবানগণ এখনও উক্ত উস্তুনে হান্নানা যিয়ারত করেন। মসজিদে নববীর একটি পিলারের নাম উস্তুনে হান্নানা।

নবী করিম (দঃ) নিজের জন্য যে হুজরা তৈরী করেছিলেন, তাতে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) থাকতেন। এই হুজরাতেই অধিকাংশ সময় হযরত জিব্রাইল (আঃ) অহী নিয়ে আসতেন। এই হুজরা মোবারকেই রওযা শরীফ অবস্থিত। অর্ধেকে ছিল রওযা মোবারক এবং বাকী অর্ধেকে ছিল হযরত আয়েশা (রাঃ) এর বাসস্থান। পরে হযরত আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) কে উক্ত হুজরায় নবী করিম (দঃ)-এর পাশে দাফন করা হয়। হযরত ওমর (রাঃ)-এর কারণেই হযরত আয়েশা (রাঃ) হিজাব পরিধান (পর্দা) করে যিয়ারত করতেন। কেননা, হযরত ওমর (রাঃ) কে তিনি তাঁর দিকে রওযা থেকে চেয়ে থাকতে দেখেছিলেন (আল বাছায়ের)। নবী প্রেমিকগণ কবরে জিন্দা থাকেন এবং আল্লাহর অলীগণ কাশফের মাধ্যমে কবরবাসীকে দেখতে পান। এটা তাঁদের কারামত। হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ)- উভয়েরই কাশফুল কুবুর ছিল।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

মসজিদে নববীতে প্রথমে তেলের বাতি জ্বালানো হতো। হযরত তামিম দারী (রাঃ) দামেশক হতে মূল্যবান ঝালর বাতি এনে পিলারের সাথে লাগান। নবী করিম (দঃ) এ বলে দোয়া করলেন- **"তামীম দারীর (রাঃ) কবর যেন এমনিভাবে রৌশন হয়"।**

হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে খতমে তারাবীতে **মসজিদে নববীতে অধিক আলোকসজ্জা করা হতো। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, "ওমরের কবরকেও আল্লাহ রৌশন করুন"। হযরত ওমর (রাঃ) বলতেন, "মসজিদে আলোকসজ্জার জন্য নবী করিম (দঃ) হযরত তামীম দারীকে দোয়া করেছিলেন, আর আমার জন্য দোয়া করেছেন তাঁরই জামাতা ইমাম হাসান হোসাইনের পিতা এবং বিবি ফাতেমা (রাঃ)-এর স্বামী হযরত আলী (রাঃ)"।** মসজিদে আলোক সজ্জা করার ইহাই দলীল। (তাফসীর রুহুল বয়ান- ছুরা দোখান)

ইহা ছিল মসজিদে নববীর প্রথম অবস্থা। বর্তমান অবস্থার সাথে তার আকাশ-পাতাল ব্যবধান। নবী করিম (দঃ)-এর পর হযরত ওমর (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ), আবদুল মালেক, ওমর ইবনে আবদুল আযিয (রহঃ)- প্রমুখ কর্তৃক সজ্জিত হতে হতে মসজিদে নববী বর্তমান বর্ণাঢ্য সাজে সজ্জিত হয়েছে। এগুলো যদিও বিদআতে হাছানাভুক্ত- অর্থাৎ নবী করিম (দঃ)-এর পরে সংযোজিত, তবুও পরিত্যাজ্য নয়। কেননা, কোন কোন বিদআত ওয়াজিব- যেমন হযরত আলী (রাঃ) কর্তৃক ইলমে নাহু, ইলমে ফেকাহ-এর প্রচলন। কোন কোন বিদ্‌আত সুন্নাত- যেমন হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক ২০ রাকআত বিশিষ্ট তারাবিহ নামায জামাতে আদায় করা এবং হযরত ওসমান (রাঃ) কর্তৃক জুমুয়ার বর্তমানের প্রথম আযান প্রবর্তন করা। কোন কোন বিদ্‌আত মোস্তাহাব- যেমন হযরত ওমর ও হযরত ওসমান (রাঃ) কর্তৃক মসজিদে নববী সজ্জিতকরন ও নক্‌শা করন। ৮৬ হিজরীতে কোরআন শরীফে নোক্‌তা ও হরকত সংযোজন করা হয়। মিলাদ শরীফের মাহ্‌ফিল সাজানো এবং আনুষ্ঠানিকভাবে খানাপিনা তৈরী করা, সমবেতভাবে দরূদ ও ছালাম পেশ করার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি করা বিদ্‌আতে মোস্তাহাব পর্যায়ভুক্ত (মৌলুদে বরজিঞ্জি, শামী, নছরুদ্‌ দোরার ফী মৌলুদে ইবনে হাজর-ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

তদুপরি, সপ্তম শতকের সমস্ত আলেম উলামা ও জনগণ কর্তৃক ইজমায়ে উম্মত দ্বারা মিলাদ মাহফিল প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং ওহাবী সম্প্রদায় পরবর্তী যুগে মিলাদ শরীফের বিরোধিতা করলেও তা গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের আপত্তি চিরদিন আপত্তি হিসাবেই থাকবে– মূল বিষয় কোনদিনই হবে না।

মসজিদে নববী তৈরী করার কাজে নবী করিম (দঃ) নিজে ইট সরবরাহ করে দিতেন এবং সাহাবীগণকে উৎসাহিত করার জন্য আরবী কবিতা দ্বারা দোয়া করতেন। কবিতার শেষাংশ ছিল–

اَللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ اِلَّا الْعَيْشُ الْاٰخِرَة+فَارْحَمِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَة -

অর্থ–**"হে আল্লাহ! পরকালের সুখই প্রকৃত সুখ। তুমি আমার আনসার ও মোহাজির সাহাবীদের প্রতি দয়া করো"**।

ভালকাজে অনুরূপ মর্মের কবিতা পাঠ করা উত্তম। মসজিদের ছাদ পিটানো বা বিল্ডিং-এর ছাদ অথবা অন্য যেকোন ভারী কাজে দলবদ্ধ হয়ে ইসলামী কবিতা পাঠ করা বা গযল না'ত পাঠ করা উক্ত হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

একত্রিশতম অধ্যায়

মক্কা শরীফ উত্তম–না কি মদিনা শরীফ উত্তম?

মক্কা মোয়াযযমায় খানায়ে কা'বা আছে। হাজরে আসওয়াদ আছে। জমজম আছে। সাফা মারওয়া আছে। মাকামে ইব্রাহীমও আছে। মিনা-মোজদালেফা ও আরাফাত- সব কিছুই মক্কা শরীফে অবস্থিত। কিন্তু মদিনা মোনাওয়ারাতে শুধু রাসুল পাক (দঃ)-এর রওযা মোবারক আছে। এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি উত্তম–এ নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

ইমাম আবু হানিফা (রাঃ), ইমাম মালেক (রাঃ), ইমাম শাফেয়ী (রাঃ), এই তিন ইমামের মতে শহর হিসাবে মক্কা শহর মদিনা শহর থেকে উত্তম। কেননা, আল্লাহ্‌পাক মক্কা শহরের শপথ করেছেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাঃ)-এর মতে মদিনা শহরই উত্তম। তাঁর যুক্তি হলো– মক্কাতে নবী করিম (দঃ)-এর অবস্থানের কারণেই আল্লাহ তায়ালা মক্কা শহরের শপথ করেছেন– সুরা বালাদ-এ। সুতরাং নবী করিম (দঃ)-এর অবস্থানের পরিবর্তনের সাথে সাথে ঐ হুকুমেরও পরিবর্তন হওয়া যুক্তিযুক্ত। তদুপরি, তাবরানী শরীফে আছে " মক্কা হতে মদিনা উত্তম" (শেখ দেহলভীর জযবুল কুলুব সূত্রে তাবরানী)।

ইমামগণের এই মত কেবল শহরের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। কিন্তু রওযা মোবারকের পবিত্র স্থানটুকু সম্পর্কে সকল ইমামই একমত যে, রওযা মোবারকের যে স্থানটুকু হুযুর (দঃ)-এর পবিত্র দেহের সাথে সংযুক্ত, তা সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এমনকি, বাইতুল্লাহ, বাইতুল মামুর, আরশ-কুরছি-লাওহ-কলম থেকেও উত্তম। (ফতোয়ায়ে শামী যিয়ারত অধ্যায়)। আরবী এবারত ৬০তম অধ্যায়ে দেখুন। জনৈক আশেক কবি বলেন ঃ

عرش سے زیادہ رتبہ والا روضہ رسول اللہ کا

اسی روضہ انوارپہ غلامون کے لاکھون سلام-

কাব্যানুবাদঃ

আরশ হতে অধিক উত্তম দয়াল নবীর রওযা পাক,
সেই রওযাতে গোলামদের-ই লক্ষ কোটি ছালাম যাক।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে–আইনের চোখে যাই হোক না কেন, প্রেমের চোখে কিন্তু মদিনার মূল্যই আলাদা। প্রেমিকজনের কাছে প্রেমাস্পদের শহরই সর্বোত্তম। ইমাম মালেক (রহঃ) মদিনাবাসী হয়েও জীবনে মাত্র একবার ফরয হজ্ব আদায় করতে মক্কা শরীফ এসেছিলেন। তিনি মদিনা ছেড়ে জীবনে আর কোথাও ভ্রমণ করেননি। তিনি জীবনে কখনো জুতা পায়ে দিয়ে মদিনার গলিতে চলতেন না এবং প্রস্রাব পায়খানার কাজও মদিনার বাইরে যেয়ে সেরে আসতেন। রূহানী জগতে বিচরণকারী আশেকান মদিনার জমিনে যেই প্রশান্তি লাভ করেন– মক্কার জমিনে সেই প্রশান্তি পান না। মদিনাতে হায়াতুন্নবী–জিন্দানবী (দঃ) শুয়ে আরাম করছেন। সুতরাং প্রেমিকজনের দিলের কা'বা হচ্ছে মদিনা। "মক্কা হচ্ছে কপালের কা'বা কিন্তু মদিনা হচ্ছে রূহের কা'বা"–(খাজা আজমেরী)। সত্যি বলতে কি–কা'বারও কা'বা হচ্ছে সোনার মদিনা। এ জন্যই কা'বা ঘর মদিনার দিকে ঝুঁকে আছে। জনৈক কবি বলেন–

روئے ہمارا سوئے کعبہ- روئے کعبہ سوئے محمد

کعبہ کا کعبہ روئے محمد-صلی اللہ علیہ وسلم

অর্থ–"আমাদের মুখ কা'বার দিকে, কিন্তু কা'বার মুখ মদিনার দিকে। সত্যিই নবী করিম (দঃ) হচ্ছেন কা'বারও কা'বা। ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম"।

তাবরানী শরীফের একটি হাদীস উদ্ধৃত করে শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহ্‌লভী (রহঃ) তাঁর রচিত জযবুল কুলুব গ্রন্থে বলেছেন– হিজরতের পূর্বে মক্কা ছিল উত্তম। হিজরতের পর মদিনা শরীফই এখন উত্তম। নবীজীর অবস্থানের কারণেই মদিনা শরীফের ফযিলত বেশী। হাদীসখানা হলো ঃ

اَلْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ مِّنْ مَكَّةَ -

অর্থ–"মক্কা থেকে মদিনা উত্তম" (তাবরানী শরীফ–জযবুল কুলুব ও মাওয়াহিব)।

মক্কা হলো নবীজীর প্রিয় মাতৃভূমি, আর মদিনা হলো আল্লাহর প্রিয় হাবীবের রওযা ভূমি। আমাদের আক্বিদা হলো ফতোয়ায়ে শামী বর্ণিত ফতোয়া এবং তাবরানী বর্ণিত হাদীস।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

বত্রিশতম অধ্যায়

এক নযরে মদিনার যিন্দেগী

প্রসঙ্গ ঃ হিজরতের পর এক বৎসর পর্যন্ত নবী করিম (দঃ) প্রবাস জীবনের প্রাথমিক কাজ সমাধা করেন। মোহাজির সমস্যা, মদিনার উপকণ্ঠে বসবাসকারী তিনটি ইয়াহুদী গোত্র- বনু কাইনুকা, বনু কোরায়যা ও বনু নযির এবং মদিনার আদিবাসী আউছ ও খাজরাজ গোত্রদ্বয়ের সমন্বয়ে শান্তি ও প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর, মসজিদে নববী তৈরী, বিবিগণের বাসস্থান নির্মাণ-ইত্যাদি প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ এ সময়ে সমাধা করা হয়। কিন্তু নবীগণের জীবন কখনও কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। নবী করিম (দঃ)-এর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেন ঃ

اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً اَلْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْاَوْلِيَاءُ ثُمَّ الْمُؤْمِنُوْنَ (اَلْبِدَايَةُ)

অর্থাৎ- **"সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা হয় নবীগণের, তারপর অলি-আল্লাহগণের, তারপর সাধারণ মোমেনগণের** (বেদায়া)"।

কয়েকমাস (১৬/১৭ মাস) যেতে না যেতেই ইয়াহুদীরা মদিনা চুক্তি ভঙ্গ করে গোপনে মক্কার কোরাইশদের সাথে আঁতাত গড়ে তোলে। অপরদিকে মদিনার আদিবাসী আউছ ও খাজরাজ গোত্রের মধ্য হতে একদল মোনাফেকের সৃষ্টি হয়। এরা প্রকাশ্যে মুসলমান হলেও ভিতরে ভিতরে ইয়াহুদী ও কোরাইশদের সাথে যোগ দেয়। এদের সর্দার ছিল আবদুল্লাহ ইবনে ওবাই। সে নবী করিম (দঃ)-এর পিছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়তো। কিন্তু মসজিদের বাইরে গেলেই তার মোনাফেকী শুরু হতো। সে মদিনার সম্ভাব্য নেতা হতে যাচ্ছিল। নবী করিম (দঃ)-এর আগমনের ফলে তার সে আশা চূর্ণ হয়ে গেলো। এই মোনাফেকরাই ইসলামের ক্ষতি করেছে বেশী। এদের আহবানেই মক্কার কোরাইশরা বার বার মদিনা আক্রমণ করতে সাহস পেয়েছিল। হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে বদরের যুদ্ধ, তৃতীয় হিজরীতে ওহোদের যুদ্ধ এবং পঞ্চম হিজরীতে খন্দকের যুদ্ধে মুনাফিকদের যোগ সাজশেই মক্কার কোরাইশরা আক্রমণাত্মক ভূমিকা পালন করে। এরপর থেকেই কোরাইশদের দর্প চূর্ণ হয়ে যায়। ৫ম হিজরী পর্যন্ত নবী

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

করিম (দঃ) আত্মরক্ষামূলক জিহাদ পরিচালনা করতেন। ৬ষ্ঠ হিজরী সন থেকে ইতিহাসের গতি ফিরে যায়। নবী করিম (দঃ) খন্দকের যুদ্ধের পর থেকেই আক্রমণাত্মক যুদ্ধ পরিচালনা করতে সক্ষম হন। খায়বার, মুতা, মক্কা বিজয়, হোনায়ন, তায়েফ ও তাবুক-প্রভৃতি যুদ্ধে নবী করিম (দঃ) মদিনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এসব যুদ্ধে কাফেরগণ পর্যুদস্ত হয়ে যায়। গোটা আরব উপদ্বীপে (জযিরাতুল আরব) ইসলামের বিজয় নিশান উড্ডীন হয়। নবী করিম (দঃ) ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবে পরিণত হয়। মক্কী জিন্দেগীতে ইসলামের বিধি বিধান পূর্ণ বাস্তবায়িত করা সম্ভব ছিলনা। কেননা, সেখানে মুশরিক শাসন ও প্রতিকূল পরিবেশ বিরাজমান ছিল। ইসলামের মূল পাঁচটি ভিত্তির মধ্যে মাত্র ১টি-বুনিয়াদ- অর্থাৎ কলেমা "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ" মক্কাতে জারি করতে পেরেছিলেন। বাকী ৪টি রোকন-নামায, রোযা হজ্ব, যাকাত-মদিনাতে এসে বাস্তবায়িত করেন। ইসলামের অন্যান্য হুকুম আহকাম এবং বিধি বিধান মদিনাতেই নাযিল হয়। সুতরাং মদিনার জীবন কন্টকাকীর্ণ হলেও ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ এ সময়েই হয়েছিল। সাফল্যের আনন্দ ও ইসলামের পূর্ণ বিধান প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ মদিনাতেই হয়েছিল। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে নবী করিম (দঃ)-এর হিযরতের সুদূর-প্রসারী সাফল্য লক্ষ্য করা যায়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে-হিজরত প্রকাশ্যভাবে দেশ ত্যাগ হলেও প্রকৃত পক্ষে ছিল বিশ্ববিজয়ের সোপান এবং সাফল্যের দারোদঘাটন। এবার ক্রমান্বয়ে ঘটনাবলী বর্ণনা করার চেষ্টা করবে।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

তেত্রিশতম অধ্যায়

ভ্রাতৃত্ব বন্ধন

প্রসঙ্গ ঃ মদিনায় আগমনের পর প্রাথমিক কাজ

নবী করিম (দঃ) হিজরত করে মদিনা শরীফ আগমনের পর মুসলমানদের জন্য মক্কায় অবস্থান করা নিষিদ্ধ এবং হিজরত করা ফরয হয়ে যায়। কেবলমাত্র রোগী, বৃদ্ধ, স্বামী গৃহে আবদ্ধা স্ত্রী, মনিবগৃহে আবদ্ধ গোলামগণের জন্য সময় সুযোগ দেয়া হয়। মক্কা শরীফে আল্লাহর ঘর এবং পবিত্র স্থানসমূহ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তথায় বসবাস করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কেননা, নবী করিম (দঃ)-এর হিজরত করার পর সেখানে বিনা কারণে অবস্থান করা মুসলমানদের জন্য বৈধ থাকতে পারে না। স্বাভাবিক কারণেই মদিনায় মোহাজির মুসলমানদের ভিড় জমতে লাগলো। মদিনার আনসারগণ তুলনামূলকভাবে গরীব ছিলেন। প্রধানতঃ কৃষি কাজ ছিল তাঁদের রুজী রোজগারের প্রধান উৎস। ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল ইয়াহুদীদের হাতে কুক্ষিগত। এমতাবস্থায় মোহাজিরগণের আগমন আর্থিক সংকটের সৃষ্টি করলো। হিজরতের ৫ম মাসে নবী করিম (দঃ) আনসারদের সাথে মোহাজিরগণের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের কাজ সমাধা করেন। মোহাজিরগণকে আনসারদের মধ্যে বন্টন করে বিভিন্ন স্থানে পুনর্বাসিত করলেন।

আনসারগণ আনন্দচিত্তে এই ব্যবস্থা মেনে নিলেন। তাঁরা মোহাজির ভাইদেরকে আপন ভাইয়ের মর্যাদা দিয়ে সম্পত্তিতে সম অংশীদার করে নিলেন। এমন কি–দুই বিবি থাকলে তাঁরা এক বিবিকে তালাক দিয়ে মোহাজির ভাইয়ের সাথে বিবাহ দিতেন। অভাব অনটন স্বত্ত্বেও তাঁরা নিজেরা উপবাসী থেকে কৌশলে মোহাজির ভাইকে খানা খাওয়ায়ে দিতেন। রাত্রে একসাথে খানা খেতে বসে চেরাগবাতি নিভিয়ে দিয়ে প্লেটের খানা মোহাজির ভাইকে খাওয়ায়ে নিজেরা উপবাস করতেন। আনসারগণের এই ত্যাগ-তিতীক্ষার প্রশংসা করে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোরআনের আয়াত নাযেল করেন। সুরা হাশরের ৯নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন–

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ -

অর্থ–"আনসারগণ নিজেরা অভাবগ্রস্ত হয়েও মোহাজির ভাইদেরকে অগ্রাধিকার দান করে"।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

দেশী আর প্রবাসীর প্রশ্ন ওখানে ছিলনা, নবী করিম (দঃ)-এর সান্নিধ্যে তাঁরা দুধে পানিতে মিশে গিয়েছিলেন। আজকাল মোহাজির সমস্যা নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে রক্তাক্ত দাঙ্গা বেঁধে যেতেও দেখা যায়। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও প্রজ্ঞাহীন নেতৃত্বের কারণেই এসব সমস্যা দেখা দেয়। নবী করিম (দঃ)-এর সুশিক্ষা থেকে আমরা আজ কত দূরে!

মদিনার সনদ ঃ ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত "আন্তর্জাতিক সনদ"

বিভিন্ন গোত্র, গোষ্ঠি বা জাতির মধ্যে শান্তি স্থাপন ও পরস্পর নিরাপত্তার যে অঙ্গীকার করা হয়, তাকে আরবীতে মোয়াহাদা বা চুক্তি বলা হয়। আধুনিক বিশ্বের সর্বপ্রথম লিখিত সনদকে ম্যাগনা কার্টা বলা হয়ে থাকে। তারই পথ ধরে আজ জাহিসংঘ সনদ রচিত হয়েছে। কিন্তু ম্যাগনা কার্টা সনদের বহু পূর্বেই এখন থেকে ১৪২৮ বৎসর পূর্বে প্রথম হিজরী সালে মদিনায় সর্বপ্রথম লিখিত সনদ সম্পাদন করেছিলেন নবী করিম (দঃ)। মদিনায় হিজরত করে তিনি দেখতে পেলেন, সেখানে ইয়াহুদীদের তিনটি গোত্র– যথাক্রমে বনু কাইনুকা, বনু কোরায়যা ও বনু নযির এবং আদি মদিনাবাসীদের দুইটি গোত্র–আউছ ও খাযরাজ বসবাস করছে। তদুপরি মক্কা হতে নবাগত মোহাজিরগণের একটি দল মদিনায় এসে বসতি স্থাপন শুরু করেছেন। এমতাবস্থায় পরস্পরের মধ্যে সহাবস্থান, শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি করার একান্ত প্রয়োজন ছিল। তাই নবী করিম (দঃ) সকলকে নিয়ে একটি সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদন করলেন। এতে উল্লেখ ছিল–

"বিভিন্ন ধর্ম ও গোত্রের লোক নিজ নিজ ধর্মমতে অটল থেকে নিজেদের মধ্যে সহনশীলতা ও সহাবস্থান বজায় রাখবে এবং বহিরাক্রমণ থেকে সম্মিলিতভাবে মদিনাকে রক্ষা করবে। পরস্পরের মধ্যে কোন বিষয়ে মতানৈক্য বা মতবিরোধ দেখা দিলে সে ক্ষেত্রে নবী করিম (দঃ)-এর ফয়সালা চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে"। এভাবে আন্তঃধর্মীয় ও মাল্টি কালচার বিশিষ্ট একটি রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হলো।

এই সনদ বা দলীলকে মদিনার সনদ বলা হয়। এরই সূত্র ধরে আজ জাতিসংঘ গঠিত হয়েছে। সুতরাং বিশ্বশান্তি নির্মাতা হিসাবে নবী করিম (দঃ) বিশ্ব সভ্যতার পথ প্রদর্শক।

নবী করিম (দঃ) উক্ত চুক্তিনামা অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেও ইয়াহুদ গোত্রত্রয় এবং মোনাফিকরা চুক্তি ভঙ্গ করতে থাকে। তারা গোপনে মক্কাবাসীদের সাথে যোগাযোগ করে তাদেরকে মদিনা আক্রমণ করার আমন্ত্রণ জানায় এবং সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করে। এই ষড়যন্ত্রের ফলে মক্কাবাসী কোরাইশরা

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ভিতরে ভিতরে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। তারা অস্ত্রসস্ত্র সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে বাণিজ্য কাফেলার ছত্রছায়ায় সিরিয়ার খৃষ্টানদের সাথে আঁতাত গড়ে তোলে। এই কাফেলার নেতৃত্ব দিতে থাকে আবু সুফিয়ান। তিনি আট বৎসর পর্যন্ত এভাবেই মুসলমান ও হুযুর আকরাম (দঃ)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকেন। ইসলামের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করেছিলেন তিনি। অবশেষে ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের সময়ে তিনি সবংশ ইসলাম গ্রহণ করেন। নবী করিম (দঃ) অতীতের সব কিছু ভুলে গিয়ে তাঁকে বিশিষ্ট সাহাবীর মর্যাদা দান করেন।

মদিনা সনদের বরখেলাফমূলক ইহুদী ষড়যন্ত্র, মক্কাবাসী কোরাইশদের চক্রান্ত এবং সিরিয়ার খৃষ্টান জগতের শত্রুতাই যুদ্ধ বিগ্রহের সুত্রপাত করে। নবী করিম (দঃ) একান্ত বাধ্য হয়ে তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। আল্লাহর অনুগ্রহে নবীজীর শত্রুরা পর্য্যুদস্ত হয় এবং মদিনা শত্রুমুক্ত হয়। চুক্তি ভঙ্গ করার দায়ে মদিনার ইয়াহুদীরা মদিনা হতে উৎখাত হয়ে যায়। মক্কায় ১৩ বছর নির্যাতন সহ্য করার পর মুসলমানদেরকে প্রকাশ্য জিহাদের অনুমতি দেয়া হয়"। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন–

اذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا -

অর্থ–**"মুসলমানদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো- কেননা তাঁদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার চালানো হয়েছে"** (ছুরা হজ্ব ৩৯ আয়াত)।

মদিনার দশ বৎসর যিন্দেগীর মধ্যে ২৭টি বড় আকারের যুদ্ধ এবং ৪৭ টি ছোট আকারের অভিযান পরিচালিত হয়। মোট ৭৪টি ছোট বড় যুদ্ধ ও অভিযানের মধ্যে ২৭টিতে নবী করিম (দঃ) অংশগ্রহণ করেন এবং এর মধ্যে ৯টি যুদ্ধ তিনি নিজে পরিচালনা করেন। বদর, ওহুদ, খন্দক, বনু কোরায়যা, মোরাইছি, খায়বর, ফতেহ্ মক্কা, হোনায়ন ও তায়েফের যুদ্ধ স্বয়ং নবী করিম (দঃ) পরিচালনা করেন এবং সব ক'টিতেই বিজয় লাভ করেন। কেবলমাত্র ওহুদের যুদ্ধে তিনি প্রথমে জয়লাভ করা স্বত্তেও মুসলিম তীরন্দাজ বাহিনী কর্তৃক গণিমতের মাল সংগ্রহ করার লক্ষ্যে নিজ ঘাঁটি ত্যাগ করার ফলে পরাজিত কোরাইশ বাহিনী গুপ্ত হামলা করে মুসলমানদের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করে। পরে অবশ্য তারা পলায়ন করতে বাধ্য হয়। নবী করিম (দঃ)-এর একটি কড়া নির্দেশ ভুলক্রমে উপেক্ষা করার ফলেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। নির্দেশটি ছিল **"তোমরা জয়-পরাজয় কোন অবস্থাতেই নিজ ঘাটি ত্যাগ করবেনা- যে পর্যন্ত না আমি নির্দেশ করি"** (মাওয়াহেব)। নেতার হুকুম অমান্য করলে তার পরিণতি ভাল হয় না।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

চৌত্রিশতম অধ্যায়

বদর যুদ্ধ

প্রসঙ্গ ঃ হক ও বাতিলের ফয়সালা এবং অসংখ্য ইলমে গায়েবের মো'জেযা প্রকাশ

বদরের জিহাদ ছিল হক্ব ও বাতিলের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালাকারী যুদ্ধ। নবী করিম (দঃ)-এর অসংখ্য মো'জেযা এতে প্রকাশ পায়। এই যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় বদরের ময়দানে ১৭ই রমযান দ্বিতীয় হিজরীতে। বদর মদিনা শরীফ হতে সোজাপথে ৮০ মাইল পশ্চিম দক্ষিণে অবস্থিত। এক ব্যক্তির নাম ছিল বদর। সে একটি কূপ খনন করেছিল। তার নামানুসারে ঐ এলাকা ও কূপের নাম রাখা হয় বদর। ঘটনাক্রমে পরিকল্পনা ছাড়াই এই যুদ্ধ ঘটে যায়। ঘটনাটি নিম্নরূপ–

নবী করিম (দঃ)-এর হিজরত করে মদিনায় গমন এবং তথায় ইসলামের প্রসার দেখে মক্কার কোরাইশগণ জ্বলে পুড়ে মরে যাচ্ছিল। কিভাবে ইসলামের প্রসার রোধ করা যায় এবং কিভাবে মুসলমানদের শেষ করা যায়– এই ভাবনা তাদের পেয়ে বসে। তারা পরামর্শ করে স্থির করলো– যুদ্ধই ইসলামকে খতম করার একমাত্র উপায়। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তারা প্রথমে অস্ত্র সংগ্রহ করার দিকে মনোযোগ দিল। আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে এক বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়ায় গমন করলো। মক্কার কোরাইশরা সোনা চান্দি, গহনাপত্র ও অন্যান্য মাল সামানা সিরিয়ায় প্রেরণ করলো। বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা যুদ্ধাস্ত্র খরিদ করে আবু সুফিয়ানের কাফেলা মক্কার দিকে রওয়ানা দিলো। উক্ত কাফেলার নিরাপত্তার জন্য ৪০ জন সসস্ত্র অশ্বারোহী সাথে রাখলো।

তারা মদিনার কাছাকাছি পৌঁছলে হযরত জিব্রাইল (আঃ) নবী করিম (দঃ) কে উক্ত কাফেলার গতিরোধ করার উদ্দেশ্যে বের হতে আরয করলেন। নবী করিম (দঃ) মোহাজির ও আনসার মিলিয়ে মোট ৩১৩ জনের একটি দল নিয়ে আবু সুফিয়ানের অস্ত্র কাফেলার গতি রোধ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন। আবু সুফিয়ান গুপ্তচর মারফত এই সংবাদ পেয়ে লোহিত সাগরের উপকূল ধরে অন্য পথে দ্রুতগতিতে বিপজ্জনক স্থান অতিক্রম করে চলে গেলো। সে পূর্বেই গুপ্তচর মারফত মক্কায় আবু জাহলকে নবী করিম (দঃ)-এর আগমনের খবর পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। নবী করিম (দঃ) রাওহা নামক স্থানে পৌঁছে খবর পেলেন–আবু সুফিয়ানের অস্ত্রকাফেলা নিরাপদে উপকূল ধরে চলে গেছে। এ সময়ে আল্লাহ

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

তায়ালা নবী করিম (দঃ) কে মক্কা থেকে আগত আবু জাহল বাহিনীর কথা জানিয়ে দিলেন এবং মোকাবেলার নির্দেশ দিলেন। বিজয়ের শুভ সংবাদও প্রদান করলেন। আল্লাহ পাক জিব্রাইল মারফত একথাও বলে পাঠালেন যে, **"দুটি দলের মধ্যে একটিতে তোমাদের বিজয় হবে"** (আনফাল-৭)। (প্রথম দল আবু সুফিয়ান এবং দ্বিতীয় দল আবু জাহল)।

এদিকে আবু জাহল আবু সুফিয়ানের কাফেলার সাহায্যার্থে এক হাজার লোকের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে রওয়ানা দিল। তার কাফেলায় ছিল ৭০০ উট এবং একশত ঘোড়া ও প্রচুর রসদ। যুদ্ধ কাফেলা প্রস্তুতকালে আবু জাহল উক্ত বাহিনীতে নবী করিম (দঃ)-এর চাচা আব্বাস, দুই চাচাতো ভাই আকিল ও নওফেল এবং জামাতা আবুল আছকেও যোগদান করতে বাধ্য করলো। আব্বাসের নিকট থেকে চাঁদাস্বরূপ বিশ উকিয়া স্বর্ণ আদায় করা হলো। (এক উকিয়া তৎকালীন ৪০ দীনার ও বর্তমানের কয়েক লক্ষ টাকা)।

এ সময় শয়তান মানুষের রূপ ধারণ করে আবু জাহলকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহ দিতে লাগলো এবং বললো– **"আমি মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী কেনানী গোত্রের লোক। আমার নাম সুরাকা ইবনে মালেক কেনানী। আমার এলাকা দিয়ে যাতায়াতকালে আপনার বাহিনীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে এবং আমার গোত্রের লোকজন দিয়েও আপনাদের সাহায্য করা হবে"**। (হিজরতের সময় এই সুরাকা কেনানী হুযুর (দঃ) কে ধরতে গিয়েছিলো)।

সুরা আনফাল ৪৮নং আয়াতে শয়তানের এই কুমন্ত্রণা উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে ঃ

وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ–

অর্থ–**"হে রাসুল! স্মরণ করুন ঐ সময়ের কথা, যখন শয়তান আবু জাহলের বাহিনীকে এই বলে উৎসাহিত করছিলো যে, এই যুদ্ধে তোমাদের বিরুদ্ধে কেউ জয়লাভ করতে পারবেনা– বরং তোমরাই হবে বিজয়ী এবং আমি তোমাদের সাথেই থাকবো"** (সুরা আনফাল ৪৮ আয়াত)।

শয়তান এভাবে প্ররোচনা দিয়ে আবু জাহলকে তার বাহিনীসহ তাদের মরন ফাঁদ স্বরূপ বদর ময়দানে পৌঁছাতে সাহায্য করলো। কিন্তু যখন যুদ্ধ শুরু হলো এবং আসমান থেকে পাঁচ হাজার ফেরেস্তা সৈন্য নেমে এসে নবী করিম (দঃ)-এর সেনাবাহিনীর সাথে যোগ দিল, তখন শয়তান পিছু হটতে আরম্ভ করলো। আবু

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

জাহল বললো–কি ভাই! আমাদেরকে একা ফেলে তুমি কোথায় যাচ্ছো? তখন শয়তান বললো–

اِنِّيْ بَرِيْئٌ مِّنْكُمْ اِنِّيْ اَرٰى مَالَا تَرَوْنَ اِنِّيْ اَخَافُ اللّٰهَ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ–

অর্থ–**"আমি তোমাদের থেকে সরে দাঁড়ালাম। কেননা, আমি যা দেখতে পাচ্ছি (ফেরেস্তাদলকে) তোমরা তা দেখতে পাচ্ছনা। আমার অন্তরে খোদার ভীষণ ভয়। আর আল্লাহর শাস্তি অতি কঠিন"**। (সুরা আনফাল ৪৮ আয়াত)।

এভাবে কুপরামর্শ দিয়ে শয়তান আবু জাহলকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিল। মানুষ শয়তানরাও এভাবে অন্যকে উসকানী দিয়ে পরে সরে দাঁড়ায়।

আবু জাহল সসৈন্যে রওয়ানা দিয়ে পথিমধ্যে গুপ্তচর মারফত সংবাদ পেলো যে, আবু সুফিয়ানের অস্ত্রকাফেলা সাগরের উপকূল ধরে নিরাপদে চলে এসেছে। আবু জাহলের দলের লোকজন বললো, এবার আর অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন নেই, মক্কায় প্রত্যাবর্তন করাই উত্তম। কিন্তু আবু জাহল নাছোড়বান্দা। সে বললো– আমরা বদর ময়দানে গিয়ে আনন্দ ফূর্তি করবো, শরাব পান করবো, গায়িকাদের গান শুনবো এবং বিরাট যিয়াফত দিয়ে তারপর মক্কায় প্রত্যাবর্তন করবো (রুহুল বয়ান)। একথা বলে সে বদর ময়দানের দক্ষিণ প্রান্তে মক্কার দিকে নিম্নভূমিতে সুবিধামত স্থানে তাঁবু স্থাপন করলো এবং আনন্দ ফুর্তিতে মেতে উঠলো। সে জানতোনা– মুসলিমবাহিনী পূর্ব থেকেই রাওহায় অবস্থান করছেন।

আবু জাহলের বাহিনীর সংবাদ পেয়ে নবী করিম (দঃ) ৩১৩ জন সাহাবাকে নিয়ে বদর ময়দানে মদিনার দিকের উত্তরাংশে উঁচু ভূমিতে এসে তাঁবু ফেললেন। কোরাইশদের বিরাট বাহিনী দেখে প্রথমতঃ মুসলমানদের মনে কিছুটা দুর্বলতা দেখা দিলো। **কিন্তু নবী করিম (দঃ) তাঁদেরকে সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা আমাকে বিজয়ের আশ্বাস দিয়েছেন। আমি কুরাইশদের ৭০ সর্দারের নিহত হওয়ার স্থানও দেখতে পাচ্ছি। একথা বলে নবী করিম (দঃ) হাতের লাঠি দিয়ে এক একটি জায়গা চিহ্নিত করে বলতে লাগলেন– এটি আবু জাহেলের ভূলুণ্ঠিত হওয়ার জায়গা, এটি ওৎবার, ঐটি অলিদের, অমুক জায়গা শায়বার বধ্যভূমি হবে- ইত্যাদি।**

যুদ্ধ শেষে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) নবী করিম (দঃ)-এর গায়েবী সংবাদের সত্যতা বাস্তবে দেখার জন্য অনুসন্ধান করে দেখতে পেলেন– হুযুর আকরাম (দঃ) যেখানে যার নাম ধরে জায়গা চিহ্নিত করেছিলেন, ঠিক সে জায়গাতেই তাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল। **নবী করিম (দঃ)-এর আল্লাহ্ প্রদত্ত ইলমে**

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

গায়েব দেখে সাহাবায়ে কেরামের ঈমান আরও দৃঢ় হয়ে গেলো। (বেদায়া ও নেহায়া)

[কোরআনে আছে- **(নবী ব্যতিত) “কোন মানুষই নিজে নিজে জানেনা- সে কোন্ স্থানে মারা যাবে”**। ইহা আল্লাহর ইলমে গায়েব যাতী সম্পর্কিত আয়াত। ইহার সাথে রাসুলে পাকের (দঃ) ইলমে গায়েব আতায়ীর কোন বিরোধ নেই। নবীজীর এ সম্পর্কিত ইলমে গায়েব সূরা নিসা ও সূরা জ্বীন-এ উল্লেখ করা হয়েছে।]

বদর ময়দানের যে অংশে নবী করিম (দঃ) অবস্থান গ্রহণ করেন-সেটি ছিল যুদ্ধের জন্য অনুপযুক্ত স্থান। কেননা, জায়গাটি ছিল বালুময় এবং পানিশূন্য। অপর দিকে, আবু জাহলের অংশ ছিল নিম্নভূমি এবং তাতে পানির সুবিধাও ছিল। আল্লাহর হুকুমে রাত্রে প্রচুর বৃষ্টি হলো। ফলে উচু ভূমির বালু হলো শক্ত এবং নিম্নভূমির মাটি হলো কর্দমাক্ত ও যুদ্ধের জন্য অনুপযুক্ত। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) গর্ত করে প্রয়োজনীয় পানি আটকে রাখলেন।

রমযানের ১৭ তারিখ যুদ্ধ শুরু হলো। নবী করিম (দঃ) একটি তাঁবুতে নামাযের সিজদায় পড়ে এ বলে কাঁদতে লাগলেন- “হে আল্লাহ! আমার এই সল্প সংখ্যক সাহাবী যদি শহীদ হয়ে যায়- তবে তোমার নাম কে নেবে? আমি তোমার নামের উছিলা ধরে তোমার সাহায্য প্রার্থনা করছি”। (হাদীস)

এই অসহায়ত্ব প্রকাশ করা উম্মতের শিক্ষার জন্য ছিল। নতুবা তিনি তো পূর্বেই বিজয় সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন। নবী করিম (দঃ) নামায অবস্থায় মূহুর্তের জন্য তন্দ্রামগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি দেখতে পেলেন- সাদা পাগড়ী পরিহিত এক হাজার ফেরেস্তা মুজাহিদগণের সাহায্যার্থে অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর ফেরেস্তাদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে তিন হাজার ও পাঁচ হাজারে উন্নীত হলো। কোরআন মজিদের সুরা আলে-এমরানের ১২৩, ১২৪, ১২৫ আয়াতে ৫০০০ হাজার অশ্বারোহী ফেরেস্তা অবতরনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

বদরের যুদ্ধে ফেরেস্তাগণ অংশগ্রহণ করেছিলেন-কিন্তু কিভাবে শত্রু নিধন করতে হয়-তা তাদের জানা ছিলনা। আল্লাহ তায়ালা সুরা আনফাল ১২নং আয়াতে তাঁদেরকে শত্রুর উপর আঘাত হানার কৌশল শিক্ষা দিয়ে ইরশাদ করেন-

فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ-

অর্থ-**“আল্লাহ বললেন-হে ফেরেস্তাগণ, তোমরা শত্রুদের গর্দানের উপরিভাগে আঘাত হানো; আরো আঘাত হানো প্রত্যেক গিরায় গিরায়”** (আনফাল)।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ফেরেস্তাগণ কর্তৃক শত্রু নিধনের আলামত ছিল- গলায় কালো দাগ। সাহাবায়ে কেরাম বলেন, আমরা তরবারী দ্বারা আঘাত করার পূর্বেই কাফেরদের মস্তক দ্বিখন্ডিত হয়ে পড়তো। এভাবে ৭০ জনের মধ্যে ৬৪ জনই ছিল ফিরিস্তার আঘাতে নিহত। আমাদের হাতে মাত্র ৬ জন নিহত হয়েছে (তাফসীরে রুহুল বয়ান)।

পরবর্তী তিনটি যুদ্ধে ফেরেস্তাগণ সাহায্যার্থে আগমন করেছিলো–কিন্তু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। ঐ তিনটি যুদ্ধ ছিল- খন্দক, মক্কা বিজয় ও হোনাইন। ঐ সময় ফেরেস্তাদের পাগড়ী ছিল যথাক্রমে কাল এবং সবুজ। সুতরাং মানুষের পাগড়ী সাদা, কালো অথবা সবুজ হওয়া উত্তম। ফিরিস্তাদের অনুসরনের নামও ইবাদত–যদি নবীজীর অনুমোদন থাকে।

যুদ্ধে দুই কিশোরের অংশ গ্রহণ ঃ

বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য মোআয ও মোআওয়ায নামক দু'জন বালক আগ্রহ প্রকাশ করলে নবী করিম (দঃ) তাদের শান্ত্বনা দিয়ে পরবর্তী কোন এক যুদ্ধে তাদের নেয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু তাঁদের একজন পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর করে লম্বা হয়ে দাঁড়ালো। নবী করিম (দঃ) তাঁর আগ্রহ দেখে অভিভূত হয়ে তাঁকে সৈন্যদলে ভর্তি করে নিলেন। এ অবস্থা দেখে অপর সাথী বললো- "সে লম্বা হলে কি হবে, মল্লযুদ্ধে সে আমার সাথে পারবেনা"। এ বলে সে মল্লযুদ্ধে ওকে হারিয়ে দিলো। নবী করিম (দঃ) তাকেও সৈন্যবাহিনীতে নিয়ে নিলেন। এ ছিল তৎকালীন কিশোর বালকদের নবীপ্রেমের নমুনা!

তাঁরা দু'জন যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে নবীজীর দুশমন আবু জাহলকে অনুসন্ধান করতে লাগলো। একজন সাহাবীর মাধ্যমে তাঁরা আবু জাহলকে চিনে নিলো। আবু জাহল ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধের তদারকী করছিলো। বালকদ্বয় বাজপাখীর ন্যায় আবু জাহলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং তার ঘোড়ার পা কেটে ফেললো। আবু জাহল মাটিতে পড়ে গেলো। তাঁরা আবু জাহলকে ক্ষত বিক্ষত করে ফেললো। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) তড়িৎ গতিতে এগিয়ে এসে আবু জাহলের শিরশ্ছেদ করে ফেললেন। এভাবে নবীজীর বড়শত্রু আবু জাহল ছোট দুই বালকের হাতে নিহত হলো। একেই বলে কাঁদায় পড়ে হাতীর মৃত্যু–একেই বলে বালকদের নবীপ্রেম (রুহুল বয়ান)।

[নবীজীর দুশমনদের বিরুদ্ধে কঠোরতা অবলম্বন করাই সত্যিকার ঈমানের পরিচায়ক]

যুদ্ধ শুরুঃ

বদরে প্রথমে মল্লযুদ্ধ শুরু হলো। কোরাইশদের পক্ষে ওত্‌বা, তাঁর ভাই শায়বা এবং ছেলে ওলীদ- এই তিনজন ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে মুসলমানদেরকে মল্লযুদ্ধে

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

আহবান করলো। আনসারগণের মধ্য হতে তিনজন অগ্রসর হলে কোরাইশরা বললো- তোমাদের প্রয়োজন নেই। আমরা চাই আমাদের সমকক্ষ কোরাইশ বীর। নবী করিম (দঃ)-এর ইঙ্গিতে হযরত ওবায়দা (রাঃ), হযরত হাম্‌যা (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) মল্লযুদ্ধে এগিয়ে আস্‌লেন। হযরত হাম্‌যা (রাঃ) এক আঘাতেই শায়বাকে ধরাশায়ী করে ফেললেন। হযরত আলী (রাঃ) অলীদকে দ্বিখন্ডিত করে ফেললেন। হযরত ওবায়দা (রাঃ) ওত্‌বার সাথে মল্লযুদ্ধে পেরে উঠছিলেন না। হযরত হাম্‌যা ও আলী (রাঃ) অগ্রসর হয়ে ওত্‌বার উপর হামলা চালালেন এবং তাকে নিহত করলেন। ওত্‌বার কন্যা আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা পরবর্তী বছর ওহোদ যুদ্ধে এই পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছিলো। সে হযরত হামযা (রাঃ)-এর কলিজা বের করে চিবিয়ে খেয়েছিল এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছেদন করে মালা বানিয়ে গলায় পরেছিল। ফতেহ্ মক্কায় সে মুসলমান হয়।

তিন বীরের ধরাশায়ী হওয়ার দৃশ্য দেখে কোরাইশ বাহিনী ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লো। প্রচন্ড যুদ্ধ আরম্ভ হলো। একদিকে এক হাজার দূর্ধর্ষ যোদ্ধা, অপরদিকে ৩১৩ জন নিরস্ত্র প্রায় মুসলিম বাহিনী।

খেজুরের ডাল তলোয়ার হয়ে গেলো ঃ

উক্ত যুদ্ধে হযরত ওকাশা (রাঃ) নামক জনৈক সাহাবীর তরবারী ভেঙ্গে যায়। নবী করিম (দঃ) তাঁকে খেজুরের একটি শুকনো ডাল দিয়ে বললেন- তুমি এটা দিয়ে যুদ্ধ করো। আল্লাহর কুদ্‌রতে খেজুরের ডাল ইস্পাতের তলোয়ারে পরিণত হয়ে গেলো। এই তলোয়ারের নাম রাখা হয় 'আউন' বা আল্লাহর সাহায্য। হযরত ওকাশা (রাঃ) জীবনভর উক্ত তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। সুবহানাল্লাহ!

[হযরত মুছা (আঃ)-এর হাতের লাঠি হয়েছিল অজগর, আর নবী করিম (দঃ)-এর হাতের পরশে খেজুরের ডাল হলো ইস্পাতের তালোয়ার। এর চেয়েও আশ্চর্যের বিষয় ছিল- নবীজীর পরশে ঈমানশূন্য হৃদয়গুলোও আল্লাহর আরশে পরিণত হয়েছিল।]

ভাঙ্গা হাত জোড়া লাগল ঃ

বদরের যুদ্ধে হযরত মুয়ায ইবনে আমর (রাঃ)-এর একটি হাত আবু জাহলের পুত্র ইকরামার তরবারীর আঘাতে দ্বিখন্ডিত হয়ে যায়। মুয়ায (রাঃ) হাতের খন্ডিত অংশসহ নবী করিম (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন। হুযুর পাক (দঃ) একটু থুথু মোবারক লাগিয়ে খন্ডিত অংশ সংযুক্ত করে দিলেন। সাথে সাথে হাত জোড়া লেগে গেলো। হযরত মুয়ায (রাঃ) উক্ত হাত নিয়ে সুস্থ অবস্থায় হযরত ওস্‌মান (রাঃ)-এর খেলাফতকাল পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

[সাহাবায়ে কেরামের আক্বিদা ছিল- নবী করিম (দঃ) আল্লাহর প্রতিনিধি। তাঁর মধ্যে আল্লাহ তায়ালা অসংখ্য গোপন শক্তি প্রদান করেছেন। তিনি দ্বিখন্ডিত হাত ভাল করতে পারেন। সামান্য খেজুরের ডালকে তলোয়ারে পরিণত করতে পারেন। যারা এই বিশ্বাস রাখে- তারাই আহলে সুন্নাত।]

যুদ্ধের ফলাফল ঃ

বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে ১৪ জন শহীদ হন। তন্মধ্যে ৬ জন মোহাজির এবং আটজন আনসার। অপরপক্ষে কোরাইশ বাহিনীর মধ্যে ৭০ জন নেতৃস্থানীয় লোক নিহত হয় এবং ৭০ জন বন্দী হয়। নিহতদের মধ্যে ছিল আবু জাহল, ওত্বা, অলিদ, শায়বা- প্রমুখ নেতা।

বন্দী ৭০ জনের মধ্যে নবী করিম (দঃ)-এর চাচা আব্বাস, বড় জামাতা আবুল আ'ছ, চাচাত ভাই আকিল এবং নওফেল- এই চারজন ছিলেন নবী করিম (দঃ)-এর আপনজন। বদরের যুদ্ধে কোরাইশরা পর্যূদস্ত হয়ে যায়। যুদ্ধের ময়দানে মালদৌলত ও রসদপত্র এবং অস্ত্র-সস্ত্র ফেলে তারা পলায়ন করে। তাদের মাল-সামান ও ইজ্জত আবরু ধূলায় ভূলুণ্ঠিত হয়ে যায়। তাদের শোচনীয় পরাজয়ে ইসলামের বিজয় ও শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলাম একটি নূতন শক্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। আল্লাহ তায়ালা বদর দিবসকে يَوْمَ الْفُرْقَان **"হক ও বাতিলের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালাকারী দিবস" হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।**

নবীজীর হাতই আল্লাহর হাত ঃ

এই যুদ্ধের শুরুতে নবী করিম (দঃ) এক মুষ্টি কঙ্কর নিয়ে شاهت الوجوه বলে ঐগুলোতে ফুঁক দিয়ে দূর থেকে শত্রুদের দিকে নিক্ষেপ করেন। উক্ত কঙ্কর প্রত্যেক শত্রুসেনার চোখে গিয়ে পড়ে। এতে তারা দিশেহারা হয়ে যায় এবং তাদের দৃষ্টিবিভ্রাট ঘটে। আল্লাহ তায়ালা এই ঘটনা বর্ণনাকালে এরশাদ করেন-

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰي -

"হে রাসুল, আপনি যখন কঙ্কর নিক্ষেপ করছিলেন- তখন আপনি নিক্ষেপ করেননি- মূলতঃ আল্লাহ তায়ালাই নিক্ষেপ করেছেন"। (সুরা আনফাল)।

[এখানে নবী করিম (দঃ)-এর হাতকে আল্লাহ তায়ালা নিজের হাত এবং নবী করিম (দঃ)-এর কঙ্কর নিক্ষেপকে আল্লাহর নিজের নিক্ষেপ বলেছেন। প্রকৃত পক্ষে- নবী করিম (দঃ) ছিলেন আল্লাহ তায়ালার যাত ও সিফাতের প্রকাশস্থল বা মাযহার। নবী করিম (দঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা আপন শক্তি ও

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

কুদরত প্রকাশ করেছেন। "নবীর কথা আল্লাহর কথা, নবীর কাজ আল্লাহর কাজ, নবীর মায়া আল্লাহর মায়া, নবীর নারাযী আল্লাহর নারাযী এবং নবীর সন্তুষ্টি আল্লাহর সন্তুষ্টি বলে বিবেচিত"। তিনি তো আল্লাহর অতি ঘনিষ্ট বন্ধু!

এই পর্যায়কে তরিকতের ভাষায় ফানাফিল্লাহ ও বাকাবিল্লাহ্ (আল্লাহতে লীন হয়ে আল্লাহতে অস্তিত্ববান) বলা হয়। এই স্তরে পৌঁছলে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে কোন্ ভেদাভেদ থাকে না। এই অবস্থায় বান্দা সৃষ্টি জগতে মোতাছারিরফ বা কর্তৃত্ববান হয়ে যান। যাহেরী অবস্থা মানুষের হলেও বাতেনী অবস্থা খোদায়ী গুণে গুণান্বিত হয়ে যায়। (যিয়াউল কুলুব-হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজির মক্কী- পৃষ্ঠা ২৯-৩০ দ্রষ্টব্য)। উল্লেখ্য- হাজী এমদাদুল্লাহ সাহেব ছিলেন আশ্রাফ আলী থানবীর পীর। পীর বলেন কী, আর মুরীদরা বলে কী!]

যুদ্ধ শেষে নবী করিম (দঃ)-এর নির্দেশে ৭০ জন নিহত কোরাইশ নেতার লাশ একটি গর্তে নিক্ষেপ করা হয়। ঐ গর্তকে 'কালীবে বদর' বলা হয়। সমস্ত লাশ নিক্ষেপ করার তিনদিন পর নবী করিম (দঃ) উক্ত কূপ বা গর্তের মুখে দাঁড়িয়ে প্রত্যেক লাশের নাম ধরে ডাক দিলেন এবং বললেন ঃ

يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَيَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ حَقًّا؟ فَإِنِّي وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي اللّٰهُ حَقًّا-

অর্থ-**"হে অমুকের পুত্র অমুক- হে অমুকের পুত্র অমুক! আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (দঃ) তোমাদের পরিণতি সম্পর্কে যে ওয়াদা করেছিলেন-তা কি তোমরা সত্য পেয়েছো? আমার সাথে আল্লাহ যে ওয়াদা করেছিলেন- তা আমি সত্য পেয়েছি"**। (হাদীস)

তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে আরও বললেন ঃ

يَا أَهْلَ الْقَلِيبِ بِئْسَ الْعَشِيرَةُ كُنْتُمْ كَذَّبْتُمُونِي وَصَدَّقَنِي النَّاسُ-

অর্থ-**"হে গর্তবাসীগণ! তোমাদের বর্তমান জীবন কতই না নিকৃষ্ট। যখন অন্যান্য লোকেরা আমাকে সত্য নবী বলে গ্রহণ করেছিল, তখন তোমরা আমাকে মিথ্যা মনে করতে"**। (হাদীস)

মৃতদের শ্রবণ শক্তি ঃ

হযরত ওমর (রাঃ) পাশেই দন্ডায়মান ছিলেন। তিনি আরয করলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি রুহ্বিহীন মৃত লাশের সাথে কিভাবে কথা বলছেন? তারা কি

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

আপনার কথা শুনে? নবী করিম (দঃ) এরশাদ করলেন–

مَا اَنْتُمْ بِاَسْمَعَ مَا اَقُوْلُ مِنْهُمْ غَيْرَانَّهُمْ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ اَنْ يَّرُدُّوْا شَيْئًا -

অর্থ–**"আমি যা বলছি–তোমরা তাদের চেয়ে বেশী শুনতে পাচ্ছ না। কিন্তু কোন জবাব দেয়ার শক্তি এদের নেই"** (বুখারী)। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিদের শ্রবণ শক্তি জীবিতদের চেয়ে বেশী, কিন্তু জবাব দেবার শক্তি তাদের দেয়া হয়নি। এটাই সুন্নি আক্বিদা।

[এই হাদীসখানা সহিহ্ বোখারীতে বর্ণিত। এই হাদীসের দ্বারাই মৃত ব্যক্তিগণ কর্তৃক জীবিত ব্যক্তিদের কথাবার্তা শ্রবণের প্রামানিক দলিল পাওয়া যায়। মৃত কাফেরগণকে যদি এই শ্রবণ শক্তি দেয়া হয়, তাহলে মুসলমান ওলী, গাউছ ও কুতুবগণের শ্রবণ শক্তি যে আরো কত বেশী– তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ইমাম গাযালী (রাঃ), মোল্লা আলী ক্বারী এবং আল্লামা মানাভী তাদের নিজ নিজ গ্রন্থ– যথাক্রমে ইহ্ইয়াউল উলুম, মিরকাত ও তাইছির-এ বর্ণনা করেছেন–

اِذَا تَجَرَّدَتِ النُّفُوْسُ الْقُدْسِيَّةُ عَنِ الْعَلَائِقِ الْبَدَنِيَّةِ اِتَّصَلَتْ اِلَى الْمَلَاءِ الْاَعْلٰى وَتَسِيْرُ فِىْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حَيْثُ تَشَاءُ وَتَرٰى وَتَسْمَعُ الْكُلَّ كَالْمُشَاهِدِ -

অর্থ–**"পবিত্র আত্মাসমূহ (ওলী আল্লাহ্) যখন দেহ-পিঞ্জরমুক্ত হয়ে যায়–তখন উর্দ্ধজগতের ফেরেস্তাদের সাথে মিশে যায় এবং আসমান-জমিনের বিভিন্ন স্থানে যেখানে ইচ্ছা– তাঁরা ভ্রমণ করতে পারেন এবং জীবিত ব্যক্তিদের ন্যায়ই তাঁরা সব কিছু দেখতে ও শুনতে পান"**। (মিরকাত)

[পাখীরা খাঁচার বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে যেভাবে মুক্ত বিহঙ্গের মত যথায় ইচ্ছা ভ্রমণ করতে পারে, তদ্রুপ পবিত্র আত্মাগণও মুক্ত বিহঙ্গের মতই দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অধিক শক্তি নিয়ে যথায় ইচ্ছা চলাচল করতে পারেন। এর বিস্তারিত বিবরণ আল্লামা জালালুদ্দীন ছুয়ুতি কৃত 'শরহে সুদূর' এবং ইমাম কুরতুবীর "আত–তাযকিরাহ" গ্রন্থে দেখুন।] আমার লিখিত নূতন কিতাব "হায়াত মউত ও কবর হাশর"–এ কবরী যিন্দেগী বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

রমযান মাসের ১৭ তারিখেই যুদ্ধ শেষ হয়। যুদ্ধের ১৩ দিন পর শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখে নবী করিম (দঃ) নিজ পালিত পুত্র হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ) কে যুদ্ধজয়ের সু-সংবাদসহ মদিনায় প্রেরণ করেন। যায়েদ (রাঃ) মদিনায় এসে দেখেন, নবী-তনয়া হযরত রোকাইয়া (রাঃ) কে দাফন করে লোকেরা হাত

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

মুখ ধূয়ে সবেমাত্র ঘরে ফিরেছেন। হযরত ওসমান (রাঃ) কে নবী করিম (দঃ) মদিনায় রেখে গিয়েছিলেন–অসুস্থ কন্যাকে সেবা সুশ্রূষা করার জন্য। এছাড়া আরও সাত জনকে মদিনায় থাকার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। তাঁরা সবাই বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী হিসাবে গণ্য হন এবং গণিমতের মালের অংশ লাভ করেন।

যুদ্ধবন্দীদের সাথে ব্যবহার– নবীজীর এলমে গায়েব প্রকাশ ঃ

নবী করিম (দঃ) যুদ্ধবন্দীসহ মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন। যুদ্ধবন্দীগণকে মসজিদে নববী সংলগ্ন স্থানে খুঁটিতে বেঁধে রাখা হয়। নবী করিম (দঃ)-এর চাচা হযরত আব্বাস-এর গায়ে জামা ছিলনা। তিনি শীতে কাঁপছিলেন। মোনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই নিজস্ব লম্বা জামা হযরত আব্বাসকে পরিধানের জন্য দান করে। এর বিনিময়ে নবী করিম (দঃ) তার মৃত্যুর পর নিজের জামা মোবারক তার কাফনের জন্য দান করে দেনা পরিশোধ করেন। এটা ছিল সৌজন্যমূলক বিনিময়। সুতরাং এর দ্বারা সে পরকালে উপকৃত হবেনা। হাঁ, মোমেনগণ যদি তাবাররুক হিসাবে নবী করিম (দঃ)-এর কোন পবিত্র জিনিস কাফনের সাথে নিয়ে যান– তবে অবশ্যই তা নাজাতের উছিলা হিসাবে গণ্য হবে। অনেক সাহাবীকে হুযুরের কিছু নিদর্শন তাঁদের কাফনের ভিতরে দিয়ে দাফন করা হয়েছিল।

তখনও পর্যন্ত যুদ্ধবন্দী সম্পর্কে কোন আয়াত নাযিল হয়নি। তাই নবী করিম (দঃ) পরামর্শ সভা আহবান করেন এবং সাহাবীগণের মতামত জানতে চান। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন– "নবী ও ইসলামের দুশমনদের কতল করা উচিত এবং আমাদের নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনকে নিজের হাতে কতল করা উচিত। আমার নিজ মামা হেশামকে আমার নিজ হাতে কতল করতে চাই। আলী তাঁর ভাই আকিলকে হত্যা করুক। হামযা তাঁর ভাই আব্বাসকে কতল করুক"। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) আরয করলেন–"যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ আদায় করে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হোক–এতে মানবিক উদারতা ও যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ-উভয় দিকই রক্ষা পাবে"।

নবী করিম (দঃ) হযরত আবু বকরের (রাঃ) মতামত পছন্দ করে সামর্থবান বন্দীদের নিকট থেকে ২০ উকিয়া–মতান্তরে ৪০ উকিয়া করে জনপ্রতি ক্ষতিপূরণ আদায় করে ছেড়ে দেন এবং অসমর্থ যুদ্ধবন্দীদেরকে মুসলমানদের গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করেন। পৃথিবীর মানুষ হতবাক হয়ে যুদ্ধের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মত প্রত্যক্ষ করলো– **"নবী করিম (দঃ) যুদ্ধবন্দীদেরকে ওস্তাদের সম্মান প্রদান করেছেন"। এই উদারতার নযির একমাত্র ইসলামেই পাওয়া যায়।**

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

[ওহী নাযিলের পূর্বে এই পরামর্শ নেয়া হয়েছিল। কেননা, যুদ্ধবন্দীর ব্যাপারে শারয়ী বিধান বদর যুদ্ধের পরে নাযিল হয়। আল্লাহ তায়ালা এ ঘটনায় হযরত ওমর (রাঃ)-এর কঠোরতাকে পছন্দ করেছিলেন এবং অন্য সাহাবীদের পরামর্শের খারাপ পরিণতির ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। কিন্তু নবীজীর খাতিরে পরবর্তী সময়ে ছুরা মুহাম্মদ ৪নং আয়াত দ্বারা মুক্তিপণ গ্রহণকে বৈধ ঘোষণা করেছেন। পূর্ণ আয়াতটি হলো–

فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ۔ حَتّٰى اِذَآ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ
فَشُدُّوا الْوَثَاقَ۔ فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَآءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ۔

অর্থ–**"অতঃপর তোমরা যখন কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও–তখন তাদের গর্দান মারো। অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাভূত করবে–তখন তাদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেলো। অতঃপর যুদ্ধ শেষে–হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, নাহয় তাদের নিকট থেকে মুক্তিপণ লও"**। (ছুরা মুহাম্মদ ৪ আয়াত)

নবীবিদ্বেষীরা সুরা আনফালের ৬৭ নম্বর সতর্ককারী রহিতকৃত আয়াতকে পুঁজি করে নবীজীর শানে আঘাত করে থাকে।]

প্রথমেই হযরত আব্বাছের ওপর মুক্তিপণ ধার্য ঃ

এবার মুক্তিপণ আদায়ের পালা। নবী করিম (দঃ) প্রথমে আপন চাচা আব্বাস (রাঃ), জামাতা আবুল আছ, চাচাতো ভাই আকিল ও নওফেল– এই চারজন দিয়ে শুরু করেন।

নবী করিম দঃ)-এর নিজ কন্যা হযরত জয়নাব তাঁর মা হযরত খাদিজা (রাঃ) কর্তৃক উপঢৌকন স্বরূপ প্রদত্ত গলার হারখানা স্বামীর মুক্তির জন্য পাঠিয়ে দিলেন। নবী করিম (দঃ) অশ্রুস্বজল নেত্রে হারখানা উলটিয়ে পালটিয়ে দেখছিলেন এবং বিবি খাদিজা (রাঃ)-এর কথা স্মরণ করে কাঁদছিলেন। সাহাবাগণ বিবি খাদিজা (রঃ)–এর সম্মানে বিনা পণে আবুল আছকে মুক্তি দিতে অনুরোধ করলেন। নবী করিম (দঃ) গলার হার ফেরত দিয়ে মুক্তিপণ স্বরূপ হযরত জয়নবকে মদিনায় পাঠিয়ে দেয়ার শর্তে জামাতাকে মুক্তি দেন। অপর দু'জন আকিল ও নওফেল–এর উপর মাথাপিছু ২০ উকিয়া করে ৪০ উকিয়া– মতান্তরে ৪০ উকিয়া করে ৮০ উকিয়া এবং আব্বাসের একার উপর ৮০ উকিয়া ধার্য্য করে মোট ১৬০ উকিয়া স্বর্ণমুদ্রা মুক্তিপণ ধার্য্য করেন এবং হযরত আব্বাছ (রাঃ)-এর উপর এই মুক্তিপণ আদায়ের নির্দেশ দান করেন। (এক উকিয়া ৪০

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

দীনারের সমান–প্রতি দিনার সাড়ে বার টাকার সমান–যার (এক উকিয়া) মূল্য তৎকালীন ৫০০ টাকা)। এই হিসাবমতে ১৬০ উকিয়ার মূল্যমান দাঁড়ায় তৎকালীন ৫০০X১৬০ = ৮০,০০০/- আশি হাজার টাকা)।

[হযরত আব্বাছ এই বিরাট অংকের কথা শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। তিনি বললেন– "আমি পূর্বে বিশ উকিয়া স্বর্ণ (৮০ দীনার বা এক হাজার টাকা) চাঁদা বাবদ আবু জাহলকে দিয়েছি– যা গণিমতের মাল হিসাবে বর্তমানে আপনার অধিকারে এসেছে। এছাড়া আমার আর কোন সম্পদ নেই–যার দ্বারা ৮০,০০০/- (আশি হাজার) টাকার এত বিরাট অংকের মুক্তিপণ আদায় করতে পারি। নবী করিম (দঃ) বললেন –

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاَيْنَ الْمَالُ الَّذِىْ دَفَنْتَهٗ اَنْتَ وَاُمُّ الْفَضْلِ تَحْتَ اَسْكُفَّةِ الْبَابِ؟ وَقُلْتَ لَهَا اِنْ قُتِلْتُ فَهُوَ لِلصِّبْيَةِ فَقَالَ: وَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ هٰذَا شَيْئٌ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ غَيْرِىْ وَغَيْرُ اُمِّ الْفَضْلِ اِلَّا اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ الخ (بِدَايَةٌ نِهَايَةٌ)

অর্থ–"নবী করিম (দঃ) বললেন– চাচাজান, আপনি মক্কা থেকে আসবার সময় আমার চাচী উম্মুল ফযলের নিকট আশি হাজার টাকা বা ১৬০ উকিয়া স্বর্ণমুদ্রা গচ্ছিত রেখে এসেছিলেন এবং বলেছিলেন–যদি আমি যুদ্ধে মারা যাই, তাহলে এগুলো আমার সন্তানদের ভরণ পোষনের জন্য ব্যয় করবে। আমার চাচী এবং আপনি উক্ত স্বর্ণ মুদ্রাগুলো ঘরের দরজায় গোপন কুঠরিতে লুকিয়ে রেখেছিলেন। ঐ মুদ্রাগুলো কোথায়?"। তখন হযরত আব্বাছ (রাঃ) বললেন– "ঐ মালের খবর আল্লাহর পরে আমিও আমার স্ত্রী উম্মুল ফযল ছাড়া আর কেউ জানেনা– আপনি অন্ধকার রাত্রির এই ঘটনা জানলেন কী করে? হুযুর (দঃ) বললেন–এই গায়েবী খবর আল্লাহ আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন"। তাই আমি ঐ গচ্ছিত পরিমান মালই চেয়েছি-এর বেশী চাইনি"।

হযরত আব্বাছ (রাঃ) নবী করিম (দঃ)-এর ইলমে গায়েবের প্রমাণ পেয়ে হতবাক হয়ে গেলেন এবং সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করলেন। কিন্তু ৮ম হিজরীতে ফতেহ্ মক্কা পর্যন্ত তাঁর ইসলাম গ্রহণ গোপন রাখলেন। তিনি মক্কা শরীফ থেকে গোপন তথ্য মদিনায় পাঠাতেন এবং নিজের ঈমান ও নামায–রোযা গোপন রাখতেন। পারলে পড়তেন না পারলে নয়। হুযুর (দঃ) তাঁকে মোশরেকদের সাথে মিলে মিশে থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন।–(শিফা শরীফ ও বেদায়া)। (শেখ সাদী (রহঃ) ৫ বছর সোমনাথ মন্দিরে ব্রাহ্মণবেশে থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সুলতান মাহমুদ গজনবীকে দিয়েছিলেন। এরূপ করা ইসলামী জিহাদের জন্য জায়েয।)

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

[নবী করিম (দঃ)-এর ইলমে গায়েবের প্রমাণ পেয়ে এবং স্বীকৃতি দিয়ে হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর ঈমান নসীব হলো–আর বর্তমানের ওহাবী মওদুদীবাদীরা ইলমে গায়েব অস্বীকার করে ঈমানহারা হলো। মানার নামই তো ঈমান। শুধু জানার নাম ঈমান নয়। কোরাইশ নেতাগণ কোথায় কখন মারা পড়বে, এর অগ্রীম সংবাদ প্রদান করা এবং সুদূর মক্কার অন্ধকার ঘরে লুক্কায়িত মালের সন্ধান দেয়া নবী করিম (দঃ)-এর ইলমে গায়েবের প্রকৃষ্ট দলীল।

ইবনে কাছির ও কাযী আয়ায (রাঃ) নবীজীর এই ইলমে গায়েবকে স্বীকার করেছেন–অথচ আমাদের দেশের জঘন্য জ্ঞানপাপীরা তা স্বীকার-করতে কুণ্ঠিত। দারুস সালামের কথিত ভন্ডপীর আবদুল কাহ্হার ১৯৯৪ সালে প্রকাশ্যে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে ঘোষণা দিয়েছিল– "যারা নবী করিম (দঃ)-এর ইলমে গায়েব আছে বলে বিশ্বাস করবে–তারা কাফির"। আমি ১৯৯৫ সালে এপ্রিল মাসের ১লা তারিখে দৈনিক ইনকিলাবের প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন দিয়ে এই জাহেল পীরকে চ্যালেঞ্জ করেছিলাম–কিন্তু সে মোকাবেলা করেনি। নবীর ইলমে গায়েব অস্বীকার করে সে কুফরীর ফতোয়া মাথায় নিয়ে বর্তমানে কবরে আছে। তার ঘোষণামতে–হযরত আব্বাস (রাঃ), ইবনে কাছির ও কাযী আয়ায (রাঃ) নবীজীর ইলমে গায়েব বিশ্বাস করে কী হয়েছিলেন? নাউযুবিল্লাহ! বে–এলেম পীর সাজলে এমনিভাবেই মানুষকে গোমরাহ্ করে। আল্লাহ বে–এলেম পীর থেকে পানাহ্ দিন। কোন পীর নবীজীর শানে বেয়াদবীমূলক উক্তি করলে সাথে সাথে তাকে ত্যাগ করা ফরয। শরীয়তমতে তাকে কতল করা ওয়াজিব। (ফতোয়া শামী)

ইমামে রাব্বানীর ফতোয়া

হযরত মোজাদ্দেদ আলফেসানী (রহঃ) তাঁর মকতুবাত শরীফের প্রথম খন্ড ৩১০ নম্বর মকতুবে লিখেন– (ফারছী ....)

অনুবাদ ঃ **"যে ইলমে গায়েব আল্লাহ্ তায়ালার জন্যে খাছ–তৎসম্পর্কে তিনি তাঁর বিশেষ বিশেষ রাসুলগণকে অবহিত করে থাকেন"।**

উল্লেখ্য যে, আল্লাহর খাছ ইলমে গায়েব ৫টি। যথা ঃ কেয়ামত কবে হবে, কখন বৃষ্টি হবে, মায়ের পেটে কি সন্তান আছে, কার রিযিক কোথায় এবং কার মৃত্যু কোথায়? উক্ত ৫টি ইলমে গায়েব সম্পর্কেও আমাদের প্রিয় নবী (দঃ) অবহিত রয়েছেন (ছুরা জ্বীন)। অথচ আব্দুল কাহ্হার ফতোয়া দিলেন- "যারা নবী করিম (দঃ)-এর ইলমে গায়ব বিশ্বাস করে–তারা কাফের"। তার ফতোয়ামতেই তার তরিকার ইমামে রাব্বানী (রহঃ) কাফের সাব্যস্ত হয়ে যাচ্ছেন। (নাউযুবিল্লাহ!) সূত্র ঃ শর্ষিনার তাবলীগ পত্রিকা ১৯৭০ইং মে সংখ্যা। আল্লাহ প্রদত্ত নবীজীর ইলমে গায়েব স্বীকার করে না একমাত্র মউদূদ... ...ওবন্দপন্থীরা।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

পঁয়ত্রিশতম অধ্যায়

ওহোদ যুদ্ধ

প্রসঙ্গ ঃ মুসলমানদের বিজয় সত্ত্বেও সাময়িক বিপর্যয়, তিনটি মো'জেযা প্রকাশ

বদরের যুদ্ধের ১৩ মাস পর তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসের ১১ বা ১৪ তারিখ শনিবার ওহোদের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। বদরের যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলার জন্য কোরাইশরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল। মহিলারা পুরুষদেরকে ধিক্কার দিতে লাগলো। তারা সাজ সজ্জা ত্যাগ করে মাতমজারীতে মগ্ন হলো। আবু সুফিয়ান বদরের যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য ইতিপূর্বে একবার মদিনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে দু'শো কোরাইশ বাহিনী নিয়ে মদিনার তিন মাইল দূরে ওরাইজ নামক স্থানে পৌঁছে একজন আনসার মুসলমানকে শহীদ করে এবং খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দিয়ে পালিয়ে আসে। নবী করিম (দঃ) দু'শ সাহাবী নিয়ে আবু সুফিয়ানকে ধাওয়া করলে সে সসৈন্যে পালিয়ে যায় এবং গমের বস্তা রাস্তায় রাস্তায় ফেলে যায়। এজন্য এ অভিযানের নাম দেয়া হয় ছাভিক বা ছাতুর যুদ্ধ। বদরের যুদ্ধের গ্লানি আবু সুফিয়ানকে আরও পাগল করে তুলে। সে এর প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত নারী ও তৈল স্পর্শ করবেনা বলে প্রতিজ্ঞা করে।
এদিকে মদিনার ইহুদী ও মোনাফিকরা হুযুরের সাথে মদিনা চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে গোপনে মক্কায় এসে আবু সুফিয়ানকে উত্তেজিত করে তুললো। মদিনা আক্রমণ করলে তারা সাহায্যেরও আশ্বাস দিলো। মক্কায় যুদ্ধ প্রস্তুতির সাজ সাজ রব পড়ে গেলো। মহিলারা অশ্লীল গান গেয়ে পুরুষদেরকে ক্ষেপাতে লাগলো।

কুরাইশরা তিন হাজারের দূর্ধর্ষ বাহিনী নিয়ে মদিনার দিকে রওয়ানা দিল। সাথে মহিলারা গান গাইতে গাইতে অগ্রসর হলো। আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে এবং খালেদ ইবনে ওয়ালীদের সেনাপতিত্বে কোরাইশ বাহিনী ওহোদের পাদদেশে 'বাতনে ওয়াদী' নামক স্থানে একত্রিত হলো। হযরত আব্বাছ (রাঃ)- যিনি বদরের যুদ্ধে ধৃত হয়ে নবী করিম (দঃ)-এর এলমে গায়েবের পরিচয় পেয়ে মুসলমান হয়ে গোপনে মক্কায় অবস্থান করছিলেন- তিনি কোরাইশদের এই সংবাদ পূর্বাহ্নেই গোপনে মদিনায় নবীজীর দরবারে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন।

নবী করিম (দঃ) সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ সভায় বসলেন। বদরের যুদ্ধের আলোকে নবী করিম (দঃ) এবার মদিনা শহরে থেকেই দুশমনকে প্রতিরোধ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। কিন্তু যুবক শ্রেণীর আনসারগণ আরব

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

করলেন- "তারা আমাদের মাথার উপর চড়াও হয়ে আক্রমণ করবে-আর আমরা ঘরে বসে যুদ্ধ করবো-তা কী করে হয়? তারা আমাদেরকে কাপুরুষ বলে আখ্যায়িত করবে। এর চেয়ে ভাল হয়- যদি আপনি আমাদের নিয়ে শহরের বাইরে গিয়ে তাদের মোকাবিলা করেন"। **নবী করিম (দঃ) বললেন-তাহলে "ছাবয়ীন বি-ছাবয়ীন" অর্থ্যাৎ- বদরের ৭০ কোরাইশের বদলে ৭০ মুসলমানের শাহ্াদাত হতে পারে।** এভাবে হুযুর (দঃ) ওহোদের ক্ষয়ক্ষতির কথা পূর্বেই বলে দিয়েছিলেন। এটাই তাঁর ইলমে গায়েবের প্রমাণ। কিন্তু ওহাবীরা বলে-হুযুর জানতেন না।

যুবকরা এতেও রাযী দেখে নবী করিম (দঃ) তাদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। শুক্রবার দিন জুমার নামাযান্তে এক ভাষণে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির নির্দেশ দিয়ে সাথে সাথে আল্লাহর সাহায্যেরও আশ্বাস প্রদান করলেন। এতে যুবকরা খুশী হয়ে গেলেন। নবী করিম (দঃ) হুজ্‌রা মোবারকে গিয়ে যুদ্ধের পোষাক পরিধান করে বের হয়ে আসলেন। বয়স্ক সাহাবীগণ নবী করিম (দঃ)-এর প্রথম পরামর্শের যথার্থতা অনুধাবন করে আরয করলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাদের যুবকরা প্রকৃত অবস্থা গভীরভাবে চিন্তা না করেই জোশের সাথে যা বলে ফেলেছে, সেজন্য আমরা দুঃখিত। আপনার ইচ্ছামতই আপনি ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। নবী করিম (দঃ) এরশাদ করলেন- **"যুদ্ধের পোষাক পরিধান করে আবার খুলে ফেলা কোন নবীর পক্ষে শোভনীয় নয়। নবী এবং তাঁর দুশমনদের মধ্যে আল্লাহর যা ইচ্ছা- তাই তিনি ফয়সালা করবেন"**।

[এই বাণীর মধ্যে যুদ্ধের পরিণাম সম্পর্কে অতি সুক্ষ্ম ইঙ্গিত ছিল। ইহাই এলমে গায়েব। যুবকদের উদ্দেশ্যে "৭০ এর বিনিময়ে ৭০" বলার মধ্যে ছিল ওহোদ যুদ্ধের পরিণাম সম্পর্কে পরিষ্কার ইঙ্গিত। ওহাবীরা বলে- নবীজী যুদ্ধের পরিণাম জানলে যুদ্ধে যেতেন না। এটা তাঁদের অজ্ঞতারই পরিচয়।]

পরদিন সকালে অতি প্রত্যূষে ফজরের নামায সমাপ্ত করে নবী করিম (দঃ) এক হাজার সৈন্য নিয়ে মদিনার তিন মাইল উত্তরে ওহোদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। মোহাজির ডিভিশনের পতাকা দিলেন হযরত আলী (রাঃ)-এর হাতে। আনসারগণকে দুই ডিভিশনে বিভক্ত করে খাযরায গোত্রের পতাকা দিলেন হোবাবা ইবনে মুন্‌যের (রাঃ)-এর হাতে এবং আউছ ডিভিশনের পতাকা দিলেন উসায়দ ইবনে হোযায়ের (রাঃ)-এর হাতে। অগ্রগামী দলের নেতৃত্ব দিলেন

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

সাআদ ইবনে মুয়ায ও সাআদ ইবনে উবাদা (রাঃ)। মদিনার দায়িত্ব দিয়ে গেলেন অন্ধ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ)-এর উপর।

মধ্যপথ হতে মোনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তার তিনশ অনুসারী নিয়ে সটকে পড়লো এবং বললো- আমাদের পরামর্শ গ্রহণ না করে নবী করিম (দঃ) এতবড় ঝুঁকিপূর্ণ যুদ্ধের ময়দানে মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন- সুতরাং আমরা এর সাথে নেই। অদের এই শঠতা ও হঠকারিতা ছিল পূর্ব পরিকল্পিত। তার উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়া এবং শত্রুকে উৎসাহিত করা। যেমন করেছিল মীর জাফর পলাশীর ময়দানে।

অবশিষ্ট ৭০০ মুসলমান প্রথমে ঘাবড়ে গেলেও নবী করিম (দঃ)-এর আশ্বাসবাণী এবং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে তাঁদের দিলে প্রশান্তি নাযিল-এই দুই জিনিস তাঁদের মনোবল ফিরিয়ে আন্‌তে সাহায্য করলো। গোজামিলের চেয়ে গরমিল অনেক ভাল। যুগেযুগে মুসলমানদের মধ্য হতেই কিছু সংখ্যক মোনাফেক লোক মুসলমানদের চরম ক্ষতি সাধন করে থাকে। ওহোদের ময়দানে মোনাফেকরা নিজেদেরকে মুসলমানের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে ফেলে।

যুদ্ধ শুরু ঃ

নবী করিম (দঃ) ওহোদের মূল ভূমিতে ওহোদ পাহাড়কে পিছনে রেখে সৈন্য বাহিনী মোতায়েন করলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ)-এর নেতৃত্বে ৫০ জনের তীরন্দাজ বাহিনীকে পাহাড়ের চূড়ায় মোতায়েন করা হলো। **নবী করিম (দঃ) তাঁদের প্রতি নির্দেশ দিলেন "জয় পরাজয়-কোন অবস্থাতেই তোমরা আপন স্থান ত্যাগ করবেনা- যে পর্যন্ত না আমি নির্দেশ দেই। এমনকি- আমাদেরকে শহীদ হতে দেখ্‌লেও সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবেনা। বিজয়ের পর গনিমতের মাল সংগ্রহ করতে দেখেও তোমরা আপন স্থান ত্যাগ করবেনা"** (মাওয়াহেব)।

প্রথমে বিজয় ঃ

কোরাইশ বাহিনীর নেতৃত্বে খালিদ ও ইকরামা তাদের সৈন্য মোতায়েন করলো "ছাব্‌খা" নামক স্থানে। উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ শুরু হলো। মোশরেকদের পক্ষে ২৩ জন নিহত হলো। আল্লাহর সাহায্যে মুসলমানগণ প্রথমে বিজয়ী হলো। কাফেরগণ পলায়ন করতে লাগল। কোরাইশ মহিলারা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

মুসলমানগণ কোরাইশ বাহিনীর পশ্চাদধাবন করলেন। তাদের ফেলে যাওয়া মাল সম্পদ ও অস্ত্রসস্ত্রসহ গনিমতের মাল সংগ্রহ করতে লাগলেন।

মধ্যখানে বিপর্যয় ঃ

সুস্পষ্ট বিজয় দেখে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়োজিত তীরন্দাজ বাহিনীর ৫০ জনের মধ্যে ৪২ জন নীচে নেমে এসে গনিমতের মাল সংগ্রহ করতে লেগে গেলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবাইর (রাঃ)-এর সাথে মাত্র ৭ জন লোক নিজ নিজ দায়িত্বে অটল রইলেন।

দূর থেকে সুচতুর খালিদ বিন ওয়ালিদ এ অবস্থা দেখে পাহাড়ের ঘাঁটি অরক্ষিত পেয়ে বিদ্যুৎ বেগে ওহোদের পেছন দিক দিয়ে আক্রমণ করে বসলো এবং অবশিষ্ট ৮ জন তীরন্দাজকে শহীদ করে ফেললো। যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেলো। মুসলমানগণ এই আক্রমণে দিশেহারা হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগলো। কাফেরদের আক্রমণে ৭০ জন সাহাবী শহীদ হয়ে গেলেন। স্বয়ং নবী করিম (দঃ) শত্রুদের তীরের আঘাতে জর্জরিত হয়ে গেলেন। এই বিপর্যয়ের কারণ ছিল হুযুর (দঃ)-এর সুস্পষ্ট নির্দেশ ভুলক্রমে লঙ্ঘন করা।

হুযুর (দঃ)-এর মুখের নিম্নপাটির সম্মুখভাগের দুটি দান্দান মোবারক কিয়দাংশ শহীদ হয়ে গেল। মাত্র ১৪ জন সাহাবী নবী করিম (দঃ)-এর সাথে ছিলেন। নবী করিম (দঃ)-এর মুখ মোবারক থেকে যখন খুন বয়ে যাচ্ছিলো, তখন আবু ছায়ীদ খুদরী (রাঃ)-এর পিতা মালেক ইবনে সিনান (রাঃ) জখমী জায়গায় মুখ লাগিয়ে খুন মোবারক চুষে খেয়ে ফেললেন- জমিনে পড়তে দিলেন না। তাঁর এই ভালবাসা দেখে নবী করিম (দঃ) এরশাদ করলেন ঃ

مَنْ مَسَّ دَمِيْ دَمَهُ لَمْ تُصِبْهُ النَّارُ -

অর্থ–**"আমার রক্ত যার রক্তের সাথে মিশেছে-তাকে জাহান্নাম স্পর্শ করবেনা"**

এ হাদীস থেকে মোজতাহিদগণ নবী করিম (দঃ)-এর বদন মোবারক থেকে নির্গত যাবতীয় বর্জ বস্তুকে পাক পবিত্র বলে ফতোয়া দিয়েছেন।

উক্ত যুদ্ধে এক আনসারী মহিলার পিতা, ভাই ও স্বামী- তিনজনই শহীদ হন। মহিলা ওহোদের ঘটনা শুনে-বিশেষতঃ নবী করিম (দঃ)-এর শাহাদাতের ঘটনা শুনে যুদ্ধের ময়দানের দিকে দৌড়াতে লাগলেন। পথিমধ্যে মোজাহিদদের নিকট নিজ পিতা, ভ্রাতা ও স্বামীর শাহাদতের খবর শুনে শুধু "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন" পড়ে নবী করিম (দঃ) সুস্থ আছেন কিনা- তা জানতে

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

চাইলেন। অবশেষে নবী করিম (দঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন- "ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি জীবিত ও সুস্থ থাক্লেই আমি সব শোক ভুলে যাবো"। একেই বলে নবী প্রেমের বাস্তব নমুনা।

ওহোদের যুদ্ধে আহত ছয়জন সাহাবী পানি পানি করে কাত্রাচ্ছিলেন। যখন তাঁদের প্রথমজনকে পানি পান করতে দেয়া হলো- তখন তিনি বললেন, আমার পাশের ভাইকে আগে পানি দিন, তিনি বেশী আহত। এভাবে ছয়জনই অপরজনকে আগে পানি পান করানোর অনুরোধ করলেন। কিন্তু কেহই পানি পান করতে পারলেন না। সবাই শহীদ হয়ে গেলেন। এ ছিল সাহাবাগণের পরস্পরের প্রতি আত্ম-ত্যাগের নমুনা।

আমাদের ঈমানী শক্তি ক্রমেই দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। আমরা আজ মৃত ভাইয়ের মাংস পর্যন্ত তুলে নিচ্ছি। একজন আর একজনকে ওভারটেক করছি। গাড়ীর ওভারটেকিং অপরাধ বলে গণ্য হলেও মানুষ ওভারটেকিংকে কোন অপরাধ বলেই মনে করছি না। সর্বত্রই এই অবস্থা। এই প্রবণতা আমাদেরকে মানবিক মূল্যবোধ থেকে অনেক অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ওহোদের যুদ্ধে ওত্বার গোলাম ওয়াহ্শীর বর্শার আঘাতে হযরত হামযা (রাঃ) শহীদ হন। তাঁর শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে হিন্দা গলার মালা বানায় এবং কলিজা বের করে চিবাতে থাকে। পরবর্তীতে মক্কা বিজয়ের দিন এই মহিলা মুসলমান হয়ে যান। ওয়াহ্শীও মুসলমান হন। তবে নবী করিম (দঃ) তাদেরকে ভবিষ্যতে তাঁর সামনে আসতে নিষেধ করে দেন। এই ওয়াহ্শী হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে মোরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মোসায়লামা কাযযাবকে নিহত করে পূর্ব অপরাধের কিছুটা ক্ষতিপূরণ করেন।

ওহোদের যুদ্ধে প্রথমে মুসলমানদের বিজয় হলেও মধ্যখানে বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। এর একমাত্র কারণ- হুযুর আকরাম (দঃ)-এর সুস্পষ্ট নির্দেশ ভূলক্রমে লংঘন- যদিও তা ছিল সাহাবীগণের ইজতিহাদী ভুল। পরবর্তীকালে মুসলমানগণ আর কখনও এমন ভুল করেননি। আমরা আজ নবী করিম (দঃ)-এর অসংখ্য নির্দেশ লংঘন করছি। তাই আমরা সংখ্যায় বেশী হয়েও ইহুদী-খৃষ্টান-হিন্দু প্রভৃতি বিজাতীর হাতে সর্বত্র মার খাচ্ছি। এর সংশোধন না হলে অবস্থার পরিবর্তন হবে না।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ওহোদের যুদ্ধে তিনটি মোজেযা

প্রথম ঘটনাটি হলো ঃ নবী করিম (দঃ)-এর ফুফাতো ভাই ও সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে জাহাশ (রাঃ)- যিনি বিবি যয়নাব (রাঃ)-এর সহোদর ভাই ছিলেন। তাঁর তরবারীটি যুদ্ধ করতে করতে ভেঙ্গে যায়। নবী করিম (দঃ) বিকল্প কোন তরবারী না পেয়ে একটি শুক্‌না খেজুরের ডাল তাঁর হাতে দিয়ে এর দ্বারাই যুদ্ধ করতে বললেন। খেজুর ডালাটি তরবারীতে পরিণত হয়ে গেলো। ঐ তরবারীর নাম রাখা হলো "উরজুন"। যুদ্ধে তিনি শহীদ হলে ঐ তরবারীটি তাবাররুক হিসাবে সংরক্ষণ করা হয়। বাগদাদের আব্বাসীয় ৮ম খলিফা মো'তাসিম বিল্লাহর জনৈক বেগা তুর্কী আমীর উক্ত তরবারীটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ)-এর উত্তরাধিকারীগণের নিকট থেকে দু'শো দীনার দিয়ে খরিদ করে সংরক্ষণ করেন। হযরত আমির হামযা (রাঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ (রাঃ) কে ওহোদ ময়দানে একই কবরে দাফন করা হয়। তাঁরা উভয়ে মামা-ভাগ্নে ছিলেন।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হলো ঃ ওহোদের যুদ্ধে হযরত কাতাদাহ্ ইবনে নো'মান (রাঃ)-এর একটি চক্ষু শত্রুর তীরের আঘাতে খসে পড়ে গালের উপর লটকাতে থাকে। তিনি চোখটি হাতে নিয়ে নবী করিম (দঃ)-এর খেদমতে এসে আরয করলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার ঘরে নতুন স্ত্রী রয়েছে। আমার চোখটি থাকা খুবই প্রয়োজন। আপনি মেহেরবানী করে আমার চোখটি ভাল করে দেন। নবী করিম (দঃ) ইরশাদ করলেন- **"চোখ চাও-না বেহেস্ত চাও? চোখ শহীদ হলে বেহেস্ত পাবে"। হযরত কাতাদাহ্ (রাঃ) আরয করলেন- "চোখও চাই, বেহেস্তও চাই"। বেহেস্ত দেবেন আল্লাহ, আর চোখটি ঠিক করে দেবেন আপনি"।** (বেদায়া ও যিকরে জামীন)

নবী করিম (দঃ) তার আবেদনে খুশী হয়ে গেলেন। তিনি সামান্য থুথু মোবারক লাগিয়ে ঝুলন্ত চোখটি যথাস্থানে বসিয়ে দিলেন- আর এই বলে দোয়া করলেন اَللّٰهُمَّ اكْسُهُ جَمَالًا - **"হে আল্লাহ! তার চোখটি সুন্দরভাবে ফিট করে বসিয়ে দাও"।** সাথে সাথেই চোখটি জোড়া লেগে গেলো। উভয় চোখের মধ্যে এই চোখটি উত্তম ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন ছিল। কেননা, আল্লাহর কুদরত-তথা প্রাকৃতিক নিয়মের সাথে নবী করিম (দঃ)-এর মো'জেযা সংযুক্ত হলে তা ডবল গুণসম্পন্ন হয়।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

তৃতীয় ঘটনাটি হলো– হযরত হান্‌যালা (রাঃ) নব বিবাহিত ছিলেন। শেষ রাত্রে যুদ্ধের ঘোষণা শুনেই তিনি বে-খেয়ালে নাপাক অবস্থায় যুদ্ধে বের হয়ে গেলেন। নবী প্রেমের আকর্ষণে তিনি সব মোহ ভুলে গেলেন। এই অবস্থায়ই তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। তাঁর নব পরিণীতা স্ত্রী যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে নবী করিম (দঃ) কে ঘটনা খুলে বললেন এবং তাঁকে ফরয গোসল দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। শহীদগণকে রক্তমাখা অবস্থায়ই বিনা গোসলে কাফন দাফন করতে হয়। গোসল দেয়ার নিয়ম নেই। এ অবস্থায়ই তাঁরা হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবেন। লোকেরা হযরত হানযালার লাশ মোবারক তালাশ করে পেলেন না। নবী করিম (দঃ) ইরশাদ করলেন ঃ **"হানযালাকে ফেরেস্তারা আকাশে নিয়ে বেহেস্তের পানি দ্বারা গোসল দিয়ে পুনঃ ফিরত নিয়ে আসছে"**। সোব্‌হানাল্লাহ!

নবীর প্রকৃত আশেকগণ এমনিভাবেই সম্মানিত হয়ে থাকেন। নবী করিম (দঃ)-এর সাহাবীগণ এবং আশেকগণের জন্য কাল হাশরের দিনে পুলছিরাতের উপরে হযরত জিব্রাইল (আঃ) ছয়শত নূরের পাখা বিছিয়ে দেবেন। আল্লাহ বলেছেন–

هٰذَا لِمَنْ صَحِبَكَ وَاَهْلِ مَحَبَّتِكَ.

"জিব্রাইলের পাখার উপর দিয়ে গমন করার এই সম্মান আপনার আশেকান ও সাহাবীগণকে দান করা হবে" (আল হাদীসুল কুদসী-মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া ও আনোয়ারে মোহাম্মদীয়া)।

নবী করিম (দঃ) যখন ৭০ জন শহীদকে দেখলেন, তখন তিনি কেঁদে ফেললেন এবং ভাব গদগদ কণ্ঠে ইরশাদ করলেন ঃ **"আমি কাল রোজ হাশরে এঁদের জন্য সাক্ষ্য দেবো। যারা আল্লাহর পথে রক্ত দান করে শহীদ হয়, তাঁরা হাশরের ময়দানে রক্তঝরা অবস্থায় উত্থিত হবে। ঐ রক্তের রং হবে লাল–কিন্তু সুগন্ধ হবে মেশ্‌ক–আম্বরের চেয়েও অধিক"**।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) নবী করিম (দঃ) থেকে বর্ণনা করেন- "তোমাদের ভাইয়েরা যখন ওহোদের ময়দানে শহীদ হলেন- তাঁদের রুহু মোবারক সবুজ পাখীর সুরতে বেহেস্তের নহরের কুলে কুলে বেড়াতে লাগলো এবং বেহেস্তের ফল ভক্ষণ করতে লাগলো। আরশের তলে স্বর্ণের ঝালরবাতির নীচে তারা আশ্রয় গ্রহণ করলো। তাঁরা তাঁদের জন্য সংরক্ষিত এই উত্তম খানা-পিনা ও অবস্থান দর্শন করে বলতে লাগলো ঃ "আমাদের সাথে আল্লাহ তায়ালা যে

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ব্যবহার করলেন– এটা যদি আমাদের দুনিয়ার ভাইয়েরা জান্‌তো–তাহলে তাঁরাও আল্লাহর পথে জেহাদ করতে কুণ্ঠিত হতোনা"। আল্লাহ তায়ালা বললেনঃ আমি তোমাদের এই সংবাদ আমার হাবীবের মাধ্যমে তোমাদের ভাইদের নিকট পৌঁছিয়ে দিচ্ছি। এই পটভূমিকায় আল্লাহ তায়ালা সুরা আলে-ইমরানের ১৭০ নং আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ-

অর্থাৎ– **"যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়, তাদেরকে তোমরা মৃত বলে মনে মনে ধারণাও করোনা–বরং তাঁরা জীবিত এবং আল্লাহর নিকট তাঁরা রিযিক প্রাপ্ত"**। (আলে ইমরান-১৭০) সুরা বাক্বারাতে আছে وَلَا تَقُوْلُوْا অর্থাৎ শহীদগণকে মুখে শহীদ বলো না। আর অত্র আয়াতে বলছেন- মনে মনেও ধারণা করতে পারবে না।

<u>বিঃ দ্রঃ</u> নবীগণকে মৃত বলে ধারণা করাও জঘন্য কুফরী। কেননা, তাঁরা শহীদগণের চেয়েও উত্তম জীবনের অধিকারী। (আক্বায়েদ গ্রন্থসমূহ)। ইহাই সঠিক ইসলামী আক্বিদা। কিন্তু ওয়াহাবীরা বলে–"নবীজী মরে পঁচে গলে মাটির সাথে মিশে গিয়েছেন" (তাকভিয়াতুল ঈমান ও ফতোয়ায়ে রশিদিয়া) নাউযুবিল্লাহ।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ছত্রিশতম অধ্যায়

বনু নযির গোত্রের বিশ্বাসঘাতকতা

প্রসঙ্গ ঃ মদিনা থেকে তাদের বিতাড়ন

মদিনা মোনাওয়ারার শহরতলীতে ইহুদীদের তিনটি গোত্র বাস করতো। তারা হলো- বনু কাইনুকা, বনু নযির ও বনু কোরায়যা। তারা নবী করিম (দঃ)-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল যে- মুসলমান বা ইহুদীদের মধ্যে কেউ যদি অন্য গোত্রের কোন লোককে হত্যা করে, তবে উভয়ে মিলে তার ক্ষতিপূরণ আদায় করবে।

মুসলমানদের মধ্যে আমর ইবনে উমাইয়া দামারী (রাঃ) বনু আমের গোত্রের দু'জন লোককে অন্যায়ভাবে হত্যা করে ফেলে। ঐ নিহত ব্যক্তিদের উত্তরাধিকারীদের ক্ষতিপূরণ দানের জন্য চুক্তি মোতাবেক মুসলমান ও ইহুদী উভয় পক্ষকেই অর্থ বহন করতে হবে। তাই ৪র্থ হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে নবী করিম (দঃ) হযরত আবু বকর, ওমর ও আলী (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে বনু নযির পল্লীতে গমন করেন এবং ক্ষতিপূরণ দানের কাজে তাদের সহযোগিতা চান।

বনু নযির এই সুযোগে নবী করিম (দঃ) কে শহীদ করার চক্রান্ত করে। নবী করিম (দঃ) ও তাঁর সাহাবীগণকে একটি প্রাসাদের প্রাচীরের ছায়ায় বসতে দিয়ে তারা দূর্গের ভিতরে চলে যায় এবং ছাদের উপর থেকে একটি বড় পাথর নিক্ষেপের ব্যবস্থা করে। তাদের মধ্যে ছালাম ইবনে মিশ্‌কাম নামক জনৈক ইহুদী তাদেরকে পূর্ব চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে একাজ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়ে বলে-তোমাদের দূরভিসন্ধি সম্পর্কে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁকে গোপনে জানিয়ে দেবেন। এমন সময়ই আকাশ থেকে ওহী এসে তাদের গোমরফাঁক করে দিল। নবী করিম (দঃ) তড়িঘড়ি করে তৎক্ষনাৎ প্রাকৃতিক ডাকের ভান করে উক্ত স্থান ত্যাগ করে মদিনায় চলে আসেন। সাথী সাহাবীগণও কিছুটা আঁচ করতে পেরে স্থান ত্যাগ করেন।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

নবী করিম (দঃ) সাহাবীগণকে ইহুদীদের ষড়যন্ত্রের সংবাদ দিয়ে তৎক্ষনাৎ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাদের দূর্গ অবরোধ করেন। ছয়দিন–মতান্তরে পনের দিন পর্যন্ত এই অবরোধ চললো। বনু নযির দূর্গে আশ্রয় নিয়ে অবরোধের ফলে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। অবশেষে হত্যার পরিবর্তে তারা স্বেচ্ছায় নির্বাসনে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। রহমতের নবী তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং তাদের অস্থাবর সম্পত্তি ও ধন-দৌলতসহ ইহুদী অঞ্চল খায়বরে আশ্রয় গ্রহণের অনুমতি প্রদান করেন। তারা ছয়শত উট বোঝাই করে ধন-দৌলত সরিয়ে নেয় এবং ঘর–দুয়ার নিজেদের হাতে বিনষ্ট করে দিয়ে যায়। এতেও নবী করিম (দঃ) তাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। নবী করিম (দঃ) কে হত্যা-পরিকল্পনা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও পাল্টা কোন হত্যা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এতেও ইহুদীরা বিশ্বাসঘাতকতা এবং ষড়যন্ত্রের মাত্রা একটুও কমায়নি। বনু নযির মদিনা ত্যাগ করার পর নবী করিম (দঃ) ঐ স্থানে মুহাজির মুসলমানগণকে পুনর্বাসিত করেন।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

সাইত্রিশতম অধ্যায়

খন্দকের যুদ্ধ

প্রসঙ্গ ঃ কুরাইশদের শেষ আক্রমণ, হুযূর (দঃ)- এর ইলমে গায়েব প্রকাশ

কোরাইশদের পক্ষ থেকে সর্বশেষ আক্রমণাত্মক বৃহত্তম যুদ্ধ ছিল খন্দকের যুদ্ধ। এ যুদ্ধ জঙ্গে আহযাব নামেও পরিচিত। আহযাব অর্থ বিরাট বাহিনী। এ যুদ্ধে দশ হাজার সৈন্য নিয়ে তারা ৫ম হিজরীর যিলক্বদ মাসে মদিনা আক্রমণ করে। কুরাইশ ছাড়াও মদিনার বিশ্বাসঘাতক ইহুদী, গাত্ফান– প্রভৃতি গোত্র এই যুদ্ধে তাদের সাথে অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু নবী করিম (দঃ)-এর অন্যতম রণকৌশল-পরিখা খনন এবং আল্লাহর গায়েবী সাহায্য হিসাবে তীব্র হিমপ্রবাহ কোরাইশদের অভিযানকে লন্ডভন্ড করে দেয়।

যুদ্ধের কারণ ঃ

মদিনার ইহুদী সম্প্রদায় বনু কোরায়যা পূর্বচুক্তি ভঙ্গ করে মক্কার কোরাইশদেরকে মদিনা আক্রমণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। এ উদ্দেশ্যে ইহুদীদের একটি প্রতিনিধি দল মক্কায় গমন করে। তারা মক্কাবাসীদেরকে বলে, তোমরা মদিনা আক্রমণ করলে আমরা মদিনার ইহুদী সম্প্রদায় তোমাদের সাথে থাকবো এবং মুসলমানদেরকে সমূলে উৎপাটিত করবো। এভাবে তারা মক্কাবাসীকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয় এবং ঐকমত্যে পৌঁছে। অতঃপর তারা বনু গাত্ফানে গমন করে এবং কোরাইশদের প্রস্তুতির কথা জানায়। এতে বনু গাত্ফান তাদের সাথে যোগ দেয়। এভাবে কোরাইশ, গাত্ফান ও মদিনার ইহুদীদের সম্মিলিত বাহিনী যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। কোরেশ বাহিনীর সর্দার আবু সুফিয়ান, গাত্ফান বাহিনীর দুই উপ-গোত্রের দুই সর্দার উরাইনা ও হারিছ বিভিন্ন গোত্র থেকে দশ হাজার সৈন্য বাহিনী প্রস্তুত করতে থাকে।

এ সংবাদ দ্রুতবেগে মদিনায় পৌঁছে যায়। নবী করিম (দঃ) সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে পরামর্শ সভায় বসেন। নও মুসলিম বৃদ্ধ সাহাবী হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) ছিলেন যুদ্ধ কৌশলে পারদর্শী। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী নবী করিম (দঃ) মাত্র তিন হাজার সৈন্যের বাহিনী তৈরী করলেন এবং মদিনা শরীফের উত্তর-পশ্চিম দিকে পরিখা খনন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। পরিকল্পনা মোতাবেক তিনি তিন হাজার সৈন্যের মধ্যে খাল কাটার কাজ বন্টন করে দিলেন। এক এক গ্রুপের উপর নির্ধারিত স্থান খননের দায়িত্ব অর্পিত হলো।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

পরিখা খননকালে এমন কতিপয় মো'জেযা প্রকাশ পেলো– যা নবী করিম (দঃ)-এর ইল্‌মে গায়েব, গায়েবী খাদ্য প্রদান, ইসলামী হুকুমতের সীমানা সম্প্রসারণের ভবিষ্যৎবানী প্রদান এবং শত্রুদের আক্রমণাত্মক শক্তির পরিসমাপ্তি– ইত্যাদি ঘটনা হুযুরের বিস্ময়কর অলৌকিক শক্তির প্রমাণ বহন করে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো–

(ক) বিরাট প্রস্তরখন্ড আবিষ্কার এবং নবী করিম (দঃ) কর্তৃক তা বিচূর্ণ করণঃ

ইমাম নাছায়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) হযরত বারা' (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। বর্ণনাকারী সাহাবী বারা' (রাঃ) বলেন–হুযুর পাক (দঃ)-এর নির্দেশ মোতাবেক আমরা খন্দক খনন করার কাজে লেগে গেলাম। মাটির নীচে এক বিরাট পাথর আবিস্কৃত হলো। আমাদের কোদাল বা সাবল দ্বারা ঐ পাথর ভাঙ্গা কিছুতেই সম্ভব হলোনা। আমরা নবী করিম (দঃ)-এর খেদমতে এ ঘটনা পেশ করলাম। নবী করিম (দঃ) তশরীফ এনে সাবল হাতে নিলেন। বিছমিল্লাহ বলে আঘাত করতেই পাথরের এক তৃতীয়াংশ খন্ডিত হয়ে গেলো। রাসুল করিম (দঃ) "আল্লাহু আকবার" বলে তকবীর ধ্বনী দিলেন এবং এরশাদ করলেন। **"আল্লাহর শপথ! আমাকে সিরিয়ার ধন ভান্ডারের চাবিসমূহ দান করা হয়েছে। আমি এই মূহুর্তে সিরিয়ার সমস্ত প্রাসাদ এবং মূল্যবান স্বর্ণের ধনরাজী প্রত্যক্ষ করছি"** (সোবহানাল্লাহ)।

আবার তিনি ঐ পাথরে আঘাত করলেন। এবার অপর দ্বিতীয়াংশ ভেঙ্গে গেল। নবী করিম (দঃ) দ্বিতীয়বার "আল্লাহু আকবার" ধ্বনী দিয়ে বলে উঠলেন– **"আল্লাহর শপথ! আমাকে পারস্যের ধন ভান্ডারের চাবিসমূহ অর্পণ করা হয়েছে। আমি এই মূহূর্তে মাদায়েন শহরের (ইরাক) শ্বেতশুভ্র প্রাসাদরাজী অবলোকন করছি"**।

আবার তিনি তৃতীয়বার আঘাত করলেন। এবার বাকী অংশটুকুও ভেঙ্গে গেল। নবী করিম (দঃ) আল্লাহু আকবার ধ্বনী দিয়ে বলে উঠলেন- **"আল্লাহর শপথ! আমাকে ইয়েমেন-এর চাবিসমূহের মালিক বানানো হয়েছে। আমি এই মূহুর্তে ইয়েমেন-এর সানা শহরের গেইটসমূহ অবলোকন করছি"** (সোবহানাল্লাহ)!

এ ঘটনায় লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে–

প্রথমত ঃ অন্যান্য সাহাবীগণের সম্মিলিত শক্তি যেখানে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলো- নবী করিম (দঃ) একা সেই দুঃসাধ্য সাধন করলেন। হুযুরের শক্তির কোন তুলনা নেই।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধের এহেন বিভীষিকাময় মূহুর্তে আল্লাহর পক্ষ হতে ভবিষ্যৎ বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান। নবী করিম (দঃ)-এর জীবদ্দশায়ই ইয়েমেন বিজিত হয়। হুযুরে পাক (দঃ)-এর ইন্তিকালের পর ইয়ারমূক যুদ্ধে সিরিয়া এবং কাদেসিয়া যুদ্ধে পারশ্য ও মাদায়েন বিজয় সমাপ্ত হয়। পাথরখন্ডের মধ্যে আঘাতের কারণে আলো বিচ্ছুরনের মধ্যে নবী করিম (দঃ) ভবিষ্যৎ বিজয় ও মহাশক্তিগুলোর পরাজয় প্রত্যক্ষ করে নিয়েছেন। এই ভবিষ্যৎবানীকেই ইল্‌মে গায়েব আতায়ী বা আল্লাহ প্রদত্ত ইলমে গায়েব বলা হয়। (ভবিষ্যৎ বিজয়ের রেকর্ড হুযুরের শিলার মধ্যে প্রদর্শন করা হলো।

(খ) হযরত জাবের (রাঃ)-এর বাড়ীতে দাওয়াত ঃ খন্দক খননকালে নবী করিম (দঃ)-এর বাহিনীতে খাদ্যাভাব ছিল প্রকট। নবী করিম (দঃ) ছিলেন অতি ক্ষুধার্ত। হযরত জাবের (রাঃ) এই অবস্থা দেখে ঘরে এসে নিজের স্ত্রী উম্মে সোলায়মকে জিজ্ঞেস করলেন- ঘরে খাবার কিছু আছে কি? বিবি বললেন, এক ছা' বা চার সের পরিমাণ আটা এবং একটি মোটা তাজা ছোট ভেড়া ছাড়া আর কিছুই নেই। স্বামীর নির্দেশে তিনি উক্ত ভেড়াটি যবেহ করলেন এবং আটা গুলে নিলেন। গোস্ত চুলায় চড়িয়ে হযরত জাবের (রাঃ) নবী করিম (দঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে চুপে চুপে আরয করলেন–ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ)! আমরা ছোট একটি ভেড়া যবেহ্ করেছি এবং এক ছা' পরিমাণ আটার খামিরা তৈরী করেছি। অনুগ্রহ করে আপনি এই পরিমাণ সঙ্গী নিয়ে আমাদের ঘরে তশরীফ নিয়ে আসুন! নবী করিম (দঃ) খন্দক খননে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন–হে খন্দকবাসী! জাবের খানা তৈরী করেছে। তোমরা সকলে শীঘ্র করে খানা খেতে চলো! এ যেন হযরত জাবেরের (রাঃ) মাথায় বিনা মেঘে বজ্রপাত! তাঁর মনের অবস্থা লক্ষ্য করে নবী করিম (দঃ) এরশাদ করলেন- **"আমি না যাওয়া পর্যন্ত চুলার গোস্ত নামাবেনা এবং খামিরা দিয়ে রুটীও পাকাবেনা"**।

অতঃপর নবী করিম (দঃ) তশরীফ নিয়ে আসলেন এবং জাবের (রাঃ)-এর স্ত্রীকে আটার খামিরা সামনে আনার জন্য বললেন। নবী করিম (দঃ) উক্ত সামান্য আটার খামিরে পবিত্র থুথু নিক্ষেপ করলেন এবং বরকতের জন্য দোয়া করলেন। এরপর গোস্তের ডেকচির দিকে অগ্রসর হয়ে তাতেও পবিত্র থুথু নিক্ষেপ করে বরকতের জন্য দোয়া করলেন। এরপর এরশাদ করলেন– **"হে জাবের জায়া, তুমি রুটি প্রস্তুতকারিনী মহিলাদেরকে ডেকে আনো। তারা তোমার সাথে রুটি**

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

বানাবে– আর গোস্তের পাতিলের মুখ ঢেকে রাখবে এবং উনুনের উপর থেকে ডেকচি নামাবে না"।

তাই করা হলো। নবী করিম (দঃ) ডেকচির নিকটে গিয়ে বসলেন এবং উনুন থেকে গোস্ত বন্টন করতে লাগলেন। দলে দলে সাহাবীগণ আস্তে লাগলেন এবং গোস্ত ও রুটি খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে ফিরে গেলেন। হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, **"সাহাবীগণের সংখ্যা ছিল এক হাজার। সবার খানা সমাপ্ত হয়ে গেলো। কিন্তু আমাদের ডেকচির গোস্ত তখনও উনুনে টগবগ করছিল এবং রুটিও অনুরূপ রয়ে গেলো"**। (সোবহানাল্লাহ)। বোখারী ও মুসলিম এতটুকু রেওয়ায়াত করে ক্ষান্ত হয়েছেন।

(গ) হযরত জাবেরের ২ ছেলে ও যবেহকৃত ছাগলকে জীবিত করা ঃ তাফসীরে রুহুল বয়ান, তাফসীরে নাঈমী, যিক্‌রে জামিল ও "ইসলাম প্রসঙ্গ" কৃত ডঃ শহীদউল্লাহ প্রভৃতি গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য সহী হাদীসগ্রন্থ হতে এ প্রসঙ্গে দুটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। তা হলো–

হযরত জাবের (রাঃ) ভেড়া যবেহ করে যখন নবী করিম (দঃ) কে দাওয়াত করতে গেলেন- এসময়ে হযরত জাবেরের দুই ছেলে ভেড়া যবাইর নকল করতে গিয়ে একজন ছুরিতে যবাই হলো, অন্যজন মায়ের ভয়ে ঘরের ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে শহীদ হলো। ধৈর্যশীলা মা উভয় সন্তানকে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখলেন। এমনকি– স্বামীকেও এ সংবাদ জানাননি– পাছে স্বামী অধৈর্য্য হয়ে পড়েন এবং নবী করিম (দঃ) দাওয়াতে না আসেন!

আল্লাহর কুদরত! সকলকে খানা খাওয়ানোর পর নবী করিম (দঃ) জাবেরকে নিয়ে খানা খেতে বসলেন। কিন্তু হঠাৎ করে তিনি হাত গুটিয়ে নিয়ে বললেন, তোমার ছেলেরা কোথায়? তাদেরকে নিয়ে এসো। হযরত জাবের ঘরের ভিতরে গিয়ে সব ঘটনা দেখলেন এবং এসে বললেন– তারা ঘুমিয়ে আছে। নবী করিম (দঃ) তাদেরকে খানায় শরীক করার জন্য ডেকে আনতে বললেন। এবার জাবের (রাঃ) কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং সব ঘটনা খুলে বললেন। অতঃপর নবী করিম (দঃ) নিজে ছেলেদের শিয়রে গিয়ে ডাক দিতেই তারা জীবিত হয়ে নবীজীকে সালাম করলেন এবং খানায় শরিক হলেন (মাদারেজুন্নবুয়াত ও মাজ্‌মুউল ফতোয়া ২য় খন্ড)।

দ্বিতীয় ঘটনাটি আরো আশ্চর্যজনক! খাওয়া শেষে নবী করিম (দঃ) এরশাদ করলেন, হে জাবের! দেখো– ডেকচিতে কি আছে? হযরত জাবের (রাঃ)

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

বললেন-গোস্ত এবং হাড্ডি। নবী করিম (দঃ) হাড্ডিগুলো নামিয়ে এক জায়গায় রাখতে বললেন এবং তাতে ফুঁক দিলেন। সাথে সাথে একটি ভেড়া জিন্দা হয়ে কান ঝাড়তে লাগলো। নবী করিম (দঃ) এরশাদ করলেন, **"হে জাবের! তোমার ভেড়া ও আটা তুমি নিয়ে যাও"**। (যিকরে জামিল ও শানে হাবীব)

শিক্ষাঃ এ পূর্ণ ঘটনায় শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে- সামান্য খাদ্য এক হাজার লোকে খেলেন। তারপরও খানা 'যথা পূর্বং তথা পরং' রয়ে গেল। এই বাড়তি গোস্ত, পানি, সুরবা, ঝাল, তৈল ও ঘি-মসল্লা কোথা থেকে আসলো? জবাব হলো- নবী করিম (দঃ) কে আল্লাহ তায়ালা গায়েবী ধন-ভান্ডারের মালিক বানিয়েছেন- যার প্রমাণ হাদীসে এসেছে এভাবে-**"আমাকে জিব্রাইল (আঃ) এসে ধন-ভান্ডারের চাবিসমূহ প্রদান করেছেন"** (হাদীস অবলম্বনে-সালতানাতে মোস্তফা)।

হুযুর পুরনূর (দঃ)-এর শুধু থুথু মোবারকেই এত গুপ্তধন ও নেয়ামত নিহিত রয়েছে। অন্যান্য অঙ্গে যে কত নিয়ামত লুকায়িত আছে-তা আল্লাহই ভাল জানেন। হাদীসে উল্লেখ আছে- একদিন সালাতুল খুসুফ (চন্দ্র গ্রহণের নামায) আদায় করার সময় নবী করিম (দঃ) দু'হাত উপরের দিকে তুলে কি যেন ধরলেন-আবার ছেড়ে দিলেন। নামায শেষে সাহাবায়ে কেরাম কারণ জিজ্ঞেস করলেন। নবী করিম (দঃ) এরশাদ করলেন-

"বেহেস্ত আমার নিকটে এসেছিল। আমি দু'হাত বাড়িয়ে বেহেস্তের আঙ্গুরের একটি খোসা হাতে ধরলাম। কিন্তু পরকালে এগুলো দিয়ে বেহেস্তীদের খানা দেয়া হবে। তাই পুনরায় ছেড়ে দিলাম। আল্লাহর কসম! তোমরা কেয়ামত পর্যন্ত আমার দু'হাতের ঐ খোসা খেলেও তা শেষ হতো না"। এমন আরও বহু ঘটনা রয়েছে।

(ঘ) রাসুলের দোয়ায় তীব্র বায়ু প্রবাহিত ও শত্রুশিবির লন্ডভন্ড ঃ

খন্দক খনন সমাপ্ত হওয়ার পর নবী করিম (দঃ) তিন হাজার সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে শহরের ভিতরে আত্মরক্ষামূলক লাইনে দাঁড়ালেন। কোরাইশগণ তাদের মিত্র বাহিনী-ইহুদী, গাত্ফান, বনু কেনানা, তিহামা ও নজদবাসীসহ দশ হাজার সৈন্য নিয়ে ঝড়ের বেগে ওহোদের দিক দিয়ে এসে মদিনা ঘেরাও করে ফেললো। তারা সামনে খন্দক বা খাল দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলো। এর পূর্বে তারা এই নব রণকৌশলের সাথে পরিচিত ছিল না। খন্দকের দু'দিকে মুসলমান

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ও কাফিরগণ মুখোমুখী দাঁড়ালো। মুহাজিরদের নেতা হলেন রাসুল (দঃ)-এর পালিত পুত্র যায়েদ ইবনে হারিছা এবং আনসারদের নেতা হলেন সাআদ ইবনে ওবাদা। অপর দিকে মদিনার ইহুদী সম্প্রদায় বনু কোরায়যা চুক্তি ভঙ্গ করে কোরাইশদের সাথে যোগ দিল। মদিনার মোনাফেকরা মুসলমানদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়ার কাজে লেগে গেলো। এতদসত্বেও আল্লাহর হাবীব (দঃ) দৃঢ়ভাবে শত্রুর মোকাবেলা করলেন। শত্রুরা মুসলমানদেরকে অবরোধ করে রাখলো– কিন্তু যুদ্ধ হলো না। মাঝে মাঝে কিছু তীর বিনিময় হতো।

একবার কাফেরগণ খালের একটি সংকীর্ণ স্থান দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে লম্প দিয়ে পার হয়ে আসে। অমনি হযরত আলী (রাঃ) ও যোবাইর (রাঃ) অগ্রসর হয়ে আমর ও নওফেল নামে দুই কাফেরকে খতম করে ফেললেন। অবশিষ্টরা পলায়ন করে চলে যায়। এই তীর বিনিময়ের সময় আনসার সর্দার হযরত ছাআদ ইবনে মোয়ায (রাঃ) শত্রুর তীরে আঘাত প্রাপ্ত হন এবং কিছুদিন পর জখম থেকে রক্তক্ষরণের ফলে শাহাদত বরণ করেন। তাঁর জানাযায় ৭০ হাজার ফেরেস্তা যোগদান করেছিলো।

দীর্ঘ ১৫ দিন পর্য্যন্ত কাফেরদের অবরোধ চল্‌তে থাকে। এতে মুসলমানদের মধ্যে ভয়-বিহ্বলতা দেখা দেয়। এ অবস্থায় নবী করিম (দঃ) কাফেরদের বিরুদ্ধে আল্লাহর নিকট এভাবে দোয়া করেন– **"হে আল্লাহ, হে কোরআন অবতীর্ণকারী, হে দ্রুত ফয়সালাকারী, তুমি এই সম্মিলিত বাহিনীকে পরাভূত করো, হে আল্লাহ! তুমি তাদের পরাভূত করো। তাদের পদস্খলন ঘটাও" (বোখারী)। অন্য রেওয়ায়াত মতে হুযুর (দঃ) এই দোয়াও করেছিলেন– "হে পেরেশান হৃদয়ের আকুতি শ্রবণকারী, তুমি আমার পেরেশানী ও চিন্তা দূর করো। তুমি তো দেখছো– আমাদের উপর কি আপদ নাযিল হয়েছে"!**

এই দোয়ার সাথে সাথে হযরত জিব্রাইল (আঃ) এসে সু-সংবাদ দিলেন– আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর তীব্র বায়ু প্রবাহিত করবেন এবং গোপন সৈন্য পাঠাবেন। নবী করিম (দঃ) সাহাবায়ে কেরামকে এ সু-সংবাদ দিয়ে হাত তুলে মুনাজাত করলেন এবং 'শুকরান শুকরান' বল্‌তে লাগলেন। ঐ রাত্রেই প্রবল ঝঞ্জাবায়ু প্রবাহিত হলো। কুরাইশদের তাবু উড়িয়ে নিয়ে গেলো। বৃষ্টি আর শীতে তারা বেদিশা হয়ে পড়লো। তারা মুসলমানদের দিক থেকে অস্ত্রের ঝনঝনানী

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

আওয়ায ও তকবীর ধ্বনী শুনতে পেলো। এটা ছিল ফেরেস্তাদের আওয়াজ। কোরাইশ বাহিনী প্রচুর মালপত্র ও যুদ্ধ সামগ্রী ফেলে রাত্রের মধ্যেই পলায়ন করলো। নবী করিম (দঃ)-এর দোয়ার বরকতে শত্রুসৈন্য পরাজিত হলো। যিলক্বদ মাসের ৭ দিন বাকী থাক্‌তে তিনি খন্দক থেকে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করলেন এবং ভবিষ্যৎবানী করলেন- **"এ বৎসরের পর হতে কোরাইশরা তোমাদের বিরুদ্ধে আর যুদ্ধ করতে সাহ্‌স করবে না"। এটা নবী করিম (দঃ)-এর স্পষ্ট ইল্‌মে গায়েব এবং নবুয়্যতের দলীল।**

৬ষ্ঠ হিজরী সন থেকে মুসলমানগণই কাফের কোরাইশদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেছেন। হোদায়বিয়া, ফতেহ মক্কা, হোনাইনযুদ্ধ, হাওয়াজেন যুদ্ধ- প্রভৃতি এরই স্বাক্ষ্য বহন করে। ফলকথা- খন্দকের যুদ্ধে নবী করিম (দঃ)-এর ইল্‌মে গায়েব, গুপ্ত ধন-ভান্ডারের মালিকানা, মৃতকে জীবিত করার এখ্‌তিয়ার, স্বল্প খাদ্যের মধ্যে বরকতের প্রস্রবন সৃষ্টি, দোয়ার বরকতে শত্রু বাহিনীর পরাজয় এবং পরাক্রমশালী পারশ্য ও রোম সাম্রাজ্যের পতনের ভবিষ্যৎবানী-যা বাস্তবে পরিণত হয়েছিল-এতগুলো মো'জেযা প্রকাশিত হয়েছিল। ইসলামের মৌলিক আক্বিদা ও বিশ্বাসের উজ্জ্বল প্রমাণ এসব ঘটনা। ওহাবীপন্থী আলেমদেরকে আল্লাহ তায়ালা শুভবুদ্ধি দান করুন।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

আটত্রিশতম অধ্যায়

বনু কোরায়যার শাস্তি

প্রসঙ্গ ঃ ইহুদী গোত্র বনু কোরায়যা কর্তৃক চুক্তি ভঙ্গ ও তার শাস্তি বিধান

খন্দকের যুদ্ধে বনু কোরায়যা নামক ইহুদী গোত্রটি হুযুর (দঃ)-এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করে কোরাইশদের সাথে যোগ দেয়। কোরাইশরা পলায়ন করার পর বনু কোরায়যা বিপদের সম্মুখীন হয়। নবী করিম (দঃ) খন্দক থেকে ফিরে এসে অস্ত্র-সস্ত্র রেখে মাত্র গোসল সেরেছেন–এমন সময় হযরত জিব্রাইল (আঃ) খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন– **"আপনি অস্ত্র রেখে দিয়েছেন- অথচ আমরা ফিরিস্তারা এখনও অস্ত্র ত্যাগ করিনি। আপনি এখনই বনু কোরায়যার দিকে ধাবিত হোন। আমিও সেদিকে যাচ্ছি এবং তাদের মধ্যে ভূমিকম্পের সৃষ্টি করে ছাড়বো"**। (বেদায়া–নেহায়া)।

নবী করিম (দঃ) চতুর্দিকে খবর পাঠিয়ে দিলেন- যেন খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকলেই বনু কোরায়যার পল্লীতে গিয়ে আছরের নামায আদায় করে। হযরত আলী (রাঃ) কে অগ্রগামী দলের নেতৃত্ব দিয়ে প্রেরণ করলেন। অতঃপর তিনি তিন হাজার সাহাবী ও তেষট্টিটি ঘোড়া নিয়ে বনু কোরায়যার দূর্গ অবরোধ করলেন। এই অবরোধ ২৫ দিন পর্য্যন্ত অব্যাহত থাকে। অবরোধের ফলে তাদের চরম দুর্দশা দেখা দেয়। আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দেন। তারা উপায়ান্তর না দেখে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে পড়ে। তাদের সর্দার কা'ব ইবনে আছাদ তাদের কাছে তিনটি বিকল্প প্রস্তাব পেশ করে। যথা (১) "বনু কোরায়যার নারী-পুরুষ সবাই মুসলমান হয়ে যাক। কেননা, এটা দিবালোকের মত সত্য যে, নবী করিম (দঃ) একজন প্রেরিত রাসূল। তাঁর গুণাবলীর সাথে তৌরাত কিতাবে বর্ণিত গুণাবলীর হুবহু মিল রয়েছে। সুতরাং তাঁর উপর ঈমান এনে নারী-পুরুষ সকলের প্রাণ, ধন-সম্পদ ও শিশুদের জীবন রক্ষা করা কর্তব্য। (২) তা না হলে সকলে নিজেদের শিশু ও নারীদেরকে নিজ হাতে হত্যা করে সম্মিলিতভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ুক।

(৩) তাদের শনিবারের পবিত্র রাত্রে একযোগে মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

দূর্গবাসী কেউ তাদের সর্দারের উক্ত প্রস্তাবে সাড়া দিলনা। অবশেষে তারা আনসার-সর্দার হযরত ছা'আদ ইবনে মা'আয (রাঃ)-এর উপর ফয়সালার ভার ন্যাস্ত করলো। পূর্ব আত্মীয়তার সুত্রে হয়তো তিনি কিছুটা নমনীয় হবেন– এ ছিল তাদের ধারণা। নবী করিম (দঃ) সর্বেসর্বা হয়েও তাদের এ হঠকারী প্রস্তাবে রাযী হলেন। হযরত ছা'আদ (রাঃ) তৌরাত কিতাবের বিধান অনুযায়ী নিম্নোক্ত ফয়সালা করলেন (১) "বনু কোরায়যা গোত্রের সকল পুরুষকে হত্যা করা হবে, (২) তাদের সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করা হবে, (৩) তাদের শিশু ও নারীদেরকে বন্দী করে মুসলমানদের দাস-দাসীতে পরিণত করা হবে।" এই ফয়সালা ছিল তাদের কিতাব মোতাবেক চুক্তি ভঙ্গের শাস্তি। নবী করিম (দঃ) মন্তব্য করলেন- **"হে ছা'আদ, তুমি ঐ ফয়সালাই করেছো-যা আল্লাহ্ তায়ালা সপ্তাকাশের উপরে করে রেখেছেন"** (মাওয়াহিব)।

[এই সংবাদটি ছিল ইলমে গায়েবের সংবাদ। আকাশের উপর আল্লাহর ধার্যকৃত ফয়সালা নবী করিম (দঃ) মদিনায় বসে জেনে নিয়েছেন। এ ধরনের ইলমে গায়েব জিব্রাইলের মাধ্যম ছাড়াই প্রদত্ত হয়ে থাকে। এ ধরনের ইলমে গায়েবকে 'দালালাত' বলা হয় (তাফসীরে রুহুল বয়ান ৪র্থ পারা ১৭৯ আয়াত)।]

অতঃপর উক্ত ফয়সালার উপর উভয় পক্ষের দস্তখত হয়। সে মোতাবেক বনু কোরায়যার ৭০০ পুরুষকে মদিনার বাজারে শিরশ্ছেদ করা হয়। নারী ও শিশুদেরকে দাসদাসীতে পরিণত করা হয় এবং তাদের সম্পদ কোরআনের বিধান মতে মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করা হয়।

[ইহুদীরা যদি নবী করিম (দঃ)-এর উপর ফয়সালার দায়িত্ব ছেড়ে দিত, তা হলে হয়তো তাদের জীবন রক্ষা হতো–যেমনটি হয়েছিল বনু নযীর ও মক্কাবাসীদের ক্ষেত্রে। তৌরাত কিতাব অনুযায়ী চুক্তি ভঙ্গের শাস্তি হচ্ছে হত্যা করা। তাই বনু কোরায়যা হযরত ছা'আদ (রাঃ)-এর উক্ত রায় নতশীরে মেনে নিতে বাধ্য হলো। মুসলিম রাষ্ট্রে অপরাধমূলক শাস্তির ক্ষেত্রে সব প্রজাই সমান। কিন্তু সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে যার যার ধর্ম অনুযায়ী বিচার করতে হবে। এটাকে পারিবারিক আইন বলা হয়। ইসলামে প্রত্যেক ধর্মের পৃথক পারিবারিক আইন-এর ব্যবস্থা স্বীকৃত।]

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ঊনচল্লিশতম অধ্যায়

হোদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি

প্রসঙ্গ ঃ ওমরাহ্, বাইয়াতে রিদ্ওয়ান, ইলমে গায়েব প্রকাশ, হাউযে কাউছারের পানি প্রবাহ, উম্মতের মাগফিরাতের আয়াত নাযিল

মক্কার ৯ মাইল উত্তর-পশ্চিমে হোদায়বিয়া অবস্থিত । এটি একটি কূপের নাম। পরবর্তীতে স্থানের নামও হোদায়বিয়া হিসেবেই পরিচিতি লাভ করে। এইস্থানে নবী করিম (দঃ) ও কোরাইশদের মধ্যে একটি সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল ৬ষ্ঠ হিজরীর যিলক্বদ মাসে। এই অসম চুক্তিটি ছিল নবী করিম (দঃ) এবং মুসলমানদের জন্য রাজনৈতিক মহাবিজয় এবং মক্কা বিজয়ের প্রথম সোপান স্বরূপ।

এই চুক্তির মাধ্যমে কোরাইশগণ মুসলমান ও ইসলামী রাষ্ট্রকে একটি পক্ষ ও শক্তি বলে স্বীকৃতি দান করে এবং দশ বৎসরের জন্য স্বাধীনভাবে ধর্ম প্রচারের সুযোগ প্রদান করে। সুতরাং ইসলামের ইতিহাসে এই সন্ধিচুক্তিকে স্পষ্ট বিজয় বলে কোরআন মজিদে ঘোষণা করা হয়েছে।

৫ম হিজরী সনে খন্দকের যুদ্ধ শেষে নবী করিম (দঃ) ভবিষ্যৎবানী করেছিলেন- **"এ বৎসরের পর হতে কোরাইশগণ আর আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারবে না"**। হুযুর (দঃ)-এর ভবিষ্যৎবানী এক বৎসরের মধ্যেই ফলে গেলো। "তিনি স্বপ্নে দেখলেন- আপন সঙ্গীগণকে নিয়ে তিনি মক্কা মোয়ায্যমায় প্রবেশ করছেন এবং তাওয়াফ শেষে সায়ী করে কেউ মাথা মুন্ডন করছেন, কেউ চুল ছাঁটছেন এবং নিরাপদেই তিনি ওমরা সমাধা করছেন" (সূরা আল-ফাত্হ)।

এই স্বপ্ন ছিল ভবিষ্যৎ বিজয়ের ইঙ্গিতবহ। এই স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনে মোহাজির সাহাবীগণ জন্মভূমি দর্শন এবং আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করার জন্য উতাল হয়ে উঠলেন। ছয় বৎসর পূর্বে মাতৃভূমি ত্যাগ করে মদিনায় এসেও মুসলমানরা শান্তিতে থাকতে পারেননি। বদর, ওহোদ, খন্দক-প্রভৃতি যুদ্ধে তারা ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন। সুতরাং মাতৃভূমির মাটি তাঁদেরকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করতে লাগলো। নবী করিম (দঃ) চৌদ্দশত সাহাবী নিয়ে- (যাদের অধিকাংশই ছিলেন মোহাজির) মক্কার উদ্দেশ্যে ওমরা করার নিয়তে রওনা হলেন যিলক্বদ চাঁদের ১লা তারিখ সোমবার দিন। সাথে নিলেন কোরবানীর উট। তখনও হজ্ব ফরয

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

হয়নি। তাই ওমরার এই ব্যবস্থা। সাথে নিলেন উম্মুল মোমেনীন হযরত উম্মে সাল্মা (রাঃ) কে। আত্মরক্ষামূলক খাপযুক্ত সাধারণ অস্ত্র ছাড়া যুদ্ধের কোন অস্ত্রই সাথে ছিল না। কাজেই এই সফর ছিল শুধু ধর্মীয় সফর।

মদিনার সামান্য দূরে 'যুল হোলায়ফা' নামক স্থানে গিয়ে তিনি ওমরার এহ্রাম পরিধান করে তাল্বিয়া পড়ে– অর্থাৎ "লাব্বায়েক" বলে মক্কা মোয়ায্যমার পথে রওনা দিলেন। বনু খোযাআ গোত্রের একজনকে মক্কাবাসীদের প্রতিক্রিয়া জানার উদ্দেশ্যে আগে প্রেরণ করলেন। সে এসে সংবাদ দিল– কোরাইশগণ নবী করিম (দঃ)-এর কাফেলাকে বাঁধা দিবে এবং প্রয়োজনে যুদ্ধ করবে। এই সংবাদ পেয়ে নবী করিম (দঃ) সাহাবীদেরকে নিয়ে মক্কা শরীফের ৯ মাইল দূরে হোদায়বিয়া ময়দানে তাঁবু ফেললেন এবং হযরত ওসমান (রাঃ) কে নিজেদের আগমনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার জন্য কুরাইশদের নিকট মক্কায় প্রেরণ করলেন। আবু সুফিয়ান হযরত ওসমানকে সাদরে গ্রহণ করলো।

"প্রথমে আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করে পরে কথাবার্তা হবে"– আবু সুফিয়ান এই প্রস্তাব দিল। হযরত ওসমান (রাঃ) বললেন- "আমার প্রিয় নবীর পূর্বে আমি আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করতে পারিনা। প্রিয় নবীর সম্মান আল্লাহর ঘরের সম্মানের চাইতেও অনেক বেশী"। একথা শুনে আবু সুফিয়ান ও অন্য নেতৃবর্গ তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো এবং হযরত ওসমানকে আটক করে রাখ্লো। হোদায়বিয়ায় মুসলমানদের তাঁবুতে গুজব-সংবাদ পৌঁছানো হলো যে, হ্যরত ওসমান (রাঃ) কে শহীদ করে ফেলা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা দেখা দিল–হযরত ওসমান হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য।

নবী করিম (দঃ) এই অবস্থা দর্শনে সকলকে একটি ছামুরা (বাবলা) গাছের নীচে ডেকে আনলেন। তিনি শান্তভাবে তাঁদের মতামত জানতে চাইলেন। সবাই এক বাক্যে কথিত ওসমান হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার সংকল্প ঘোষনা করলেন। দূত হত্যা সকল ধর্মেই নিষিদ্ধ এবং তার পরিণতিও মারাত্মক। নবী করিম (দঃ) সাহাবায়ে কেরামের এই সংকল্পকে "বাইয়াতে" রূপদান করলেন।

আল্লাহ-রাসুলের রেযামন্দি অর্জন ও যুদ্ধ করার লক্ষ্যে এই বাইআত অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে এই বাইআতকে বাইআতে রিদওয়ান ও বাইআতে কিতাল বলা হয়। নবী করিম (দঃ)-এর ডানহাত মোবারকের নীচে সকলে ডান হাত রেখে এই বাইআত বা অঙ্গীকার করেছিলেন বলে এটাকে "বাইআতে রাসুলও" বলা হয়। কোরআন মজিদে এই বাইআতে রিদওয়ান বা বাইআতে কিতালকেই বাইআতে রাসুল বলা হয়েছে।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

বাইআতে শেখ সুন্নাতঃ

[বাইআত গ্রহণ করা সুন্নাত। তাই বাইআতে খিলাফত ও বাইআতে শেখ-উভয়টিই সুন্নাত। রাসূলে পাক (দঃ)- এর পরবর্তীকালে চার খলিফা মানুষের নিকট থেকে নিজেদের জন্য ঐ পদ্ধতিতেই "খেলাফত ও তরিকতের" বাইআত গ্রহণ করতেন। অর্থাৎ- জাগতিক ও আধ্যাত্মিক- উভয় প্রকারের বাইআত খোলাফায়ে রাশেদীন গ্রহণ করতেন (বোখারী ও মুসলিম)। ইহাই বাইআতে শেখের দলীল। বাইআতে আবুবকর, বাইআতে ওমর, বাইআতে ওসমান, বাইআতে আলী, বাইআতে হাছান ও বাইআতে হোসাইন ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁদের নামে তাঁদের হাতে লোকেরা বাইআত করতো (বুখারী)। ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর নামে কুফাবাসীরা ইমাম মুসলিমের হাতে বাইআত করেছিল। কাওলুল জামিলে বর্ণিত বাইআত পদ্ধতি খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে এবং পরবর্তী যুগেও ছিলনা।

খেলাফতের যুগ শেষ হয়ে গেলে রাজতন্ত্রের যুগ শুরু হয়। তখন থেকেই জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জগতের যৌথ বাইআত প্রথা রহিত হয়ে যায়। জাগতিক বাইআত করা হতো কথিত খলিফাদের নামে- কিন্তু আধ্যাত্মিক বাইআত করা হতো ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ইমামগণের হাতে। এভাবে তখন থেকেই অদ্যাবধি বাইআতে ছিয়াছাত এবং বাইআতে শেখ পৃথক পৃথক ভাবে চলে আসছে।

তাফসীরে রুহুল বয়ান সুরা আল ফাতাহ্-এর বর্ণনা অনুযায়ী "বাইআতে শেখ" বাইআতে রাসুলেরই প্রতিনিধিত্বকারী এবং বাইআতে রাসুল মূলতঃ বাইআতুল্লাহরই প্রতিনিধিত্বকারী। এই কারণেই তরিকতের তিনটি স্তর ফানা ফিশ শেখ, ফানা ফির রাসুল এবং ফানা ফিল্লাহ- নির্ধারিত হয়েছে। ফানা ফিস শেখ হলো ফানা ফির রাসুলের পূর্বশর্ত এবং ফানা ফির রাসুল হলো ফানা ফিল্লাহর পূর্বশর্ত। (ইরগামুল মুরিদীন)।

প্রতিনিধিত্বকারী বাইআতের পরস্পরের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। ওয়াছেতা বা পীরের মাধ্যম ছাড়া সরাসরি বাইআতে রাসুল হতে পারেনা। আল্লাহর কালাম "ওয়াব্তাগো ইলাইহিল ওয়াছিলা" এই আয়াতে ওয়াছিলার অর্থ আহলে সুন্নাতের মতে পীর ধরা বা পীরের হাতে বাইয়াত হওয়া। এই প্রভেদ না জানার কারণেই কোন কোন পীর বুযর্গদের মধ্যে বাইআতে শেখ ও বাইআতে রাসুল নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে উভয়ের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব বা সংঘাত নেই।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

বাইআতে শেখই মূলতঃ বাইআতে রাসুল এবং বাইআতে রাসুলই মূলতঃ বাইআতুল্লাহ (রুহুল বয়ান)।

তাফসীরে ছাভী-তে বলা হয়েছে- "বাইআতে রিদওয়ান" আয়াতটির নুযুল খাস হলেও হুকুম আম। অর্থ্যাৎ বাইআতে শেখ ও বাইআতে ইমাম উক্ত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। আরবী এবারত দেখুন-

هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَاِنْ كَانَ سَبَبُ نُزُوْلِهَا بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ اِلَّا اَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ فَيَشْتَمِلُ مُبَايَعَةَ الْاِمَامِ عَلَى الطَّاعَةِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَمُبَايَعَةَ الشَّيْخِ الْعَارِفِ عَلٰى مَحَبَّةِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ -

অর্থ-সুরা আল ফাতহ ১০ নম্বর আয়াতে বাইআতে রিদওয়ান শব্দ উল্লেখ থাকলেও তার হুকুম আম বা ব্যাপক। অতএব বাইআতে ইমাম বা শাসক এবং বাইআতে শেখ উক্ত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। শাসক বা ইমামের নিকট বাইআত করার অর্থ তার আনুগত্য ও ওয়াদা পূর্ণ করার শপথ। আর বাইআতে শেখের অর্থ হলো- শেখে আরেফের নিকট আল্লাহ ও রাসুলের মহব্বৎ হাসেলের জন্য শপথ করা। (তাফসীরে ছাভী সুরা আল-ফাতহ, ১০ আয়াত)

সুতরাং আয়াতের ব্যাপক অর্থ হবে এভাবে- "যারা রাসুলের হাতে বাইআত করে কিংবা পীর অথবা ন্যায়পরায়ণ শাসকের হাতে বাইআত করে-তারা মূলতঃ আল্লাহর হাতেই বাইআত করে-তাঁদের হাতের উপরেই আল্লাহর হাত রয়েছে"। (তাফসীরে ছাভী, সুরা আল-ফাতহ, ১০ আয়াত মর্ম)।

হযরত বায়েযীদ বোস্তামী (রহঃ) স্বীয় ভক্ত আবুল হাছান খারকানী (রহঃ) কে স্বপ্নে বলেছিলেন- "পৃথিবীর উপরে জীবিত পীরের কাছে তুমি মুরীদ হইও। কেননা, এটাই সুন্নাত" (ইরগামুল মুরিদীন)।

বাইআতে রিদওয়ান গ্রহণঃ

হুযুর (দঃ) সকল সাহাবীকে ছামুরা গাছের নীচে একত্রিত করে নিজের ডান হাত মোবারক সাহাবীগণের ডানহাতের উপরে স্থাপন করে জেহাদের বাইআত বা অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। তিনি আপন বাম হাত নিজ ডান হাতের নীচে স্থাপন করে বললেন, **"আমি ওসমানের পক্ষে এই বাইআত গ্রহণ করছি"**।

একথা বলার সাথে সাথে সকলে বুঝে ফেললেন যে, হযরত ওসমান এখনও জীবিত আছেন। কেননা, মৃত লোকের পক্ষে কোন বাইআত হতে পারেনা। নবী করিম (দঃ) একদিকে জেহাদের বাইআত বা অঙ্গীকার গ্রহণ করে নিলেন,

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

অপরদিকে হযরত ওসমানের বেঁচে থাকারও গায়েবী সংবাদ দিয়ে দিলেন। প্রয়োজনের সময়ই নবী করিম (দঃ) কাজের মাধ্যমে "ইলমে গায়েব" প্রকাশ করতেন। এটা ছিল আল্লাহ প্রদত্ত এলেম। সুতরাং কোরআনের যে যে স্থানে আমভাবে বলা হয়েছে–"আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ গায়েব জানে না"–তার অর্থ হচ্ছে **"নিজে নিজে এলমে গায়েব কেউ জানেনা"**। কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত এলমে গায়েব-এর নিষেধাজ্ঞামূলক কোন আয়াত বা হাদীস নেই–বরং আল্লাহ নিজে রাসুল (দঃ) কে ইলমে গায়েব শিক্ষা দিয়েছেন বলে সুরা নিছার-১৩৩ আয়াতে উল্লেখ আছে (জালালাঈন)। আয়াতটি হলো– وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ (مِنَ الْاَحْكَامِ وَالْغَيْبِ)

তাহ্‌কীক ঃ (ইলমে গায়েব)

[ইল্‌ম শব্দটি বাবে ছামিয়া-ইয়াছ্‌মাউ سَمِعَ يَسْمَعُ হতে নির্গত হলে তার অর্থ হয় "নিজে নিজে জানা", আর বাবে তাফ্‌ঈল (تَعْلِيْمٌ) হতে নির্গত হলে তাঁর অর্থ হয়–"অন্য কর্তৃক অবগত করানো"। নবী করিম (দঃ)-এর ক্ষেত্রে প্রথমটি নিষিদ্ধ, কিন্তু দ্বিতীয়টি প্রমাণিত। উভয়টিরই উল্লেখ কোরআনে আছে। যেমন- প্রথমটির দলীল হলো **"লা-ইয়ালামু মান্‌ ফিস্‌ সামাওয়াতে ওয়াল আরদিল গায়বা ইল্লাল্লাহু"– অর্থাৎ "আসমান-জমিনের কেউই নিজে নিজে গায়েব জানে না-একমাত্র আল্লাহ ছাড়া"**। অপরদিকে দ্বিতীয়টির দলীল হলো **"ওয়া আল্লামাকা মা-লাম্‌ তাকুন তা'লাম" অর্থাৎ "আপনি নিজে নিজে যা কিছু জান্‌তেন না, তা সবই আল্লাহ্‌ আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন"**। (সূরা নিসা– ১১৩ আয়াত জালালাঈন ব্যাখ্যা করেছেন"–ইলমুল আহকাম ও ইলমুল গায়েব–অর্থ্যাৎ "আল্লাহ নিজে আপনাকে ইলমুল আহকাম ও ইলমুল গায়েব শিক্ষা দিয়েছেন"।

সুতরাং ইলমে গায়েব দু-প্রকার মানতেই হবে। এক প্রকার হলো– নিজে নিজে জানা, আর এক প্রকার হলো- আল্লাহর মাধ্যমে জানা। প্রথমটিকে বলা হয় ইল্‌মে গায়েব যাতি। এটা আল্লাহর জন্য খাস। আর দ্বিতীয়টিকে বলা হয় ইলমে গায়েব আতায়ী বা আল্লাহ প্রদত্ত ইলমে গায়েব। এটা নবী রাসুল এবং তাঁদের মাধ্যমে ওলী আল্লাহদের জন্য খাস। যাতি ইল্‌মে গায়েব আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য মানা যেমন কুফরী ও শেরেকী কাজ–তদ্রূপ আতায়ী ইল্‌মে গায়েবও আল্লাহর জন্য মানা নাজায়েয এবং হারাম। কেননা, আল্লাহর নিজ ইল্‌ম আতায়ী (প্রদত্ত) হতে পারেনা। এই প্রভেদটুকু না জানার কারণেই এক শ্রেণীর ওহাবী আলেম ঢালাওভাবে নবী করিম (দঃ)-এর ইল্‌মে গায়েব আতায়ীকে অস্বীকার করে বসে। এটা তাদের মূর্খতার পরিচায়ক। আল্লাহ্‌ নিজেই বলেন–"হে হাবীব! আপনার প্রভূ আপনাকে অজানার গায়েবী এলেম নিজে শিক্ষা দিয়েছেন"। (জালালাঈন সুরা নিসা ১১৩ আয়াত)।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ওহাবী আলেমদের খপ্পরে পড়ে স্বঘোষিত নামধারী দারুস সালামের জাহেল পীর আবদুল কাহহার সাহেবও নবী করিম (দঃ)-এর আল্লাহ্ প্রদত্ত ইল্‌মে গায়েবকে অস্বীকার করে বিজ্ঞাপন ছেড়েছে ১৯৯৪ইং সালে। এ অধম বাধ্য হয়ে তাঁর উক্ত বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে ১৯৯৫ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে দৈনিক ইনকিলাবে চ্যালেঞ্জ করে বাহাছের আহবান করেছিলাম। কিন্তু এখন পর্যন্ত উক্ত পীর সাহেবের কোন প্রতিক্রিয়া নযরে পড়ছেনা। ইতিমধ্যে তিনি বাহাছের চ্যালেঞ্জ মাথায় নিয়ে কবরে চলে গেছেন।]

চুক্তি সম্পাদন ঃ

যাই হোক–মক্কার কোরাইশ এবং নবী করিম (দঃ)-এর মধ্যে দূত বিনিময় হতে লাগলো এবং আলাপ আলোচনা চল্‌তে থাকলো। **আমর নামের প্রথম দূত কোরাইশদেরকে গিয়ে বলেছিল- "আমি তাঁদের তাবুতে গিয়ে দেখলাম– নবীর সাহাবীগণ কথিত ওসমান হত্যার প্রতিশোধ নিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছেন। তারা জান দিতে প্রস্তুত। অপরদিকে তোমাদের জানের মায়া রয়েছে। নবীর সাহাবীগণ তাঁদের নবীর দিকে চোখ তুলে কথা বলেন না। যখন তিনি কথা বলেন-তখন তাঁর সাথীগণ মৃতদেহের ন্যায় নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন। তিনি যখন থুথু ফেলেন বা নাসিকা পরিষ্কার করেন, তাঁর সাথীগণ ঐসব জিনিষ পবিত্র ও তাবাররুক জ্ঞানে নিজেদের গায়ে-মুখে মালিশ করে নেন। তিনি ওযু করার সময় তাঁর ব্যবহৃত পানি সাহাবীগণ মাথায় ও মুখে-বুকে মালিশ করে নেন। আমি অনেক রাজা বাদশাহর দরবারে দৌত্যগীরি করেছি, কিন্তু এমন মর্যাদাবান কাউকে পাইনি। সুতরাং তাদের সাথে যুদ্ধ করলে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী"**।

আমরের মুখে একথা শুনে কোরাইশ নেতারা ঘাবড়িয়ে যায়। তারা হযরত ওসমানকে ছেড়ে দেয় এবং সন্ধিচুক্তির খসড়া তৈরীর জন্য সোহায়লকে প্রেরণ করে। সোহায়ল নবী করিম (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি তার সাথে আলোচনার অগ্রগতি সম্পর্কে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। কেননা, তার নামটি ছিল সোহায়ল বা সহজ।

অনেক আলোচনার পর দশ দফা ভিত্তিক একটি চুক্তিনামার খসড়া প্রস্তুত করা হয়। দশ দফা ভিত্তিক খস্‌ড়া চুক্তির মধ্যে কয়েকটি দফা বা শর্ত মুসলমানদের জন্য খুবই কষ্টদায়ক ছিল। যেমন ঃ (১) এ বৎসর মুসলমানদেরকে ওমরা করতে দেয়া হবে না (২) আগামী বৎসর নবীজী ও মুসলমানদেরকে তিন দিনের জন্য মক্কায় অবস্থান করে ওমরা করার সুযোগ দেয়া হবে। তবে সাথে উন্মুক্ত

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

তরবারী রাখা যাবে না (৩) মক্কার কেউ মুসলমান হয়ে মদিনায় আশ্রয় নিলে তাকে ফেরত দিতে হবে। (৪) মদিনার কোন মুসলমান মক্কায় আশ্রয় নিলে তাকে ফেরত দেয়া হবে না।

অপর পক্ষে কয়েকটি ধারা ছিল যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য। যেমন (৫) আগামী দশ বৎসরের জন্য যুদ্ধ বিরতি বহাল থাকবে। (৬) মক্কা সংলগ্ন বনু বকর গোত্র কোরাইশদের আশ্রয়ে থাকবে এবং মদিনা সংলগ্ন বনু খোযাআ গোত্র নবী করিম (দঃ)-এর আশ্রয়ে থাকবে। (৭) এই দুই গোত্রের যে কোন একটির উপর হামলা করা হলে চুক্তির শর্ত ভঙ্গ হয়ে যাবে (৮) চুক্তির মেয়াদকালে উভয় পক্ষের লোকজন মক্কা ও মদিনায় অবাধে যাতায়াত করতে পারবে। **(৯) চুক্তির মেয়াদকালে যার যার ধর্ম পালন ও প্রচার করার স্বাধীনতা থাকবে।**

শেষোক্ত ধারাগুলোর মধ্যে নবী করিম (দঃ) আপন নবুয়তী জ্ঞান দ্বারা সুদূর প্রসারী বিজয় লক্ষ্য করে চুক্তি স্বাক্ষরে সম্মতি দিলেন। চুক্তিনামা স্বাক্ষরের জন্য পেশ করা হলে নবী করিম (দঃ)-এর নাম এভাবে লেখা হলো-"মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (দঃ)-এর পক্ষে" ...... । সোহায়ল একথায় আপত্তি জানিয়ে বললো- "রাসুলুল্লাহ" শব্দটি বাদ দিতে হবে এবং তদস্থলে "ইবনে আবদুল্লাহ" লিখতে হবে। হযরত ওমর রাগে গর্জে উঠলেন। এমন অপমানজনক শর্তে কিভাবে চুক্তি হতে পারে- ইয়া রাসুলাল্লাহ? নবী করিম (দঃ) শান্তস্বরে বললেন, **"আমিতো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর রাসুল- এটা লিখা বা না লিখার মধ্যে এমন কিছু আসে যায়না। আমি যে ইবনে আবদুল্লাহ্- এটাও তো সত্য। হযরত আলীকে 'রাসুলুল্লাহ' শব্দটি মুছে ফেলতে তিনি নির্দেশ দিলেন। হযরত আলী (রাঃ) আদবের সাথে ঐ শব্দ মুছে ফেলতে অস্বীকৃতি জানালেন। একদিকে নির্দেশ পালন করা ওয়াজিব-অন্যদিকে আদব রক্ষা করা ফরয। নির্দেশ পালনের উপরে হলো আদবের স্থান।**

তাই হযরত আলী (রাঃ) অস্বীকৃতি জানিয়ে আদব রক্ষা করলেন (সোবহানাল্লাহ)। নবী করিম (দঃ) আবদুল্লাহ শব্দটি নিজহাতে লিখে দিলেন। আল্লামা খরপুতি (রঃ) কাছিদায়ে বুরদা শরীফের ব্যাখ্যায় লিখেছেন-

وَفِيْ حَدِيْثٍ يُرْوٰى عَنْ مُعَاوِيَةَ اَنَّهٗ كَانَ يَكْتُبُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فَقَالَ لَهٗ اِلْقِ الدَّوَاةَ وَحَرِّفِ الْقَلَمَ وَاَقِمِ الْبَاءَ وَفَرِّقِ السِّيْنَ وَلَا تُعَوِّرِ
الْمِيْمَ مَعَ اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَكْتُبْ وَلَمْ يَقْرَأْ ـ

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

অর্থাৎ-"হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) হতে হাদীস বর্ণিত আছে যে, তিনি হুযুর (দঃ)-এর সামনেই অহী লিখার কাজ করতেন। রাসুলে পাক (দঃ) তাঁকে এভাবে নির্দেশ দিতেন-"দোয়াত এভাবে রাখ, কলমকে ঘুরাও, "বা" হরফ সোজা করো, "ছীন" হরফটি পৃথক করে লিখ, মীম হরফকে বাকা করোনা"- অথচ তিনি (দঃ) লিখার পদ্ধতি কোরআন নাযিলের পূর্বে কোনদিন শিখেননি এবং পূর্ববর্তী কোন কিতাবও পাঠ করেননি" (খরপুতি-শরহে বুরদা)। বুঝা গেল-আল্লাহ্পাক কোরআন শিক্ষা দেয়ার সাথে সাথে কোরআন লিখন পদ্ধতিও শিক্ষা দিয়েছেন। তা না হলে তিনি নির্দেশ দিতেন কি করে?

এতে প্রমাণিত হলো- নবী করিম (দঃ) প্রচলিত অর্থে নিরক্ষর ছিলেননা- বরং তিনি ছিলেন উম্মি বা সৃষ্টির মূল। তাফসীরে রুহুল বয়ানের গ্রন্থকার সুরা আরাফে উম্মি শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন- "নবী করিম (দঃ)-এর উম্মি হওয়ার অর্থ-তিনি সৃষ্টির মূল-অর্থাৎ উম্মুল খালায়েক। যেমন, উম্মুল কোরা মক্কা শরীফকে বলা হয় এবং উম্মুল কোরআন সুরা ফাতিহাকে বলা হয়-তদ্রূপ উম্মি শব্দটির অর্থ সৃষ্টির মূল। ইহা নবী করিম (দঃ)-এর একক বৈশিষ্ট্য। অন্য কোন নবী এই উপাধীতে ভূষিত ছিলেননা। দুনিয়ার কলম কাগজের সাহায্য নেয়ার কোন প্রয়োজনই হয়নি নবী করিম (দঃ)-এর। কেননা, আল্লাহর কুদ্‌রতী কলম ছিল নবী করিম (দঃ)-এর আজ্ঞাবহ খাদেম এবং লওহে-মাহফুয ছিল হুযুর (দঃ)-এর কিতাব বা দৃষ্টিস্থল। (তাফসীরে রুহুল বয়ান ৯ পারা)।

যুক্তিতেও বলে-তিনি নিরক্ষর হতে পারেন না। কেননা, তিনি সাহাবীদেরকে দিয়ে কোরআন লিখিয়েছেন এবং নিজে হরফ লেখার পদ্ধতির নির্দেশনা দিয়েছেন। নিজে নিরক্ষর হলে কি বিশুদ্ধভাবে অহী লেখানো সম্ভব হতো? তবে তিনি ইচ্ছা করেই লিখতেন না। (খরপুতি শরহে কাসিদায়ে বুরদা)।

পানির ফোয়ারা ঃ

হোদায়বিয়ার ময়দানে নবী করিম (দঃ) সাহাবাগণকে নিয়ে ১৯ দিন অবস্থান করেছিলেন। শুষ্ক মরুভূমিতে এমনিতেই পানির অভাব। চৌদ্দশত সাহাবীর সাথে রক্ষিত পানি অল্প সময়ের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়। সাহাবাগণ পানির অভাবের কথা এবং তীব্র পিপাসার কথা নবী করিম (দঃ)-এর খেদমতে পেশ করলেন। হুযুর আকরাম (দঃ) এরশাদ করলেন-"কারও কাছে সামান্য কিছু পানি আছে কিনা"? সাহাবাগণ আরয করলেন-আপনার লোটাতেই কেবল সামান্য পানি আছে। হুযুর পুরনূর (দঃ) লোটার উপরে পবিত্র ডান হাত স্থাপন করলেন। অমনি পাঁচ আঙ্গুলের চারটি ফাঁক দিয়ে ৪টি পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হলো।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

পানি উপচে পড়তে লাগলো। সাহাবাগণকে তিনি আহ্বান করলেন–যার যার প্রয়োজন মত পানি সংগ্রহ করার জন্য। চৌদ্দশত সাহাবী নিজেদের প্রয়োজনীয় পানি সংগ্রহ করে নিলেন। তারপর নবী করিম (দঃ) হাত মোবারক তুলে নিলেন। পানিপ্রবাহ সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেল। বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) উক্ত হাদীস বর্ণনাকালে তাঁকে প্রশ্ন করা হলো- **"আপনারা ঐ সফরে কতজন সাথী ছিলেন? উত্তরে তিনি বললেন– আল্লাহর শপথ! যদি আমরা একলক্ষ লোকও হতাম, তবুও ঐ পানি আমাদের প্রয়োজন মেটাতে পারতো। আমরা ছিলাম মাত্র চৌদ্দশত"** (সোবহানাল্লাহ)।

ইমামে আহ্লে সুন্নাত আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহঃ) উক্ত ঘটনাকে উর্দূ কবিতায় কত সুন্দর করে বর্ণনা করেছেনঃ

"নূরকে চশ্মে লেহ্রায়ে দরিয়া বহে
অংলিউ কি কারামত পে লাখো ছালাম"।

অর্থ ঃ 'নূরের নহর নয়তো- যেন সাগর বহমান
অঙ্গুলীরই কারামতে লাখো ছালাম'।

উক্ত ঘটনায় কয়েকটি শিক্ষণীয় বিষয় –

(১) পানির সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে একটি আবাদী এলাকা বিরান হয়ে যায়। সরকারী ব্যবস্থাপনায় ইঞ্জিনিয়ার, পাইপ, টিউব সংগ্রহ করে এবং অনেক অর্থ ব্যয় করে পানির ব্যবস্থা করতে হয়। তাও আবার সময় সাপেক্ষ। কিন্তু আল্লাহর প্রিয় হাবীব (দঃ) সামান্য পানির উপর দস্ত মোবারক রাখার সাথে সাথে পানির প্রস্রবন প্রবাহিত হয়। এই পানির উৎস কোথায়? বেহেস্তের চারটি নহর ছিল এর উৎস। **হুযুরের হাত ছিল জমিনে–কিন্তু তার ক্রিয়া হয়েছিল জান্নাতে। এটা ছিল প্রাকৃতিক ক্ষমতার উর্দ্ধের শক্তি। এজন্যই "নবী কিরম (দঃ) ছিলেন অতিমানব এবং মহামানব। নবী করিম (দঃ) প্রয়োজনের সময় গায়েবী পানি দিতে পারেন– এটা ছিল সাহাবীগণের আক্বিদা। এই আকিদার নামই ছুন্নী আকিদা।**

(২) সামান্য পানিকে উছিলা করে পানির সাগর প্রবাহিত করার মধ্যে হেকমত হলো- "নাই" থেকে কিছু পয়দা করা আল্লাহর একক কুদরত। আর নবী করিম (দঃ) সামান্য কোন জিনিসকে উপলক্ষ করে তাতে বৃদ্ধি ঘটাতেন। এটা ছিল আল্লাহর সাথে আদ্দব রক্ষা করা।

(৩) প্রশ্নঃ পৃথিবীর কোন্ পানি সর্বোত্তম? এর জবাব হলো- সাধারণ পানির চেয়ে অযুর পানি উত্তম। অযুর পানির চেয়ে যমযমের পানি উত্তম। আর যমযমের

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

পানির চেয়েও উত্তম হলো হুযুর (দঃ)-এর দস্ত মোবারক হতে প্রবাহিত পানি (শামী)। তদ্রুপ দুনিয়ার যে মাটি নবী করিম (দঃ)-এর দেহ মোবারকের সাথে সংলগ্ন অর্থাৎ রওযা মোবারকের পবিত্র মাটি– তা আসমান, জমিন, কা'বা, বাইতুল মামুর, এমনকি– আরশ মোয়াল্লা হতেও উত্তম (শামী-যিয়ারত অধ্যায়)। **নবীর সাথে সম্পর্কের কারণে যদি মাটির এই মর্তবা হয়, তাহলে যে অন্তরে নবীর নূর ও জ্যোতি বিদ্যমান– সে অন্তরের মর্যাদা কি হতে পারে? আল্লাহ্ সকলকে উপলব্দির শক্তি দান করুন।**

মো'জেযা দু'প্রকার ঃ **ইখ্‌তিয়ারী ও ইয্‌তিরারী**

মোদ্দা কথা হলো–হোদায়বিয়ার একটি সফরেই অসংখ্য মো'জেযার প্রকাশ ঘটে। হুযুরের কোন কোন মো'জেযা ছিল ইখতেয়ারাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন। এটাকে ইখতেয়ারী মো'জেযা বলা হয়। যেমন-অঙ্গুলী থেকে পানি বের করা, স্বল্প খাদ্যে বরকত দান, বৃক্ষের আগমন ও প্রত্যাবর্তন, পানির উপর পাথরের সন্তরণ– ইত্যাদি।

আর কিছু মো'জেযা ছিল ইয্‌তিরারী বা এখতিয়ার বহির্ভূত। যেমন কোন কোন গায়েবের সংবাদ, কেয়ামতের তারিখ। এগুলো আল্লাহর ইচ্ছাধীন। (জা'আল হক-মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী)। তবে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নিজে ব্যাপক ইলমে গায়েব শিক্ষা দিয়েছেন বলে ছুরা নিছার ১১৩ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ আছে। (জালালাঈন দেখুন)।

ওহাবীরা প্রথম ধরনের মো'জেযাকে অস্বীকার করে। তারা বলে- "নবীর ইচ্ছায় কিছুই হয় না। মো'জেযার মধ্যে নবীর কোন এখতেয়ার নেই"। নাউযুবিল্লাহ। (দেখুন বদরে আলম মিরাটি -এর তরজুমানুস সুন্নাহ– ইসলামিক ফাউণ্ডেশন)।

সুস্পষ্ট বিজয় ঃ

হোদায়বিয়ার সন্ধিটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে অসন্তোষজনক মনে হলেও সুক্ষ্ম কুটনৈতিক বিচারে এটি মুসলমানদের জন্য বিরাট স্পষ্ট বিজয় সুচনা করেছিল। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এই সন্ধিকে "ফাতহাম মুবিনা" বা 'সুদূর প্রসারী স্পষ্ট বিজয়' বলে কোরআনে উল্লেখ করেছেন এবং মুসলমানগণকে শান্ত্বনা দিয়েছেন। সাথে সাথে এ ঘোষণাও দিয়েছেন যে, "নবী করিম (দঃ)-এর উছিলায় তাদের পূর্বাপর গুনাহসমূহ আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন" (সুরা ফাতাহ, আয়াত-২)

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

মদিনার পথে ঃ

নবী করিম (দঃ) হোদায়বিয়ায় উট কোরবানী করে মাথা মুন্ডন করে ওমরার কাজ এখানেই সম্পন্ন করেন। সকলকে নিয়ে ১৯ দিন পর তিনি মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন। প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যে "কুরা গামীম" নামক স্থানে ১০ই মুহররম আশুরার দিনে সুরা ফাতাহ-এর প্রথম কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়। হোদায়বিয়ার সন্ধির শর্তাবলীর অন্তর্নিহিত গুরু রহস্য অনুধাবন করতে সাহাবায়ে কেরামের কিছুটা অসুবিধা হয়েছিল। রাসুলে পাকের নির্দেশ শিরোধার্য করে নিলেও তাঁদের মনে ছিল বাহ্যিক ব্যর্থতার গ্লানি। তাই আল্লাহ তায়ালা তাঁদের পূর্বাপর ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করার সুসংবাদবাহী শান্তনামূলক নিম্ন আয়াতটি নাযিল করলেন-

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ-

অর্থ ঃ "হে প্রিয় রাসুল! জেনে রাখুন-এটা পরাজয় নয়- বরং আমরা আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি। আপনার উছিলায়ই আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের গুনাহসমূহ আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন"। (তাফসীরে কানযুল ঈমান ও রুহুল বয়ান)। যারা বলে- "নবীজীর গুণাহ ক্ষমা করা হয়েছে" তারা অপব্যাখ্যাকারী ও পথভ্রষ্ট। কেননা, নবীগণ সবসময়ই বে-গুণাহ্ বা মাসুম। তাই আয়াতটির সরাসরি শাব্দিক অর্থ করা মারাত্মক ভুল। সেজন্য তাফসীর ভিত্তিক অর্থ করতে হবে। কোরআন মজিদের বাংলা অনুবাদে শাব্দিক অর্থ করা জায়েয নয়-বরং তাফসীর ভিত্তিক অনুবাদ করতে হবে। এই দৃষ্টিতে দেখতে গেলে একমাত্র আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরেলী (রহঃ)-এর উর্দূ অনুবাদ "কানযুল ঈমান" স্বার্থক অনুবাদ প্রমাণিত হয়েছে।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

চল্লিশতম অধ্যায়

খায়বর যুদ্ধ

প্রসঙ্গ ঃ দূর্গ জয়ের গায়েবী সংবাদ, হযরত আলীর চক্ষুরোগ থুথু মোবারকের মাধ্যমে প্রশমন, ডুবন্ত সূর্য্যকে পুনঃ উদিতকরণের মো'জেযা প্রদর্শন, ইহুদী রমনী কর্তৃক খাদ্যে বিষ মিশ্রণ ও নবীজীর ক্ষেত্রে বিষক্রিয়া নিষ্ক্রিয়করণ– ইত্যাদি

ঘটনা ঃ

খায়বর যুদ্ধ সংঘটিত হয় ৭ম হিজরীর মুহররম ও সফর মাসে। ১৯ দিন খায়বরের ইহুদী দূর্গ অবরোধের পর অবশেষে হযরত আলী (রাঃ)-এর হাতে দূর্গের পতন হয়।

বিবরণ ঃ

মদিনা হতে বিতাড়িত বনূ নযীর ও বনু কাইনুকা ইহুদী গোত্রদ্বয় খায়বরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল এবং তারা মদিনা শরীফ আক্রমণের ষড়যন্ত্র করছিল। মদিনা থেকে সিরিয়ায় বাণিজ্য কাফেলা যাতায়াতের পথে খায়বরের ইহুদীরা উৎপাত করতো। তাই হোদায়বিয়া হতে প্রত্যাবর্তনের পরপরই **নবী করিম (দঃ) চৌদ্দশত পদাতিক ও দুই শত অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে খায়বর যাত্রা করেন।** মুহররমের শেষের দিকে তিনি এই যুদ্ধযাত্রা করেন। লটারীর মাধ্যমে সাথে নেন বিবি উম্মে সাল্মা (রাঃ) কে।

বোখারী শরীফে উল্লেখ আছে, নবী করিম (দঃ) রাত্রিবেলায় খায়বরে উপস্থিত হন। কিন্তু রাতে আক্রমণ থেকে বিরত থাকেন। এটাই ছিল তাঁর নিয়ম। ভোরে ইহুদীরা দূর্গ হতে বের হয়ে মুসলিম বাহিনী দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায়। তারা চিৎকার করে বলে উঠে– আশ্চর্য্য! মোহাম্মদ (দঃ) এবং তাঁর বাহিনী এসে গেছে!

নবী করিম (দঃ) তাদের উদ্দেশ্যে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনী দিয়ে বলে উঠলেন–"আমরা যে ময়দানেই অবতরণ করি, সেখানকার বাসিন্দাদের প্রাতঃকাল ভয়াবহ হয়ে থাকে"। একথা বলেই তিনি সেনাবাহিনীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দূর্গ অবরোধ করার নির্দেশ দেন। কিন্তু তাঁরা ইহুদীদের মজবুত প্রাচীর- অবরোধ ভাঙ্গতে পারেননি। ১৯ দিন পর অবশেষে তিনি ঘোষণা দিলেন, "আগামীকাল আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে ইসলামী পতাকা ও নেতৃত্বের দায়িত্ব

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

দেবো- যাকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল (দঃ) বিশেষভাবে ভালবাসেন। আল্লাহ তাঁর মাধ্যমেই বিজয় দেবেন"।

পরদিন সকালবেলা সকল সাহাবী নবী করিম (দঃ)-এর খেদমতে হাযির হলেন- নতুন নেতা বরণ করার জন্য। সকলেরই আশা ছিল-নবী করিম (দঃ) হয়তো তাঁর হাতে পতাকা দেবেন। কিন্তু নবী করিম (দঃ) হযরত আলীকে খোঁজ করলেন। তখন হযরত আলী (রাঃ) চোখের অসুখের কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন। সকলে বললেন- তিনি চোখের অসুখে অসুস্থ। নবী করিম (দঃ) তাঁকে ডেকে এনে তাঁর চোখে সামান্য থুথু মোবারক লেপন করে দিলেন এবং আরোগ্যের জন্য দোয়া করলেন। সাথে সাথে হযরত আলীর চোখ ভাল হয়ে গেল। এরপর থেকে তাঁর ঐ চোখে আর কোন দিন অসুখ হয়নি। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, এরপর থেকে আমি ঐ চোখে অধিক পরিষ্কার দেখতাম।

[যুদ্ধ জয়ের ভবিষ্যৎবানী ছিল নবী করিম (দঃ)-এর ইল্‌মে গায়েবের মোজেযা এবং চক্ষুরোগ আরোগ্য করন ছিল সর্বরোগহরা থুথু মোবারকের বরকত।]

হুযুর (দঃ) হযরত আলীর হাতে পতাকা দিয়ে বললেনঃ اَنْتَ اَسَدٌ مِّنْ اَسَدِ اللّٰهِ "তুমি শেরে খোদা-আছাদুল্লাহ"*। উল্লেখ্য- হযরত আলী (রাঃ)-এর কয়েকটি উপাধী স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক প্রদত্ত। যথা ঃ (১) আছাদুল্লাহ বা শেরে খোদা (২) কাশিফুল কুরুবাত বা মুশকিল কুশা (৩) মাওলা আলী (৪) আবু তুরাব। (আল-বেদায়া)

পতাকা হাতে নিয়ে হযরত আলী (রাঃ) আরয করলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরা যুদ্ধ করেই ইহুদীদেরকে মুসলমান বানাবো। নবী করিম (দঃ) তাঁকে উপদেশ দিয়ে বললেন, "একটু ধীরে সুস্থে কাজ করো। প্রথমে তাদের দূর্গ অবরোধ করে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেবে এবং আল্লাহর বিধি-বিধান সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করবে। আল্লাহর শপথ! যদি একটি লোককেও আল্লাহ তায়ালা হেদায়াত নসিব করেন, তাহলে তা হবে অজস্র মূল্যবান লাল উটের চেয়েও উত্তম"।

হযরত আলী (রাঃ) সেদিন যে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন, তা ছিল ইতিহাসের বিস্ময়কর ঘটনা। তিনি একাই আল-কামুছ দূর্গের লোহার ভারী গেইটটি উৎপাটন করে দূরে নিক্ষেপ করে ফেলে দিলেন এবং ভিতরে প্রবেশ করে আক্রমণ পরিচালনা করলেন। এই আক্রমণে দূর্গ জয় হলো। ইহুদীদের ৯৩ জন এই যুদ্ধে নিহত হয় এবং ১৫ জন মুসলমান সাহাবী (রাঃ) শাহাদত বরণ করেন।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ইহুদী সর্দার আবুল হোকাইক ও তার পরিবারের নিকট হতে গাধার চামড়ার বাক্সে ও সিন্ধুকে রক্ষিত হীরা-মানিক্য ও ধন-সম্পদ উদ্ধার করা হয়। অসংখ্য গণিমতের মাল হস্তগত হয়। বিজিত অঞ্চল কতিপয় শর্তের মাধ্যমে করদ রাজ্য হিসাবে তাদের হাতে ফিরিয়ে দেয়া হয়। শুধু ফিদাক নামক অঞ্চলটি হুযুর (দঃ) নিজ অধিকারে নিয়ে আসেন-পরিবার পরিজনের ভরণ-পোষণের উদ্দেশ্যে।

ঐ যুদ্ধে প্রাপ্ত হযরত হারুন (আঃ)-এর বংশধর ইহুদী কন্যা হযরত বিবি সফিয়া (রাঃ) কে আজাদ করে মুসলমান বানিয়ে নবী করিম (দঃ) তাঁকে বিবাহ করেন। বিবি সফিয়া (রাঃ)-এর স্বামী ঐ যুদ্ধে নিহত হয়েছিল।

পূর্ব স্বামীর সাথে বিবাহ হওয়ার পর এক রাত্রিতে তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন- "আকাশের চাঁদ টুক্‌রো হয়ে তাঁর কোলে পতিত হয়েছে"। এ স্বপ্ন স্বামীর কাছে খুলে বললে স্বামী তাঁর গালে একটি চপেটাঘাত করে বলেছিল- "চাঁদ-বদন তুল্য অন্য স্বামীর সংসার স্বপ্নে দেখেছো তুমি"। তাঁর সে স্বপ্ন আজ বাস্তবে পরিণত হলো। সে চাঁদ হলেন শিশুকালে চাঁদের খেলার সাথী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)।

বিবি সফিয়া (রাঃ)-এর সাথে হুযুরের বাসর রাতে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) তাঁবু পাহারা দিচ্ছিলেন এই আশংকায় যে- যদি বিবি সফিয়া (রাঃ) কোন অঘটন ঘটিয়ে ফেলেন। ভোরে উঠে রাসুলে করিম (দঃ) পাহারারত আবু আইয়ুব আনসারীকে (রাঃ) দেখে হেসে বললেন-"তুমি আমার হেফাযতের নিয়তে রাতভর বিনিদ্র-রজনী কাটিয়েছো-আল্লাহ তোমার দেহকে এভাবে হেফাযত করুন"।

নবী করিম (দঃ)-এর এই ভবিষ্যৎবানী ও দোয়া অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেলো। ৪৮ হিজরী সনে আমীর মোয়াবিয়া (রাঃ)-এর খেলাফতকালে কুস্‌তুনতুনিয়া (বর্তমান ইস্তাম্বুল) অভিযানে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) ইস্তাম্বুলে গিয়ে প্লেগ-রোগে আক্রান্ত হয়ে শহীদ হন। ইস্তাম্বুল জয় করা তখন সম্ভব হয়নি। সেখানকার শাসনকর্তা মুসলমানদের কাছে অনুরোধ করে ইস্তাম্বুলের দূর্গ-প্রাচীরের নিকটে হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ) কে দাফন করার ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীকালে হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ)-এর মাযারের উছিলায় সেখানে মুসলিম সমাজ গড়ে উঠে এবং ওসমানী খলিফাগণ ইস্তাম্বুল জয় করতে সক্ষম হন।

মাযার সংরক্ষণ ঃ

মাযার ও স্মৃতি-নিদর্শনসমূহ রক্ষা করার মধ্যে ইসলামের অসংখ্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। অলী-গাউছদের মাযারের উছিলায় সেখানে পরবর্তীতে মুসলিম সমাজ

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

গড়ে উঠে। যেমন– আজমীর ও সিলেট। এটা ইতিহাসের বাস্তব প্রমাণ। কাজেই অলী-গাউছদের স্মৃতি-নিদর্শন ধ্বংস না করে তা সংরক্ষণ করাই কর্তব্য। মাযার সমূহ হচ্ছে ইসলামী ঐতিহ্যের প্রতীক বা শিয়ারে ইসলাম (তাফসীরে রুহুল বয়ান)।

দুঃখের বিষয়, মক্কা ও মদিনায় ওহাবী শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯২৫-২৬ সালে সেখানকার সাহাবী ও অলীগণের হাজার হাজার মাযার ধ্বংস করে দেয়া হয়। বাদশাহ আবদুল আজিজের নির্দেশে একাজ করা হয়েছে। বিবি খাদিজা (রাঃ) ও বিবি ফাতেমা (রাঃ) সহ হাসান-হোসাইন বংশের ইমামগণের মাযার ধূলিস্যাত করে দেয়া হয়েছে। মাওলানা মোহাম্মদ আলী জাওহার ১৯২৫-২৬ সালে মক্কা মদিনায় একটি ভারতীয় খেলাফত প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে ঐ ধ্বংসলীলার চিত্র সংগ্রহ করেন। আল্লামা আরশাদুল ক্বাদেরী (বিহার) তাঁর 'তাবলীগী জামাত' গ্রন্থে এসব ধ্বংসলীলার চিত্রসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। বাদশাহর কর্মকান্ডে তখন ভারতের মুসলমানদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। এভাবে ৮ বছর পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে হজ্জ্ব হতে পারেনি।

বর্তমানে সৌদী আরবে মসজিদে নববীতে সংরক্ষিত নবী করিম (দঃ) ও তাঁর সাহাবীদ্বয়ের (রাঃ) রওযা মোবারক ব্যতীত অন্য কোন মাযারের চিহ্ন নেই। আমাদের দেশের ওহাবীপন্থী তথাকথিত রাজনৈতিক দলগুলোও দেশের অলী-আল্লাহগণের মাযারসমূহ ধ্বংস করার পরিকল্পনা করে রেখেছে– যদি কোন সময় তারা সে সুযোগ পায়।

ওহাবীপন্থী অর্ধশিক্ষিত ওয়ায়েজীনরা বলে বেড়ায়– সৌদী আরবে কোন পাকা মাযার নেই। কাজেই এটা হারাম। এসব জ্ঞানপাপীরা জেনে-শুনেই ইতিহাস বিকৃত করছে এবং মাযার ধ্বংসের আসল তথ্য জনগণকে জানাচ্ছেনা। ইরাক-ইরান-মিশর-লিবিয়া-জর্দান-সিরিয়া সর্বত্রই অসংখ্য নবী-অলীগণের পাকা মাযার বিদ্যমান রয়েছে। ঐ সব দেশের মুসলমানরা তুলনামূলকভাবে ইসলামী জযবায় উজ্জীবিত। ইরাকে শীশ পয়গম্বর (আঃ), হযরত ইউনুছ (আঃ), হযরত আইউব (আঃ)-এর মাযারসহ অসংখ্য সাহাবায়ে কেরাম, ওলী গাউছগণের মাযার এখনও অক্ষত অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে। ইরাকের মাযার সমূহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছিলেন শহীদ প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন (রহঃ)।

খায়বরের ইহুদী নারীর বিষ প্রয়োগ ঃ খায়বরের যুদ্ধের পর জয়নব বিনতে হারেছ নাম্নী জনৈকা ইহুদী মহিলা ছাগলের ভুনাগোস্তে বিষ মিশিয়ে নবী করিম (দঃ)-

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

এর খেদমতে হাদিয়া হিসাবে প্রেরণ করেছিল। নবী করিম (দঃ) এবং কতিপয় সাহাবী উক্ত ভূনা গোস্তের কিছু অংশ খেয়ে ফেললেন। নবী করিম (দঃ) হঠাৎ বলে উঠলেন, তোমরা সকলে হাত তুলে নাও এবং খানা বন্ধ করো। নবী করিম (দঃ) উক্ত ইহুদী মহিলাকে ডেকে আনলেন এবং গোস্তে বিষ মিশানোর কথা জিজ্ঞাসা করলেন। মহিলা ঘটনা স্বীকার করলো এবং নবীজী কিভাবে বিষের ঘটনা জানলেন- তা জানতে চাইলো। নবী করিম (দঃ) এরশাদ করলেন, **"ছাগলের সামনের দুই বাহু আমাকে এই সংবাদ দিয়েছে"**।

মহিলা বললো-আমার উদ্দেশ্য ছিল, যদি আপনি নবী হয়ে থাকেন, তা হলে বিষের ক্রিয়া আপনার মধ্যে নিশ্চয়ই হবে না। আর যদি নবী না হন, তাহলে বিষের ক্রিয়ায় আপনি শহীদ হলে আমরা নিস্তার পাবো"।

উক্ত বিষে কতিপয় সাহাবী শহীদ হলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন বুশ্‌র ইবনে বারা। কিন্তু নবী করিম (দঃ) কে বিষে ক্রিয়া করেনি। নবী করিম (দঃ) নিজের বেলায় তাকে ক্ষমা করলেন। কিন্তু সাহাবীগণের আত্মীয়গণের কাছে তাকে হস্তান্তর করলেন। তারা উক্ত মহিলাকে খুনের অপরাধে হত্যা করলেন। নবী করিম (দঃ)-এর বেলায় বিষ তাৎক্ষণিক ক্রিয়া না করে ইনতিকালের সময় পুনরায় ক্রিয়া করতে থাকে। এতে নবী করিম (দঃ) প্রত্যক্ষ শাহাদতের মর্যাদাও লাভ করেন।

খায়বর হতে মদিনার পথে সাহ্‌বা নামক স্থানে অস্তমিত সূর্য্যের পূনরোদয়ের ঘটনাঃ

কাযী আয়ায, ইমাম তাহাভী-প্রমূখ মোহাদ্দেসগণ হযরত আস্‌মা বিন্‌তে ওমায়ছ (রাঃ), হযরত আবু সায়ীদ খুদ্‌রী (রাঃ), হযরত আবু হোয়ায়রা (রাঃ) প্রমূখ সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণনা করেন-

"খায়বর থেকে মদিনায় প্রত্যাবর্তনকালে সাহ্‌বা নামক স্থানে নবী করিম (দঃ) তাঁবু ফেলেন। সকলে মিলে আসরের নামায আদায় করেন। কিন্তু হযরত আলী (রাঃ) তখনও আসর নামায আদায় করেননি। এমন সময় নবী করিম (দঃ)-এর উপর ওহী নাযিল হলো। তিনি হযরত আলীকে ডেকে তাঁর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। ওহী নাযিল মাগরিব পর্যন্ত চলতে লাগলো। ইত্যবসরে সূর্য্য ডুবে গেল। এমন সময় জিব্রাইল (আঃ) বিদায় নিলেন। নবী করিম (দঃ) হযরত আলীকে জিজ্ঞাসা করলেন-তুমি কি আসর পড়েছ? হযরত আলী বললেন, জ্বী-

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

না। নবীপ্রেমে হযরত আলী আসর নামায কাযা করে ফেললেন। নামায হলো আমল–আর নবীপ্রেম হলো ঈমান। এমতাবস্থায় ঈমান রক্ষা করাই প্রথম ফরয। নবী করিম (দঃ) সঙ্গে সঙ্গে দোয়া করলেন **"হে আল্লাহ! আলী তোমার এবং তোমার রাসুলের খেদমতে এতক্ষণ নিয়োজিত ছিল। তাই আসর কাযা হয়ে গেছে। হে আল্লাহ! তুমি সূর্য্যকে ফিরিয়ে দাও"**।

হযরত আস্‌মা বিন্‌তে ওমায়ছ (রাঃ) বলেন, আমি দেখতে পেলাম যে, অস্তমিত সূর্য্য পুনরায় পশ্চিম গগনে উদিত হলো এবং অনেকটুকু উপরে উঠে এলো। ইত্যবসরে হযরত আলী (রাঃ) আছর পড়ে নিলেন। এরপর দেখলাম– সূর্য্য পুনরায় ডুবে গেল। আস্‌মা (রাঃ)-এর বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

فَرَأَيْتُهَا غَرَبَتْ ثُمَّ طَلَعَتْ بَعْدَ اَنْ غَرَبَتْ-

অর্থাৎ ঃ **"প্রথমে দেখলাম- সূর্য্য অস্তমিত হয়ে গেছে। এরপর দেখলাম–অস্তের পর পুনরায় উদিত হয়েছে"**।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

نَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأْسُهُ فِيْ حِجْرِ عَلِيٍّ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الْعَصْرَ حَتّٰى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَلَمَّا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَالَهُ فَرُدَّتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ حَتّٰى صَلّٰى ثُمَّ غَرَبَتْ ثَانِيًا : (اَلْبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ ج ٦)

অর্থ–**"নবী করিম (দঃ) হযরত আলীর কোলে মাথা মোবারক রেখে শয়ন করলেন। হযরত আলী তখনও আছর পড়তে পারেননি। ইত্যবসরে সূর্য ডুবে গেলো। অতঃপর নবী করিম (দঃ) গাত্রোত্থান করলেন এবং আলীর জন্য দোয়া করলেন। সূর্য তাঁর জন্য ফিরে আসলো। ইত্যবসরে আলী (আছর) নামায আদায় করলেন। এর কিছুক্ষণ পরেই সূর্য পুনরায় ডুবে গেলো"** (বেদায়া নেহায়া ৬ষ্ঠ খন্ড ৭৯ পৃষ্ঠা)। **একই দিনে দু'বার সূর্য্যোদয় ও দু'বার সূর্য্যাস্তের ঘটনা এটাই প্রথম। রাসুলে পাকের মো'জেযার গুণ-ই আলাদা।**

নবী করিম (দঃ) হলেন একমাত্র মহামানব– যার খাতিরে ডুবন্ত সূর্য পুনঃ উদিত হয়েছে। কেয়ামতের পূর্বে আর একবার সূর্য্য পশ্চিম আকাশে পুনঃ উদিত হয়ে ডুবে যাবে বলে হাদীসে এসেছে। এরপর কারো তওবা কবুল হবে না।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

পৃথিবীর ১৩ লক্ষ গুণ বড় সূর্য্যের নিয়মিত গতি পাল্টিয়ে দেয়া চাট্টিখানি কথা নয়। আল্লাহর কত প্রিয় হলে তাঁর আবেদনে নিয়ম বহির্ভূতভাবে সূর্যকে তিনি উল্টো ফিরিয়ে আনেন–এটা তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সব নিয়মই রাসুলে পাকের অধীন।

মক্কা শরীফে চাঁদ দ্বিখন্ডিত হওয়া, সাহ্বা নামক স্থানে সূর্যের পুনঃ উদয় হওয়া এবং গতি উল্টিয়ে যাওয়া কত বড় অলৌকিক শক্তি ও মো'জেযার প্রমাণ বহন করে–তা বিবেচনা করলে একজন ঈমানদার অলী–আল্লাহ হয়ে যেতে পারেন। উর্ধ্বজগতে নবীজীর কর্তৃত্বের ইহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ঃ ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাইয়েম, ইবনে কাছির– প্রমূখ খারেজী আলেমগণ এই ঘটনাকেও অস্বীকার করেছে। বর্তমানে ওহাবী দেওবন্দী আলেমগণও ইবনে তাইমিয়াকে অনুসরণ করে চলে এবং এই বর্ণনাকে জইফ, মউযু ইত্যাদি বলে প্রত্যাখ্যান করে। আল্লাহ কখন তাদের হেদায়াত দান করবেন–তা তিনিই জানেন।

ইমাম তাহাভী ও কাযী আয়ায (রহঃ)-এর ন্যায় বিশ্ববিখ্যাত মোহাদ্দেসগণ এই হাদিসকে সহী ও নির্ভরযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন। ওহাবীদেরকে উদ্দেশ্য করে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহঃ) বলেন

سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک-
اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی- ۔

চন্দ্র হলো দ্বিখন্ডিত–সূর্য উল্টোপথে,
অন্ধ নজদী! হয়নি একীন– নবীজীর কুদরতে? (লেখক)

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

একচল্লিশতম অধ্যায়

বিদেশে ইসলামের দাওয়াত ঃ ৭ম হিজরী

প্রসঙ্গ ঃ ছয়জন সাহাবী দূতকে একমূহুর্তে ঐ দেশীয় ভাষা শিক্ষাদান, নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণ, পারশ্যরাজের বেয়াদবী ও তার পরিণাম, রুম সম্রাট ও মিশর অধিপতি কর্তৃক পত্রের সম্মান প্রদর্শন।

হোদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির পর নবী করিম (দঃ) মদিনায় প্রত্যাবর্তন করে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধিপতিদের নামে ইসলামী দাওয়াতপত্র লিখে ছয়জন সাহাবীকে দূত মনোনীত করে তাঁদের কাছে পবিত্র পত্র অর্পণ করেন। সাথে কিছু প্রতিনিধি সদস্যও দিলেন। ৭ম হিজরীতে তাঁরা বিভিন্ন রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার প্রাক্কালে সকলেই ঐদেশের ভাষায় কথা বলতে শুরু করলেন। তাঁদের এই ভাষাজ্ঞান অর্জন ছিল নবী করিম (দঃ)-এর নেক নযরের বরকতে।

হযরত আদম (আঃ) পাঁচ লক্ষ–মতান্তরে সাত লক্ষ ভাষা জানতেন (বেদায়া-নেহায়া)। আমাদের প্রিয়নবী (দঃ) যে কেবল বিভিন্ন দেশের মানুষের ভাষাই জানতেন– তা নয়, বরং জ্বীন, পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ- এমনকি, নির্জীব পাথরের সাথেও কথা বলেছেন। হযরত আদম (আঃ) এবং সমস্ত নবীগণের এলেম এক পাল্লায় রাখা হলে আর নবী করিম (দঃ)-এর এলেম অন্য পাল্লায় রাখা হলে এটিই ভারী হবে। **"অন্য নবীগণের এলেম এক ফোটা পানির তূল্য এবং নবী করিম (দঃ)-এর এলেম সাগরতূল্য"** (কাসিদায়ে বুরদা ও রুহুল বয়ান)।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়– দেওবন্দের মাওলানা খলিল আহমদ আম্বেটী বারাহীনে কাতেয়া গ্রন্থে তার একটি স্বপ্ন বৃত্তান্ত এভাবে লিখেছে– "নবী করিম (দঃ) তার সাথে স্বপ্নে দেখা দিয়ে উর্দ্দূতে কথা বলছিলেন। খলিল আহমদ সাহেব জিজ্ঞাসা করলো- হে আল্লাহর রাসুল! আপনি তো আরবীভাষী– উর্দূ শিখলেন কোত্থেকে? উত্তরে নবী করিম (দঃ) নাকি বললেন– "যেদিন থেকে দেওবন্দের ওলামাদের সাথে মেলামেশা শুরু করেছি, সেদিন থেকেই"। **তাহলে বুঝা গেল–দেওবন্দের হুযুরগণ নবীজীর উর্দুর ওস্তাদ।** (নাউযুবিল্লাহ)

ছয়জন সাহাবীকে যিনি একমুহুর্তে অন্য দেশের ভাষা শেখাতে পারেন– তিনি দেওবন্দে এসে উর্দূ শিখবেন কেন (?) কুফরী আর কাকে বলে? দেওবন্দীরা স্বপ্নের দ্বারা নবীজীর ভাষাজ্ঞানের অভাব প্রমাণ করছে। নাউযুবিল্লাহ!

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

যাই হোক, যে ছয়জনকে নবী করিম (দঃ) পত্রবাহক দূত হিসেবে মনোনীত করেছিলেন, তাঁরা হলেন– (১) আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ নাজজাশী আস্হামার দরবারে প্রেরিত হযরত আমর ইবনে উমাইয়া দামিরী (রাঃ), (২) রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের দরবারে প্রেরিত হযরত দাহ্ইয়া কল্বী (রাঃ), (৩) পারশ্যরাজ খসরু পারভেজের দরবারে প্রেরিত হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে হোযাফা সাহ্মী (রাঃ), (৪) মিশর অধিপতি মুকাইকিছ–এর দরবারে প্রেরিত হযরত হাতেব ইবনে আবু বোল্তাআ, (৫) গাসসানী শাসক হারেছের দরবারে প্রেরিত হযরত সুজা ইবনে হাদরামী (রাঃ), (৬) বাহ্রাইন অধিপতি মুন্যির-এর দরবারে প্রেরিত হযরত আলা ইবনে হাদরামী (রাঃ)।

এছাড়াও সুমামা, ওমান, ইয়েমেন- ইত্যাদি স্থানের অধিপতিদের নিকটও দাওয়াতীপত্র প্রেরণ করা হয়েছিল। উক্ত পত্র আরবীতে লিখা ছিল এবং পত্রের নীচে আংটি দ্বারা সই–মোহর অঙ্কিত ছিল। উক্ত সীলে লেখা ছিল– ক্রমান্বয়ে নীচ থেকে উপরের দিকে **"মোহাম্মাদ–রাসুল–আল্লাহ"**। উক্ত মোবারক পত্রের ভাষা ছিল অত্যন্ত সরল অথচ তেজোদীপ্ত। বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট মুসলমান হওয়ার দাওয়াতনামা প্রেরণ করা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিল। কিন্তু সেই কঠিন কাজটিই করেছিলেন আমাদের প্রিয় নবী (দঃ)।

নাজ্জাশীর (রহঃ) ইসলাম গ্রহণ ঃ

সর্বপ্রথম পত্র বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় আবিসিনিয়ায়। আবিসিনিয়ার সম্রাট আসহামা নাজ্জাশী ১৫/১৬ বৎসর পূর্ব হতেই ইসলামের সাথে পরিচিত ছিলেন। নবুয়তের ৫ম সালে মক্কা শরীফ হতে মুসলমানদের দুটি দল আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন এবং নাজ্জাশীর আশ্রয় পেয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত ওসমান (রঃ) ও হযরত রোকাইয়া (রাঃ) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁদের চালচলন– ইত্যাদি দেখে নাজ্জাশী মুগ্ধ হয়েছিলেন– যদিও তিনি ছিলেন খৃষ্টান রাজা।

প্রতিনিধি হযরত আমর ইবনে উমাইয়া দমিরী (রাঃ) পত্র হস্তান্তর করলে বাদ্শাহ্ নাজ্জাশী মনোযোগ দিয়ে পত্র পাঠ করে শুনলেন এবং সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করে জবাবী পত্র লিখলেন এভাবে–

"বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম! আল্লাহর প্রিয় রাসুল মোহাম্মদ (দঃ)-এর খেদমতে আস্হামা নাজ্জাশী (সম্রাট)-এর পত্র। হে আল্লাহর রাসুল। আপনার উপর আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক– যিনি ভিন্ন অন্য কোন মাবুদ নেই। তিনি আমাকে ইসলামের দিকে হেদায়াত দান

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

করেছেন। হে আল্লাহর প্রিয় রাসুল! আপনার পবিত্র দাওয়াতনামা আমি পেয়েছি। আপনি পত্রে হযরত ঈছা (আঃ) সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছেন– তা হুবহু সত্য। আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি– নিশ্চয়ই আপনি সত্য রাসুল। আমি আপনার নিকট ইসলামের উপর বাইআত করলাম এবং আপনার প্রেরিত প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য আপনার চাচাতো ভাই হযরত জাফর ইবনে আবু তালিব-এর নিকটও বাইআত করলাম। আমি তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করলাম। আপনার প্রতিনিধিদলের সাথে আমার ছেলেকে পাঠালাম। নির্দেশ পেলে আমি নিজে খেদমতে হাযির হবো। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি– আপনার যাবতীয় কথা সত্য। ওয়াস সালাম"। (নাজ্জাশী ছিলেন তাবেয়ী)

এই নাজ্জাশী (রহঃ) ৯ম হিজরীতে রমযান মাসে ইনতিকাল করেন। নবী করিম (দঃ) তাবুকের যুদ্ধ হতে সবেমাত্র মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেছেন। মদিনা শরীফ থেকে তিনি নাজ্জাশীর লাশ দেখ্‌তে পেলেন এবং সাহাবীদের নিয়ে জানাযার নামায আদায় করলেন।
[জানাযার নামাযে লাশ ইমামের দৃষ্টির সামনে থাকা শর্ত। লাশ সামনে না রেখে গায়েবী জানাযা পড়া হানাফী মযহাবমতে দূরস্ত নয়। নাজ্জাশীর ঘটনায় প্রমাণিত হলো– নবীজী হাযির ও নাযির। তিনি নিকটে ও দূরে একই রকম দেখেন ও শুনেন।]

রোমের সম্রাট পত্র পেয়ে সম্মান প্রদর্শন করলেন বটে, কিন্তু লোকের ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে পারলেন না। কিন্তু পারশ্যরাজ খসরু পত্র পেয়ে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো এবং পত্রখানা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললো। আবদুল্লাহ ইবনে হোযাফা সাহমী (রাঃ)-এর নিকট থেকে এই সংবাদ পেয়ে নবী করিম (দঃ) মুখে উচ্চারণ করলেন– **"তাঁর রাষ্ট্রই বরং টুকরো টুকরো হয়ে যাবে"**। পরবর্তীতে তাই হয়েছিল। মিশর অধিপতি মুকাইকিছ পত্র পেয়ে দূতকে সম্মান করলেন। প্রথা অনুযায়ী অনেক হাদিয়া তোহ্‌ফা দিয়ে এবং উচ্চবংশীয় দু'জন কিব্‌তী রমনীকে (হযরত মারিয়া ও তাঁর বোন শীরীন) হাদিয়া হিসাবে দান করে দূতের নিকট জবাবী পত্রে লিখলেন–

"আমি আপনার প্রেরিত দাওয়াতী পত্রখানা পাঠ করেছি এবং মর্ম অবগত হয়েছি। আমি জানি– একজন নবীর আগমন এখনও বাকী রয়েছে। আমার ধারণা ছিল– তিনি সিরিয়াতে আগমন করবেন। আমি আপনার দূত (হাতেব) কে সম্মান প্রদর্শন করেছি। আপনার খেদমতে আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রথা অনুযায়ী দু'জন উচ্চবংশীয় কিব্‌তী রমনীকে উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরণ করা হলো। সাথে কিছু

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

মূল্যবান পোষাক ও একটি উন্নতমানের খচ্চর প্রেরণ করা হলো। ওয়াস সালাম।"

হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রাঃ) কে নিজে বিবাহ করে নবী করিম (দঃ) অপর বোন শিরীন (রাঃ) কে হযরত হাসসান বিন সাবিত (রাঃ)-এর সাথে বিবাহ দেন। হযরত মারিয়া কিবৃতিয়া (রাঃ)-এর গর্ভে নবী করিম (দঃ)-এর এক শাহজাদা হযরত ইব্রাহীম (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন এবং দুগ্ধ পানকালেই তিনি ইন্তিকাল করেন।

বাহ্রাইন অধিপতি মুনযির নিজে মুসলমান না হলেও পত্রপাঠে কিছুলোক মুসলমান হয়ে যায়। কিন্তু ইয়াহুদী ও অগ্নি উপাসকরা ইসলাম গ্রহণ করেনি। দামেস্কের পথে বুছরার গাসসানী অধিপতি হারেছ-এর নিকট পত্রে নবী করিম (দঃ) সরাসরি তাকে মুসলমান হওয়ার আহ্বান জানান। কিন্তু সে ইসলাম গ্রহণ করেনি। নবী করিম (দঃ) এই সংবাদে বললেন- **"বাদা ওয়া বাদা মুলকুহু- অর্থাৎ "তার রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত"**।

সপ্তম হিজরীতে দাওয়াতীপত্র প্রেরণের মাধ্যমে নবী করিম (দঃ) বিশ্বের দরবারে নিজেকে নবী হিসাবে পেশ করলেন। তাঁর ইসলামী দাওয়াতকেই তাবলীগ বলা হয়। বিশ্বব্যাপী সে সময়েই ইসলামী মূল তাবলীগ পৌঁছে গিয়েছিল। ইসলামের তাবলীগী দাওয়াত হয় শুধু কাফেরদের জন্য (সুরা মায়েদা)। মুসলমানদের বেলায় ইসলামী নিয়ম কানুন নামায-রোযা ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়াকে কোরআনের ভাষায় যিক্রা বা তালীম ও নসিহত বলা হয় (আল-কোরআন)। ইহাকে তাবলীগ বলা নবুয়তি দাবীর নামান্তর। মাদ্রাসা, খানকাহ ও ওয়াজের মাধ্যমে ইসলামী তা'লীম চিরদিন চলবে। ছুরা–কালাম শিক্ষা দেওয়ার নাম তাবলীগ নয়–তা'লীম।

আজকাল দিল্লীর যে তাবলীগ জামাত বের হয়েছে, তা মদিনার ইসলামী তাবলীগ নয়। কেননা, নবী করিম (দঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম কোনদিন ছয় উছুল নিয়ে এভাবে বিছানাপত্র ও হাড়ি-পাতিল নিয়ে কোন মুসলমানের এলাকায় যাননি এবং মসজিদেও রাত্রি যাপন করেননি। ইসলামের ইতিহাস তার সাক্ষী। তদুপরি– নবীজীর যুগে, সাহাবীগণের যুগে এবং বিগত ১৪ শত বৎসরেও ছয় ওছুল ছিলনা। তাই ইহা একটি নূতন বিদআতে ছাইয়েয়া বা হারাম বিদআত। ইসলামী পঞ্চবেনার সাথে এই ৬ অছুল সাংঘর্ষিক–তাই পরিত্যাজ্য।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

বিয়াল্লিশতম অধ্যায়

জঙ্গে মূতা বা মুতার যুদ্ধ

প্রসঙ্গ ঃ তিনজন সেনাপতির শাহাদতের অগ্রিম ইঙ্গিত, মদিনা শরীফ থেকে সুদূর মুতা দর্শন, গায়েবী সালামের জবাব দান, জানাযার পর দোয়া ঃ

মুতা সৌদী আরব সংলগ্ন জর্দানের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত শহর। নবী করিম (দঃ) ইসলামের দাওয়াতপত্র দিয়ে ৭ম হিজরীতে বুছরা অঞ্চলের গাসসানী শাসকের নিকট হারেছ ইবনে ওমাইর (রাঃ) নামক সাহাবীকে দূত হিসাবে প্রেরণ করেছিলেন। দূত মুতা নামক স্থানে পৌছলে শাসক সুরাহ্বিল ইবনে আমর গাসসানী তাঁকে শহীদ করে ফেলে। এর পূর্বে নবী করিম (দঃ) কর্তৃক প্রেরিত কোন দূত শহীদ হননি।

এই সংবাদে নবী করিম (দঃ) ৮ম হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসে তাঁর পালিত পুত্র হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ)-এর অধীনে তিন হাজার সাহাবীকে গাসসানী শাসক সুরাহ বিল-এর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করার সময়ই নবী করিম (দঃ) তিনজন সেনাপতির শাহাদাতবরণের অগ্রিম ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তিনি এরশাদ করলেন- **"যদি তোমাদের আমীর যায়েদ ইবনে হারেছা শহীদ হন, তাহলে পরবর্তী আমীর হবেন জাফর ইবনে আবু তালেব। তিনিও শহীদ হলে তোমাদের আমীর হবেন আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা। তিনিও শহীদ হলে তোমাদের মধ্য হতে যেকোন একজনকে আমীর বানিয়ে নেবে"**।

এ বলেই তিনি সৈন্য বাহিনী রওনা করে দিলেন এবং নিজে অনেকদূর অগ্রসর হয়ে তাদেরকে বিদায় দিয়ে বললেন, **"প্রথমে মুতাবাসীকে ইসলামের দাওয়াত দিবে। কবুল না করলে যুদ্ধ করবে"**।

এই সংবাদ পেয়ে সুরাহবিল একলক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করলো। রোমের বাদ্শাহ্ হিরাক্লিয়াস একলক্ষ সৈন্য নিয়ে বালকা নামক স্থানে সুরাহ্বিলের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসলো। একদিকে তিন হাজার, অপরদিকে দুই লক্ষ সৈন্যের মধ্যে অসম যুদ্ধ শুরু হলো। হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা প্রথমে শহীদ হয়ে গেলেন। নবীজীর ইলমে গায়েব বাস্তবে পরিণত হলো। এরপর সেনাপতির দায়িত্ব নিলেন হযরত জাফর (রাঃ)। প্রথমে তাঁর ডানহাত শহীদ হলো। বামহাতে তিনি পতাকা তুলে ধরলেন। এবার তাঁর বাম হাতও শত্রুর তরবারীর আঘাতে শহীদ

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

হলো। এবার তিনি পতাকা মুখে কামড় দিয়ে বুকে ধারণ করলেন। শত্রুরা তাঁকে শহীদ করে ফেললো। তাঁর শরীরের সম্মুখভাগেই ৭২টি বর্শা ও তীরের আঘাত লেগেছিল।

যখন তিনি শহীদ হয়ে গেলেন– তখন নবী করিম (দঃ) মদিনা শরীফের মসজিদে নববীতে বসে বসে সব কিছুই দেখতে পেলেন। তিনি হঠাৎ করে গায়েবী সালামের জবাব দিয়ে বললেন, 'ওয়া আলাইকুমুছ ছালাম'। উপস্থিত সাহাবাগণ কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। নবী করিম (দঃ) এরশাদ করলেন–

إِنِّيْ أَسْمَعُ مَالَا تَسْمَعُوْنَ وَاِنِّيْ أَرٰى مَالَا تَرَوْنَ (بُخَارِيٌّ)–

অর্থাৎ ঃ "তোমরা যাহা শুননা– আমি তাহা শুনি; তোমরা যাহা দেখনা– আমি তাহা দেখি" (বুখারী)। আমি দেখতে পাচ্ছি– আল্লাহ্ পাক জাফরকে দু'হাতের বদলে দুটি নূরের বাহু দান করেছেন। তিনি ফেরেস্তাসহ আকাশপথে উড়ে যাচ্ছেন– আর আমাকে এভাবে আখেরী সালাম দিচ্ছেন– "আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ"। তাই আমি তাঁর সালামের জবাব দিচ্ছি"। সুব্হানাল্লাহ! নবী প্রেমিকদেরকে আল্লাহ এমনিভাবেই সম্মানিত করে থাকেন। [নবীজী জমিনে–কিন্তু তাঁর দৃষ্টি আকাশে।]

যুদ্ধে হযরত জাফর (রাঃ) শহীদ হওয়ার পর হুযুরের পূর্ব নির্দেশ মোতাবেক হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) সেনাপতিত্ব গ্রহণ করলেন। বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে তিনিও শহীদ হয়ে গেলেন। এবার সাহাবাগণ নবী করিম (দঃ)-এর পূর্ব নির্দেশ মোতাবেক পরামর্শ করে হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালিদকে সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। হযরত খালেদ বীরবিক্রমে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অসংখ্য শত্রুকে তিনি নিধন করে চললেন। শত্রুরা পলায়ন করলো। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাঁর হাতে মুসলমানদের বিজয় দান করলেন। বিপুল গণিমতের মাল নিয়ে হযরত খালেদ (রাঃ) মদিনায় প্রর্ত্যাবর্তন করলেন।

[জঙ্গে মূতার যুদ্ধ পরিস্থিতির আগাম সংবাদ প্রদান করে নবী করিম (দঃ) আল্লাহ্ প্রদত্ত ইল্মে গায়েব প্রমাণ করে দিয়েছেন। তারপর হযরত জাফর (রাঃ) আকাশ পথে নূরের পাখায় ভর করে ফেরেস্তাসহ যাওয়ার পথে নবী করিম (দঃ) কে ছালাম প্রদান করা এবং নবী করিম (দঃ) তাঁকে শূন্যলোকে দেখা– এসবই গায়েবী জিনিস। কোন সাহাবীই এ ঘটনা দেখেননি। কিন্তু নবীজীর কথায় তাঁরা বিশ্বাস করেছেন। নবীজীর ইল্মে গায়েব চাক্ষুস না দেখেও সাহাবীগণ বিশ্বাস করতেন। কিন্তু আলেম নামধারী ভ্রান্ত কিছু লোক আজকাল নবীজীর ইল্মে

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

গায়েবকে অস্বীকার করে চলেছে এবং লেখনির মাধ্যমে মানুষকে গোমরাহ করছে।

বোখারী শরীফের উদ্ধৃত উপরের হাদীসখানায় (মা) শব্দটি দুবার ব্যবহার করা হয়েছে। যার মর্মার্থ দাঁড়ায়–সাহাবাগণের দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তির বাইরে যা কিছু আছে– নবী করিম (দঃ) তার সবকিছুই দেখেন ও শুনেন। বস্তুতঃ মানুষের শ্রবণ ও দৃষ্টির অগোচরের সবকিছুই নবী করিম (দঃ)-এর শ্রবণ ও দৃষ্টিসীমার আওতায় রয়েছে। মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও আকল বহির্ভূত বস্তুকেই গায়েব বলা হয় এবং এ বিষয়ে অবগতির নামই ইল্‌মে গায়েব। নবীজীর এই ইলমে গায়েব আল্লাহ্ প্রদত্ত।

জানাযার পর দোয়া ঃ

জঙ্গে মূতায় তিনজন শহীদ সিপাহসালারের জানাযা নামায মদিনা শরীফে নবী করিম (দঃ) সঙ্গে সঙ্গে আদায় করেছিলেন এবং ছালাম ফিরিয়ে দোয়াও করেছিলেন। বেদায়া ও নেহায়া গ্রন্থের ৪র্থ খন্ড ২৪৩ পৃষ্ঠায় নবীজীর দোয়ার কথা এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে–

فَصَلّٰى عَلَيْهِ (زَيْدٍ) رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ
إِسْتَغْفِرُوْا لَهٗ فَقَدْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ شَهِيْدٌ ...... فَصَلّٰى عَلَيْهِ
(جَعْفَرَ) رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِسْتَغْفِرُوْا
لِأَخِيْكُمْ فَإِنَّهٗ شَهِيْدٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ يَطِيْرُ فِى الْجَنَّةِ -

অর্থ–"হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ) মূতায় শাহাদাত বরণ করার পর নবীজী মদিনা শরীফে তাঁর জানাযা নামায পড়ে সাহাবাগণকে বললেন–তোমাদের ভাই যায়েদ ইবনে হারেছার জন্য দোয়া কর–সে জান্নাতে প্রবেশ করেছে। হযরত জাফর শহীদ হলে হুযুর (দঃ) মদিনা শরীফে তাঁর জানাযা নামায পড়ালেন এবং সাহাবাগণকে বললেন–তোমাদের ভাই জাফরের জন্য দোয়া করো। কেননা, সে শহীদ হয়ে জান্নাতে উড়ে বেড়াচ্ছে"। .... (বেদায়া নেহায়া ও ফতহুল ক্বাদীর)। প্রমাণ স্বরূপ দেখুন আমার লিখিত পুস্তক **"ফতোয়ায়ে ছালাছা"**। জানাযা নামাযের পর দোয়া ও মুনাজাত সম্পর্কে হাদীস থেকে ৭টি দলীল তাতে পেশ করা হয়েছে। জানাযা হলো ফরয নামায। ফরয নামাযের পর যে দোয়া করা হয়–তা শীঘ্র কবুল হয়। উক্ত কিতাবে মোনাজাত বিরোধীদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া হয়েছে।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

তিতাল্লিশতম অধ্যায়

মক্কা বিজয়

প্রসঙ্গ ঃ [কোরআনে ঘোষিত "মহাবিজয়" বাস্তবায়িত, নবী করিম (দঃ)-এর অতুলনীয় ক্ষমা প্রদর্শন। কা'বার মূর্তিসমূহের পতন, বায়তুল্লাহর ছাদে হযরত বিলালের আযানের কেবলা কোন্ দিকে ছিল?]

পবিত্র মক্কা বিজয় ৮ম হিজরীর রমযান মাসের ১৭ তারিখে সংঘটিত হয়। এই চূড়ান্ত বিজয়ের পটভূমিকা ধাপেধাপে সূচিত হয়েছিল। নবী করিম (দঃ)-এর হিজরত ছিল প্রথম ধাপ। **দ্বিতীয় ধাপ** ছিল বদরের যুদ্ধ। বদরের যুদ্ধে প্রথম সংঘর্ষেই কুরাইশদের পরাজয় ও মুসলমানদের বিজয়ে একটি বিজয়ী শক্তি হিসাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। ওহোদ, খন্দক প্রভৃতি যুদ্ধের ফলাফল কোরাইশদের বিরুদ্ধেই গিয়েছিল। সর্বশেষ হোদায়বিয়ার সন্ধিতে স্বাক্ষর করে কুরাইশরা দশ বৎসরের জন্য পঙ্গু হয়ে ঘরে বসে থাকার দাসখত লিখে দিয়ে আস্‌লো। যদি সেসময় তারা বাধা না দিয়ে নবী করিম (দঃ) ও মুসলমানদেরকে ওমরাহ্ পালন করার সুযোগ দিত, তা হলে পরাজয়মূলক সন্ধি করার দরকার হতোনা।

সন্ধি করার কূটনৈতিক পরাজয় বুঝতে পেরে তারা তা ভঙ্গ করার চেষ্টা করলো। সন্ধিশর্ত ভঙ্গ করার ফলেই নবী করিম (দঃ) মক্কা আক্রমণ করার সুযোগ পান এবং পরিকল্পনা তৈরী করেন। সুতরাং হিজরত থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি ধাপেই কোরাইশরা নিজেদের পরাজয়ের পটভূমিকা নিজেরাই তৈরী করেছিল। অপরদিকে ধাপে ধাপে নবীজী বিজয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। এটা ছিল খোদায়ী গায়েবী মদদ।

যুদ্ধের কারণ ঃ

৬ষ্ঠ হিজরীতে হোদায়বিয়ার সন্ধির পর কোরা গামীমে নাযিলকৃত "মহান বিজয়ের" সুসংবাদবাহী আল্লাহর ভবিষ্যৎবাণী (ছুরা ফাত্হ-২) ৮ম হিজরীতে মক্কাবিজয়ের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করলো। হোদায়বিয়ার সন্ধির একটি ধারা ছিল এই যে, মক্কা সংলগ্ন বনু বকর গোত্র কোরাইশদের আশ্রয়ে থাকবে এবং মদিনাসংলগ্ন বনু খোজাআ গোত্র মুসলমানদের আশ্রয়ে থাকবে। এদের যেকোন গোত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণকে মূল আশ্রয়দাতার বিরুদ্ধেই আক্রমণ বলে গণ্য করা হবে।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

সন্ধির কিছুদিন পরেই কোরাইশরা মক্কা সংলগ্ন বনু বকরকে উস্কিয়ে দিয়ে মদিনা সংলগ্ন বনু খোজাআর উপর আক্রমণ চালায়। বনু খোযাআ নবী করিম (দঃ)-এর দরবারে এই আক্রমণের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ জানায়। এতে পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে উঠে। কোরাইশ অধিপতি আবু সুফিয়ান পরিস্থিতির অবনতি উপলব্ধি করতে পেরে মদিনায় গমন করে। সে নূতন করে চুক্তি নবায়নের প্রস্তাব করলে নবী করিম (দঃ) তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন।

[ঐ উদ্দেশ্যে মদিনায় এসে আবু সুফিয়ান নিজ কন্যা উম্মুল মোমেনীন হযরত উম্মে হাবীবার (রাঃ) ঘরে গিয়ে নবী করিম (দঃ)-এর বিছানায় বস্‌তেই হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ) বলে উঠেন- **"আল্লাহর দোস্ত যে বিছানায় আরাম করেন- সেখানে আল্লাহর দুশমন বস্‌তে পারে না"**। পিতাকে নবীর দুশমন বলা নবী প্রেমেরই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।]

একথা বলেই তিনি পিতাকে বিছানা থেকে তুলে দিলেন। এ ছিল সে যুগের নবীপ্রেমের নিদর্শন। বর্তমানে নবীজীর দুশমনদের সাথে বস্‌তে সুন্নি মুসলমানরা লজ্জাবোধ করেনা। এক শ্রেণীর মুসলমান নামধারীরা নবী করিম (দঃ) কে বড় ভাই বলে এবং আল্লাহর সম্মুখে তাঁর সম্মান **মুচি চামারের মত** বলে মন্তব্য করে। অথচ এদের নামের পিছনে **"রহমাতুল্লাহি আলাইহে"** শব্দ ব্যবহার করতেও একশ্রেণীর পীর মাশায়েখরা কুণ্ঠিত হয়না। এসব পীরেরা ওহাবীদের সাথে আপোষ করে চলে। শেষ পর্যন্ত তারা বাতিল দলে মিশে যায়। নবীজীর দুশমনের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা ঈমানেরই অংশ (সুরা মুজাদালা-২৮ পারা)

অভিযানের প্রস্তুতি ঃ

আবু সুফিয়ান উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হয়ে মক্কায় ফিরে আসে। এদিকে নবী করিম (দঃ) অতি গোপনে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। একজন বদরী সাহাবী হযরত হাতেব ইবনে আবু বোলতাআ (রাঃ) মক্কা আক্রমণের প্রস্তুতি আঁচ করতে পেরে মক্কায় অবস্থিত তাঁর সন্তানাদির নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার জন্য মক্কায় অবস্থিত তাঁর এক বন্ধুর কাছে গোপনে একটি পত্র লেখেন এবং একজন গায়িকা মহিলার মাধ্যমে তা মক্কায় প্রেরণ করেন। গোপন ওহীর মাধ্যমে নবী করিম (দঃ) এই সংবাদ পেয়ে হযরত আলী (রাঃ), হযরত যোবাইর (রাঃ) ও হযরত মিকদাদ (রাঃ)-এই তিনজনকে উক্ত পত্র ছিনিয়ে আন্‌তে পাঠালেন। হুযুর (দঃ) ইলমে গায়েবের মাধ্যমে একথাও বলে দিলেন যে, উক্ত মহিলাকে তোমরা "রওযাখাক" নামক স্থানে গিয়ে পাবে।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

তাঁরা ঘোড়া ছুটিয়ে উক্ত স্থানে গিয়েই মহিলাকে পেলেন এবং ধমক দেয়ার পর সে চুলের খোপা থেকে উক্ত গোপন চিঠিটি বের করে দিল। সাহাবীত্রয় হুযুর (দঃ)-এর গায়েবী ইলেমের পরিচয় পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। হযরত হাতেব (রাঃ) তাঁর এই অসতর্কতার জন্য নবী করিম (দঃ)-এর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে দয়াল নবী তাঁকে ক্ষমা করে দেন। এ উপলক্ষে নবী করিম (দঃ) বদরী সাহাবীগণ সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালার রেযামন্দির সংবাদ দেন। একারণেই সকল বদরী সাহাবী (৩১৩ জন) জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত।

এছাড়াও হোদায়বিয়ার চৌদ্দশত সাহাবীও জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত। মূলতঃ সকল সাহাবীই জান্নাতী। হুযুর (দঃ) এরশাদ করেছেন-"আমাকে দর্শনকারী কোন মুসলমানকেই জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করতে পারবে না"। (হাদীস) তন্মধ্যে ১০ জন আশারা মোবাশ্শারা হিসাবে সবিশেষ পরিচিত। **ঈমানের চোখে নবীদর্শনই জান্নাতের গ্যারান্টি**। একজন সাহাবীর বিরুদ্ধে কটুক্তি করা মানে নবীজীকে কটুক্তি করা। আহলে সুন্নাতের মতে সাহাবীগণের সমালোচনা করা হারাম।

নবী করিম (দঃ) ৮ম হিজরীতে গোপনে দশ হাজার সৈন্য নিয়ে রমযানের ২ তারিখে মক্কার দিকে রওনা হন। আসলাম, গিফার, মোযায়না, জুহাইনা, আশজা, সোলায়ম সহ বিভিন্ন গোত্র ও আনসার মোহাজেরীন মিলিয়ে দশটি গোত্র নিয়ে তিনি মক্কার দিকে চললেন। পথিমধ্যে জোহ্ফা নামক স্থানে হযরত আব্বাস (রাঃ) ও তাঁর পরিবার পরিজনের সাথে সাক্ষাৎ হলো। তাঁরা হিযরত করে মদিনা শরীফ আসছিলেন। তাঁরাও সাথে ফিরে চললেন। পথিমধ্যে আব্ওয়া নামক স্থানে-যেখানে হযরত আমেনা (রাঃ)-এর মাযার শরীফ অবস্থিত- সেখানে হুযুর (দঃ)-এর আর এক চাচাতো ভাই আবু সুফিয়ান ইবনে হারেছ এবং তাঁর পুত্র জাফর নবী করিম (দঃ)-এর হাতে মুসলমান হয়ে সৈন্যদলে যোগ দিলেন।

মক্কার নিকটবর্তী এলাকা কোদায়দ নামক স্থানে পৌঁছে নবী করিম (দঃ) সৈন্যদলকে গোত্রে গোত্রে বিভক্ত করলেন এবং প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক পতাকা প্রদান করলেন। এটা ছিল নবী করিম (দঃ)-এর যুদ্ধ পরিচালনার আধুনিক কৌশল। স্মরণযোগ্য, এই কোদায়দ নামক স্থানেই উম্মে মা'বাদের গৃহ। নবী করিম (দঃ) হিজরতের সময় এখানে এসে প্রথম বিশ্রাম নেন এবং ছাগীর শুকনা বাঁটে দুধের নহর প্রবাহিত করেন।

ওদিকে আবু সুফিয়ানের মদিনা মিশন ব্যর্থ হওয়ার পর থেকেই মক্কার কোরাইশরা উৎকণ্ঠায় দিনাতিপাত করছিল। কিন্তু নবী করিম (দঃ)-এর

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

অভিযানের বিষয়ে তারা-বিন্দু বিসর্গও জান্তে পারেনি। তাই তারা খোঁজ খবর নেয়ার জন্য তাদের সর্দার আবু সুফিয়ান ইবনে হরবকে মদিনার দিকে এই বলে পাঠালো–যদি মুহাম্মদ (দঃ) অভিযানে এসেই পড়েন–তবে সে যেন মক্কাবাসীদের জীবনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে আসে।

আবু সুফিয়ান হাকিম ও বোদাইল নামক দুজন সঙ্গী নিয়ে অনুসন্ধানে বের হলো। "মাররুয যাহরান" নামক স্থানে এসে আবু সুফিয়ান ইসলামী লস্কর দেখে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। পাহারাদার সাহাবীদের হাতে আবু সুফিয়ান ও সঙ্গীরা বন্দী হয়ে রাসুলের দরবারে নীত হয়। এ অবস্থায় আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করেন (রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু)। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর পূর্বকৃত সব গুণাহ ও অপরাধ মাফ হয়ে যায়। শিয়ারা সাহাবী বিদ্বেষী। তাই তারা গোমরাহ ও বাতিল। বর্তমানে জামাআতে ইসলামীরাও সাহাবী বিদ্বেষী দল। শিয়ারা আবু সুফিয়ানের গোটা পরিবারকে গালাগাল করে থাকে- অথচ নবীজী তাঁকে সাহাবীর সম্মান দিয়েছেন। তাঁরা নবীজীরও দুশমন।

ইসলামী কাফেলা কোদায়দ থেকে পুনঃ রওনা দেয়ার সময় নবী করিম (দঃ) তাঁর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ) কে বললেন, **"আপনি আবু সুফিয়ানকে পাহাড়ের টিলার উপরে নিয়ে মুসলিম বাহিনীর শৌর্যবীর্য দেখিয়ে দিন"। নবী করিম (দঃ) ভীতি সঞ্চারের উদ্দেশ্যে দশ হাজার মশাল জ্বালিয়ে রওনা দিলেন।** আবু সুফিয়ান সুসজ্জিত পৃথক পৃথক মুসলিম বাহিনী দেখছিল- আর শিউরে উঠছিল। নবী করিম (দঃ) অতীতের সব ব্যথা ভুলে গিয়ে ঘোষণা করলেন– **"যারা আল্লাহর ঘরে আশ্রয় নেবে– তারা নিরাপদ, যারা আপন আপন ঘরে বিনা অস্ত্রে দরজা বন্ধ করে অবস্থান করবে– তারাও নিরাপদ এবং যারা আবু সুফিয়ানের বাড়ীতে আশ্রয় নেবে– তারাও নিরাপদ"। এভাবে আবু সুফিয়ানকে সম্মানিত করা হলো।**

মক্কার ছয়জন পুরুষ ও চারজন মহিলাকে এই ঘোষণার আওতা বহির্ভূত রাখা হলো। এই বলে নবী করিম (দঃ) সৈন্য বাহিনীকে বিভিন্ন পথে মক্কায় প্রবেশ করার নির্দেশ দিলেন। আক্রান্ত না হলে যেন আক্রমণ না করা হয়– সে নির্দেশও দিলেন। আবু সুফিয়ান (রাঃ) পাহাড়ের চূড়ায় উঠে মক্কাবাসীকে নিরাপত্তার ঘোষণা শুনিয়ে দিলেন। হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ)-এর বাহিনীকে বাধা দেয়ার ফলে সামান্য কিছু সংঘর্ষ হয়। এতে বনু বকর ও বনু হোযায়ল গোত্রের ২৩/২৪ জন লোক নিহত হয়। প্রায় বিনা বাধায় নবী করিম (দঃ) মক্কায় প্রবেশ করেন। মক্কাবাসীগণ এখন হুযুরের হাতে বন্দী। মক্কা বিজয় সমাপ্ত হলো–তাদের আত্মসমর্পনের মাধ্যমে।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

এই সেই মক্কাভূমি– যেখানকার লোকেরা ষড়যন্ত্র করে ১৩টি বছর নবী করিম (দঃ) ও মুসলমানদের উপর নির্মম নির্যাতন পরিচালনা করেছিল। শেষ পর্যন্ত নবী করিম (দঃ) জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আজ বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ। রাহমাতুল্লিল আলামীন (দঃ) অতি বিনয় ও শুকরিয়ার সাথে মক্কায় প্রবেশ করছেন আর জবানে পাকে উচ্চারণ করছেন "জা-আল হক্ব ওয়া যাহাক্বাল বাতিল; ইন্নাল বাতিলা কানা যাহুক্বা"। –"সত্য আগত, অসত্য দূরীভূত; নিঃসন্দেহে অসত্য দূরীভূত হওয়ারই যোগ্য" (আল কোরআন)। এ ঘটনা ১৭ই রমযানের। আজ চিরদিনের জন্য মক্কাভূমি মূর্তি উপাসনা থেকে মুক্ত হলো। নবীজীর ইলমে গায়েবের ঘোষণা "কিয়ামত পর্যন্ত মক্কায় আর মূর্তিপূজা হবে না"।

পরদিন সকালে নবী করিম (দঃ) মক্কাবাসীদেরকে একত্রিত করে ভাষণ দিলেন। ভাষণে তিনি বললেন–"তোমরা আজ আমার নিকট কি ধরনের আচরণ আশা করো"? সকলে একবাক্যে উচ্চারণ করলো, "দয়ার আচরণ– নিকটাত্মীয়ের আচরণ"। রাহমাতুল্লিল আলামীন (দঃ) ঘোষণা করলেন– "যাও, তোমরা সব মুক্ত। তোমাদের বিরুদ্ধে আজ আমার কোন অভিযোগ নেই"।

ক্ষমার এই ঘোষণা শুনে উপস্থিত লোকেরা চিৎকার করে বলে উঠলো– লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্– আমরা মুসলমান হয়ে গেলাম। অতুলনীয় ক্ষমার এই দৃষ্টান্ত আজ পর্যন্ত দুনিয়ার কোন বিজয়ী শক্তি প্রদর্শন করতে পারেনি। এভাবে মক্কার অধিকাংশ লোকই মুসলমান হয়ে গেলো। কিছু লোক তখনও মুশরিক থেকে গেলো। নবীজী জবরদস্তি কাউকে মুসলমান বানাননি–তারই প্রমাণ হলো এটি।

এদিকে নবী করিম (দঃ)-এর এই অভূতপূর্ব ক্ষমা ঘোষণায় মদিনার আনসার বাহিনী আশংকা করতে লাগলেন– হয়তো নবী করিম (দঃ) আর মদিনায় ফেরত যাবেন না। জন্মভূমিতেই তিনি স্থায়ীভাবে থেকে যাবেন। তাঁদের মনের ভাব বুঝতে পেরে নবী করিম (দঃ) ঘোষণা করলেন, "হে আনসারগণ! আমি জীবনেও তোমাদের সাথে- মরনেও তোমাদের সাথেই থাক্‌বো"। (বেদায়া)

কতিপয় ঘটনা ঃ

(ক) মূর্তি নিধন ঃ নবী করিম (দঃ) খানায়ে কা'বার ভিতরে প্রবেশ করে ৩৬০টি

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

মূর্তি স্থাপিত দেখতে পেলেন। তিনি হাতের লাঠি দ্বারা একটি একটি করে মূর্তিকে টোকা দিতেই নিচের মূর্তিগুলো মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে খানখান হয়ে গেলো– অথচ এগুলো পেরাগ দিয়ে শক্ত করে দেয়ালে গেঁথে রাখা হয়েছিল। এতদিন আল্লাহর ঘর মূর্তিভর্তি ছিল। আজ আল্লাহ্ তাঁর হাবীবকে দিয়ে তাঁর ঘর মূর্তিমুক্ত করে পবিত্র করলেন। এটাই ছিল আল্লাহর ইচ্ছা। প্রতিমা নিধন ছিল নবী করিম (দঃ)-এর মিশন। কিন্তু আমরা তাঁর উম্মত হয়েও আজ শুরু করেছি স্থানে স্থানে প্রতিমা স্থাপন। আফ্‌সোস! উপরের মূর্তিগুলো ভাঙ্গার জন্য হযরত আলী (রাঃ) কে তাঁর কাঁধে তুলে নিলেন। এখানে একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছিল–যাতে নবীজীর প্রকৃত ওজন হযরত আলী প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

(খ) চাবি প্রদান ঃ এতদিন পর্যন্ত খানায়ে কা'বার দরজার চাবি সংরক্ষণের দায়িত্ব ছিল ওসমান ইবনে তাল্‌হা নামক জনৈক কোরাইশের উপর। সে প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার দরজা খুল্‌তো। নবী করিম (দঃ) মক্কী জীবনে একদিন লোকদের সাথে খানায়ে কা'বার ভিতরে প্রবেশ করতে গেলে ওসমান হুযুরকে বাধা দিয়েছিল। নবী করিম (দঃ) ধৈর্য্য ধরে সেদিন মন্তব্য করেছিলেন– "হে ওসমান! আজ তুমি আমাকে বাধা দিচ্ছ, হয়তো এমন একদিন আসবে- যখন তোমার হাতের চাবিখানা আমার হাতে আসবে এবং আমি যাকে ইচ্ছা তাকে দিয়ে দেবো"। সুবহানাল্লাহ!

তখন ওসমান বলেছিল, তা হলে কেবল কোরাইশদের ধ্বংস ও অপমানের মাধ্যমেই তা হতে পারে। নবী করিম (দঃ) উত্তরে তখন বলেছিলেন– "না, বরং কোরাইশগণ সে সময় নতুন জীবন লাভ করবে এবং সম্মানিত হবে" (বেদায়া নেহায়া)।

মক্কা বিজয়ের পর নবী করিম (দঃ) সেই ওসমানকে ডেকে এনে খানায়ে কা'বার চাবি হস্তান্তর করতে বললেন। ওসমান নীরবে ঘর থেকে চাবি এনে নবী করিম (দঃ)-এর হাতে তুলে দিলেন। দয়াল নবীজী চাবিখানা ওসমানের হাতে ফেরত দিয়ে বললেন– "নাও! এ চাবি তোমার ও তোমার বংশের লোকদের হাতে চিরদিন থাকবে– যদি না কোন যালেম তা ছিনিয়ে নেয়"। ওসমান নবী করিম (দঃ)-এর পূর্বের ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হতে দেখে অবাক হয়ে যায়। এটাও ছিল নবী করিম (দঃ)-এর নবুয়তের প্রমাণবহ্ ইল্‌মে গায়েব।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ওয়াহাবী সম্প্রদায় তবুও হুযুরের ইলমে গায়েব আতায়ী অস্বীকার করেই চলছে।

(গ) হযরত বেলালের আযানের কেবলা ঃ

নবী করিম (দঃ) হযরত বেলাল (রাঃ) কে খানায়ে কা'বার ছাদে উঠে আযান দিতে নির্দেশ দিলেন। হযরত বেলাল (রাঃ) ছাদে উঠে আরয করলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ! মদিনায় থাকতে কেবলামূখী হয়ে আযান দিতাম। এখন তো কা'বা আমার নীচে- কোন্ দিকে ফিরে এখন আযান দেবো? **নবী করিম (দঃ) নিজের দিকে ইশারা করে বললেন- "আমার দিকে"। মোহাদ্দেসীন কেরাম এই হাদীসের তাৎপর্য্য এভাবে বর্ণনা করেছেন- "কেবৃলার অবর্তমানে নবী করিম (দঃ)-এর পবিত্র সত্তাই কেবৃলা। কেননা, তিনি কা'বারও কা'বা"।** (যিকরে জামীল)

উর্দূ কবি বলেন ঃ روئے ھمارا سوئے کعبہ روئے کعبہ سوئے محمد
کعبہ کا کعبہ روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم-

"মোদের কপাল কা'বার দিকে, কা'বা ঝুঁকে নবীর পানে,
কা'বার কা'বা প্রিয় মোহাম্মদ, শত দুরূদ তাঁরই শানে"।

—লেখক

<u>বিঃ দ্রঃ</u> ইবনু আবি মোলায়কার বর্ণনায় কা'বার ছাদে শুধু আযান দেয়ার কথা উল্লেখ আছে (বেদায়া ৪র্থ খন্ড ২৯৬ পৃষ্ঠা)।

(ঘ) ফোযালার মনের গোপন কথা ঃ

একবার নবী করিম (দঃ) কা'বা শরীফ তাওয়াফ করছিলেন। ফোযালা ইবনে ওমাইর নামীয় জনৈক কোরাইশ নবী করিম (দঃ) কে একা একা পেয়ে তাঁকে শহীদ করার বদ নিয়তে সে-ও তাওয়াফ করতে লাগলো এবং সুযোগ খুঁজতে লাগলো। এক পর্যায়ে সে নবী করিম (দঃ)-এর অতি নিকটে এসে পড়লো। নবী করিম (দঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন- তুমি কি ফোযালা? সে জবাব দিল, হ্যাঁ। নবী করিম (দঃ) পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন-তুমি মনে মনে কি ভাবছ? সে থতমত খেয়ে বললো, কই-না তো! কিছুই ভাবছি না- বরং আমি মনে মনে আল্লাহর যিকির করছি। তার একথা শুনে নবী করিম (দঃ) রহস্যের হাসি

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

হাসলেন এবং শুধু এতটুকুন বললেন- "আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও"। একথা বলেই নবী করিম (দঃ) তার বুকে পবিত্র হাত স্থাপন করলেন। সাথে সাথে ফোযালার মনের কুচিন্তা দূর হয়ে গেল। ফোযালা বলেন ঃ "নবী করিম (দঃ) আমার বুক থেকে হাত উঠায়ে নেয়ার পর বর্তমানে আমার মনের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, আল্লাহর সৃষ্টি জগতের মধ্যে আমার নিকট নবী করিম (দঃ)-এর চেয়ে বেশী প্রিয় আর কেহই নেই" (মাওয়াহিব)। একেই বলে ফয়যে ইনয়েকাছি।

(ঙ) হযরত কা'ব ইবনে যোহাইর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ এবং নবীজীর শানে একটি প্রশংসামূলক কবিতা পাঠ, বিনিময়ে চাদর মোবারক দান ঃ

মক্কা বিজয়ের পর নবী করিম (দঃ) ৮ম হিজরীর শাওয়াল ও যিলক্বদ মাসে হোনায়ন ও তায়েফ জয় করে ২ মাস ১৬ দিন পর মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন। ৯ম হিজরীর রজব মাসে তিনি তাবুক অভিযানে বের হন। নবীজীর তাবুক অভিযানে যাওয়ার পূর্বে মক্কার কবি কা'ব ইবনে যোহাইর মদিনায় এসে মুসলমান হয়ে যান। প্রথমে তিনি নবীজীর বিরুদ্ধে অনেক ব্যঙ্গ কবিতা লিখতেন। কিভাবে তিনি মুসলমান হলেন- তার একটি চমকপ্রদ ঘটনা আছে। এখানে সংক্ষেপে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করা হলো।

কা'ব এবং বুজাইর- তাঁরা ছিলেন দু'ভাই। তাদের পিতার নাম যোহাইর। মক্কার বাসিন্দা তাঁরা। পিতা যোহাইর আহ্‌লে কিতাব পন্ডিতদের মজলিসে উঠাবসা করতো। সে পন্ডিতদের মুখে শুনেছিল "শেষ নবীর আগমনের সময় ঘনিয়ে এসেছে"। ইতিমধ্যে সে স্বপ্নে দেখলো- আকাশ থেকে একটি রশি নিচের দিকে নেমে আসছে। সে ঐ রশিটি ধরতে চেয়েও ব্যর্থ হয়। যোহাইর তার দুই ছেলে- কা'ব ও বুজাইরকে ডেকে বললো- "শেষ যামানার নবীর আবির্ভাবের সময় আমি পাব না-যা স্বপ্নে দেখেছি- কিন্তু তোমরা তাঁকে পেলে অবশ্যই ঈমান আন্‌বে"।

ইত্যবসরে কা'ব-উঁচুদরের কবি হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। মক্কার অন্যান্য কবিদের ন্যায় তিনিও প্রথমদিকে নবী করিম (দঃ)-এর বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ কবিতা লিখতেন। নবী করিম (দঃ) মক্কা জয় করার সময় ঘোষণা করেছিলেন, "মক্কাবাসী সকলে মাফ পাবে-কিন্তু যেসব কবি আমার বিরুদ্ধে কবিতা লিখেছে-তাদেরকে কতল করা হবে"।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

মক্কা বিজয়ের পর ইকরামা, কা'ব-প্রমুখ কবিগণ গা ঢাকা দেয়। কা'ব-এর ভাই বুজাইর মক্কা বিজয়ের পর মদিনায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ভাই কা'বকে পত্র লিখে অভয় দেন যে, কেউ মুসলমান হয়ে গেলে সে ঘোর শত্রু হলেও নবী করিম (দঃ) তাকে ক্ষমা করে দেন। সুতরাং তুমি এসে মুসলমান হয়ে যাও।

ভাই বুজাইর-এর পত্র পেয়ে কা'ব একটি দীর্ঘ ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করে ভাইকে গালাগাল করে পত্র প্রেরণ করলো। বুজাইর (রাঃ) ভাই কা'ব-এর পত্র পেয়ে নবী করিম (দঃ) কে শুনান। নবী করিম (দঃ) পত্র শুনে এরশাদ করেন, **"যে কেউ কা'বকে পাবে, সে যেন কা'বকে কতল করে ফেলে"**।

এই ঘোষণা শুনে কা'ব ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। পৃথিবী তার কাছে সঙ্কুচিত বলে মনে হলো। তিনি গোপনে মদিনায় এসে নবী করিম (দঃ)-এর হাতে হাত রেখে বললেন- **"কা'ব ইবনে যোহাইর যদি খালেছ দিলে মুসলমান হয়ে আপনার কাছে ক্ষমা চায়-আপনি কি তাকে ক্ষমা করবেন? যদি ক্ষমা করেন তাহলে আমি তাকে আপনার খেদমতে হাযির করে দেবো"**। নবী করিম (দঃ) বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি আত্মপরিচয় দিয়ে সাথে সাথে কলেমা শরীফ পাঠ করে মুসলমান হয়ে যান।

কা'ব ইবনে যোহাইর (রাঃ) তাৎক্ষণিকভাবে নবী করিম (দঃ)-এর শানে একটি কবিতা রচনা করে তা পাঠ করে নবীজীকে শুনান। দীর্ঘ কবিতাটির শুরু ছিল "বানাত সোয়াদো"। কবিতার শেষাংশে তিনি নবীজীর শানে বললেন ঃ

إِنَّ الرَّسُوْلَ لَنُوْرٌ يُسْتَضَاءُ بِهٖ- مُهَنَّدٌ مِّنْ سُيُوْفِ اللّٰهِ مَسْلُوْلٌ-

অর্থ-**"নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসুল (দঃ) আপাদমস্তক এমন একটি নূর, যার মাধ্যমে সবকিছু আলোকিত হয়। তিনি আল্লাহর তীক্ষ্ণ তরবারী সমূহের মধ্যে বিশ্বখ্যাত একটি হিন্দুস্তানী তরবারী"**।

হযরত কা'ব (রাঃ)-এর উক্ত পংক্তিটি শুনে নবী করিম (দঃ) ভাবাবেগে এত আপ্লুত হয়ে উঠেন যে, তিনি তাঁর গায়ের মূল্যবান ইয়ামানী চাদরখানা কা'বের গায়ে জড়িয়ে দেন। পরবর্তী সময়ে এই পবিত্র চাদরখানা কিনে নেয়ার জন্য হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) দশ হাজার মুদ্রা দিতে চাইলেন। হযরত কা'ব ইবনে যোহাইর (রাঃ) বললেন, নবী করিম (দঃ)-এর পবিত্র চাদরখানা অন্য কাউকে দেয়ার মত বদান্যতা আমি দেখাবোনা। হযরত কা'ব (রাঃ)-এর ইনতিকালের

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

পর হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) বিশ হাজার মুদ্রার বিনিময়ে ঐ চাদর মোবারক তাঁর উত্তরাধিকারীগণের নিকট থেকে সংগ্রহ করে নেন এবং নিজের কাছে সংরক্ষণ করে রাখেন। ঐ পবিত্র চাদরখানা বংশ পরম্পরায় বাদশাহগণের হেফাযতে সংরক্ষিত হতে হতে অবশেষে তুর্কী খলিফাগণের হেফাযতে আসে এবং অদ্যাবধি উক্ত চাদরখানা তুরস্কে সরকারী হেফাযতে রয়েছে।

এখানে দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। (১) নবী করিম (দঃ)-এর উপস্থিতিতে কা'ব তাঁকে "আপাদমস্তক নূর" বলে সম্বোধন করেছেন। এতে খুশী হয়ে নবী করিম (দঃ) কা'বকে পুরস্কৃত করেছেন। এমনিভাবে যাঁরা নবী করিম (দঃ) কে "আপদমস্তক নূর" বলে বিশ্বাস করবে- তারাও নবী করিম (দঃ)–এর সন্তুষ্টি লাভ করতে থাকবে। আর যারা মাটির মানুষ বলবে–তারা নবীজীর অসন্তোষ পেতে থাকবে।

(২) আল্লাহর প্রিয় রাসুলের শানে উত্তম না'ত পেশ করা হলে তাঁকে সম্মানিত করা নবীজিরই সুন্নাত। এজন্যই মোশাআরা প্রতিযোগিতায় উত্তম কবিতা 'না'তিয়া কালাম' পাঠকারীকে উপহার দিয়ে সম্মানিত করার রেওয়ায এখনো প্রচলিত রয়েছে।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

চুয়াল্লিশতম অধ্যায়

তাবুক যুদ্ধ

প্রসঙ্গ ঃ যুদ্ধের বিরাট চাঁদাদানের বিনিময়ে হযরত ওসমানের জান্নাত লাভ, গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থানে অবস্থান না করা, পানিতে বরকত, ২১ টি খুরমা দিয়ে ৩০ হাজার সৈন্য বাহিনীর খাদ্য প্রদান, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) কে ২১টি খুরমা দান এবং তা দিয়ে ২৬ বৎসর সংসার পরিচালনা, তীব্র বায়ু প্রবাহের গায়েবী সংবাদ প্রদান, একই সময়ে নবীজী তাবুক ও মদিনায় হাযির-নাযির, মদিনা থেকে নাজ্জাশীর জানাযা আদায়।

মক্কা বিজয়ের পর তা'বুকের যুদ্ধ ৯ম হিজরীর রজব মাসে পরিচালিত হয়। মদিনা শরীফ থেকে দামেস্কের মধ্যপথে রাস্তায় তাবুক অবস্থিত-বর্তমানে সৌদী আরবের বর্ডার। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের অধীনে খৃষ্টান সামন্ত রাজারা এসব অঞ্চল শাসন করতো। আরব উপদ্বীপ ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে আসার পর সিরিয়ার খৃষ্টানদের মধ্যে মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উস্কানীমূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারা মদিনা আক্রমণ করার পাঁয়তারা করতে থাকে।

এই সংবাদে নবী করিম (দঃ) প্রকাশ্যে তাবুক যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে লোক ও রসদ সংগ্রহ করতে থাকেন। মৌসুম ছিল অত্যন্ত গরম। মদিনা শরীফে ছিল অর্থকরী খেজুর ফসলের মৌসুম। খেজুর পাকার মাস। তদুপরি অপরিচিত দূর দেশে অভিযান। এসব দিক বিবেচনা করে লোক ও অর্থ সংগ্রহ করা খুবই প্রয়োজন ছিল। নবী করিম (দঃ) স্বয়ং চাঁদা আদায়ের জন্য নিয়মিতভাবে মসজিদে নব্বীতে সভার আয়োজন করেন এবং মিম্বার শরীফে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ তহবিলে চাঁদা দানের জন্য আহবান জানান। নবী করিম (দঃ)-এর আহবানে সাড়া দিয়ে সকল সাহাবায়ে কেরাম সাধ্যমত দান করতে থাকেন।

হযরত ওসমান (রাঃ) চাঁদার অপ্রতুলতা দেখে একাই দশ হাজার সৈন্যের যাবতীয় খরচ বহন করার প্রতিশ্রুতি দেন। নবী করিম (দঃ) হযরত ওসমানের এই দানে এতই খুশী হলেন যে, তিনি পবিত্র জবানে ঘোষণা করে দিলেন,

لَا يَضُرُّ عُثْمَانَ شَيْءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ (بُخَارِى)

"আজকের পর হতে আর কোন গুনাহই (যদি হয়) ওসমানের জন্য ক্ষতিকর হবে না"। (বায়হাকী সূত্রে বেদায়া)

এই সুসংবাদটি ছিল শুভ পরিণতির চরম ঘোষণা। হযরত আবু বকর (রাঃ) ঘরের সব কিছু দান করলেন। হযরত ওমর (রাঃ) দান করলেন অর্ধেক সম্পদ।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

নবী করিম (দঃ) তাঁদের দু'জনের মুখে এ কথা শুনে হেসে হেসে বললেন ঃ **"তোমাদের দু'জনের কথা ও দানের মধ্যে যতটুকু ব্যবধান- ঈমানের ক্ষেত্রেও ততটুকু ব্যবধান"** (রুহুল বয়ান)।

একজন সাহাবী খুবই গরীব ছিলেন। তিনি কাঠ বিক্রি করে দৈনিক দু'ছা গম খরিদ করতেন। এক ছা (৪ সের) গম নিয়ে তিনি নবী করিম (দঃ)-এর খেদমতে পেশ করলেন। হুযুর (দঃ) উক্ত গম সমস্ত মালের স্তুপের উপর ছিটিয়ে দিয়ে বললেন, **"তুমি সকলের দানের সাথেই শরীক হয়েছ"**।

আবদুল্লাহ ইবনে ওবাই এবং তার দলের মোনাফিকরা এ অবস্থা দেখে ভিতরে ভিতরে সমালোচনা করতে লাগলো। তারা বলতে লাগলো, দেখো- নাম ফুটাবার জন্য অমুকে অমুকে এত টাকা দিয়েছেন। আর এতবড় যুদ্ধের খরচ বাবদ অমুকে দান করেছে মাত্র এক ছা গম। এতে কি হবে? ইত্যাদি। তাদের উদ্দেশ্য ছিল- যুদ্ধের প্রস্তুতি বানচাল করে দেয়া।

মুনাফিকদের টালবাহানা ঃ

তারা এসে ওযর পেশ করলো- এত গরমের মধ্যে সফর করা আমাদের সহ্য হবে না। তাই ক্ষমা করুন। এক বেহায়া মোনাফিক বললো- তাবুকের যুবতী মেয়েদেরকে দেখ্‌লে আমি স্থির থাকতে পারবো না। তাই আমাকে রেহাই দিন। নবী করিম (দঃ) মোনাফিকদের এসব খোড়া ওযর কবুল করে তাদেরকে বাদ দিলেন। কিন্তু মুসলমানদেরকে জোর তাকিদ দিলেন। অনেকেই যাওয়ার জন্য প্রস্তুত-কিন্তু যানবাহন ও অস্ত্রের অভাবে যেতে পারেননি। তাঁরা কেঁদে অস্থির হয়ে পড়লেন। নবী করিম (দঃ) তাঁদেরকে শান্তনা দিয়ে রেখে গেলেন।

এমনিভাবে প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে তিনি রজবের বৃহস্পতিবার দিন তাবুক পানে রওনা দিলেন। কোরআনের সুরা তৌবায় মুসলমানদের আগ্রহ ও মোনাফেকদের টালবাহানার ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের মধ্যে দশজন সাহাবী ওযর বশতঃ বিনা অনুমতিতে যোগদান থেকে বিরত ছিলেন। তাঁরা পরে লজ্জিত হয়ে নিজেদেরকে মসজিদে নববীর খুটীর সাথে বেধে নবীজীর দরবারে ক্ষমা ভিক্ষা করেন। কিছুদিন পর আল্লাহর অনুমতিক্রমে নবী করিম (দঃ) তাদেরকে ক্ষমা করে দেন।

কা'ব ইবনে মালেক, হেলাল ইবনে উমাইয়া এবং মুরারা ইবনে রাবিয়া-নামক তিনজন সাহাবী বিনা ওযরেই ফসল তোলার কাজে ব্যস্ততার কারণে-যাবো

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

যাবো করেও শেষ পর্যন্ত যেতে পারেননি। এর জন্য আল্লাহ তাঁদেরকে ৫০ দিন বয়কটের শাস্তি দিয়ে পরে ক্ষমা করেন। **নবীর দরবার থেকে বঞ্চিত হলে আল্লাহর দরবারেও স্থান হয়না।** অবশ্য তাঁদের তওবা কবুল হওয়ার পর তারা সমস্ত সম্পত্তি নবীজীর খেদমতে সদ্‌কা করে দেন। নবী করিম (দঃ) এক তৃতীয়াংশ কবুল করে বাকী অংশ ফেরত দিয়ে দেন।

হযরত আবুযর গিফারী (রাঃ) যানবাহনের অভাবে হুযুর (দঃ)-এর সাথে যেতে পারেননি। অবশেষে পায়ে হেঁটে তিনি একা তাবুকে গিয়ে নবীজীর সাথে মিলিত হন। নবী করিম (দঃ) আবুযর (রাঃ) কে একা দেখে বলে উঠলেন- **"আল্লাহ আবুযরকে রহম করুন! সে চলবে একা, মরবে একা এবং পুনরোত্থিতও হবে একা"**।

নবী করিম (দঃ)-এর উক্ত গায়েবী সংবাদ ছিল আবুযর গিফারী-এর জীবনের শেষ পরিণতি সম্পর্কে। সম্পদের ব্যক্তি মালিকানা সম্পর্কে তিনি সকল সাহাবী থেকে ভিন্নমত পোষণ করতেন এবং নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সকল সম্পদ দান করার প্রবক্তা ছিলেন তিনি। তাই তাঁকে একলা চলতে হয়েছে নির্বাসনে গিয়ে। মদিনার নিকটবর্তী রাবযা নামক স্থানে তাঁকে হযরত ওসমান (রাঃ) কর্তৃক নির্বাসন দেয়া হয় এবং সেখানেই তিনি একাকী ইন্তিকাল করেন। এভাবে নবীজীর ইলমে গায়েবের সংবাদ বাস্তবে পরিণত হয়।

পথিমধ্যে মো'জেযা প্রদর্শন ঃ

নবী করিম (দঃ) দশ হাজার উট ও ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে যখন তাবুকের পথে রওনা হলেন- তখন কতিপয় অলৌকিক মো'জেযা প্রদর্শন করেন। যথা ঃ

(১) পিপাসা ঃ নবীজীর ইশারায় বৃষ্টি বর্ষণ ঃ

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন-"আমরা তাবুকের যাত্রায় তিনটি কষ্টে পতিত হয়েছিলাম। (ক) পানির কষ্ট (খ) খাদ্যের কষ্ট (গ) গরমের কষ্ট। এই তিন কষ্টের কারণে আমাদের এই সফরকে 'কষ্টের সফর' বলা হতো। পানির অভাবে আমরা এতই কাতর ও কাহিল হয়ে পড়েছিলাম যে, মনে হচ্ছিল যেন আমাদের প্রাণ এখনই বের হয়ে যাবে। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ যানবাহন হিসাবে ব্যবহৃত নিজেদের উট যবেহ্ করে তার পানির থলে বের করে ঐ পানিটুকু পান করে পিপাসা নিবৃত্ত করতো। কেউ কেউ উটের কলিজা বের করে চিবিয়ে তা পান করতো। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) নবী করিম (দঃ)-এর খেদমতে আরয করলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ) আপনি আমাদের পানির জন্য আল্লাহর

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

কাছে প্রার্থনা করুন। নবী করিম (দঃ) এরশাদ করলেন, **“তুমি কি এটাই ভাল মনে করো?” আবু বকর বললেন-হাঁ। নবী করিম (দঃ) আকাশের দিকে দু'হাত তুলে কি যেন বললেন। হাত নামানোর পূর্বেই আকাশ গর্জন করে উঠলো এবং বর্ষণ শুরু হয়ে গেলো। সাহাবীগণ যার যার পাত্র পানিতে পূর্ণ করে নিলেন। আমাদের (সাহাবীগনের) প্রয়োজন শেষ হলো- বর্ষনও বন্ধ হয়ে গেলো”।** (বেদায়া নেহায়া)।

(২) হারানো উটের সন্ধান দান ঃ

ইমাম বায়হাকী ও আবু নোয়াইম (রহঃ) বর্ণনা করেন- তাবুকের পথে একস্থানে বিশ্রামকালে নবী করিম (দঃ)-এর উটটি হারিয়ে যায়। অনুসন্ধানের জন্য তিনি লোক পাঠালেন। একজন মুনাফিক (যায়েদ ইবনে লুছাইত) বলে উঠলো- দেখুন, মুহাম্মদ (দঃ) একদিকে বলছেন তিনি নবী এবং আকাশের গায়েবী খবরও তিনি তোমাদেরকে বলেন- অন্য দিকে দেখছি- তিনি জমিনের খবরই জানেন না। তাঁর উটটি কোথায় আছে- তা তিনি বলতে পারছেন না। নবী করিম (দঃ) তার কথা শুন্‌তে পেয়ে বললেন-

“এক নিকৃষ্ট ব্যক্তি বলাবলি করছে, আমি নাকি জমিনের গায়েবী খবর জানি না। তোমরা শুন! আমি নিজে নিজে গায়েবী সংবাদ জানিনা বটে, কিন্তু আল্লাহ আমাকে যেসব গায়েবী খবর জানান- তা অবশ্যই জানি”। যাও তোমরা গিয়ে দেখো- “আমার উটটি ময়দানের একটি গাছের সাথে রশি আটকিয়ে আছে। তোমরা গিয়ে উটটি নিয়ে এসো”।

সাহাবায়ে কেরাম উক্ত স্থানে গিয়ে গায়েবী খবর অনুযায়ী উটটি পেয়ে নিয়ে আসলেন। উক্ত মোনাফেক তখন লজ্জায় মরে যাচ্ছিল। সে নবী করিম (দঃ)-এর ইলমে গায়েবের পরিচয় পেয়ে তওবা করে খালেস মুসলমান হয়ে গেলো। (মাওয়াহেব) আমাদের দেশের বাতিল পন্থীরা তাওবা করে না- বরং আরও জিদ করে হুযুরের ইলমে গায়েবকে অস্বীকার করে।

(৩) কুপে পানির ফোয়ারা প্রবাহিত ঃ

মুসলিম শরীফে হযরত মোয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) সূত্রে হাদীসে বর্ণিত আছে- সাহাবীগণ তাবুকের একটি শুষ্ক কুপের নিকট পৌঁছে অল্প অল্প করে পানি তুলে একটি ভান্ডে রাখলেন। নবী করিম (দঃ) ঐ পানি দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে অবশিষ্ট পানিটুকু পুনরায় কূপে ঢেলে দিলেন। অমনি কূপে পানির স্রোত প্রবাহিত হতে লাগলো। এভাবে তিনি পানির অভাব পূরণ করেন। এই পানির সংযোগ ছিল হাউযে কাউছারের সাথে এবং এই পানিই পৃথিবীতে প্রাপ্ত পানির মধ্যে সর্বোত্তম। (বেদায়া নেহায়া)। তিনি তো হাউযে কাউছারের মালিক-জান্নাতেরও মালিক।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

(৪) তীব্র বায়ু প্রবাহের আগাম সংবাদ প্রদান ঃ গযবের স্থান হিজর অতিক্রম ঃ

নবী করিম (দঃ) তাবুক যাওয়ার পথে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি সামুদ গোত্রের আবাসস্থল 'হিজ্‌র' এলাকা তাড়াতাড়ি অতিক্রম করলেন এবং চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললেন। তিনি এরশাদ করলেন- "যখনই তোমরা কোন ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থান অতিক্রম করবে" তখন কেঁদে কেঁদে আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ্ চাইবে- যেন তোমাদের উপর ঐরূপ আযাব অবতীর্ণ না হয়"।

হিজর অতিক্রমকালে সাহাবীগণের কেউ কেউ ঐ স্থানের কূপ থেকে পানি সংগ্রহ করে নিলেন। ঐ স্থান অতিক্রম করে যাওয়ার পর নবী করিম (দঃ) ঘোষণা দিলেন- "এই স্থানের পানি দিয়ে তোমরা কেউ অযু করবে না এবং পানও করবে না। ঐ পানি দিয়ে যদি কেউ রুটির খামিরা তৈরী করে থাকো- তা হলে তাও নিজেরা খাবে না- বরং ঐ রুটি উটকে খাওয়ায়ে ফেলবে। আজ রাত্রে তোমাদের উপর দিয়ে প্রবল ঝঞ্ঝা বায়ু প্রবাহিত হবে। সুতরাং তোমরা কেউ তাঁবু থেকে একা বের হবে না"।

নবী করিম (দঃ)-এর নির্দেশ মোতাবেক সবাই ঘরে আবদ্ধ রইলেন। কিন্তু মদিনার বনু সায়েদার দুই ব্যক্তি তাঁবু থেকে বের হলেন- একজন প্রকৃতির ডাকে, আর একজন উটের সন্ধানে। এমন সময় হঠাৎ করে প্রবল বায়ু প্রবাহিত হলো। প্রকৃতির ডাকে যিনি বের হয়েছিলেন, তিনি দম বন্ধ হয়ে পড়ে গেলেন। আর যিনি উটের অনুসন্ধানে বের হয়েছিলেন, বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে 'তাঈ' নামক পাহাড়ে নিক্ষেপ করলো। নবী করিম (দঃ) কে এই সংবাদ দেয়া হলে তিনি বেহুঁশ ব্যক্তির জন্য দোয়া করলেন। তিনি সাথে সাথে জ্ঞান ফিরে পেলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি সম্পর্কে ইবনে ইসহাকের বর্ণনা হলো- নবী করিম (দঃ) তাবুক থেকে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করার পর নবীজীর সম্মানে তাঈ পাহাড় উক্ত ব্যক্তিকে মদিনায় পৌঁছিয়ে দেয় (বেদায়া-নেহায়া)। উল্লেখ্য, হযরত সালেহ (আঃ) উক্ত 'হিজর' এলাকার নবী ছিলেন। তাঁর উম্মতগণ কুদরতী উটের পা কেটে দিলে তাদেরকে গযবী পাথর (শিলা) মেরে ধ্বংস করা হয়। কুফায় হযরত সালেহ (আঃ)-এর মাযার অবস্থিত। আমি কাফেলা সহ উক্ত মাযার জিয়ারত করেছি।

(৫) ২১টি খেজুর দিয়ে সকল সৈন্যকে উদরপূর্তি করে বেয়াকত দান ঃ

তাবুকের যুদ্ধে খাদ্যাভাব ছিল প্রকট। সাহাবীগণ খাদ্যের অভাবের কথা নবী করিম (দঃ)-এর খেদমতে পেশ করেন। নবী করিম (দঃ) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) কে ডেকে বললেন- দেখ, কারো কাছে সামান্য খাদ্যবস্তু আছে কিনা?

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) অনুসন্ধান করে ২১টি খেজুর থলেতে করে নবী করিম (দঃ)-এর খেদমতে পেশ করলেন। প্রিয় নবী (দঃ) ঐগুলোর উপর হাত মোবারক রেখে দোয়া করলেন এবং লোকদেরকে ডেকে আনলেন। সবাইকে তিনি উক্ত খেজুরের থলে থেকে প্রয়োজন মাফিক খুরমা-খেজুর সরবরাহ করলেন। সকলে খেয়ে তৃপ্ত হলেন। এভাবে পুরো বাহিনী উক্ত খেজুর খেয়ে তৃপ্ত হলেন। তাবুক বাহিনীতে ত্রিশ হাজার সৈন্য ছিল। এরপর থলে খুলে দেখা গেলো ২১টি খেজুরই অবশিষ্ট রয়ে গেছে। সোবহানাল্লাহ! (যিকরে জামীল)

নবী করিম (দঃ) এরশাদ করলেন, **"হে আবু হোরায়রা! তুমি খেজুরের থলেটি নিয়ে যাও। যখনই তুমি প্রয়োজন মনে করবে, তখন থলের মুখে হাত প্রবেশ করে খেজুর বের করে আনবে। কিন্তু মুখ একেবারে খুলবেনা"। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন– "নবী করিম (দঃ)-এর বাকী যুগ, হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর আড়াই বৎসরের খেলাফত যুগ, হযরত ওমর (রাঃ)-এর দশ বৎসরের খেলাফত যুগ, হযরত ওসমান (রাঃ)-এর বার বৎসরের খেলাফত যুগ-মোট সাড়ে ২৬ বৎসর উক্ত থলে থেকে নিজের পরিবার পরিজন নিয়ে খেয়েছি এবং আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেছি। যেদিন হযরত ওসমান (রাঃ) শহীদ হলেন (৩৫ হিজরী) সেদিন আমার অন্যান্য আসবাবসহ উক্ত থলেটিও লুট হয়ে যায়। আমি কি আপনাদেরকে বলবো–কি পরিমাণ খেয়েছি এবং কি পরিমাণ দান করেছি? নিজেরা খেয়েছি দুইশত ওয়াছাক এবং দান করেছি পঞ্চাশ ওয়াছাক (বায়হাকী)।"**

২৪০ সের বা ছয় মনে এক ওয়াছাক (খুচী) হয়। এ হিসাবে আড়াইশ ওয়াছাকে ২৫০X৬=১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত মন) হয়। সোবহানাল্লাহ! প্রশ্ন জাগে–এত গায়েবী খেজুর কোথা থেকে আস্‌লো? বস্তুতঃ আল্লাহ তায়ালা আসমান জমিনের ধনদৌলতের চাবিকাঠি নবী করিম (দঃ)-এর নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন। (মিশকাত)। উক্ত ধনদৌলত দেখা যায়না বটে, কিন্তু পাওয়া যায়। দাতা আর গ্রহীতার ভেদ অন্য কেউ অনুধাবন করতে অক্ষম। হতবাক হওয়া ছাড়া গতি নেই। এটা বিশ্বাস করার নামই সুন্নী আক্বিদা।

৬) একই সময়ে হুযুর (দঃ) তাবুক ও মদিনায় হাযির-নাযির ঃ

তাবুক যুদ্ধের সময়ের একটি ঘটনা। হযরত আনাছ ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন- আমরা এবং নবী করিম (দঃ) তখন তাবুকে অবস্থানরত। এসময়ে মদিনাবাসী সাহাবী মোয়াবিয়া ইবনে আবু মোয়াবিয়া লাইছী (রাঃ) মদিনায় ইনতিকাল করেন। ঐদিন সূর্য্যের আলো ছিল তীব্র উজ্জ্বল। এমন সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ) হুযুর পাক (দঃ) এর দরবারে এসে এর কারণ এভাবে বর্ণনা করলেন–

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

"মদিনাবাসী মোয়াবিয়া ইবনে আবু মোয়াবিয়া লাইছী (রাঃ) আজ ইনতিকাল করেছেন। উনার জানাযাতে শরিক হওয়ার জন্য সত্তর হাজার ফিরিস্তা আকাশ থেকে নেমে এসেছে–তাই আজ এত আলো। সূর্য্যের আলোর সাথে ফিরিস্তাদের নূর মিশে এমন আলো ছড়াচ্ছে। মোয়াবিয়া দিনে-রাতে, উঠা-বসায়, চলা-ফেরায় সর্বদা ছুরা ইখলাছ পড়তে ভালবাসতেন"। জিবরাঈল (আঃ) আরয করলেন ঃ فَهَلْ لَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْ اَقْبِضَ لَكَ الْاَرْضَ فَتُصَلِّيَ عَلَيْهِ؟
قَالَ نَعَمْ. قَالَ (اَنَسٌ) فَصَلّٰى عَلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَ.

"হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ইচ্ছা করলে আমি জমিনকে সংকুচিত করে দেবো– যাতে আপনি তাঁর জানাযা পড়াতে পারেন"।

হুযুর (দঃ) বললেন– তাই করুন। বর্ণনাকারী হযরত আনাছ ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন– فصلى عليه ثم رجع **"রাসুল মকবুল (দঃ) মদিনায় জানাযা পড়ায়ে মুহুর্তের মধ্যে আবার তাবুকে ফিরে আসলেন"।** (ইয়াযিদ ইবনে হারুন (রাঃ) সুত্রে হযরত আনাছ ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে - বায়হাকী)।

ইমাম বায়হাকী অন্য একটি সনদে ওসমান ইবনে হাইছাম সুত্রে হযরত আনাছ (রাঃ) হতে উপরোক্ত বর্ণনার পর আরো কিছু শব্দ যোগ করেছেন। তাহলো–

قَالَ عُثْمَانُ. فَسَأَلْتُ اَبِيْ مَيْمُوْنَةَ اَيْنَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ؟ قَالَ بِغَزْوَةِ تَبُوْكَ بِالشَّامِ وَمَاتَ مُعَاوِيَةُ بِالْمَدِيْنَةِ وَرُفِعَ لَهُ سَرِيْرُهُ حَتّٰى نَظَرَ اِلَيْهِ وَصَلّٰى عَلَيْهِ.

অর্থ–"বর্ণনাকারী রাবী ওসমান বলেন–আমি আমার উপরের বর্ণনাকারী আবু মাইমুনাকে জিজ্ঞাসা করলাম–আচ্ছা, "মোয়াবিয়া ইবনে আবু মোয়াবিয়ার জানাযা পড়াবার সময় নবী করিম (দঃ) কোথায় ছিলেন? তিনি জওয়াব দিলেন- সিরিয়ার তাবুকে ছিলেন। ঐ সময় মোয়াবিয়া ইবনে আবু মোয়াবিয়া মদিনাতে মৃত্যুবরণ করেন, আর নবী করিম (দঃ) ছিলেন তাবুকে। এমতাবস্থায় মধ্যখানের পর্দা সরে গেলো। নবী করিম (দঃ) তাঁর দিকে চেয়ে চেয়ে নামাযে জানাযা পড়ায়ে ছিলেন"। আনাছ ইবনে মালেক (রাঃ)-এর বর্ণনায় একথাও উল্লেখ আছে যে, "হুযুরের পিছনে সত্তর হাজার করে দুই কাতারে একলক্ষ চল্লিশ হাজার ফিরিস্তা শরিক ছিল"। (আল- বেদায়া ৫ম খন্ড ১৫ পৃষ্ঠা)।

প্রথম বর্ণনায় বুঝা গেল- হুযুর (দঃ) একই সময়ে তাবুক এবং মদিনা উভয় স্থানে উপস্থিত ছিলেন। নবীজীর জন্য জমিন সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল। এই ঘটনার পরও যদি কেউ বলে– নবীজী একসাথে বিভিন্ন স্থানে হাযির হতে পারেন না - তাহলে তাকে অন্ধ জাহেল ছাড়া আর কি বলা যাবে?

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

জঙ্গে তাবুকের সংক্ষিপ্ত ঘটনা ঃ

নবী করিম (দঃ) ১৯ কিম্বা বিশ দিন তাবুকে অবস্থান করেন। এই অভিযানের সংবাদ পেয়ে খৃষ্টান সামন্ত রাজারা একে একে সন্ধি প্রস্তাব নিয়ে হাযির হলো। তাদের মধ্যে আয়লার অধিপতি ইউহ্না এবং "জারবা ও আজরুহ" শহরদ্বয়ের সামন্তগণ উল্লেখযোগ্য। তারা সকলে নিয়মিত জিযিয়া কর প্রদানের অঙ্গীকার করে নবী করিম (দঃ)-এর সাথে শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করে। নবী করিম (দঃ) তাদেরকে নিরাপত্তানামা লিখে দেন। (বেদায়া নেহায়া)

রোম অধিপতি হিরাক্লিয়াস সেসময় কুসতুনতুনিয়া থেকে সিরিয়ার হিম্‌স শহরে এসে অবস্থান করছিল। নবী করিম (দঃ) হযরত দাহ্ইয়া কলবী (রাঃ)-এর মাধ্যমে হিরাক্লিয়াসের নিকট হিম্‌স শহরে পুনরায় একখানা দাওয়াতী পত্র প্রেরণ করেন। হিরাক্লিয়াস তার আমাত্যবর্গকে ডেকে পত্রের মর্ম অবগত করায়ে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে তাদের মতামত জানতে চাইলে তারা উত্তেজিত হয়ে দরবার ত্যাগ করে। হিরাক্লিয়াস ভীত হয়ে তার প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেয় এবং খৃষ্টান ধর্মের প্রতি তার আনুগত্য পুনঃ ঘোষণা করে। সে বদনসীবই রয়ে গেলো। পূর্বে হিজরী সপ্তম সালেও তার কাছে দাওয়াতীপত্র প্রেরণ করা হয়েছিল।

দুমাতুল জন্দল নামক স্থানের অধিপতি উকাইদির ইবনে আবদুল মালিক নামক খৃষ্টান সামন্তের নিকট খালেদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ) কে চারশত সৈন্য দিয়ে প্রেরণ করা হয়। হযরত খালেদ (রাঃ) দুমাতুল জন্দলে উপস্থিত হয়ে উকাইদির ও তার ভাই হাসসানকে দেখতে পেয়ে তাদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে হাসসানকে নিহত করেন এবং উকাইদিরকে ধরে নিয়ে আসেন। সে জিজিয়া কর আদায় করার শর্তে নবী করিম (দঃ)-এর সাথে সন্ধি চুক্তি করে আত্মরক্ষা করে। **তাবুক যুদ্ধই রাসুলুল্লাহর (দঃ) জীবনের সর্বশেষ বড় যুদ্ধ।**

মদিনায় প্রত্যাবর্তন ও মুনাফিকদের মসজিদে দিরার ধ্বংস ঃ

তাবুকের অভিযান শেষ করে নবী করিম (দঃ) মদিনার পথে রওনা হন। মদিনা শরীফের কাছাকাছি পৌছে তিনি খবর পেলেন, মোনাফিকরা ইত্যবসরে কুবায় একটি পৃথক মসজিদ তৈরী করে ফেলেছে। এই মসজিদটি মুসলমানদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে দূর্গ হিসাবে নির্মাণ করা হয়েছিল। এজন্য আল্লাহ তায়ালা এই মসজিদকে 'মসজিদে দিরার' বা ক্ষতিকর মসজিদ বলে আখ্যায়িত করে একে ধ্বংস করে দেয়ার নির্দেশ দেন। মসজিদে কুবার বিরুদ্ধে এই মসজিদটি তৈরী

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

করা হয়েছিল। আবু আমের পাদ্রী এই মসজিদের নির্মাতা। নবী করিম (দঃ) মদিনায় পৌঁছার পূবেই মালেক ও আছেম নামের দুই ভাইকে পাঠিয়ে উক্ত মসজিদটি জ্বালিয়ে দেন। (বেদায়া নেহায়া) [এখনও বাতিল পন্থীরা সুন্নী মসজিদের বিপরীতে বাতিল মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে পৃথক মসজিদ তৈরী করে। এগুলোও মসজিদে দিরার হিসাবে গন্য।]

নবী করিম (দঃ) মদিনা শরীফের নিকটবর্তী হয়ে মদিনা শরীফকে উদ্দেশ্য করে বললেন- **"ইহা তাবা" এবং ওহোদ পাহাড়কে উদ্দেশ্য করে বললেন- "এটি ওহোদ পাহাড়"- সে আমাকে ভালবাসে এবং আমিও ওহোদকে ভালবাসি"**। সে সময় থেকে মদিনা শরীফের সাথে "তাইয়েবা" যোগ হয়ে মদিনা তাইয়েবা হয়। ওহোদ পাহাড় পাথর হয়েও নবীকে ভালবাসে। একারণে নবী করিমও (দঃ) ওহোদকে ভালবাসতেন। যে প্রেমিক রাসুলকে (দঃ) ভালবাসবে, নবী করিমও (দঃ) নিশ্চয়ই তাকে ভালবাসবেন।

নাজ্জাশীর (রহঃ) জানাযা ঃ

রমযানের প্রথম ভাগে মদিনায় আসার পর তিনি আবিসিনিয়ার মুসলমান বাদশাহ আস্‌হামা নাজ্জাশীর মৃত্যু সংবাদ ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত হন। নবী করিম (দঃ) এবং আবিসিনিয়ার মধ্যখানের যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে গেল। তিনি নাজ্জাশীকে চোখের সামনে রেখে জানাযা পড়ালেন। তাবুক থেকে ফেরত এসে প্রথমে তিনি মসজিদে নববীতে কিছুক্ষণ অবস্থান করেন। মদিনার নারী-পুরুষ-যুবা-শিশু নির্বিশেষে সকলেই ঘর থেকে বের হয়ে নবী করিম (দঃ) কে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং গেয়ে উঠেন ঃ

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا—مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ
وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا—مَادَعَا لِلّٰهِ دَاعٍ -

তাঁরা হিজরতের সময়ও নবীজীর আগমনে এরূপ গেয়েছিলেন।

তাবুকের যুদ্ধ হতে ফেরত এসে নবী করিম (দঃ) হযরত আলীকে লক্ষ্য করে এরশাদ করলেন ঃ

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْاَصْغَرِ اِلَى الْجِهَادِ الْاَكْبَرِ -

অর্থ- **"আমরা ছোট যুদ্ধ শেষ করে এবার বড় যুদ্ধের দিকে (নফসের বিরুদ্ধে) অগ্রসর হলাম"** (আল হাদীস)। মানুষ শত্রুর চেয়ে নফ্‌ছশত্রু অনেক ভয়ঙ্কর। তাই নফছ শয়তানের বিরুদ্ধে জেহাদ করা হলো বড় জেহাদ।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

পঁয়তাল্লিশতম অধ্যায়

মুনাফিক সর্দারের মৃত্যু

প্রসঙ্গ ঃ মোনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইব্‌নে উবাই-এর মৃত্যুঃ নবী করিম (দঃ) কর্তৃক তার নামাযে জানাযা পড়ার রহস্য

নবী করিম (দঃ) ৯ম হিজরীর রমযান মাসের প্রথম দিকে তাবুক থেকে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন। শাওয়াল মাসের শেষের দিকে মদিনার মেনাফেক সর্দার আব্‌দুল্লাহ ইবনে উবাই অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং যিলকদ মাসের প্রথমভাগে মৃত্যুবরণ করে জাহান্নামবাসী হয়। ইসলামের ভিতরের এই শত্রুর অসুখের খবর শুনে নবী করিম (দঃ) তাকে দেখাশুনা করতেন। নবী করিম (দঃ)-এর মহানুভবতা ছিল অতুলনীয়।

তার মৃত্যুর দিন নবী করিম (দঃ) তাকে দেখতে গেলেন। কথার এক পর্যায়ে তিনি মোনাফেক আবদুল্লাহকে বললেন- **"আমি তোমাকে ইহুদীদের সাথে গোপন যোগাযোগ রক্ষা করতে এবং তাদের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা রাখতে নিষেধ করেছিলাম"! আবদুল্লাহ রাগতঃ স্বরে জবাব দিল- "আস্‌আদ ইবনে জুরারা (সাহাবী) তো ইহুদীদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতো-তার কি লাভ হয়েছে- ইয়া রাসুলাল্লাহ? একজনের মৃত্যুর সময় তাকে ভর্ৎসনা করা ঠিক নয়- বরং আমার গোসলের সময় আপনি নিজে উপস্থিত থাকবেন, আমার কাফনের জন্য আপনার গায়ের জামাখানা দিবেন এবং আমার জানাযার নামায আপনি পড়াবেন"**।

দয়াল নবী (দঃ) তার এই অন্যায় আব্দারও রক্ষা করলেন। যখন তার জানাযা পড়ানোর জন্য নবী করিম (দঃ) তৈরী হলেন, তখন হযরত ওমর (রাঃ) আর ধৈর্য্য ধারণ করতে পারলেন না। তিনি নবী করিম (দঃ)-এর চাদর মোবারক টেনে ধরে বাধা দিয়ে বললেন- "ইয়া রাসুলাল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা এই মোনাফিকদের বিরুদ্ধে আয়াত নাযিল করে তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করতে আপনাকে নিরুৎসাহিত করেছেন। তা সত্ত্বেও কি আপনি তার জানাযা পড়াতে যাবেন? নবী করিম (দঃ) শান্ত স্বরে আল্লাহর আয়াতের মর্মব্যাখ্যা বুঝিয়ে বললেন- **"হে ওমর, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, হে রাসুল! মোনাফিকদের জন্য মাগফিরাত কামনা করা এবং না করা- আপনার ইচ্ছাধীন। তবে আপনি যদি ৭০ বারও তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করেন, তাহলে**

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

আল্লাহ তায়ালা আপনার এই দুশমনদেরকে কখনও ক্ষমা করবেন না"। এখানে আল্লাহ তায়ালা আমাকে এখতেয়ার দিয়েছেন–মাগফিরাত চাওয়া- না চাওয়ার ব্যাপারে। এখনও পরিষ্কারভাবে নিষেধ করেননি। তাই প্রয়োজন হলে আমি ৭০ বারের চেয়েও বেশী তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো"। (কেননা, আমি তো রাহমাতুল্লিল আলামীন)

হযরত ওমর (রাঃ) বললেন– "এই মোনাফিক অমুক অমুক দিন আপনার সম্পর্কে কত জঘন্য উক্তি করেছে! এরপরও কি তার জানাযা পড়াবেন"? নবী করিম (দঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-এর ভক্তিপূর্ণ আব্দার উপেক্ষা করেই উক্ত মোনাফিকের জানাযা পড়ালেন (বোখারী ও মুসলিম)।

যখন জানাযার নামায শেষ হয়ে গেল, তখন উপস্থিত এক হাজার মোনাফিক নবীজীর বদান্যতায় মুগ্ধ হয়ে তওবা করে খাঁটি মুসলমান হয়ে গেল (তাফসীর রুহুল বয়ান ও তাফসীর নাঈমী)! এর পরপরই কাফের ও মোনাফিকদের নামাযে জানাযা পড়ানোর পরিষ্কার নিষেধাজ্ঞাসূচক সূরা তৌবার আয়াতটি নাযিল করা হলো (বেদায়া ও নেহায়া-বোখারী শরীফের সূত্রে) আয়াতটি হল ঃ

وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا+ وَلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ -

"হে রাসুল! আপনি (আজ থেকে) মুনাফিকদের মৃত্যুর পর তাদের জানাযা পড়াবেন না এবং তাদের কবরপার্শ্বেও দাঁড়াবেন না"- (সুরা তাওবাহ, ৮৪ আয়াত)। **তাই কাফির ও মুনাফিকদের জন্য দোয়া করা হারাম**।

হযরত ওমর (রাঃ) এবার বুঝতে পারলেন নবী করিম (দঃ)-এর দূরদৃষ্টি ও অদৃশ্য জ্ঞানের (ইলমে গায়েব) আসল মর্মকথা। এক মোনাফিকের জানাযা পড়ানোর মধ্যে হাজার লোকের ইসলাম গ্রহণের মর্ম ছিল লুক্কায়িত। নবী করিম (দঃ)-এর আসল লক্ষ্য ও মূল উদ্দেশ্যের শুভ ফলাফল দেখে ওমর (রাঃ) লজ্জিত হয়ে যান। পরবর্তীতে হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন– **"নবী করিম (দঃ) কে বাধা দেয়ার ঐ দুঃসাহসে এখনও আমি লজ্জিত। প্রকৃত রহস্য আমার জানা ছিল না। আল্লাহ-রাসুলই প্রকৃত রহস্যের সমধিক জ্ঞান রাখেন"** (বেদায়া ও নেহায়া ৫ম খন্ড ৩৫ পৃষ্ঠা)।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

উল্লেখ্য, এখানে একটি শব্দ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তা হলো- اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ অর্থাৎ "আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই সর্বজ্ঞ"॥

এটি হযরত ওমরের উক্তি॥ তিনি 'সর্বজ্ঞ' (اَعْلَمُ) শব্দটি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল-উভয়ের জন্যই সমভাবে ব্যবহার করেছেন। রাসুল (দঃ) কে 'সর্বজ্ঞ' বলা হলে ওহাবী-মউদুদীপন্থী মৌলভীগণ 'শেরেক শেরেক' বলে চিৎকার করে উঠে! আমাদের শুধু একটি প্রশ্ন-কার বিরুদ্ধে এই ফতোয়া? হযরত ওমর (রাঃ) এর বিরুদ্ধে নয়তো? আমরা তো তাঁর অনুসারী মাত্র। সাহাবীগণ সর্বদাই বলতেন- "আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল সর্বজ্ঞ"॥ এই বাক্যে কর্তা দু'জন, কিন্তু ক্রিয়া মাত্র একটি॥ উক্ত আ'লামু ক্রিয়াটি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। ইহা শিরক নয়- বরং সুন্নাত॥

যারা তিনটি বিষয়ে বিশ্বাস করবে, তারা পূর্ণ মোমেনঃ

১॥ রাসুল (দঃ) আল্লাহর যাতি নূরের জ্যোতি হতে সৃষ্ট (মুসান্নাফ ও যারকানী)।

২॥ নবীজী আল্লাহর নিকট থেকে ইলমে গায়েব শিক্ষালাভ করেছেন (তাফসীরে জালালাইন, সূরা নিসা- ১১৩ আয়াতের ব্যাখ্যা)

৩॥ তিনি আলমে খাল্ক বা সৃষ্টি জগতের সর্বত্র হাযির নাযির। আল্লাহ হচ্ছেন সর্বত্র বিরাজমান (তাফসীরে রাগেব ইস্পাহানী- সূরা আহযাবঃ আয়াত নম্বর ৪৫ "শাহিদান"॥

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ছিচল্লিশতম অধ্যায়

ইসলামের প্রথম হজ্ব

প্রসঙ্গঃ হযরত আবু বকর (রাঃ) আমিরুল হজ্ব মনোনীত, পরবর্তী বৎসর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মুশরিকদের হজ্ব নিষিদ্ধ ঘোষিত, নবী করিম (দঃ)-এর ভবিষ্যৎবাণীর সত্যতা ঃ

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ বা রুকনের মধ্যে হজ্ব হচ্ছে নুযুলের ধারাবাহিকতায় পঞ্চম ও শেষ রুকন। নবুয়তের ২১ বছরের শেষ মাথায় ৯ম হিজরীতে শাওয়াল মাসে হজ্বের আয়াত নাযিল হয়। আয়াতটি হলো-

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا -

অর্থ-"যে ব্যক্তির হজ্বে যাওয়ার সামর্থ আছে-আল্লাহ তার উপর হজ্ব ফরয করেছেন" ।

তাই অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়, হোনায়ন যুদ্ধ এবং তায়েফ যুদ্ধ শেষে নবী করিম (দঃ) মদিনায় প্রত্যাবর্তন করার পর ৯ম হিজরী শাওয়াল মাসে হজ্ব ফরয করা হয় ও উক্ত আয়াত নাযিল হয়। সুতরাং ৮ম হিজরীতে শুধু ওমরাহ্ করেই হুযুর (দঃ) মদিনায় ফিরে আসেন।

আল্লাহর ঘরের ব্যবস্থাপনা পূর্ব হতেই কোরাইশদের মাধ্যমে সম্পন্ন হতো। তাই তাদের নির্ধারিত মাসে ও তারিখেই- অর্থ্যাৎ **৯ম হিজরীর যিল্‌ক্বদ মাসে প্রথম হজ্ব আদায় করতে হয়েছে**। এ বছর বার্ষিক তাওয়াফের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল বনু কেনানার উপর। তারা নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী একমাস পূর্বেই জিলক্বদ মাসের ১০ তারিখে তাওয়াফের তারিখ ঘোষণা করলো। ইমাম হাদ্দাদী (রাঃ) বলেন- **"ইসলামের প্রথম হজ্ব বনু কেনানার ব্যবস্থামতে যিলক্বদ মাসের ১০ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী বছর- অর্থাৎ দশম হিজরীতে বিদায় হজ্ব নবী করিম (দঃ)-এর ব্যবস্থাপনায় যিলহজ্ব মাসের ৯ তারিখেই অনুষ্ঠিত হয়"** (তাফসীরে রুহুল বয়ান সুরা তৌবা ১০ম পারা পৃষ্ঠা ৩৮৩)।

মক্কা বিজয়ের বছর ৮ম হিজরীতে হজ্ব ফরয না হওয়া সত্ত্বেও নবী করিম (দঃ) মক্কার মুসলিম শাসক আত্তাব ইবনে উসাইদ-এর নেতৃত্বে স্থানীয় মুসলমানদের

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

নিয়ে আরাফায় গমন করে উকুফ করার জন্য তাঁকে নির্দেশ দিয়ে এসেছিলেন। (বেদায়া-নেহায়া)।

৯ম হিজরীতে রাসূল করিম (দঃ) মুসলমানদের হজ্ব আদায় করার জন্য হযরত আবু বকর (রাঃ) কে আমীর নিযুক্ত করেন। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর সাথে তিনশত সাহাবীকে মদিনা শরীফ থেকে প্রেরণ করা হয়। রাসূল করিম (দঃ) ২০টি উট কুরবানীর জন্য সাথে দিয়ে দেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) আরো ৫টি উট সংগ্রহ করে নেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) কাফেলা নিয়ে হজ্বের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়ার পর শাওয়াল মাসে সুরা তৌবার প্রথম ৪০টি আয়াত নাযিল হয়। আল্লাহর ঘরে ভবিষ্যতে কারা কারা হজ্ব ও ওমরাহ্ করতে পারবে না– এ সংক্রান্ত নির্দেশ এই ছুরায় ছিল। আল্লাহ তায়ালা উক্ত ছুরার ২৮ ও ২৯ নং আয়াতে মুশরিকদের জন্য এ বছরের পর হতে হজ্ব ও ওমরায় আগমন চিরদিনের জন্য নিষিদ্ধ করে দেন। শুধু ৯ম হিজরীর হজ্বে তারা অংশগ্রহণ করতে পারবে বলে অনুমতি দেয়া হয়।

তাই আল্লাহর এই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ পাঠ করে শুনানোর জন্য নবী করিম (দঃ) ছুরা তৌবার প্রথম চল্লিশটি আয়াত লিখে এবং অন্যান্য নির্দেশসহ আপন জামাতা হযরত আলী (রাঃ) কে প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর সাথে তিনি মিলিত হন। **আমীরুল হজ্ব হিসাবে হযরত আবু বকর (রাঃ) এ বছর আরাফাতের ময়দানে বনু কেনানার নির্ধারিত ১০ই যিলক্বদ তারিখেই হজ্বের খুতবা প্রদান করেন।**

হযরত আলী (রাঃ) নবীজীর প্রতিনিধি হিসাবে সুরা তৌবার ৪০ আয়াত সম্বলিত নির্দেশ পাঠ করে শুনান। মীনাতেও তিনি উক্ত ঘোষণা পাঠ করে শুনান।

ঘোষণাপত্রে চারটি বিষয় ছিল। যথা (১) **"এ বছরের পর কোন মুশরিক তাওয়াফ করার জন্য মক্কায় আসতে পারবে না, (২) কোন উলঙ্গ ব্যক্তি আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করতে পারবেনা, (৩) মোমেন ব্যতীত কেউ বেহেস্তে প্রবেশ করবেনা, (৪) যাদের সাথে নবী করিম (দঃ)-এর চুক্তি রয়েছে–উক্ত চুক্তির মেয়াদের পর তা আর নবায়ন করা হবে না এবং যাদের সাথে চুক্তি নেই অথবা চার মাসের কম সময়ের জন্য চুক্তি আছে–তাদেরকে চারমাস সময় দেয়া হবে। সে মোতাবেক চারমাস রবিউস সানীর ১০ তারিখে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে"।**

এই ঘোষণার ফলে মুশরিকদের তাওয়াফ চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সম্পাদিত চুক্তির মেয়াদকাল পর্যন্ত তাদের আগমন ও তাওয়াফ বহাল রাখা হয়।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

রাজনৈতিক এই সিদ্ধান্তের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। পরবর্তী বছরে নবী করিম (দঃ) বিদায় হজ্বে এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার সাহাবী নিয়ে হজ্ব আদায় করেন। একজন মুশরিকও এই হজ্বে শরিক হতে পারেনি। হজ্ব ও ওমরাহ্ সংক্রান্ত বিস্তারিত হুকুম আহকাম বিদায় হজ্বেই ঘোষণা করা হয়।

যে মক্কা মোয়ায্যমা হতে নবী করিম (দঃ) একদিন বিদায় হতে বাধ্য হয়েছিলেন–আজ সেই বিতাড়নকারীরাই চিরদিনের জন্য বিতাড়িত হলো–আল্লাহর নির্দেশে। "আল্লাহর মাইর-মানুষের বাইর"। তিনি প্রিয় নবী (দঃ)-এর জন্য মক্কা মোয়ায্যমাকে চিরদিনের জন্য নিষ্কন্টক করে দিলেন।

["পবিত্র হজ্ব গুনাহসমূহ ধূয়ে এভাবে পরিষ্কার করে দেয়–যেভাবে পানি ময়লাকে ধূয়ে পরিষ্কার করে দেয়" (মিশকাত ও বুখারী)।

হজ্বে মকবুলের পুরষ্কার হচ্ছে জান্নাত–কিন্তু মদিনার রওযা মোবারকের যিয়ারত হচ্ছে জান্নাতের মালিকের সাক্ষাৎ এবং শাফাআত পাওয়ার গ্যারান্টি। বস্তুতঃ যিয়ারতের দ্বারা রাসুলও (দঃ) পাওয়া যায় এবং জান্নাতও পাওয়া যায়। এখানে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে। তা হলো-৯ম হিজরীতে হুযুর (দঃ) হজ্ব করেননি কেন? এ প্রশ্নের একাধিক জওয়াব আছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য জওয়াব হলো-তিনি জানতেন আগামী বৎসর ১০ হিজরী পর্যন্ত তিনি হায়্যাত পাবেন- তাই বিলম্ব করেছিলেন। ইহাই মৃত্যু সম্পর্কীয় ইলমে গায়েব। হুযুর (দঃ)- কে আল্লাহ পাক পঞ্চগায়েবের ইলেমও দান করেছেন। পঞ্চগায়েবের ইলেম আল্লাহর জন্য যাতী এবং রাসুলে পাকের জন্য আতায়ী।]

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

সাতচল্লিশতম অধ্যায়

বিদায় হজ্ব ১০ম হিজরী

প্রসঙ্গ ঃ আরাফাতের খুতবা, আরাফাতের মসজিদে নামিরার স্থানে ও মোযদালেফার মাশআরিল হারাম মসজিদের স্থানে দুই নামায একত্রে আদায়; নবী করিম (দঃ)-এর পিতা-মাতার পুনঃজীবন লাভ ও ইসলাম গ্রহণ, প্রাসঙ্গিক কথা, ইনতিকালের আগাম সংবাদ ঃ

মক্কাবাসীগণ পূর্ব হতেই হজ্বের মৌসুমে (শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ্ব) আরাফাত ও মিনায় অবস্থান করতো এবং শেরেকী পন্থায় আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করতো। নবী করিম (দঃ)ও নিয়মিতভাবে ঐ সময় আরাফাত এবং মিনায় যেতেন এবং আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল থাকতেন। হিজরতের পূর্বে তিনি মিনায় মদিনাবাসীদের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিতেন। একাধারে তিন বৎসর তিনি হজ্বের মৌসুমে আগত মদিনাবাসী নারী-পুরুষদের সাথে মিনার আকাবায় মিলিত হয়ে হিজরতের কথা পাকাপোক্ত করেছিলেন। তখন মদিনাবাসী মুসলমানের সংখ্যা ছিল ৯০ জন।

হিজরতের পর তিনি ৪ বার ওমরাহ্ ও একবার হজ্ব আদায় করেন। প্রথমবার ৬ষ্ঠ হিজরীতে ওমরাহ্ করতে এসে হোদায়বিয়া হতে ফেরত যান। এটাও ওমরার মধ্যে গণ্য হয়। পরের বৎসর ৭ম হিজরীতে সন্ধির শর্ত অনুযায়ী ওমরাতুল ক্বাযা পালন করেন। ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর হোনায়ন ও তায়েফ যুদ্ধ শেষে জি'রানা নামক স্থান থেকে এহরাম বেঁধে ওমরাহ আদায় করেন। ৪র্থ ওমরাহ্ আদায় করেন বিদায় হজ্বের সাথে।

দ্বিতীয় ওমরাহ্ আদায় করার সময় (৭ম হিজরী) মক্কাশরীফ কোরাইশদের দখলে ছিল। সেসময় কা'বার ভিতরে ৩৬০টি মূর্তি ছিল। এমতাবস্থায় নবী করিম (দঃ) সাহাবীদেরকে নিয়ে আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করেন এবং বাইরে নামায আদায় করেন। এতে সাহাবীগণের মনে খট্‌কা লাগে। নবী করিম (দঃ) তাঁদেরকে শান্তনা দিয়ে বললেন- **"আমাদের নিয়ত হচ্ছে আল্লাহর ঘরের বাইরে তাওয়াফ করা- ভিতরের মূর্তির তাওয়াফ করা নয়। আল্লাহ নিয়ত অনুযায়ী বরকত দেবেন"**। (পেটের ভিতরে পেশাব পায়খানা রেখেও নামায পড়া যায়।)

এতে একটি মাসআলা জানা গেল যে, কোন পবিত্র স্থানে অপবিত্র কর্মকান্ড অনুষ্ঠি[illegible] হলেও উক্ত পবিত্রস্থানের বৈধ অনুষ্ঠানে যোগদান করা উচিত। যদি ওখা[illegible]কার অন্যায় কাজ বন্ধ করা সম্ভব না হয়, তবে একারণে মূল বৈধ কাজ বাদ দেয়া যাবে না। যেমন- কোন মাযারে নারী-পুরুষ একসাথে যিয়ারত করলে

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

অথবা শরীয়ত বিরোধী কোন কার্যকলাপ সেখানে অনুষ্ঠিত হলে– এই অজুহাতে মূল যিয়ারত বন্ধ করা যাবেনা। কেননা যিয়ারত করা সুন্নাত। শক্তি থাকলে শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করা ওয়াজিব। নতুবা নিজে নিজে যিয়ারত করে চলে আসবে। (শামী, বাহারে শরীয়ত)।

নবম হিজরীতে নবী করিম (দঃ) নিজে হজ্ব না করে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) কে আমীর বানিয়ে তিনশত লোক পাঠিয়ে প্রথম হজ্ব পালন করান। এ বছর মুশরিকরাও তাওয়াফ করতে এসেছিলো। তাই হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর নেতৃত্বে মুসলমানদের হজ্ব ছিল মুসলমান ও মুশরিকদের মিশ্রিত হজ্ব। মুশরিকগণ তাদের শেরেকী প্রথা অনুযায়ী হজ্ব বা তাওয়াফ করেছিল এবং মুসলমানগণ ইসলামী কায়দায় হজ্ব আদায় করেন। এই বৎসরই ছিল মুশরিকদের শেষ সুযোগ। হযরত আলী (রাঃ) কে পাঠিয়ে নবী করিম (দঃ) আরাফাতে ও মিনায় আল্লাহর ঘোষণা প্রচারের ব্যবস্থা করেন এই বলে যে, **"দশম হিজরী থেকে মুশরিকদের জন্য হজ্ব ও ওমরায় আগমন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হলো"**। এভাবে মক্কা, আরাফাত, মোজদালেফা ও মিনাকে মুশরিকমুক্ত করে নবী করিম (দঃ) দশম হিজরীতে নিজে হজ্ব আদায় করার ব্যবস্থা করেন। বিলম্বের ইহাই মূল কারণ।

সংস্কার কাজ করা যে কত কঠিন ও সময় সাপেক্ষ–হজ্বের এ ঘটনার মধ্যেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। পরিবেশ সৃষ্টি না করে প্রথম থেকেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলে তা বাস্তবায়ন করা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। একটি হজ্বের জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরী করতে ২ বৎসর লেগেছিল।

হজ্বের প্রস্তুতি ঃ

নবী করিম (দঃ) দশম হিজরীর হজ্ব মৌসুমের পূর্বেই ঘোষণা করে দেন যে, তিনি এ বৎসর হজ্ব আদায় করবেন। সাহাবীগণ যেন সমবেতভাবে নবী করিম (দঃ)-এর সাথে হজ্বে গমনের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। সারা আরবে সাজসাজ রব পড়ে গেল। আনন্দের ঢেউ খেলে গেলো। সকলের মনে বিগত একুশ বৎসরের যুলুম-অত্যাচার, দেশত্যাগ, যুদ্ধ বিগ্রহ, অবশেষে মক্কা বিজয়, কোরাইশদের চরম পরাজয় ও অপমান– সব কিছুর ছবি চোখের সামনে একে একে ভেসে উঠতে লাগলো। মহানবীর (দঃ) মহান হজ্ব যেন একই সাথে মহা বিজয় মিছিলে পরিণত হতে লাগলো। চতুর্দিকে প্রস্তুতির ধুম পড়ে গেল।

কিন্তু এতসব আনন্দ আয়োজনের মধ্যেও যেন বিদায়ের একটি করুণ সুর বেজে উঠলো। মহানবীর (দঃ) উপর অর্পিত দায়িত্ব যেন চূড়ান্ত সমাপ্তিপথে দ্রুত

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

এগিয়ে চলছে। হজ্বের প্রস্তুতির সাথে সাথে মহানবী (দঃ) মহাপ্রয়াণের প্রস্তুতিও মনে মনে গ্রহণ করতে লাগলেন।

দশম হিজরীর যিলক্বদ মাসের ৫ দিন বাকী থাক্‌তে নবী করিম (দঃ) এক লক্ষ চব্বিশ হাজার-মতান্তরে একলক্ষ ছাব্বিশ হাজার সাহাবীর হজ্ব কাফেলা নিয়ে হজ্বে রওনা দিলেন এবং জিলহজ্ব মাসের ৪ তারিখে মক্কা মোয়ায্‌যমায় উপস্থিত হলেন। মক্কা মোয়ায্‌যমা নবী করিম (দঃ)-এর আগমনে যেন পুনঃজীবন লাভ করলো। নবী করিম (দঃ)-এর পদধূলিতে মক্কা ভূমি পুনরায় গৌরবান্বিত হলো। একলক্ষ ছাব্বিশ হাজার সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে মক্কাভূমি জান্নাতে রূপান্তরিত হলো। সে বৎসরই মক্কার হাজুন কবরস্থানটি "জান্নাতুল মায়াল্লা" উপাধীতে ভূষিত হলো। মক্কার এই দৃশ্য কেয়ামত পর্যন্ত দ্বিতীয়বার আর দেখা যাবেনা। এই জান্নাতী দৃশ্য কল্পনা করেই রাসুল-প্রেমিকদের হৃদয় হজ্বে গমনে আকুল হয়ে উঠে।

মদিনা শরীফের মসজিদে নব্বীতে যোহর নামায আদায় করে তিনি রওনা দেন এবং যুল-হোলায়ফা নামক স্থানে গিয়ে আসরের নামায দু-রাকাত-অর্থাৎ কসর আদায় করেন। সেখান থেকেই তিনি ইহ্‌রাম পরিধান করে তাল্‌বিয়া বা লাব্বাইকা দোয়া পাঠ করেন। মদিনা শরীফের ৬ মাইল দূরে যুল-হোলায়ফা মদিনাবাসীদের ইহ্‌রামের মীকাত। মক্কা মোয়ায্‌যমার পথে তিনি ৯ দিন সফর করেন। যেখানে যেখানে তিনি অবতরণ করে নামায আদায় করতেন—ঐ স্থানগুলোতে পরবর্তীতে মসজিদ তৈরী হয়। সাহাবাগণের যুগে অবশ্য সব মসজিদ তৈরী হয়নি। তবুও তাঁরা যখনই এপথে মক্কায় গমনাগমন করতেন, তখন ঐ পবিত্র স্থানসমূহে বরকতের আশায় নামায আদায় করতেন এবং নবী করিম (দঃ)-এর স্মৃতি বিজড়িত পবিত্রস্থান হিসাবে ঐ স্থানের তাযীম করতেন। ইবনে কাছির (৭৭৪ হিজরী) তাঁর অমরগ্রন্থ আলবেদায়া ওয়ান নেহায়া'তে এই স্থানগুলোর উল্লেখ করে কোন্ কোন্ সাহাবী এসব স্থানে নামায আদায় করতেন—তাঁদের নামও উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, পরবর্তী যুগের জাহেল ও মূর্খ লোকদের অবহেলায় ঐসব স্থানের অনেক স্মৃতি চিহ্নই বিনষ্ট হয়ে যায়।

পবিত্র স্থানসমূহ সংরক্ষণের গুরুত্ব

নবী-রাসুল-অলী-আব্‌দাল ও গাউছ-কুতুবগণের স্মৃতি চিহ্ন সংরক্ষণ করা ইসলামকে সতেজ রাখার একটি প্রকৃষ্ট উপায়। ইহা ইসলামী ঐতিহ্যের প্রমাণ ও

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

প্রতীক। যেখানে মহান সাধকগণের মাযার ও স্মৃতিচিহ্ন বিদ্যমান-সেখানে ইসলামের জোশ ও প্রেরণা উজ্জিবিত। উদাহরণ স্বরূপ- মদিনা মোনাওয়ারা, বাগদাদ শরীফ, আজমীর শরীফ, সিরহিন্দ শরীফ, বেরেলী শরীফ, সিলেট, দিল্লী, পাকপত্তন, কালিয়ার শরীফ, কাচওয়াছা ফয়যাবাদ, ছিরিকোট, লাহোর, পানিপথ- ইত্যাদি স্থানের পবিত্র রওযা ও মাযারসমূহ। এসব মাযার ইতিহাসের জ্বলন্ত স্বাক্ষী ও মুসলিম ঐতিহ্যের প্রতীক। এগুলো হলো প্রেরণার উৎস। **মাযার সমূহ ধ্বংস করার অর্থ- গোটা মুসলিম জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে ধ্বংস করা। সৌদী সরকার তাই করেছে- তারা ইসলামী ঐতিহ্য হত্যাকারী।**

বর্তমান সৌদি রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ আবদুল আযিয ১৯২৫-২৬ সালে মক্কা, মদিনা, তায়েফ- ইত্যাদি স্থানের সাহাবীগণের, নবী পত্নীগণের ও বিবি ফাতেমার (রাঃ) মাযারসমূহ ধূলিস্যাত করে দিয়েছে। এতে করে দিনদিন সৌদি আরবের প্রকৃত ইসলামী প্রেরণা হ্রাস পাচ্ছে এবং বেদ্বীন আমেরিকার গোলামে তারা পরিণত হচ্ছে। ওহাবী রাজতন্ত্র যেদিন খতম হবে, সেদিন স্মৃতিচিহ্ন, স্মৃতিসৌধ ও মাযারসমূহ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে- ইন্‌শাআল্লাহ। বর্তমানে বিদেশে অবস্থানরত কিছু কিছু সৌদি ওলামা রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে মুখ খুলছেন।

মক্কা-মদিনার সুন্নী ওলামাগণ কোন্‌ঠাসা অবস্থায় আহাজারী করছেন। সৌদী বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ১৯৯৪ সালে সৌদি সরকার অনেক আলেম-উলামাকে জেলে পাঠিয়েছে। উলামা ও মসজিদের ইমামগণ দিনদিন সোচ্চার হয়ে উঠছেন। কমিউনিজম শত বসৎরের মাথায় এসে ভেঙ্গে পড়েছে। ওহাবী ইজমও শত বৎসরের মাথায় এসে ভেঙ্গে যাওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়। বর্তমানে (২০০৭) ৮৩ বৎসর চল্‌ছে।

মক্কায় উপস্থিতি ও তাওয়াফ

নবী করিম (দঃ) যিলহজ্ব চাঁদের ৪ তারিখ রোববার সকালে সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে মক্কা-মোয়ায্‌যমায় প্রবেশ করে খানায়ে কা'বার তাওয়াফ করেন এবং সাফা মারওয়ার সাঈ সমাপ্ত করেন-যারা প্রথমে শুধু ওমরাহ্ করার নিয়তে এহ্‌রাম বেঁধেছিলেন, তাঁদেরকে এহ্‌রাম খুলে ফেল্‌তে নির্দেশ দিলেন। ইহাকে হজ্বে তামাত্তু বলা হয়। ঐ দিনই তিনি মক্কা-মোয়ায্‌যমার পূর্বপ্রান্তে বাত্‌হা বা আবৃতাহ্ নামক স্থানে গিয়ে অবস্থান করতে লাগলেন। এ জন্য হুযুর (দঃ) কে আবৃতাহীও বলা হয়। ৭ তারিখ বুধবার পর্যন্ত তিনি ঐ স্থানেই অবস্থান করেন। এই সময় বিবি ফাতেমা (রাঃ) ও উম্মুল মোমেনীনগণ হুযুর (দঃ)-এর সাথে ছিলেন।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন ইয়ামেন দেশে গভর্ণর হিসাবে। নবী করিম (দঃ)-এর নির্দেশে হযরত আলী (রাঃ) ইয়ামেন থেকে এসে তাঁর সাথে আবতাহ্ নামক স্থানে মিলিত হন। যিলহজ্ব মাসের ৮ তারিখ বৃহস্পতিবার হজ্বের উদ্দেশ্যে তিনি মীনায় গমন করেন এবং যোহর থেকে ৫ ওয়াক্ত নামায সেখানে আদায় করেন।

আরাফায় গমন ও উকুফ পালন, হজ্বের ভাষণ প্রদান ঃ

নবী করিম (দঃ) মক্কার হিসাব মতে ৯ই যিলহজ্ব শুক্রবার সকালবেলা মীনা থেকে পূর্বদিকে আরাফাতের উদ্দেশ্যে রওনা হন। সাথে এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার সাহাবায়ে কেরামও মীনা থেকে আরাফাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। লক্ষ কণ্ঠের গগনবিদারী লাব্বাইক ধ্বনীতে দু'পাশের পর্বতমালা কেঁপে উঠলো। নবী করিম (দঃ) আরাফাতে পৌঁছে মসজিদে নামিরার স্থানে দাঁড়িয়ে ঐতিহাসিক বিদায় হজ্বের ভাষণ (খুতবা) প্রদান করেন। উক্ত ভাষণে তিনি ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব, আরব-আজমের ভেদাভেদহীন সমাজব্যবস্থা, সুদ হারাম, পরস্পর খুনখারাবীর উপর নিষেধাজ্ঞা, নারীদের ইজ্জত-সম্ভ্রম রক্ষা, জীবনের নিরাপত্তা, সম্পদের নিরাপত্তা- ইত্যাদি বিষয়ে এক নীতি-নির্ধারনী সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। এই ভাষণকেই হজ্বের খুতবা বা বিদায়ী ভাষণ বলা হয়। যোহর নামাযের পূর্বে এই খুতবা দেয়া হয়। অতঃপর তিনি জাবালে রহমতের পাদদেশে দোয়া মুনাজাতে মশ্‌গুল হয়ে পড়েন।

সেদিন তিনি মুসাফির হিসাবে যোহর ও আছর নামায একসাথে পরপর আদায় করেন-জুমা পড়েননি। এই ব্যবস্থাকে 'জম্‌য়ে তাকদীম' বলা হয়। কিয়ামত পর্যন্ত আরাফাতের দিন শুধু মসজিদে নামিরার জমাতে এই নিয়ম চালু থাকবে। কিন্তু তাঁবুতে পড়লে যোহর ও আছর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পড়তে হবে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বেই কোরআন মজিদের ঐতিহাসিক আয়াতটি নাযিল হয়। আল্লাহ্ তায়ালা উক্ত আয়াতে আল্লাহপাক এরশাদ করেন-

"আজকের দিনে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণতা দান করলাম। আর আমার নেঁয়ামতও তোমাদের উপর পরিপূর্ণ করে দিলাম। আর ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসাবে তোমাদের জন্য পছন্দ করলাম" (সুরা মায়েদাহ)। আয়াত হিসাবে এই আয়াতটিই সর্বশেষ নাযিল হয়। এরপর মীনাতে নাযিল হয় সর্বশেষ পরিপূর্ণ সুরা আন্-নাস্‌র।

আরাফাতে উক্ত আয়াতটি নাযিল হওয়ার সাথে সাথে সাহাবীগন আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেন। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ), হযরত ওমর

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

(রাঃ) ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) নীরবে কাঁদতে লাগলেন। কাঁদার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁরা বললেন- এই আয়াতে নবী করিম (দঃ)-এর বিদায়ের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতও রয়েছে। সুতরাং আমরা নবী করিম (দঃ)-এর বিদায়-আশংকায় কাঁদ্‌ছি।

উক্ত আয়াতে নবুয়তধারার পরিসমাপ্তি এবং দ্বীনের পূর্ণাঙ্গতা সম্বন্ধে আল্লাহপাক যে শুভ সংবাদ দিয়েছেন-তা কত গুরুত্বপূর্ণ, জনৈক ইয়াহুদী পাদ্রীর উক্তিতে তা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে উক্ত ইয়াহুদী পাদ্রী তাঁর দরবারে এসে বললো- "হে আমিরুল মোমেনীন! আপনারা আপনাদের কোরআনে এমন একটি আয়াত পাঠ করেন- যদি সেই আয়াতটি আমরা ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের উপর অবতীর্ণ হতো-তাহলে আমরা ঐ দিনটিকে ঈদের দিন হিসাবে পালন করতাম"। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন- "সে আয়াতটি কি? ইয়াহুদী বললো- 'আল্ ইয়াওমা আকমাল্‌তু লাকুম'... আয়াত। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন- উক্ত আয়াতটি যে দিনে, যে তারিখে ও যে সময়ে নাযিল হয়েছিল- তা আমার স্পষ্ট স্মরণ আছে- দুই ঈদের দিনে অর্থ্যাৎ- আরাফাতের দিনে ও জুমার দিনে বিকাল বেলায় নবী করিম (দঃ)-এর উপর উক্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছিল (মুসলিম)। অর্থাৎ হজ্ব ও জুমার দিন আমাদের নিকট ঈদের দিন। পবিত্র তারিখে, পবিত্র দিনে, পবিত্র স্থানে ও পবিত্র ক্ষণেই উক্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছে"।

(বিঃ দ্রঃ) কিছু জাহেল লোক বলে- দুই ঈদ ছাড়া শরিয়তে তৃতীয় কোন ঈদ নেই। তাদের জানা উচিৎ-জুমা এবং আরাফাতের দিনও ঈদের দিন। এভাবে মিলাদুন্নবীর দিনও ঈদের দিন। ঈদের দিন ৯টি- (১) ঈদে রামাদ্বান (২) ঈদে কোরবান (৩) ঈদে জুমুয়া ৪। ঈদে আরাফাহ (৫) ঈদে লাইলাতুল বারাআত (৬) ঈদে লাইলাতুল ক্বদর (৭) ঈদে আশুরা (৮) ঈদে নুযুলে মায়েদাহ (৯) ঈদে মিলাদুন্নবী বা ঈদে ইয়াওমে বেলাদাত (গুনিয়াতুত্বালেবীন, মাওয়াহিব, মাদারিজ- ইত্যাদি)।

মোজদালেফায় রাত্রি যাপন ঃ

আরাফাতের ময়দানে নবী করিম (দঃ) সন্ধ্যা পর্যন্ত অবস্থান করেন। দিনের মধ্যাহ্ন হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত আরাফাত ময়দানে হাজীগণের অবস্থান করাকে 'উকুফ'

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

বলা হয়। এই কাজটি হজ্বের ফরয। এই সামান্য সময় অবস্থানের ফলে আল্লাহ্ তায়ালা জীবনের সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন। সূর্য্য ডুবে হলুদ রং অপসারিত হওয়ার পর নবী করিম (দঃ) কাস্ওয়া নামক উটে আরোহন করেন এবং পিছনে পালিত পুত্রের সন্তান উসামা ইবনে যায়েদকে (রাঃ) বসান। এই কাস্ওয়া উটটি হযরত আবু বকর (রাঃ) হিজরতের সময় ক্রয় করে নবী করিম (দঃ) কে দান করেছিলেন। এই উটে সওয়ার হয়েই নবী করিম (দঃ) হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবেন বলে এক হাদীসে এসেছে। হযরত আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক ক্রয়কৃত অন্য উটটির নাম ছিল আদ্‌বা। এটিতে চড়ে হাশরে যাবেন বিবি ফাতেমা (রাঃ)। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর অবদানকে রাসুলে মকবুল (দঃ) এভাবেই সম্মানিত করেছেন।

নবী করিম (দঃ) সকল সাহাবীকে মোযদালিফার দিকে রওনা দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন এবং পথিমধ্যে মাগরিব নামায না পড়ার কথা বলে দিলেন। কেননা, আরাফাত ও মোযদালিফার মধ্যখানে আব্‌রাহার হস্তি বাহিনীর উপর আল্লাহ তায়ালা গযব নাযিল করেছিলেন। মোযদালিফায় এসে নবী করিম (দঃ) ঐ স্থানে অবস্থান করলেন– যেখানে হযরত আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়া (আঃ) প্রথম বাসররাত্রি যাপন করেছিলেন–খোলা আকাশের নীচে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আরাফাহ্ ও মোযদালিফা–এই দুটি স্থান আদি পিতা-মাতার স্মৃতিবিজড়িত স্থান। হাজীগণ আরাফাত ও মোযদালিফায় গমন করে আদি পিতা-মাতার স্মৃতি স্মরণ করে এবং কিছুক্ষণ পিতৃস্থানে অবস্থান করে। তদ্রুপ মীনা হলো হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর কঠিন পরীক্ষাস্থল। এখানে এসে হাজীগণ আল্লাহর পথে আত্মত্যাগের শিক্ষা গ্রহণ করেন। মূলতঃ পূর্ণ হজ্ব ক্রিয়াটিই নবীগণের সম্পাদিত ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান ও অনুকরণ ব্যতীত আর কিছুই নয়– এটাই ইবাদত বলে গণ্য। এখানে তিনি এক আযানেই মাগরিব ও এশার নামায একসাথে পর পর আদায় করেন। ইহাকে 'জম্‌য়ে তাখীর' বলে। হজ্বের দিন আরাফাহ্ ও মোযদালেফা ছাড়া অন্য কোন স্থানে দুই নামায একসাথে পড়ার বিধান নেই। ইহাই হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত।

মীনায় গমন ও ৪ দিন অবস্থান

মোযদালিফায় রাত্রি যাপন করে ৭০টি করে কংকর সংগ্রহ করে ১০ তারিখ প্রত্যুষে ফজর নামায আদায় করে নবী করিম (দঃ) সাহাবায়ে কেরাম

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

সমবিভ্যাহারে মিনার দিকে রওনা হন। এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার সাহাবায়ে কেরাম তাঁর সঙ্গী। তাঁদের কণ্ঠে ধ্বনীত হচ্ছে– লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক! হে আল্লাহ্! আমরা তোমার ডাকে হাযির! কি আবেগময় দৃশ্য! এভাবে কাফেলা মিনায় গিয়ে পৌঁছলো। এ সফরে নবী করিম (দঃ) উটের পিঠে তুলে নিলেন ফযল ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে।

মিনায় পৌঁছেই তিনি জামরাতুল উলা বা বড় শয়তানকে ৭টি কঙ্কর মেরে তাঁবুতে ফিরে আসেন। হযরত ইসমাঈল (আঃ) কে যে জায়গায় কোরবানীর জন্য শোয়ানো হয়েছিল– সে স্থানটির নাম মায্বাহ্। সেখানে নবী করিম (দঃ) সাহাবীগণকে নিজেদের কোরবানী করার নির্দেশ দেন। সাহাবীগণ কোরবানী কাজ সমাধা করে ইহরাম খুলে ফেলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর কোরবানী অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁরা শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন নিজেদের কোরবানী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। ঐ দিনেই তিনি সাহাবীগনসহ মক্কায় গমন করে তাওয়াফে যিয়ারত শেষ করে পুনঃ মিনায় এসে রাত্রি যাপন করেন। এটাই প্রকৃত সুন্নাত। ১১, ১২ ও ১৩ জ্বিলহজ্ব তিনদিন তিনটি জামারায় পাথর নিক্ষেপ করলেন– প্রতিটিতে পর পর ৭টি করে ২১টি। এভাবে ১ম দিনে ৭টি, দ্বিতীয় দিনে ২১টি, তৃতীয় দিনে ২১টি এবং চতুর্থ দিনে ২১ টি মোট ৭০টি পাথর নিক্ষেপ করলেন শয়তানের উদ্দেশ্যে। কেয়ামত পর্যন্ত এই পাথর নিক্ষেপ একটি ওয়াজিব ইবাদতে পরিণত হয়ে গেল। নবীগণের অনুকরণের নামই ইবাদাত। হাজীগনকে ১২ তারিখ পর্যন্ত ৩দিনে ৪৯টি কংকর মারতে হয়। ঐ দিন কোন কারণে সন্ধ্যার পূর্বে মিনা হতে বের হতে না পারলে ১৩ তারিখে আরো ২১ টি মারতে হবে।

মাযবাহে গিয়ে কোরবানীর কাজ শেষ করে মাথা হলক করে ইহরাম খুলে নবী করিম (দঃ) সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে ঐ দিনই ১০ই জিলহজ্ব তারিখে বাইতুল্লাহ যিয়ারত করতে গেলেন এবং তাওয়াফ যিয়ারত শেষে পুনরায় মিনায় ফিরে আসেন। এই তাওয়াফকে তাওয়াফে যিয়ারত বলা হয় এবং এটি হজ্বের শেষ ফরয। হজ্বের ফরয তিনটি। যথা (১) ইহরাম, (১) উকুফে আরাফাহ্, (৩) তাওয়াফে যিয়ারত। নবী করিম (দঃ) হজ্বের সম্পূর্ণ বিধান নিজের আমলের মাধ্যমে উম্মতের সামনে পেশ করেছেন। এজন্য হজ্ব এত মর্যাদাপূর্ণ।

মিনাতে অবস্থানকালেই সুরা নাসর অবতীর্ণ হয়। এতে নবী করিম (দঃ)-এর ইনতিকালের পূর্বাভাস বিদ্যমান। উক্ত সুরা নাযিলের পর মিনার খুতবায় নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেন– **"সম্ভবতঃ এ বৎসরের পর তোমাদের সাথে আর**

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

হজ্ব করতে পারবোনা" । এখানে পরিষ্কারভাবে নবীজীর ইলমে গায়েবের প্রমাণ পাওয়া যায় । ১৩ই যিলহজ্ব তারিখে ২১টি পাথর নিক্ষেপ শেষে তিনি মক্কায় ফিরে আসেন ।

হাজুন কবরস্থানকে জান্নাতুল মায়াল্লা ঘোষণা-নবী করিম (দঃ)-এর পিতা-মাতার পুনঃজীবন লাভ ও ইসলাম গ্রহণ

নবী করিম (দঃ) হজ্বের এক পর্যায়ে 'হাজুন' নামক কবরস্থানে গমন করেন। এটি মক্কার সর্বসাধারনের কবরস্থান । এখানেই শায়িত আছেন ইসলামের প্রথম পূণ্যবতী মহিলা উম্মুল মোমেনীন হযরত খাদিজাতুল কোব্‌রা (রাঃ) । তিনি ধন-সম্পদ জীবন-মরণ সব কিছু বিলিয়ে দিয়ে নবী করিম (দঃ)-এর দ্বীনের খেদমত করেছেন । এমন আত্মত্যাগী নারী দ্বিতীয়জন আর নেই । যখন তিনি ইনতিকাল করেন, তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বৎসর । তখন নবী করিম (দঃ)-এর বয়স হয়েছিল ৫০ বৎসর । তিন বৎসর নির্বাসন জীবন শেষ করে নবুয়তের দশম সালে সবেমাত্র মুক্ত আলোতে নিঃশ্বাস নিবেন এবং স্বামীর সুখ দুঃখের সঙ্গিনী হবেন– এমন সময়ই তিনি রমযান মাসে ইন্‌তিকাল করলেন । নবী করিম (দঃ)-এর চাচা আবু তালেবও এ সময়েই ইনতিকাল করেন । নবী করিম (দঃ) সেই বৎসরকে (নবুয়তের দশম সাল) শোকের বৎসর বলে আখ্যায়িত করেন । বিবি খাদিজা (রাঃ)-এর ইনতিকালের সময় পর্যন্ত জানাযা নামাযের হুকুম নাযিল হয়নি । তাই জানাযার নামাযও হয়নি । নবী করিম (দঃ) অন্যান্য দোয়া দরুদ পড়ে বিবি খাদিজা (রাঃ) কে কবরে সোপর্দ করেন ।

এরপর নবী করিম (দঃ) তায়েফে গিয়ে অত্যাচারিত হলেন । সবশেষে হিজরত করতে বাধ্য হলেন । মদিনার জীবনে চাপিয়ে দেয়া ৭৪টি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেন । ৮ম হিজরীতে মক্কাভূমি পুরুদ্ধার হলো । এভাবে ১৩টি বৎসর পার হয়ে গেলো । এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার সাহাবী নিয়ে এখন (১০ম হিজরী) তিনি হজ্বে আগত । তাঁর অঙ্গুলী হেলনে এখন মক্কা মোয়াযযমা পরিচালিত । কিন্তু সব থাকা সত্ত্বেও যেন অনেক কিছুই নেই । পিতা ইনতিকাল করলেন মাতৃগর্ভে থাকতে । মাতা ইনতিকাল করলেন ছয় বছরের শিশুকালে । দাফন হলেন মদিনা থেকে মক্কায় আসার পথে আব্‌ওয়া নামক স্থানে । পিতার কবর মদিনাতে । মাতার কবরও মক্কা-মদিনার মাঝপথে । বিবি খাদিজা শুয়ে আছেন হাজুন গোরস্থানে । একথা স্মরণ করে হুযুরের হৃদয় হাহাকার করে উঠলো ।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

নবী করিম (দঃ)-এর বর্তমান বিজয়ীবেশ এবং ভক্ত অনুরক্তের এই বিশাল সমাবেশ তাঁরা কেউ দেখে যেতে পারলেন না। সব কিছু পেয়েও যেন তিনি অনেক কিছুই হারিয়েছেন। একে একে সব স্মৃতি নবী করিম (দঃ)-এর স্মৃতিপটে ভেসে উঠতে লাগলো। তিনি চলে গেলেন প্রিয় সহধর্মিনী বিবি খাদিজার মাযার যিয়ারতে–হাজুন নামক গোরস্থানে। তাঁর মন আজ ভারাক্রান্ত। এমন সময় তিনি দেখতে পেলেন–তাঁর পিতা-মাতা হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) ও বিবি আমেনা (রাঃ) জীবিত হয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত। এবার আল্লাহতায়ালা নবীর সম্মানে তাঁর পিতা-মাতাকে জীবিত করে তাঁর সামনে উপস্থিত করে দিলেন। তাঁরা উভয়েই কলেমা শরীফ পাঠ করে মুসলমান সাহাবী হলেন এবং আল্লাহর নির্দেশে পুনরায় মৃত্যুবরণ করলেন। যদিও তাঁরা পূর্ব হতেই মিল্লাতে ইবরাহীমীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং মোমিন হানিফ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন–তবুও নবীজীর সম্মানে আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে পুনঃজীবিত করে মুসলমান ও সাহাবী হবার সুযোগ করে দিলেন। এখন থেকে তারা সরাসরি মুসলমান ও সাহাবী নামে অভিহিত। হযরত ঈছা আলাইহিস সালাম মৃতকে জীবিত করতেন। এটা নবীদের মো'জেযা। নবী করিম (দঃ)-এর হাতেও অনেক মৃত ব্যক্তি জীবন লাভ করেছে। যেমনঃ তাঁর পিতা-মাতা, জাবেরের দুই পুত্র। এক মুহাজির মহিলার একমাত্র মৃতপুত্র গোসল ও কাফনের পর নবীজীর দোয়ায় পুনঃজীবন লাভ করেছেন। মহিলার এই পুত্র পরে বিবাহ শাদী করেছেন এবং হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন। **(প্রমাণপঞ্জী ঃ ফতোয়ায়ে শামী, হাফেয নাসিরুদ্দীন বাগদাদী, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস, তাফসীরে রুহুল বয়ান, তাফসীরে নাঈমী, শানে হাবীব, আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, আল্লামা সোহায়লী প্রভৃতি)।**

নবী করিম (দঃ) হাজুনে গিয়েছিলেন কাঁদতে কাঁদতে, কিন্তু প্রত্যাবর্তন করলেন হাসতে হাসতে। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ **"নবী করিম (দঃ) আমাকে উটের লাগাম ধরে দাঁড়াতে বলে হাজুনে তশরীফ নিয়ে গেলেন কাঁদতে কাঁদতে। আমিও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ পর নবী করিম (দঃ) হাসতে হাসতে প্রত্যাবর্তন করলেন। আমি এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি পিতা-মাতার জীবিত হয়ে আগমন এবং নূতন করে ইসলাম গ্রহণ ইত্যাদি ঘটনা খুলে বললেন"** (বেদায়া ও নেহায়া ৬ষ্ঠ খন্ড, তাফসীরে রুহুল বয়ান ১ম খন্ড ২১৬ পৃষ্ঠা)।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

তখন থেকে নবী করিম (দঃ) 'হাজুন' কবরস্থানের নাম রাখলেন জান্নাতুল মায়াল্লা এবং মদিনা শরীফের 'বাক্বীউল গারকাদ' কবরস্থানের নাম রাখলেন জান্নাতুল বাক্বী। হুযুরের রওযা মোবারক ও মিম্বার শরীফের মধ্যবর্তী স্থানের নাম রাখলেন "রিয়াযুল জান্নাত"। দুনিয়ার এই তিনটি জান্নাত পরকালের ৮টি জান্নাতের সাথে যোগ হবে বলেও কোন কোন বর্ণনায় এসেছে (মাওয়াহিব, শানে হাবীব)। নবীজীর রওযা মোবারক হচ্ছে আরশে মোয়াল্লার চেয়েও উত্তম।

নবী করিম (দঃ)-এর পিতা-মাতার পুনঃজীবন লাভের রেওয়ায়াত সম্পর্কে বিখ্যাত মোহাদ্দেছ হাফেয সামছুদ্দিন দামেস্কী একটি আরবী কবিতায় মন্তব্য করেছেন

حَبَّا اللّٰهُ النَّبِيَّ مَزِيْدَ فَضْلٍ+عَلٰى فَضْلٍ وَكَانَ بِهٖ رَؤُفًا -

فَاَحْيَا لَهٗ اُمَّهٗ وَكَذَا اَبَاهُ+لِاِيْمَانٍ بِهٖ فَضْلًا لَطِيْفًا -

فَسَلِّمْ فَالْقَدِيْمُ بِهٖ قَادِرٌ+وَاِنْ كَانَ الْحَدِيْثُ بِهٖ ضَعِيْفًا -

(رُوْحُ الْبَيَانْ)

মর্মার্থঃ "আল্লাহ তায়ালা আপন হাবীবের প্রতি অতি মেহেরবান ও স্নেহময়। তিনি আপন হাবীবকে মর্যাদার উপর আরো মর্যাদা দান করেছেন। তিনি আপন হাবীবের প্রতি স্নেহপরবশ হয়ে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাঁর পিতা-মাতাকে পুনঃজীবিত করেছেন। হে শ্রোতা! তুমি নতশীরে হাদীসখানা মেনে নাও। হাদীস শাস্ত্রের কঠোর নীতিমালা অনুযায়ী অত্র হাদীসের সনদ যদিও কিছুটা দুর্বল, কিন্তু মৌলিক হাদীসখানা (মতন) দুর্বল নয়। আর তাঁর পিতা-মাতাকে জীবিত করা আল্লাহর শক্তির বাইরেও নয়"। (রহুল বয়ান সূত্রে)

এখনে আল্লামা দামেস্কী হাদীস বর্ণনাকারীর কারণে রেওয়াতটিকে তৃতীয় পর্যায়ের অর্থাৎ দুর্বল পর্যায়ের বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু হাদীসশাস্ত্রে একটি সূত্র আছে– "যদি একটি দুর্বল রেওয়ায়াত বিভিন্ন সূত্রে গৃহীত ও বর্ণিত হয়, তাহলে তা আর দুর্বল থাকে না– বরং শক্তিশালী হয়ে হাসান পর্যায়ে উন্নীত হয়ে যায়"। হাদীস বিশারদ আলেম মাত্রই এই সূত্রটি জানেন।

নবী করিম (দঃ)-এর পিতা-মাতার ইসলাম গ্রহণ ও পুনঃজীবন লাভ-এর বর্ণনাটি মূলে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত এবং পরবর্তী যুগে এসে বিভিন্ন

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

সূত্রে বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য কিতাবে হাদীসের ইমামগণ তা বর্ণনা করেছেন, যা আমি কিছু পূর্বেই যথাস্থানে উল্লেখ করেছি।

সুতরাং– যারা নবী করিম (দঃ)-এর পিতা-মাতাকে কুফরী অবস্থায় মারা গিয়েছেন বলে দাবী করে, তাঁরা ভ্রান্ত ধারণায় নিঃপতিত। এরা রাসুল বিরোধী দল।

ওহাবী গোমরাহ্ আলেমগণ তাদের দলীল হিসাবে বলেন– ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) নাকি তার ফিক্‌হে আকবর কিতাবে লিখেছেন–

إِنَّ أَبَوَىِ النَّبِيِّ مَاتَا عَلَى الْكُفْرِ ۔

অর্থ–**"নবী করিম (দঃ)-এর পিতা-মাতা কুফরী অবস্থায় ইনতিকাল করেছেন"**।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ফিক্‌হে আকবর-এর পুরাতন পাণ্ডুলিপিতে এবারত ছিল এরূপ ঃ

إِنَّ أَبَوَىِ النَّبِيِّ مَامَاتَا عَلَى الْكُفْرِ ۔

অর্থ–**"নবী করিম (দঃ)-এর পিতা-মাতা কুফরী অবস্থায় ইনতিকাল করেননি"**। পরবর্তীকালে পাণ্ডলিপি নকল করতে গিয়ে (مَـــا) "না" বোধক প্রথম অক্ষরটি বাদ পড়ে যায়-যার কারণে "না" বোধক বাক্যটি "হ্যাঁ" বোধক বাক্যে পরিণত হয়ে যায়। আর এতেই এক (مَـــا)'মা' খসে পড়ার কারণে সব ভুলের জন্ম হয়। আল্লাহ আমাদেরকে সত্য উৎঘাটনের তৌফিক দিন। (সূত্র ঃ আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতি কৃত– (هِدَايَةُ الْغَبِيِّ فِيْ اِسْلَامِ اَبَوِيِ النَّبِيِّ)

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

আটচল্লিশতম অধ্যায়

মদিনায় প্রত্যাবর্তন

প্রসঙ্গ ঃ গাদীরে খুমের ঘটনা ও শিয়া সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত আক্বিদা ঃ

মীনায় ৪ দিন অবস্থান করার পর নবী করিম (দঃ) জিলহজ্ব চাঁদের ১৩ তারিখ মধ্যাহ্নে মক্কায় রওনা হন। পথিমধ্যে মোহাচ্ছাব বা আব্‌তাহ্ বা বাত্‌হা বা কাদা নামক স্থানে অবতরণ করে যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায তথায় আদায় করেন। সফরের প্রথম দিকেও এখানেই ৪ দিন অবস্থান করেছিলেন। জনৈক সাহাবী আরয করলেন- **"ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ), আপনার পৈত্রিক বাড়ীতে অবস্থান করলে কি ভাল হতনা"? নবী করিম (দঃ) এরশাদ করলেন, "আমার চাচাত ভাই আকিল কি সে সুযোগ রেখেছে? সে তো তা বিক্রি করে দিয়েছে"** ।

এই মোহাচ্ছাব বা বাত্‌হা নামক স্থান থেকেই নবী করিম (দঃ) হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) কে তাঁর শরীর পাক হওয়ার পর তাঁর ভাই আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ) এর সাথে তান্‌ঈম নামক স্থানে প্রেরণ করেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) সেখান থেকে এহ্‌রাম পরে কাযা ওমরাহ্ আদায় করেন। তাঁর উছিলায় এই স্থানটি চিরকালের জন্য ওমরার মীকাত ও হরম শরীফের উত্তর সীমানা নির্ধারিত হয়ে যায়।

এশার নামায মোহাচ্ছাবে আদায় করে কিছুক্ষণ আরাম করার পর নবী করিম (দঃ) সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে ফযরের পূর্বেই কা'বা শরীফে প্রবেশ করেন এবং ফযরের নামায আদায় করেন। ঐ দিন ছিল ১৪ই যিলহজ্ব। ফযরের নামায আদায় করে তিনি সকলকে নিয়ে বিদায়ী তাওয়াফ সম্পাদন করে মদিনা শরীফের দিকে রওনা হন। তাওয়াফে বিদা' ওয়াজিব।

গাদীরে খুমের ঘটনা এবং শিয়াদের ঈদের দিন ঃ

যিলহজ্ব মাসের ১৮ তারিখ পথিমধ্যে 'গাদীরে খুম' নামক কুপের স্থানে বিশ্রামের জন্য তিনি অবতরণ করেন। এখানে তিনি হযরত আলী (রাঃ)-এর ফযিলত ও

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

মরতবা বয়ান করে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান করেন। সে ভাষণে নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেন–

مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ- اَللّٰهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ (نسائى)

অর্থ–**"আমি যার মনিব বা মাওলা, হযরত আলীও তাঁর মাওলা। হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি হযরত আলীর সাথে বন্ধুত্ব রাখে, তুমিও তার সাথে বন্ধুত্ব রাখো এবং যে তাঁর সাথে শত্রুতা পোষণ করে, তুমিও তাকে শত্রুতার উপযুক্ত জবাব দাও"** (নাছায়ী)। উল্লেখ্য, কোন কোন সাহাবী হযরত আলী (রাঃ)-এর কঠোরতা সম্পর্কে নবী করিম (দঃ)-এর খেদমতে আরযি পেশ করলে নবী করিম (দঃ) ঐরূপ উক্তি করেন।

উক্ত হাদীসে একটি জিনিস প্রমাণিত হলো যে, 'মাওলা, শব্দটি আল্লাহ, রাসুল ও হযরত আলীর শানে ব্যবহার করা হয়েছে। পরবর্তীতে জনৈক সাহাবী হযরত আলীকে 'মাওলানা' বলে এভাবে সালাম দিতেন– "আসসালামু আলাইকা ইয়া মাওলানা" (বেদায়া নেহায়া)।

কিন্তু শিয়ারা এই হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা করে বলে যে, নবী করিম (দঃ) নাকি হযরত আলীকেই তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করে যান। সুতরাং "গাদীরে খুম"– এ উপস্থিত যেসব সাহাবী নবী করিম (দঃ)-এর ইন্তিকালের পর হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর হাতে খেলাফতের বাইয়াত করেছিলেন–তাঁরা শিয়াদের মতে সবাই কাফের হয়ে গেছেন। (নাউযুবিল্লাহ!) শিয়ারা 'গাদীরে খুম' দিবসে অর্থাৎ ১৮ই যিলহজ্ব তারিখে ঈদ পালন করে থাকে। এমনকি–কোরবানীর ঈদের চেয়েও এই দিনকে তাঁরা বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

আহলে সুন্নাতের আক্বিদা হলো–'মাওলা' শব্দটি দ্বারা খলিফা বুঝায় না। পরবর্তীকালের সাহাবীরাও মাওলা অর্থ খলিফা বলেননি। কিন্তু শিয়া সম্প্রদায় এর অর্থ করে **"একমাত্র নিযুক্ত খলিফা"**। এটি তাদের ভুল। (তোহ্ফায়ে ইস্না আশারিয়া–কৃত শাহ আবদুল আযিয (রহঃ)।

হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদিস–রাসুল করীম (দঃ) এরশাদ করেছেন- **"হে আলী! তোমার মধ্যে হযরত ঈছা আলাইহিস সালামের সাদৃশ্য বিদ্যমান। হযরত ঈছা (আঃ)–এর সাথে ইয়াহুদীরা শত্রুতা পোষণ করতো। তারা তাঁর**

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

মাতার চরিত্রের উপর মিথ্যা তোহমত দিতো। আর ঈসায়ী বা নাছারাগণ তাঁকে সীমাতিরিক্ত মহব্বৎ করতো। তারা হযরত ঈছা (আঃ) কে এমন পর্যায়ে নিয়েছিল- যা তাঁর মধ্যে ছিলনা" অর্থাৎ তারা তাঁকে আল্লাহর বেটা বলতো।

এই হাদীস বর্ণনা করে হযরত আলী (রাঃ) নিজ সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন-

"আমার ব্যাপারে দু প্রকারের লোক ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে- একদল আমার সম্বন্ধে সীমাহীন বাড়াবাড়ি করবে-যা আমার মধ্যে নেই। আর একদল লোক আমার সাথে শত্রুতা পোষণ করে আমার ব্যাপারে মিথ্যা দোষারোপ করবে"। (ইমাম আহমদ ও মিশকাত ৫৬৫ পৃঃ আরবী)

বিঃ দ্রঃ অত্র হাদীসে বর্ণিত প্রথমোক্ত দল হলো শিয়া এবং দ্বিতীয়োক্ত দল হলো খারেজী ও মওদূদী)। শিয়ারা হযরত আলী (রাঃ) সম্বন্ধে এমন সব আজগুবি কথা বলে-যা তাঁর মধ্যে ছিলনা। খারেজীও মউদূদীরা এমন সব মিথ্যা অপবাদ হযরত আলীর উপর বর্তায়-যা তাঁর মধ্যে ছিলনা। আমার লিখিত 'শিয়া পরিচিতি' গ্রন্থে শিয়াদের বিস্তারিত আক্বিদা দেখা যেতে পারে।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

উনপঞ্চাশতম অধ্যায়

হুযুরের বিদায়ী অসুখ

মদিনায় উপস্থিতি ও বিদায়ের প্রস্তুতি

মদিনায় ১১ হিজরীর প্রথম দিন ছিল ১লা মুহররম রোববার। এদিনে নবী করিম (দঃ) হজ্ব সমাপন করে মদিনা শরীফ এসে পৌঁছেন। এরপর ২ মাস ১২ দিন- অর্থাৎ ৭২ দিন পর ইনতিকাল করেন। বিদায় হজ্বের সময়ই নবী করিম (দঃ) সাহাবায়ে কেরামকে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, হয়তো আগামী বৎসর আর তোমাদের সাথে হজ্ব করার সুযোগ পাবোনা। আরাফাত ও মীনাতে খুত্‌বার মধ্যে তিনি এ ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। আরাফাতে "আল্‌ ইয়াওমা আক্‌মালতু" আয়াতটি নাযিল হয়। হযরত ওমর, হযরত আবু বকর ও হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম- প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামগণ উক্ত আয়াতে নবী করিম (দঃ)-এর বিদায়ের প্রচ্ছন্ন আভাস পেয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন।

মিনায় আইয়ামে তাশরীক (৯-১৩ যিলহজ্ব)-এর মাঝামাঝি সময়ে (অর্থ্যাৎ ১১ তারিখে) পূর্ণ সুরা নাসর নাযিল হয়। কোরআন মজিদ নাযিলের ধারা এই সুরার দ্বারাই সমাপ্ত হয়। এরপর কোন সুরা বা আয়াত নাযিল হয়নি। (ইত্‌কান)। কেউ কেউ বলেন- এরপর একটি মাত্র আয়াত নাযিল হয়েছিল। উক্ত আয়াতটি হলো-সূরা বাক্বারার ২৮১নং আয়াত "ওয়াততাক্কু ইয়াওমান"... । সুরা নছর নাযিল হওয়ার সাথে সাথে সুক্ষ্মদর্শী সাহাবীগণের বুঝতে আর বাকী রইলনা যে, নবী করিম (দঃ)-এর বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এসেছে। ৬৩ বৎসর বয়স এমন কিছু নয়। তবুও আল্লাহর ইচ্ছা-এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলেন। ২৩ বৎসরের মধ্যেই তিনি ৩০ পারা কোরআন মজিদ নাযিল সমাপ্ত করে দিলেন।

অন্যান্য নবীগণের নিকট অসমানী কিতাবসমূহ লিখিত আকারে একদিনে নাযিল হয়েছিল। কিন্তু কোরআনই এর ব্যতিক্রম। ২৩ বৎসরে কোরআন মজিদ নাযিল হয় এবং জিব্রাইল (আঃ) পাঠ করে শুনিয়েছেন নবী করিম (দঃ) কে। নবী করিম (দঃ) নিজের যবানে তা পাঠ করে শুনিয়েছেন উম্মতকে। কালাম হলো আল্লাহর,

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

আর জবান হলো রাসুলুল্লাহর। রাসুলে পাকের যবানে আল্লাহ পাক কালাম করেছেন ২৩ বৎসর পর্যন্ত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন- **"তিনি (রাসুল) আপন ইচ্ছায় নিজের পক্ষ হতে বানানো কথা বলেন না; বরং যা বলেন- তা ওহী ব্যতিত আর কিছুই নয়- যা তাঁর প্রতি গোপনে অবতীর্ণ হয়"** (সুরা আন্ নাজম-৩ আয়াত)। ২৩ বৎসর পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা এভাবে নিজের বাণী আপন হাবীবের পবিত্র যবান দিয়ে প্রকাশ করেছেন। অন্য কোন নবীর মুখে এভাবে আল্লাহ তায়ালা আপন বাণী প্রকাশ করেননি। ইহা নবীজীর একক বৈশিষ্ট্য। আল্লাহপাক হযরত মূছা (আঃ)-এর সাথে কথা বলেছিলেন খেজুর গাছের মাধ্যমে। কিন্তু তৌরাত নাযিল করেছেন একরাত্রে লিখিত আকারে।

ওহী বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সকলেই বুঝে ফেললেন যে, সময় ঘনিয়ে এসেছে। সকলের মনে এক আশংকা বিরাজ করছিল। একদিন হযরত ওমর (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন-সুরা নাছর সম্পর্কে আপনার মতামত কি? ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন- আল্লাহ তায়ালা এই সুরায় মহান বিজয়দানের কথা বলেছেন এবং দলে দলে ইসলাম গ্রহণের কথাও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এরপরই বলেছেন- **"হে রাসুল! এখন আপনি শুধু আপনার প্রতিপালকের তস্‌বীহ্ পাঠ করুন এবং তাঁর কাছে (উম্মতের জন্য) ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি তাওবাহ্ কবুলকারী"**।

এখানে দেখা যাচ্ছে-নবী করিম (দঃ)-এর আসল কাজ সমাপ্ত হয়ে গেছে। এখন শুধু দোয়া ও এস্‌তেগফার করার জন্য আল্লাহর নির্দেশ। সুতরাং হুযুর (দঃ)-এর সময় যে শেষ হয়ে আসছে-এতেই স্পষ্ট বুঝা যায়। ইবনে আব্বাসের একথা শুনে হযরত ওমর (রাঃ) বললেন-আপনি যা বুঝেছেন, আমিও তাই অনুমান করেছি। তাবরানী শরীফে উল্লেখ আছে- **যখন নবী করিম (দঃ) বিদায় হজ্ব শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন, তখন একদিন মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে এক ভাষণে আল্লাহর প্রশংসা ও সানা পাঠ করে বললেন- "হে লোক সকল! আবু বকর কখনও আমাকে কষ্ট দেয়নি। তোমরা তাঁর একাজের স্বীকৃতি দিও। হে উপস্থিত লোক সকল! আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী, তালহা, যোবাইর, আবদুর রহমান এবং প্রথম দিকের হিজরতকারীগণের প্রতি আমি সন্তুষ্ট।**

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

তোমরা তাঁদের অবদানের প্রতি স্বীকৃতি দিও। হে লোক সকল! তোমরা আমার সাহাবী ও শ্বশুরদ্বয়ের ব্যাপারে এবং আমার বন্ধুদের ব্যাপারে আমার কথার সম্মান রক্ষা করো। হে লোক সকল! তোমরা মুসলমানের ব্যাপারে তোমাদের মুখকে সংযত রাখো! তাদের কেউ মারা গেলে তার সম্পর্কে ভাল বলবে" (বেদায়া)।

এভাবে তিনি হৃদয় বিদারক ভাষণ দিয়ে বিদায়ের পূর্বাভাস দিতে লাগলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়–শিয়ারা হুযুরের দুই শ্বশুর ও এক জামাতার বিরুদ্ধে গালিগালাজ ও তাওরিয়া করে থাকে। একারণেই তারা আহলে বায়তের মহব্বতের দাবীদার হওয়া স্বত্বেও গোমরাহ্ ও পথভ্রষ্ট এবং বাতিল ফের্কার অন্তর্ভুক্ত। শিয়ারা ৫জন ছাড়া সব সাহাবীদের বিরোধী।

হুযুর (দঃ) আরও বললেন– **"আমার হায়াত মউত- উভয়ই তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। কেননা, আমার জীবদ্দশায় তোমাদের উপর কোন দূর্ঘটনা ঘটলে আমি সাথে সাথেই সমাধান দিয়ে থাকি। আর আমার তিরোধানের পর তোমাদের যাবতীয় আমলনামা আমার দৃষ্টিতে পেশ করা হয়। ভাল দেখলে আল্লাহর প্রশংসা করি, মন্দ দেখলে আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি"** (মওয়াহিব, মাদারিজ, আদিল্লাতু আহলিছ ছুন্নাহ)।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

পঞ্চাশতম অধ্যায়

বিদায়ের প্রত্যক্ষ লক্ষণ

প্রসঙ্গ ঃ অসুখ আরম্ভ

সময় গড়িয়ে চল্‌লো। সফর মাসের মধ্যভাগে নবীজী একদিন মদিনার পবিত্র গোরস্থান জান্নাতুল বাক্বীতে রাত্রে যিয়ারত করতে গেলেন। দীর্ঘক্ষণ ধরে তিনি যিয়ারত করলেন এবং ইনতিকালপ্রাপ্ত সাহাবীদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন– **"হে কবরবাসী সাহাবীগণ! তোমাদের উপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক! তোমরা ভালয় ভালয় চলে গেছো। আগামীতে ফেৎনা ফাসাদ অন্ধকার রাত্রির মত ঘনিয়ে আস্‌ছে। পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে পরবর্তী সময়টি হবে নিকৃষ্ট"**। এরপর তাঁর **সহগামী আবু মোয়াইহাবা–কে লক্ষ্য করে বললেন ঃ "আমাকে দুনিয়ার যাবতীয় ধনভান্ডারের চাবি প্রদান করা হয়েছে এবং দীর্ঘদিন বেঁচে থাকা অথবা জান্নাতে গমনের এখতেয়ারও দেয়া হয়েছে"**।

আবু মোয়াইহাবা (রাঃ) আরয করলেন-ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি দুনিয়ার ধন ভান্ডার এবং দীর্ঘদিন দুনিয়াতে অবস্থানের বিষয়টি প্রথমে গ্রহণ করুন। তারপর বেহেস্তে গমন! নবী করিম (দঃ) তাঁর কথা শুনে বললেন–

"না-বরং আমার প্রতিপালকের সান্নিধ্য এবং জান্নাতকেই আমি গ্রহণ করেছি"।

এরপর জান্নাতুলবাক্বী কবরবাসীদের জন্য দোয়া করে অধিক রাতে হুজরা শরীফে ফিরে আসলেন। এসে দেখেন–বিবি আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) **'মাথা গেলো, মাথা গেলো'–বলে কাতরাচ্ছেন। নবী করিম (দঃ) বললেন–"না, তোমার মাথা নয়–বরং আমার মাথা"**। একথা বলার সাথে সাথে হযরত আয়েশা (রাঃ) সুস্থ হয়ে উঠলেন, আর মাথা ব্যথা শুরু হলো নবী করিম (দঃ)-এর। একজনের অসুখ বা বিপদাপদকে অন্যজনে নিজের মধ্যে টেনে নেয়াকে আরবীতে "ছাল্‌ব" বলা হয়। এটা ফয়েযের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এভাবেই নবী করিম (দঃ) সেচ্ছায় অসুখ বরণ করে নিলেন।

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাদিঃ) বলেন– যখন আমি মাথা ব্যথায় কাতরাচ্ছিলাম এবং বলছিলাম-মাথা গেলো। তখন নবী করিম (দঃ) আমাকে বললেন– "যদি

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

তুমি আমার পূর্বেই মারা যাও, তা হলে তো তোমার ভাগ্য ভাল! কেননা, আমি নিজে তোমার গোসল ও কাফন দাফনের ব্যবস্থা করবো। আমার হাতে তুমি মারা যাবে। এটা তোমার বড় সৌভাগ্য"। তখন আমি অভিমান করে বললাম- "তাহলে তো বরং আপনারই বড় সৌভাগ্য হবে। আমার বিছানায় আর একজন বিবিকে নিয়ে সংসার করতে পারবেন"। একথা শুনে নবী করীম (দঃ) মৃদু হাস্‌লেন এবং মাথা ব্যথা নিয়েই শুয়ে পড়লেন।

অসুখ নিয়েই নবী করিম (দঃ) প্রত্যেক বিবির ঘরে সমান সমান পালায় অবস্থান করতে লাগলেন। বিবি মায়মুনা (রাঃ)-এর ঘরে অবস্থানকালে অসুখ অনেক বেড়ে যায়। তখন সকল বিবিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন-অসুস্থ অবস্থায় কার ঘরে তিনি অবস্থান করবেন? সকলেই বিবি আয়েশা (রাঃ)-এর ঘরে থাকার অনুমতি প্রদান করেন। এ ছিল বিবিগণের মধ্যে সমতা রক্ষা করার আদর্শ। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন-"নবী করিম (দঃ) বিবি মায়মুনার ঘর থেকে হযরত ফযল ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ)-এর কাঁধের উপর ভর দিয়ে বের হলেন। তখন তাঁর পা মোবারক মাটিতে হোঁচট খাচ্ছিল"।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

একান্নতম অধ্যায়

আখেরী চাহার শোম্বা

প্রসঙ্গ ঃ সফর মাসের শেষ বুধবার রোগমুক্তির গোসল ঃ

সফর মাসের শেষ বুধবার ছিল চাঁদের ৩০ তারিখ। এদিন নবী করিম (দঃ)-এর অসুখ হঠাৎ কমে গেল। তিনি সকালবেলা উঠেই হযরত আয়েশা (রাঃ) কে ডেকে বললেন–**"আমার জ্বর কমে গেছে। তুমি আমাকে গোসল করিয়ে দাও"**। সেমতে তাঁকে গোসল করানো হলো। তিনি সুস্থ বোধ করলেন। এটিই ছিল দুনিয়ার শেষ গোসল। ইমাম হাসান, ইমাম হোসাইন ও বিবি ফাতেমা (রাঃ) কে ডেকে আনা হলো। নাতীদ্বয়কে নিয়ে তিনি সকালের নাস্তা করলেন। হযরত বেলাল (রাঃ) ও সুফফাবাসীগণ বিদ্যুতের ন্যায় এ সংবাদ মদিনার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিলেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে আনন্দের ঢেউ খেলে গেলো। তাঁরা বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মত দলে দলে আসতে লাগলেন এবং হুযুর (দঃ)কে এক নযর দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে রইলেন।

হুযুরের রোগমুক্তির সংবাদে সাহাবায়ে কেরাম কত খুশী ও আনন্দিত হয়েছিলেন– তাঁর কিছুটা আন্দাজ করা যায় পরের ঘটনার মাধ্যমে। হযরত আবু বকর (রাঃ) পাঁচ হাজার দিরহাম ফকির মিসকিনদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) দান করলেন সাত হাজার দিরহাম। হযরত ওসমান (রাঃ) দান করলেন দশ হাজার দিরহাম। হযরত আলী (রাঃ) দান করলেন তিন হাজার দিরহাম। সবচেয়ে বেশী দান করলেন ধনী ব্যবসায়ী হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)–তিনি একশত উট আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিলেন। সুব্হানাল্লাহ! নবী করিম (দঃ)-এর একটু শান্তি ও আরামের সংবাদে সাহাবীগণ কিভাবে জানমাল উৎসর্গ করে দিতেন– এটা তাঁরই আংশিক প্রমাণ। "হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রতি বৎসর ঈদে মিলাদুন্নবীর (দঃ) দিনে একটি মূল্যবান লাল উট যবেহ করে যিয়াফত দিতেন" (Endless Blessings- বা সাআদাতে আবাদিয়া দ্রষ্টব্য–তুরস্ক)।

নবী করিম (দঃ)-এর সাময়িক রোগমুক্তির দিবসকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য পারশ্যসহ মধ্য এশিয়া ও পাক ভারত উপমহাদেশে অত্যন্ত ভাবগম্ভীর

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

পরিবেশে এই দিবসটি পালন করা হয়। বুযুর্গানে দ্বীনের তরিকা অনুযায়ী এদিনে নবীজীর স্মরণে এবং রোগবালাই থেকে মুক্তির নিয়তে আখেরী চাহার শোম্বা দিবসে গোসল করে দু'রাক্‌আত শুকরিয়া নামায আদায় করা হয়। এছাড়াও বৈধ সমস্ত নেক আমল করা হয়। কোরআন মজিদের ৬টি আয়াতে শেফা ও সাত সালামের আয়াত চিনির প্লেটে বা কলা পাতায় লিখে পানিতে ধৌত করে ঐ পানি পান করলে পাইলস্ বা গেজ রোগ নিরাময় হয় বলে বুযুর্গানে দ্বীন ফাযায়েলের কিতাবে লিখে গেছেন।

আখেরী চাহার শোম্বা বা সফরের শেষ বুধবার দিবসটি পালন করে মুসলমানরা ইসলামের একটি স্মরণীয় দিনকে এখনও প্রেরণার উৎস করে রেখেছে। মূলতঃ এসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই ইসলামী জোশ্ বারবার চাঙ্গা হয়ে উঠে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, নবী করিম (দঃ)-এর স্মৃতিবিজড়িত এই দিবসটি পালন করতে একশ্রেণীর ওলামা নিষেধ করেন এবং এটাকে বিদ্‌আত বলে মানুষকে ভয় দেখান। তাদের উদ্দেশ্য একটিই- সেটি হলো- ইসলামের স্মরণীয় ঘটনাসমূহ মুসলমানদের হৃদয় থেকে মুছে ফেলা। নবী-অলীদের স্মৃতিবিজড়িত চিহ্ন সংরক্ষণ করা ও দিবস পালনের মধ্যে অজস্র কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

এজন্যই কোরআন মজিদে পূর্ববর্তী নবীগণের বিভিন্ন স্মরণীয় দিনের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে- যাতে মানুষ ঐগুলো থেকে হেদায়াতের আলো লাভ করতে পারে। ঐসব স্মরনীয় দিনগুলোকে আল্লাহ্ পাক কোরআন মজিদে "আইয়ামিল্লাহ" বা "আল্লাহর স্বরণীয় দিবস" বলেছেন। আখেরী চাহারশোম্বার গোসলটি ছিল নবী করিম (দঃ)-এর জীবনের শেষ গোসল। এরপর ছিল জানাযার গোসল।

আখেরী চাহার শোম্বার দিন বিকাল থেকেই পুনরায় জ্বর দেখা দেয়। এই জ্বরেই নবী করিম (দঃ) ১২দিন পর ইনতিকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহ.....)। সুতরাং সফরের শেষ বুধবার একদিকে খুশীর দিন-অপরদিকে শোকেরও দিন। সকালে আনন্দ- বিকালে বিষাদ। কিন্তু দুটি একসাথে হলে প্রথমটিই পালন করতে হয়- যেমন ১২ ই রবিউল আউয়াল।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

দিবস পালনের গুরুত্ব ঃ

স্মরণীয় দিনগুলোর উল্লেখ করে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন-
"হে বনী ইসরাঈল! তোমরা ঐদিনের ঘটনা স্মরণ করো-যেদিন আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে ফিরআউনের অত্যাচার থেকে নাজাত দিয়েছিলেন এবং ফিরআউনকে সদলবলে ডুবিয়ে মেরেছিলেন"-সূরা বাক্বারা। তাই তারা আশুরার দিনে রোযা রাখতো। আমরাও হুযুরের বেলাদত দিবস পালন করি।

"হে প্রিয় হাবীব! ঐদিনকে স্মরণ করুন-যেদিন আল্লাহতায়ালা সমস্ত নবীকে একত্রিত করে আপনার সম্পর্কে এই মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, যখন তোমাদেরকে নবুয়ত, কিতাব ও হিকমত দিয়ে সম্মানিত করা হবে, আর সবার পরে তোমাদের নবুয়তের সত্যায়নকারী মহান রাসুলকে প্রেরণ করবো- তখন তোমরা তাঁর উপর অবশ্য অবশ্যই ঈমান আনবে এবং অবশ্য অবশ্যই তাঁকে সর্বোতভাবে সাহায্য সহযোগিতা করবে"। (সূরা আলে ইমরান ৮১ আয়াত)

উক্ত দুইটি ঘটনায় বুঝা যায়- স্মরণীয় দিনগুলো তথা আশুরা ও ঈদে মিলাদুন্নবী দিবস বারবার স্মরণ করা ও পালন করা আল্লাহরই নির্দেশ। কারণ ইহাই সবচেয়ে বড় স্মরণীয় ও খুশীর দিন।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

বায়ান্নতম অধ্যায়

আল্লাহর সাথে মহামিলনের প্রস্তুতি

প্রসঙ্গ ঃ শেষ ১২ দিনের ঘটনা প্রবাহ

হযরত মায়মুনা (রাঃ)-এর ঘর থেকে নবী করিম (দঃ) অসুস্থ অবস্থায় হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ঘরে দু'জন সাহাবীর কাঁধে ভর দিয়ে তশরীফ নিয়ে আসেন এবং অন্যান্য বিবিগণের অনুমতিক্রমে ইনতিকাল পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করেন। ইনতিকালের পর এই ঘরের একাংশের মধ্যেই রওযা মোবারক তৈরী করা হয়। [বর্তমানে রওযা মোবারক মসজিদে নববীর ভিতরে অবস্থিত। তিনদিকে মসজিদ। পূর্বদিক খোলা চত্বর।]

আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আখেরী চাহারশোম্বার দিন বিকাল থেকেই তিনি পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। সকাল ছিল আনন্দময়, বিকাল হলো বিষাদময়। এ সময় থেকে তিনি ৮ই রবিউল আউয়াল বৃহস্পতিবার যোহর পর্যন্ত অসুখ নিয়েই সমস্ত নামায মসজিদে গিয়ে আদায় করতেন। সাহাবীগণের কাঁধে ভর দিয়ে তিনি মসজিদে যেতেন এবং নামায আদায় করতেন। কোন কোন সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) কে ইমামতি করতে বলতেন। কিন্তু তাঁর আগমনের সাথে সাথে হযরত আবু বকর (রাঃ) পিছনে সরে আসতেন এবং বাকী নামায নবীজীর পিছনে মোকাব্বির হয়ে আদায় করতেন।

নামাযকে তিনি এত গুরুত্ব দিতেন। আমরা উম্মত হয়ে আজ নামাযের গুরুত্ব ভুলে গিয়েছি। আফসোস! নামাযে আমাদের দৃষ্টি থাকে মোসল্লার দিকে–কিন্তু হযরত আবু বকর ও সাহাবীগণের দৃষ্টি থাকতো আল্লাহর রাসূলের দিকে।

অসুস্থ অবস্থায় নবী করিম (দঃ) প্রায়ই বলতেন–"হে আয়েশা! খায়বরের ইয়াহুদী রমনী যয়নবের বিষমিশ্রিত খাদ্যের বিষক্রিয়া এখন আমি অনুভব করছি। আমার মনে হয়–ঐ বিষের জ্বালায় আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চূর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যাচ্ছে"।

[মোহাদ্দেস আবদুল গনি নাবলুছী (ফিলিস্তিন)– যিনি আল্লামা শামীর ওস্তাদ ও মোজ্‌তাহিদ ছিলেন-তাঁর লিখিত কিতাব "আল হাদিকায়" উল্লেখ আছে– **"নবী করিম (দঃ) দুবার নিজের মউতের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছিলেন। প্রথমবার খায়বরের বিষক্রিয়া জনিত সম্ভাব্য মৃত্যু তিনি ৪ বৎসর পর্যন্ত বিলম্বিত করেছিলেন। দ্বিতীয় বার ইনতিকালের সময় হযরত আযরাঈল (আঃ) কে বসিয়ে রেখে জিব্‌রাইল (আঃ) ও আল্লাহর সাথে কিছু কথা বলেছিলেন এবং উম্মতের**

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

জন্য কিছু প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিলেন"। এই বিলম্ব নবীজীর ইচ্ছায় ও আল্লাহর নির্দেশে ঘটেছিল। কাযী আয়ায (রহঃ) তাঁর শিফা শরীফের "বাবুল কারামত ও নবীজীর বৈশিষ্ট্য" অধ্যায়ে লিখেছেন- **"আমরা মউতের অধীন, কিন্তু মউত নবীজীর ইখতেয়ারাধীন"। মউত আল্লাহর সৃষ্ট মখলুক। "সকল মখলুককেই আল্লাহ তায়ালা নবীজীর অধীনস্থ করে দিয়েছেন-কেননা তিনি সমস্ত সৃষ্টির মূল"** (শিফা শরীফ)।

এই আক্বিদা ও বিশ্বাসের নামই সুন্নী আক্বিদা। হিযরত অধ্যায়ে জমিনের উপর নবীজীর কর্তৃত্বের হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। ইখতিয়ার, কর্তৃত্ব ও তাসাররূপ নবীজীর মো'জেযার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর রাজ্যে রাসুলে পাকের রাজত্ব সর্ব স্বীকৃত বিষয়"।

নবী জীবনের শেষ বৃহস্পতিবার ৮ই রবিউল আউয়াল ঃ ইয়াওমুল খামিছ-

নবী করিম (দঃ)-এর জীবনের শেষ বৃহস্পতিবার ছিল ৮ই রবিউল আউয়াল। ঐ দিন হুযুর (দঃ) যোহরের নামাযের বাকী অংশে কোন রকমে জামাতের ইমামতি করেন। ঐ দিন হযরত আবু বকর (রাঃ) হুযুরের নির্দেশে যোহরের নামায পড়াচ্ছিলেন। এমন সময় হুযুর (দঃ) কে আসতে দেখে পিছনে হঁটে আসলেন। নামায শেষে তিনি সমবেত সাহাবীগণের উদ্দেশ্যে এক অশ্রুপূর্ণ ভাষণ দেন এবং তাঁদের থেকে শেষ বিদায় গ্রহণ করেন। সেদিনের করুণ পরিবেশ আকাশ বাতাসকে অশ্রু ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল। সাহাবায়ে কেরামের রোনাজারীতে আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল। মদিনায় রোনাজারী ও মাতমের হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল সেদিন। শেষ বৃহস্পতিবারের হৃদয় বিদারক অবস্থার কথা স্মরণ করে পরবর্তী সময়ে ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রায়ই বলতেন- "ইয়াওমুল খামিছ, ওয়ামা ইয়াওমুল খামিছ"।

সেদিনের ভাষণে তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর অনেক মর্তবা ও মর্যাদা বর্ণনা করেন এবং অবশিষ্ট দিনগুলোতে নবী করিম (দঃ)-এর স্থলে ইমামতি করার জন্য তাঁকে নির্দেশ প্রদান করেন। **এর মাধ্যমেই পরবর্তী খিলাফতের বিষয়টি একরকম চূড়ান্ত হয়ে যায়। নামাযের ইমামতি হচ্ছে- ইমামতে ছোগরা এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ইমামত বা নেতৃত্ব হচ্ছে ইমামতে কোব্রা। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) আকারে ইঙ্গিতে ভবিষ্যৎ নির্ধারণের নীতিমালা আঁচ করে নিলেন।**

বিদায়ী শেষ ভাষণ ঃ

নামাযের পর নবী করিম (দঃ) যে বিদায়ী ভাষণ প্রদান করেন- তা কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা হচ্ছেন ঃ হযরত আইউব বিন বশীর (রাঃ),

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

উম্মে সালমা (রাঃ), আবু সাঈদ (রাঃ), আবুল মোয়াল্লা (রাঃ), জুনদুব (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং ফযল ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ। তাঁদের বর্ণিত হাদীসে শব্দের কিছু বেশ কম রয়েছে। সবার বর্ণিত হাদীসের সারমর্ম নিম্নরূপ।

"যোহরের নামায শেষ করে নবী করিম (দঃ) মিম্বারে উঠে উপবেশন করলেন। আল্লাহর হাম্‌দ ও সানা পাঠ করে সমবেত সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন– **"আল্লাহ্ তায়ালা আপন এক প্রিয় বান্দাকে দুটি জিনিসের মধ্যে একটি গ্রহণ করার এখতিয়ার ও স্বাধীনতা দিয়েছেন। যথা– (ক) তিনি যতদিন ইচ্ছা জীবিত থেকে দুনিয়ার সুখ শান্তি ও আরাম আয়েশ ভোগ করতে পারবেন,**

(খ) এখনই আল্লাহর সান্নিধ্যে গিয়ে তাঁর জন্য সংরক্ষিত নেয়ামত ভোগ করবেন। আল্লাহর সেই প্রিয় বান্দা এই দুটির মধ্যে শেষেরটিই গ্রহণ করে নিয়েছেন"।

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন– "দীর্ঘজীবনের এখতিয়ার একমাত্র নবী করিম (দঃ) কেই দান করা হয়েছে– অন্য কাউকে নয়"। নবী করিম (দঃ)-এর ভাষণের অন্তর্নিহিত মর্ম বুঝতে পেরে সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর (রাঃ) কেঁদে কেঁদে আরয করতে লাগলেন–"ইয়া রাসুলাল্লাহ্! আমাদের নিজের জীবন, পিতা-মাতার জীবন, সন্তানাদির জীবন ও অর্থ সম্পদের বিনিময়ে আমরা আপনাকে পেতে চাই"।

নবী করিম (দঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ) কে ধৈর্য ধারনের উপদেশ দিলেন। আবু সাঈদ (রাঃ)-এর বর্ণনায় নবী করিম (দঃ) এরশাদ করলেন–

"আমার সান্নিধ্য লাভে এবং দ্বীনের জন্য ধন সম্পদ বিলিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে আমার উপর আবু বকরের চেয়ে অন্য কারো অধিক এহ্‌সান আছে বলে আমার জানা নেই। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে যদি আমি খলীল বা একান্ত বন্ধু বানিয়ে নিতাম, তা হলে আবু বকরকেই খলীল বানিয়ে নিতাম। আল্লাহ্ আমাকে খলীল বা একান্ত বন্ধু বানিয়ে নিয়েছেন এবং আমিও আল্লাহ্‌কে জানপ্রাণ দিয়ে খলীল বা একক বন্ধু বানিয়েছি। তোমরা আমার মসজিদের দিকে তোমাদের ঘরের ছোট ছোট সব দরজা, জানালা বন্ধ করে দাও। একমাত্র আবু বকরের দরজাটি খোলা রাখো। আবু বকরের সাথে আমার ইসলামী বন্ধুত্ব ও ভালবাসা রয়েছে"।

খলিল ও হাবীব-এর পার্থক্য ঃ

উল্লেখ্য যে, কাযী আয়ায (রহঃ) শিফা শরীফে খলীল শব্দটি বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে–"খালা" অথবা "খুল্লাতুন" মূলধাতু হতে খলীল শব্দটির উৎপত্তি।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

'খালা'-র অর্থ হলো সব কিছুর বিনিময়ে বন্ধুত্ব। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সব কিছু আল্লাহর জন্য বিলিয়ে দিয়ে খলীল উপাধী পেয়েছিলেন। তদ্রুপ নবী করিম (দঃ)ও সব কিছু আল্লাহর জন্য বিলিয়ে দিয়ে খলীল উপাধীতে ভূষিত হয়েছেন। অপরদিকে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে হাবীবুল্লাহ বা একান্ত প্রেমাস্পদ উপাধী দান করেছেন।

"খলীল বলা হয়- যিনি আল্লাহর জন্য সব কিছু দান করেন; কিন্তু 'হাবীব বলা হয়–আল্লাহ যার জন্য সব কিছু বিলিয়ে দেন"। "খলীল হচ্ছেন প্রেমিক; আর হাবীব হচ্ছেন প্রেমাস্পদ"। নবী করিম (দঃ) ছিলেন আল্লাহর প্রেমিক এবং প্রেমাস্পদ–উভয়ই (সোবহানাল্লাহ)।

খুল্লাতুন ধাতুর অর্থ হচ্ছে–একান্ত ভালবাসা (Exclusive love)। এ অর্থে নবী করিম (দঃ) আপন জীবন দিয়ে একান্তভাবে আল্লাহকে ভালবাসতেন (শিফা শরীফ)। এই ভালবাসা যদি তিনি আল্লাহর জন্য দান না করতেন, তাহলে আবু বকর (রাঃ) কেই এই স্থানে বসাতেন। এই হাদীসে সমস্ত সাহাবীর উপর হযরত আবু বকরের (রাঃ) গুরুত্ব দান করা হয়েছে।

হযরত আইউব বিন বশীর (রাঃ)-এর বর্ণনা মতে আরো কিছু নসিহতের কথা উল্লেখ আছে। যথা–**"নবী করিম (দঃ) মিম্বারে বসে প্রথমে ওহোদের শহীদানদের জন্য বিশেষ দোয়া করেন। ইসলামের জন্য তাঁদের আত্মত্যাগ ও শাহাদতের কথা স্মরণ করেন"**।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় আরো আছে–"নবী করিম (দঃ) মদিনার আনসারদের সেবা ও অবদানের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে বললেন"–

"হে মোহাজিরগণ! তোমরা সংখ্যায় অনেক বেড়ে গিয়েছো এবং দিন দিন তোমাদের আগমনের সংখ্যা বাড়ছেই। কিন্তু আনসারের সংখ্যা পূর্বের ন্যায়ই রয়েছে। তাঁরা আমাকে আশ্রয় দিয়েছে। তোমরা (মোহাজিরগণ) তাঁদের সম্মানিত ব্যক্তিদের সম্মান করবে এবং তাঁরা কোন ত্রুটি করলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে"।

ফযল ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ নবী করিম (দঃ) অন্যান্য কথার মধ্যে একথাও বলেছিলেন–

"হে উপস্থিত লোক সকল! তোমাদের বিগতজনেরা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। আমার বর্তমান মিম্বারে তোমরা আর কখনও আমাকে দেখতে পাবেনা। আমি যদি তোমাদের কারো পিঠে —— দ্বারা আঘাত করে থাকি,

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

তাহলে এই নাও আমার পিঠ। তোমরা বদলা নিতে পারো। আমি যদি কারও নিকট থেকে মাল নিয়ে থাকি, তাহলে তোমরা তা আমার থেকে নিয়ে নাও। আর যদি কারও সম্মান লাঘব করে থাকি, তাহলে আমার থেকে তার বদলা নিতে পারো। কেউ যেন আমাকে কাপুরুষ বা বখিল বলতে না পারে। বখিলী আমার শানও নয় এবং চরিত্রও নয়। যদি তোমাদের কারও কোন হক্ক আমার উপর থেকে থাকে, তাহলে সে ব্যক্তি সে হক্ক নিয়ে নিক-সে ব্যক্তিই আমার সবচেয়ে প্রিয় হবে"।

এক সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন-ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি আপনার কাছে তিন দিরহাম পাওনা আছি। একদিন এক ফকির আপনার কাছে কিছু চাইলে আপনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাকে তিনটি দিরহাম দেয়ার জন্য। ঐ তিনটি দিরহামই আমি পাবো। নবী করিম (দঃ) ফযল ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে তা দিয়ে দিতে আদেশ করলেন।

এরপর নবী করিম (দঃ) বললেন- তোমাদের কারও কাছে যুদ্ধেপ্রাপ্ত কোন অবৈধ মাল আছে কি? তাহলে তা বাইতুলমালে জমা দিয়ে দাও। এক সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন- আমার নিকট তিন দিরহাম আছে। নবী করিম (দঃ) বললেন- তুমি কেন তা নিয়েছিলে? ঐ সাহাবী উত্তর করলেন-আমি খুবই দরিদ্র। তাই নিয়েছিলাম। নবী করিম (দঃ) ফযল (রাঃ) কে তা আদায় করে নিতে নির্দেশ দিলেন। নবী করিম (দঃ) পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন- কারও মনে কিছু ঈমানী দুর্বলতা থাকলে বলো-আমি দোয়া করবো। একজন লোক সামনে এগিয়ে এসে বললো-ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি একজন মুনাফিক, মিথ্যাবাদী ও দূরাচার। তার কথা শুনে হযরত ওমর (রাঃ) বললেন-তোমার সর্বনাশ হোক! তুমি নিজের দোষ খোলাখোলি না বললেও পারতে! আল্লাহ্ তোমাকে গোপনে ক্ষমা করে দিতেন। নবী করিম (দঃ) হযরত ওমরকে থামিয়ে দিয়ে বললেন-"দুনিয়ার অপমান পরকালের অপমানের তুলনায় অনেক তুচ্ছ। হে আল্লাহ! তুমি তাকে সততা ও ঈমান দান করো"। তারপর হযরত ওমরকে শান্তনা দিয়ে বললেন-ওমর আমার সাথে এবং আমিও ওমরের সাথে আছি। আমার পর "সত্য ওমরের সাথী হবে"। ভাষণ শেষ করে সবার থেকে বিদায় নিয়ে তিনি হুজরা মোবারকে চলে গেলেন। এরপর থেকে হযরত আবু বকর (রাঃ) নামাযে ইমামতি করতে লাগলেন। বৃহস্পতিবার আছর থেকে সোমবার ফজর পর্যন্ত তিনি একাধারে ১৯ ওয়াক্ত নামাযে ইমামতি করেন। তখন থেকে নবী করিম (দঃ) নিজ হুজরায় একাকী নামায পড়তেন।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

তিপ্পান্নতম অধ্যায়

খেলাফতের ইঙ্গিত

প্রসঙ্গ ঃ হযরত আবু বকর (রাঃ) মোট ১৯ ওয়াক্ত নামাযের ইমামতি করেন ঃ

৮ই রবিউল আউয়াল বৃহস্পতিবার যোহরের নামাযান্তে নবী করিম (দঃ) হুজরা মোবারকে চলে আসেন। ঐ দিন আছরের নামায থেকে ১২ তারিখ সোমবার ফযরের নামায পর্যন্ত মোট ১৯ ওয়াক্ত নামাযে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) ইমামতি করেন।

একদিন হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর বিলম্ব হলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জামআ (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ) কে ইমামতি করতে বলেন। যখন ওমর (রাঃ) উচ্চস্বরে তাকবীর দিয়ে নামায আরম্ভ করেন, তখন নবী করিম (দঃ) জিজ্ঞাসা করলেন–আবু বকর কোথায়? আল্লাহ এবং মুসলমানগণ আবু বকর ছাড়া অন্য কাউকে গ্রহণ করবেনা। এভাবে দুবার বললেন। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কাছে লোক পাঠিয়ে তাঁকে আনা হলো এবং পুনরায় হযরত আবু বকর (রাঃ) কে দিয়ে নবী করিম (দঃ) দ্বিতীয়বার নামায আদায় করান। এ ব্যাপারে হযরত ওমর (রাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে জাম্‌আ (রাঃ) কে খুব শাঁসালেন এবং বললেন–আমি মনে করেছি–তুমি নবী কারিম (দঃ)-এর নির্দেশেই আমাকে নামায পড়ানোর জন্য বলেছিলে। আবদুল্লাহ ইবনে জাম্‌আ (রাঃ) বললেন–না, নবী করিম (দঃ) নির্দেশ করেননি–বরং আবু বকর (রাঃ) কে অনুপস্থিত দেখে উপস্থিত মুসল্লীগণের মধ্যে আপনাকেই সর্বাধিক উপযুক্ত মনে করে আমি নিজেই আপনাকে নামায পড়ানোর অনুরোধ করেছিলাম (ইমাম আহমদ ও আবু দাউদ)। নবীজীর বর্তমানে অন্য কেউ হুকুম দিতে পারেনা।

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) বলেন–"এশার নামাযের সময় হলে হযরত বেলাল (রাঃ) আযান দিলেন। নবী করিম (দঃ) এরশাদ করলেন– আবু বকরকে নামায পড়াতে বলো। হযরত আয়েশা (রাঃ) আরয করলেন-ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ)! আবু বকর (রাঃ) খুবই শোকে কাতর। আপনার স্থানে দাঁড়িয়ে তিনি ইমামতি করা সহ্য করতে পারবেননা– বরং অন্য কাউকে দিয়ে নামায পড়ান। নবী করিম (দঃ) পুনরায় বললেন– আবু বকরকে বলো ইমামতি করার জন্য। এভাবে তিনবারের সময় বললেন-তোমরা হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সাথে মিশরীয় মহিলাদের ন্যায় আমার সাথে আচরণ করছো। যাও, আবু বকরকে বলো–নামায পড়াতে। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) নামায পড়াতে

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

দাঁড়ালেন। নবী করিম (দঃ) শরীর কিছুটা হালকা অনুভব করলেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ)-এর কাঁধে ভর দিয়ে তিনি হুজরা মোবারক থেকে বের হলেন। কিন্তু তাঁর পা মোবারক মাটিতে হোঁচট খাচ্ছিল। হযরত আবু বকর (রাঃ) টের পেয়ে পিছিয়ে আসতে চাইলেন। নবী করিম (দঃ) তাঁকে ইশারায় ডান পার্শ্বে দাঁড় করিয়ে নিজে অবশিষ্ট নামায বসে বসে আদায় করলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) মোকাব্বির হয়ে নামায আদায় করলেন।

[এটি কোন্ নামায ছিল? হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে–এটি ছিল এশার নামায। কিন্তু অন্য একটি বর্ণনা মতে এটি ছিল যোহরের নামায। ইবনে কাছির বলেন– এটি ছিল শেষ বৃহস্পতিবার যোহর নামাযের ঘটনা। কেননা, এরপর নবী করিম (দঃ) আর মসজিদে যেতে পারেননি। অধ্যায়ের শুরুতে এটির বিবরণ দেয়া হয়েছে।

১২ই রবিউল আউয়াল ঃ ফজরের শেষ নামায ঃ

সোমবার ফজরের নামাযের সময় নবী করিম (দঃ) জানালার পর্দা সরিয়ে সর্বশেষ জামাতের দৃশ্য দেখে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন। সাহাবায়ে কেরাম টের পেয়ে নামায ছেড়ে দেওয়ার মত অবস্থা হয়ে গিয়েছিল। হযরত আবু বকর (রাঃ) পিছনে সরে আসার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এমন সময় নবী করিম (দঃ) হাতে ইশারা দিয়ে তাঁকে বারণ করে জানালার পর্দা ফেলে দেন। ঐ নামাযের মধ্যে সাহাবীগণ নবীজীর সম্মানকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

এখন আমি গোলাবীদের জিজ্ঞেস করি–" আপনাদের কিতাব সীরাতে মোস্তাকীম মতে তো নামাযে নবীজীর খেয়াল করা যিনাতুল্য গুনাহ্"। এখন বলুন–হযরত আবু বকর ও সাহাবীগণ নামাযে কার খেয়াল করেছিলেন! নবীজীর গুরুত্ব কত বেশী-এঘটনা থেকেই বুঝা যায়।

নামায জামাতে শেষ করে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) বিবি আয়েশার গৃহে প্রবেশ করেন এবং বলেন– মনে হয়–নবী করিম (দঃ) আজ অনেক সুস্থ, অসুখ অনেক কমে গেছে। আমাদের দিকে চেয়ে তিনি হেসেছেন। মুসল্লিগণসহ আমরা সকলেই হুযুরের হাসি দেখে খুবই আনন্দিত হয়েছি। এমন কি–আমাদের নামায ছেড়ে দেয়ারও উপক্রম হয়েছিল। এ কথা বলে তিনি মদিনার অদূরে নিজ স্ত্রীর গৃহের দিকে রওনা হন। মদিনা শরীফের পূর্বপ্রান্তে তাঁর এক বিবি বিন্তে খারেজা (রাঃ) বাস করতেন। মহল্লাটির নাম ছিল সানাহ্। তিনি ঘোড়ায় চড়ে সেদিকে রওনা দিলেন।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

চুয়ান্নতম অধ্যায়

শেষ দিনের ঘটনা

প্রসঙ্গ ঃ মহামিলন দিবসের ঘটনা প্রবাহ ঃ ইনতিকাল লক্ষণ শুরু

১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ)-এর গৃহে নবী করিম (দঃ) অবস্থানরত। বেলা যতই বাড়তে লাগলো– নবী করিম (দঃ)-এর জ্বর ততই বৃদ্ধি পেতে লাগলো। কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) এবং অন্যান্য বিবিগণ এসে উপস্থিত। নবী করিম (দঃ)-এর অবস্থার পরিবর্তন দেখে হযরত ফাতেমা (রাঃ) কাঁদ্‌তে লাগলেন। নবী করিম (দঃ) তাঁকে শান্তনা দিয়ে বললেন– **"মা! কেঁদোনা! আজকের পর তোমার আব্বার আর কোন কষ্ট থাকবে না"**।

একথা শুনে হযরত ফাতেমা (রাঃ) ডুকরে কেঁদে উঠলেন। স্নেহময় পিতা এবার হযরত ফাতেমাকে টেনে নিজের কাছে নিলেন এবং কানে কানে কিছু কথা বললেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ) একটু করুণ হাসি হাসলেন। হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে পরবর্তীতে তিনি বলেছিলেন– নবী করিম (দঃ) তাঁকে শান্তনা দিয়ে বলেছিলেন– **"তুমি অচিরেই আমার পরিবারবর্গের মধ্যে প্রথমে আমার সাথে মিলিত হবে। তুমি বেহেস্তের নারীদের সর্দার হবে"**। নবী করিম (দঃ)-এর এ আগাম সংবাদটি ছিল মৃত্যু সম্পর্কীয় ইলমে গায়েব। ঠিক ছয় মাসের মাথায় নবী পরিবারের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইনতিকাল করেন। এই ছয়মাসের মধ্যে কেউ তাঁকে কোনদিন হাসতে দেখেননি।

সকালবেলা নবী করিম (দঃ)-এর অসুখ বৃদ্ধির কথা দাবানলের মত মদিনায় ছড়িয়ে পড়ে। সাহাবায়ে কেরাম মসজিদে এসে সমবেত হন। হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) হুজরা মোবারকে প্রবেশ করে নবী করিম (দঃ) কে সালাম দিয়ে পবিত্র শরীরে হাত রেখে বলে উঠলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ)! জ্বরের তাপে আপনার পবিত্র শরীরে হাত রাখা কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে। এমন কঠিন অবস্থায়ও নবী করিম (দঃ) এরশাদ করলেন– **"আমরা নবীগণের পুরস্কার যেমন দ্বিগুণ, তদ্রূপ পরীক্ষাও দ্বিগুণ। নবীগণ সুখের সময় যেমন আনন্দিত, তদ্রূপ পরীক্ষাকালেও আনন্দিত"**।

নবী করিম (দঃ)-এর পালিত পুত্র যায়েদ বিন হারেছা (রাঃ) ৮ম হিজরীতে মুতার যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। তাঁর পুত্র হযরত উসামা (রাঃ) কে নবী করিম (দঃ)

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি বলেন- আমি যুদ্ধের সেনাপতি হয়ে নবী করিম (দঃ) এর নির্দেশে সিরিয়ার পথে রওনা দিয়ে দিলাম। হুযুর (দঃ)-এর অবস্থার পরিবর্তনের কথা শুনে রাস্তা হতে ফিরে আসলাম এবং নবীজীর খেদমতে হাযির হলাম। তখন নবী করিম (দঃ) কথা বলতে পারছিলেন না। তিনি শুধু হাত মোবারক আসমানের দিকে উত্তোলন করে পুনরায় মুখে মালিশ করলেন। আমি বুঝতে পারলাম- তিনি আমার জন্য নীরবে দোয়া করছেন। (আহমদ ইবনে হাম্বল)।

হযরত আয়েশা (রাঃ) নবী করিম (দঃ) কে বুকে নিয়ে ঠেস দিয়ে বসেছিলেন। নবী করিম (দঃ) ক্ষণে ক্ষণে নিকটে সংরক্ষিত পাত্র থেকে পানি নিয়ে মুখে মালিশ করছিলেন আর বলছিলেন- **"মৃত্যুর যন্ত্রণা সত্যিই কষ্টদায়ক"**। এই কঠিন সময়ের মধ্যেও উম্মতকে লক্ষ্য করে তিনি কতিপয় ওসিয়ত বা শেষ উপদেশ দিয়ে যান। তিনি এরশাদ করেন ঃ **"তোমরা নামাযের পাবন্দী করবে এবং দাস-দাসীদের প্রতি সদয় হবে"**।

মানুষের মধ্যে সবচেয়ে অবহেলিত ছিল দাস-দাসী। শেষ সময়েও নবী করিম (দঃ)-এর দৃষ্টি সেই অবহেলিত মানুষের দুর্দশার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তিনি ছিলেন মানবতার মুক্তিদূত। আল্লাহর হক্ক নামায এবং বান্দার হক্ক সেবা-এই দুটি নীতির প্রতি তিনি সর্বশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। আমরা আজ উভয়টিকে ভুলতে বসেছি।

পিতা মাতার সর্বশেষ ওসিয়ত সন্তানগণ প্রাণ দিয়ে রক্ষা করে। কিন্তু আমরা উম্মত হয়ে নবীজীর শেষ ওসিয়ত ভঙ্গ করছি। সেকারণেই আজ আমরা অধঃপতিত। নামায আমাদের জন্য ভারী বোঝা স্বরূপ। আর দুর্বলদের শোষণ করা আমাদের মজ্জাগত স্বভাবে পরিণত হয়েছে। ইমাম মালেক (রাঃ) মোয়াত্তায় লিখেন-

"নবী করিম (দঃ)-এর আখেরী উপদেশের মধ্যে এটিও ছিল যে, পূর্ববর্তী ইহুদী ও নাছারাগণ তাদের নবী ও বুযুর্গগণের মাযারকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছিল। তারা মাযারকে সিজদা করতো। তাদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক। তারা যা করতো, তোমরা তা করোনা। (মাযারে সিজদা করা হারাম- শুধু চুম্বন করা বৈধ)। আরব উপদ্বীপে দুটি ধর্ম একসাথে অবস্থান করবেনা। ইয়াহুদ নাছারাদেরকে জাযিরাতুল আরব থেকে বের করে দাও"। (মোয়াত্তা ইমাম মালেক)

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

দুঃখের সাথে বলতে হয়- নবীজীর আদেশে হযরত ওমর (রাঃ) যে আরব দেশকে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানমুক্ত করেছিলেন-সেই আরবে নজদী বাদশাহ ফাহাদ ১৯৯০ সালে কুয়েত রক্ষার নামে এবং ইরাককে শায়েস্তা করার লক্ষ্যে পাঁচলক্ষ ইয়াহুদী-খৃষ্টান সৈন্য আমদানী করে নবীজীর পাক ভূমিকে অপমান করেছে। নবীজীর নির্দেশ ছিল- "আখ্‌রিজুল ইয়াহুদ ওয়ান নাছারা' অর্থাৎ ইয়াহুদী ও নাছারাকে বহিস্কার করো। আর সৌদী সরকারের নীতি হলো, 'আদ্‌খিলুল ইয়াহুদ ওয়ান নাছারা' অর্থাৎ ইয়াহুদী ও নাছারাকে প্রবেশ করাও। মূলতঃ এরা বৃটেন ও আমেরিকার সামরিক সাহায্য নিয়েই ১৯১৪-১৯১৮ইং সাল পর্যন্ত ওসমানী খিলাফতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পুরস্কার স্বরূপ ১৯২৪ সালে ওহাবী রাষ্ট্র কায়েম করে। তাই তারা বর্তমানেও আমেরিকা ও ব্রিটেনের স্বার্থরক্ষা করে চলেছে। আমেরিকা গণতন্ত্রী হয়েও সৌদী রাজতন্ত্রকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। অন্যদেশকে গণতন্ত্রের জন্য চাপ দিলেও সৌদী আরব সম্পর্কে একেবারে চুপ। বিষয়টি খুবই রহস্যময়। ১৯১৪-১৮ সালের প্রথম মহাযুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানরা ছিল তুরস্কের পক্ষে। কিন্তু ওহাবী ওলামা হিন্দ ছিল নজদীর পক্ষে।

ইন্‌তিকালের মূহুর্ত ঃ

সোমবার দিন বেলা যতই বাড়তে লাগলো, হুযুর আকরাম (দঃ)-এর অস্থিরতাও ততই বৃদ্ধি পেতে লাগলো। এ অবস্থা দর্শন করে হযরত হযরত ফাতেমা (রাঃ) কেঁদে উঠলেন এবং বললেন-ওয়া কুরাবু আবাতাহ্। অর্থাৎ- "হায়! আমার আব্বার কত কষ্ট ও যন্ত্রণা! হযরত ফাতেমার অস্থিরতা লক্ষ্য করে নবী করিম (দঃ) তাঁকে শান্তনা দিয়ে বললেন-**"আজকের পর তোমার আব্বার আর কোন যন্ত্রণা থাকবেনা"**। হযরত ফাতেমা (রাঃ) আবার কেঁদে উঠলেন। নবী করিম (দঃ) হযরত ফাতেমার কান মুখের কাছে টেনে এনে চুপে চুপে বললেন- **"তুমি কি একথায় সন্তুষ্ট নও যে, তুমিই আমার পরিবারের মধ্যে সর্বপ্রথম আমার সাথে মিলিত হবে"?** নিজের মৃত্যুর আগাম সংবাদ পেয়ে এবং নবীজীর সাথে মিলিত হওয়ার সুসংবাদ পেয়ে হযরত ফাতেমা (রাঃ) করুণ হাসি হাসলেন। এখানেও হযরত ফাতেমার মৃত্যু সময়ের গায়েবী সংবাদের (ইলমে গায়েব) প্রমাণ পাওয়া যায়। নবীজী আল্লাহ প্রদত্ত পঞ্চগায়েবের ইলমে গায়েব সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ছিলেন। আ'লা হযরতের আদ-দৌলাতুল মাক্কিয়া দেখুন।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

পঞ্চান্নতম অধ্যায়

বিদায়ে বিলম্ব

প্রসঙ্গ ঃ আযরাঈল ও জিবরাঈলের আগমন

আল্লাহর যখন ইচ্ছা হলো নবী করিম (দঃ) কে আপন সান্নিধ্যে তুলে নেবেন, তখন হযরত আযরাঈলকে বললেন– **"তুমি উত্তম সুরতে আমার প্রিয় হাবীবের খেদমতে হাযির হয়ে প্রথমে আমার সালাম দিয়ে বলবে যে, তুমি তাঁর সাথে দেখা করতে গিয়েছো এবং তাঁর অনুমতি পেলেই তাঁর রুহ্ মোবারক কব্য করবে"** ।

হযরত আযরাঈল (আঃ) নির্দেশ মোতাবেক উত্তম সূরত ধারণ করে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর হুজরার দরজায় এসে দাঁড়ালেন এবং নবী পরিবারবর্গকে সালাম দিয়ে ঘরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। এই আওয়ায হুযুর পাক (দঃ)-এর কর্ণে প্রবেশ করা মাত্র তিনি হযরত ফাতেমা (রাঃ) কে আগন্তুকের পরিচয় জানার জন্য পাঠালেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ) ফিরে এসে বললেন– দরজায় এক ভয়ঙ্কররূপী ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছেন। নবী করিম (দঃ) বললেন–

هٰذَا هَادِمُ اللَّذَّاتِ - هٰذَا مُخْمِدُ الصَّوْتِ - هٰذَا مَلَكُ الْمَوْتِ -

"মা ফাতেমা! ইনি মানুষের সমস্ত স্বাদ আহলাদ হরণকারী, ইনি মানুষের কণ্ঠ রোধকারী, ইনি মালাকুল মউত" ।

অতঃপর তিনি আযরাঈল (আঃ) কে ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি দিলেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ) মানুষের বেশে আযরাঈলকে দেখে নিলেন। এরপর অদৃশ্যভাবে আযরাঈল (আঃ) ভিতরে এসে নবী করিম (দঃ) কে সালাম দিলেন এবং বললেন–

"আল্লাহ্ আপনাকে সালাম দিয়েছেন। আমি আপনার সাথে দেখা করতে এসেছি। আল্লাহ্ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনার ইচ্ছা ও অনুমতি ব্যতীত যেন আপনার রুহ্ মোবারক কব্জ না করি"। একথা শুনে হুযুর (দঃ) বললেন– "তুমি বসো, আমার ভাই জিবরাঈল আসুক"। আযরাইল বসে রইলেন।

এমন সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ) এসে বললেন–

"আলবেদা; ইয়া রাসুলাল্লাহ্! বিচ্ছেদের সময় সমাগত, প্রস্থানের সময় নিকটবর্তী, আপনার প্রভু আপনার প্রতীক্ষায় অপেক্ষমান"। নবী করিম (দঃ) বললেন, "হে ভাই জিবরাঈল! আযরাঈল আমার রুহ্ কব্জ করার অনুমতি চাচ্ছে। আমি ২৩

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

বৎসর যাবৎ আমার উম্মতের দেখা শুনা করেছি এবং তাদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান দিয়েছি। আমার পর উম্মতের জিম্মাদার কে হবেন"? একথা শুনে জিবরাঈল অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আবার মূহুর্তের মধ্যে দৃশ্যমান হয়ে **বললেন–"আল্লাহ্ আপনাকে সালাম দিয়ে বলছেন, আপনার পর তিনিই আপনার উম্মতের জিম্মাদার হবেন। কোরআন মজিদে তো আল্লাহ্ পাক আপনাকে রাযী ও সন্তুষ্ট করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন (সুরা দোহা)! অতএব, আপনি সন্তুষ্ট চিত্তে রাজী হোন"**।

এ সময় নবীজীর সম্মানে ইসমাইল ফেরেস্তা এক হাজার কোটি ফেরেস্তা নিয়ে হাযির হলেন (বায়হকী)। অতঃপর নবী করিম (দঃ) আযরাঈল (আঃ) কে রুহ্ কব্জ করার অনুমতি প্রদান করলেন। যখন ইনতিকাল-ক্রিয়া শুরু হয়, তখন নবী করিম (দঃ) আযরাঈল (আঃ) কে বললেন– **"আর একটু সহজভাবে জান কব্জ করো"**। আযরাঈল (আঃ) বললেন– আল্লাহর সমস্ত প্রাণীকূলের মধ্যে আপনার রুহ্ মোবারকই সবচেয়ে সহজভাবে কব্য করার জন্য আমি নির্দেশ পেয়েছি। নবী করিম (দঃ) উম্মতের মৃত্যু কষ্ট স্মরণ করে বলে উঠলেন– **"তাহলে আমার উম্মতের মউতের সমস্ত কষ্টই আমাকে দিয়ে দাও"**।

একথা বলেই নবী করিম (দঃ) মেসওয়াক করা অবস্থায় বিবি আয়েশা (রাঃ)-এর বুকে মাথা মোবারক এলিয়ে দিয়ে উচ্চারণ করলেন–

"আল্লাহুম্মা বির রাফীক্বিল আ'লা"– "আমার প্রিয়তম বন্ধুর সান্নিধ্যে– হে আল্লাহ"! একথা বলেই তাঁর পবিত্র রুহ আল্লাহর সান্নিধ্যে গমন করেন এবং তিনি বেছাল প্রাপ্ত হন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

এদিকে চাশ্তের নামাযের সময় দুপুরের পূর্বেই নবী করিম (দঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং রফিকে আ'লার সাথে মিলিত হন। (ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

সালেম ইবনে ওবায়দ (রাঃ) নামে জনৈক সাহাবী নবী করিম (দঃ)-এর ইনতিকালের সংবাদ নিয়ে সানাহ্ গমন করেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) কে সংবাদ দেন। সংবাদ পেয়ে তিনি ছুটে আসেন এবং হুজরায় প্রবেশ করে নবী করিম (দঃ)-এর চেহারা মোবারকের কাপড় সরিয়ে কেঁদে ফেলেন। তিনি তিনবার হুযুরের ললাটে চুম্বন করেন (বেদায়া-নেহায়া)।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

[আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন–"তোমরা শহীদগণকে মুখে মৃত বলোনা" অথবা "তাদেরকে মৃত বলে অন্তরে ধারণাও করোনা"–বরং তাঁরা জীবিত–কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পারোনা" (সূরা বাক্বারা ও সূরা আলে ইমরান)

বিঃ দ্রঃ শহীদগণের মর্যাদা তৃতীয় স্তরের। দ্বিতীয় স্তর সিদ্দিকগণের এবং প্রথম স্তর হচ্ছে আম্বিয়ায়ে কেরামের। তাহলে তাঁদের জীবিত থাকার বিষয়টি প্রশ্নাতীত ব্যাপার। শহীদগণ শাহাদাতের পর পুনরায় জীবন লাভ করেন। নবীগণও পুনরায় জীবন লাভ করেন। (দেখুন–ইমাম সুবকী (রহঃ)–এর গ্রন্থ শিফাউস সিকাম") ।]

নির্ভরযোগ্য বর্ণনামতে তখন সময়টি ছিল দ্বিপ্রহরের পূর্বে চাশ্‌ত-এর নামাযের সময়। দিনটি ছিল সোমবার। মাস ছিল রবিউল আউয়াল। তারিখ ছিল প্রসিদ্ধ ও অধিকাংশ বর্ণনাকারীদের মতে ১২ই রবিউল আউয়াল (বেদায়া ও নেহায়া-ইবনে কাছির ৫ম খন্ড পৃষ্ঠা ২৫৬, ছাপাখানা মাক্‌তাবাতুল মাআরেফ ১৯৮৮ইং)। কাযী আয়ায শিফা শরীফে নবীজীর বৈশিষ্ট্য অধ্যায়ে বর্ণনা করেন– **"মউত ও মউতের সময়কে নবী করিম (দঃ)-এর এখতিয়ারাধীন করা হয়েছে। অন্য কাউকে এ বৈশিষ্ট্য দেয়া হয়নি"** ।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন– **হে প্রিয় রাসূল! "আপনার ইনতিকাল হবে একপ্রকার (ক্ষণিকের জন্য) এবং অন্যদের মৃত্যু হবে অন্যপ্রকার"** (২৩ পারা শেষ আয়াত)

আল্লামা তাকিউদ্দিন সুবুকী (রহঃ) "শিফাউস সিকাম" গ্রন্থে বলেন– **"হুযুর (দঃ)-এর দাফনের পর আল্লাহ তায়ালা তাঁর রূহ মোবারক দেহ মোবারকে ফিরত পাঠিয়ে দেন। তাই তিনি কিয়ামত পর্যন্ত হায়াতুন্নবী"। কাজেই তাঁর মৃত্যুদিবস পালন করা অবৈধ।**

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ছাপ্পান্নতম অধ্যায়

সন্দেহ অপনোদন

প্রসঙ্গ ঃ ইন্‌তিকালের তারিখ সম্পর্কে ভুল ধারণার অপনোদন

আহ্‌লে হাদীস বা লা-মাযহাবীদের নেতা মাওলানা আকরাম খাঁ, ওহাবী ও মউদূদী পন্থীসহ ঈদে মিলাদুন্নবী বিরোধীরা নবী করিম (দঃ)-এর ইনতিকালের তারিখ নিয়ে মানুষের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করে প্রতি বৎসর পেপার পত্রিকায় প্রচারণা চালাচ্ছে। তাদের অবশ্যই জানা থাকার কথা যে, কোন একটি বিষয়ে বিভিন্ন বর্ণনা ও মতামত থাকলেও নির্ভরযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য একটি সিদ্ধান্ত অবশ্যই আছে। অনুসন্ধান করে সেটা বের করা এবং সে অনুযায়ী আমল করাই ঈমানদারের কাজ এবং মানুষকেও ঐ সত্যটি অবগত করানো উচিত। কিন্তু তারা ইচ্ছাকৃতভাবেই সন্দেহের সৃষ্টি করে রাখে–কিতাবের বর্ণণা অনুযায়ী সঠিক ফয়সালাটি তারা বলেনা। তাদের কেউ বলে–রবিউল আউয়াল মাসের ২ তারিখে নবী করিম (দঃ) ইনতিকাল করেছেন। কেউ কেউ বলে–৮ তারিখ। কেউ বলে–৯ তারিখ। কেউ বলে–১০ তারিখ। কিন্তু ১২ই রবিউল আউয়ালের বর্ণনাটিই যে সঠিক এবং অধিকাংশের মত, এ কথাটা তারা গোপন রাখে।

তাই আমি পাঠকদের খেদমতে ইবনে কাছির প্রণীত আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া গ্রন্থের ৫ম খন্ড পৃষ্ঠা ২৫৪-২৫৬ হতে প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি পেশ করলাম– যেন তারা আপন গুরুর কথা মানে। ইমাম আহমদ রেযা (রহঃ)-এর ফতোয়াও এতদসঙ্গে উল্লেখ করা হলো।

ইবনে কাছির (মৃত্যু ৭৭৪ হিজরী) বলেন– **"ইবনে ইসহাক ও ওয়াকেদীর বিশুদ্ধ বর্ণনামতে নবী করিম (দঃ) ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখ সোমবার দিন ইন্‌তিকাল করেছেন"**। উক্তিটি নিম্নরূপ ঃ

تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاِثْنَتَيْ عَشَرَةَ لَيْلَةً
خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَبِيْعِ الْاَوَّلِ فِى الْيَوْمِ الَّذِيْ قَدِمَ فِيْهِ الْمَدِيْنَةَ مُهَاجِرًا-

অর্থ–**"নবী করিম (দঃ) ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে সোমবার দিনে ইন্‌তিকাল করেন–যে দিনে তিনি হিজরত করে মদিনায় প্রবেশ করেছিলেন"** (বেদায়া-নেহায়া ৫ম খন্ড ২৫৫ পৃষ্ঠা)। এরপর ইব্‌নে কাসির মন্তব্য করেন–

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

وَالْمَشْهُوْرُ قَوْلُ ابْنِ إِسْحَاقَ وَالْوَاقِدِيِّ وَرَوَاهُ الْوَاقِدِيُّ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا وَعَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَا تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ لِثِنْتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَبِيْعِ الْأَوَّلِ وَرَوَاهُ
ابْنُ اسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ اَبِيْهِ مِثْلَهُ
وَزَادَ وَدُفِنَ لَيْلَةَ الْاَرْبِعَاءِ-

অর্থ–"**নবী করিম (দঃ)-এর ইন্তিকালের তারিখের বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে ইবনে ইসহাক ও ওয়াকিদীর বর্ণনাই প্রসিদ্ধ ও মশহুর। ওয়াকেদী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং ওরওয়া ইবনে যুবাইর (রাঃ)-এর সূত্রে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়াত করেন- তাঁরা উভয়ে বলেন- "রাসূলে করিম (দঃ) ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখ সোমবার বেছালপ্রাপ্ত হন।** ইব্‌নে ইসহাক আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর ইব্‌নে হজম সূত্রে উপরোক্ত রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত এই কথাটি ছিল– **"এবং মঙ্গলবার দিবাগত বুধবার রাত্রে নবী করিম (দঃ) কে দাফন করা হয়"** (বেদায়া নেহায়া ৫ম খন্ড ২৫৫-২৫৬ পৃষ্ঠা)।

ইনতিকাল তারিখ নির্ধারণে মতভেদের প্রকৃত কারণ ঃ

ইব্‌নে কাছির বলেন– নবী করিম (দঃ)-এর ইনতিকালের তারিখ নিয়ে বিভিন্ন মতের কারণ হলো– চন্দ্র দর্শনের হিসাব নিয়ে গোলমাল। কেননা, প্রথম চন্দ্র দর্শনের তারিখটি বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম হয়। **মক্কা শরীফ ও মদিনা শরীফেও কোন কোন সময় ১ দিনের ব্যবধান হয়ে যায়।** পূর্বাঞ্চলে ২ দিনের ব্যবধানও লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং মদিনা শরীফের চাঁদের হিসাবটিই এ ক্ষেত্রে মানদন্ড ধরে নিলে কোন সমস্যা থাকে না। সব হিসাব মিলে যাবে। সে মতে ১০ম হিজরীর শেষ মাস যিলহজ্ব চাঁদের ১লা তারিখ মদিনাবাসীগণ শুক্রবার থেকে গণনা করেন। কিন্তু মক্কাবাসীগণ আগের দিন বৃহস্পতিবার থেকে গণনা

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

করে ৯ তারিখ শুক্রবার হজ্বের দিন ধার্য করেন– অথচ সেদিন মদিনা শরীফে ছিল চাঁদের ৮ তারিখ। মক্কা মদিনার দূরত্ব ৫০০ কিঃ মিঃ–সুতরাং চন্দ্রদর্শন বেশকম হতে পারে।

সে মতে এ মাস থেকে পরবর্তী ৩ মাস মদিনায় একাধারে ৩০ দিনে পূর্ণ হয়। সেমতে মোহাররম মাসের ১লা তারিখ মদিনা শরীফে ছিল **রবিবার**। পরবর্তী সফর মাসের ১লা তারিখ ছিল **মঙ্গলবার**। তার পরবর্তী মাস রবিউল আউয়ালের ১লা তারিখ ছিল **বৃহস্পতিবার** এবং ১২ তারিখ ছিল **সোমবার**। সুতরাং নবী করিম (দঃ)-এর ইন্তিকাল তারিখটি ছিল ১২ই রবিউল আউয়াল **সোমবার**। (বেদায়া নেহায়া ৫ম খন্ড পৃষ্ঠা ২৫৬)। **ওয়াকেদীর ব্যাপারে কারো আপত্তি থাকলেও ইবনে ইছহাকের ব্যাপারে কারো কোন আপত্তি নেই**। সুতরাং উপরের রেওয়াতটি বিশুদ্ধ।

আর একটি সহীহ্ বর্ণনা দেখুন ঃ

عَنْ عَفَّانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِيْنَا عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُمَا قَالَا
وُلِدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفِيْلِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ
الثَّانِيْ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَبِيْعِ الْاَوَّلِ وَفِيْهِ بُعِثَ وَفِيْهِ هَاجَرَ وَفِيْهِ
مَاتَ وَهٰذَا هُوَ الْمَشْهُوْرُ (اَلْبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ ج ٢ صفحة ٢٦)

অর্থ–"হযরত জাবের (রাঃ) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে সায়ীদ ইবনে মীনা সূত্রে আফফান বর্ণনা করেছেন– জাবের ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ "নবী করিম (দঃ) হস্তীসনের ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার দিন ভূমিষ্ট হয়েছেন। ঐ ১২ তারিখে এবং ঐ সোমবার দিনেই তিনি নবুয়তের দায়িত্ব লাভ করেছেন, হিজরত করেছেন ও ইন্তিকাল করেছেন। ইহাই প্রসিদ্ধ বর্ণনা"। (বেদায়া ২য় খন্ড ২৬০ পৃষ্ঠা)।

৭৭৪ হিজরী সনের পূর্বেই ইবনে কাছির তাঁর গ্রন্থে নবী করিম (দঃ)-এর জন্ম ও ইন্তিকালের তারিখ এবং দিনক্ষণের সুষ্ঠু সমাধান দেয়ার পর বর্তমানকালের স্বঘোষিত পন্ডিতগণ বিভ্রান্তি সৃষ্টির পাঁয়তারা করায় তাদের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে কারো কষ্ট হবার কথা নয়। আল্লাহ্ বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীদের সুমতি দান

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

করুন। তাদের মতেই ইবনে ইসহাক ও মীনা নির্ভরযোগ্য রাবী। সেজন্যই তাঁদের উদ্ধৃতি পেশ করলাম।

ইমাম আহমদ রেযা (রহঃ)-এর ফতোয়া ঃ

ইমাম আহমদ রেযা (রহঃ) তাঁর (নুৎকুল হিলাল) গ্রন্থে ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার হুযুর (দঃ)-এর বেছাল শরীফের তারিখটি আটটি দলীল দ্বারা প্রমাণ করেছেন। তার মধ্যে তাবাকাতে ইবনে সা'আদ সূত্রে হযরত আলী (রাঃ)-এর রেওয়ায়াত, যারকানী শরীফ সূত্রে ইবনে ইসহাক-এর রেওয়াআত, আল্লামা দিয়ার বিকরীর তারিখুল খামিছ সূত্রে দুইটি রেওয়ায়াত, যারকানী শরীফে জমহুর উলামা সূত্রে অন্য একটি রেওয়াআত, ইমাম আবু হাতেম রাযী, ইমাম রাযীন আবদারী ও ইমাম ইবনে যাওজীর কিতাবুল ওয়াফী সূত্রে, ইমাম ইবনে জাযরীর কামিল গ্রন্থ সূত্রে, মাজমাউল বিহারিল আন্ওয়ার সূত্রে এবং ফাযেল মুহাম্মদ সাব্বাব কৃত আছআফুর রাগিবীন গ্রন্থ সূত্রে– সর্বমোট আটটি রেওয়ায়াত অতি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। রাবীগণের মধ্যে হযরত আলী, হযরত আয়েশা' ছাআদ, উরওয়া, ইবনে মুসাইয়িব, ইবনে শিহাব, আফফান, ছায়ীদ, ইবনে মিনা, জাবের, ইবনে আব্বাস, ইবনে ইসহাক–প্রমুখ রাবীগণ একবাক্যে বলেছেন– ১২ তারিখ সোমবার হুযুর (দঃ)-এর ওফাত তারিখ।

হুযুরের পরিবারবর্গের রেওয়ায়াতকে পাশ কাটিয়ে অন্যের দুর্বল রেওয়ায়াত গ্রহণ করে একটি প্রতিষ্ঠিত বিষয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করা কোনমতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহঃ)–এর গবেষণামূলক ফতোয়া আমার মাসিক পত্রিকা সুন্নীবার্তা ৫৯ নম্বরে ছাপা হয়েছে। সেখানে বিস্তারিত দলীল ও হিসাব বর্ণনা করা হয়েছে। গবেষকগণের জন্য এটি অতি মূল্যবান তথ্য।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

সাতান্নতম অধ্যায়

বাইআতে আবু বকর (রাঃ)

প্রসঙ্গ ঃ খেলাফত ও বাইআত পদ্ধতি ঃ

নবী করিম (দঃ)-এর ইনতিকালের সময় ঘনিয়ে আসলে হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ) কে সংবাদ পাঠান। হযরত হাফসা (রাঃ) সংবাদ দেন নিজ পিতা হযরত ওমর (রাঃ) কে এবং হযরত ফাতেমা (রাঃ) খবর দেন হযরত আলী (রাঃ) কে (বেদায়া নেহায়া)। তাঁরা কেউ ঐ সময় উপস্থিত ছিলেন না। ইত্যবসরে হুযুর (রাঃ)- এর ওফাত শরীফ সংঘটিত হয়।

হযরত আবু বকর (রাঃ) সংবাদ পেয়ে সানাহ্ নামক মহল্লায় তাঁর স্ত্রী বিন্‌তে খারেজার গৃহ হতে তড়িৎ গতিতে চলে আসেন এবং নবী করিম (দঃ)-এর চাদর মোবারক সরিয়ে ইন্নালিল্লাহি বলে হুযুরের (দঃ) কপাল মোবারকে তিনবার চুম্বন দিয়ে বলেন–**"ইয়া রাসুলাল্লাহ। আপনি হায়াত মউত–উভয় অবস্থায়ই কত পবিত্র"**! একথা বলে তিনি সোজা মসজিদে নববীতে চলে যান এবং ক্রন্দনরত অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামকে শান্তনা দিয়ে ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেন। কেননা, নবী করিম (দঃ)-এর কাফন দাফনের পূর্বেই ইসলামী রাষ্ট্রের পরবর্তী উত্তরাধিকারী নির্বাচন করা একান্ত জরুরী ছিল। তা না হলে বৈদেশিক আক্রমণ এবং অভ্যন্তরীণ বিশৃংখলার মোকাবেলা কে করবে? এবং জানাযার ইনতিযাম কে করবেন?

হযরত ওমর (রাঃ) প্রথমে নবী করিম (দঃ)-এর ইনতিকালের কথা স্বীকারই করেননি। তাঁর অবস্থা ছিল তখন ভাব বিহ্বলতাপূর্ণ। হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন কোরআনের আয়াত **"ওয়ামা মোহাম্মদুন ইল্লা রাসুল"** তিলাওয়াত করে শুনালেন–তখন হযরত ওমর ও অন্যান্য সকলের বিহ্বলতা কেটে যায় এবং ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেন। হযরত ওমর (রাঃ) মত প্রকাশ করেন যে, যেহেতু হুযুর (দঃ)-এর নির্দেশে হযরত আবু বকর (রাঃ) ইমামতি করেছেন–সুতরাং, রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব ও খিলাফতের জন্য তিনিই যোগ্যতম ব্যক্তি। একথা বলে হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর হাত ধরে বলে উঠলেন– فاخذ عمر بيده و قال بايعتك - فبايعه الناس (بخارى)

"হে খলিফাতুর রাসুল! আমি আপনার নিকট আনুগত্যের বাইআত করছি"। এভাবে মসজিদে উপস্থিত মোজাহিরগণ হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর হাতে

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

বাইআত করেন- (বোখারী)। সোমবারের অবশিষ্ট দিন ও রাত মসজিদে নববীতে বাইআতের কাজ চলতে থাকে।

পরদিন মঙ্গলবার সকালে মদিনার বনু সায়েদার দরবার হলে আনসারগণ একত্রিত হয়ে খেলাফতের বিষয়ে আলোচনা করেন। তাঁদের মতামত ছিল– মোহাজিরগণের খলিফা হবেন একজন, আর আনসারগণের খলিফা হবেন আনসারদের মধ্য হতে অন্য একজন। হযরত্ সাআদ ইবনে ওবাদা আনসারী (রাঃ) ছিলেন এই প্রস্তাবের উদ্যোক্তা। এমন সময় হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবীগণ সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁদের কথা শুনে বললেন–এক রাজ্যে দু'খলিফা মনোনীত হওয়ার অর্থ–নিজেরাই নিজেদেরকে দ্বিখন্ডিত করে ফেলা। তিনি নবী করিম (দঃ)–এর বাণী স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন–**হুযুর (দঃ) বলেছেন– "আল খিলাফাতু মিন কোরাইশিন"** অর্থাৎ–"আমার পরবর্তী খলিফা হবে কোরাইশদের মধ্য হতে"।

আনসারদের মধ্যে অনেকেরই এ হাদীসটির কথা স্মরণ ছিলনা। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর মুখে এ হাদীস শুনে সকলের হুঁশ হলো এবং একটি বিপর্যয় থেকে উম্মত রক্ষা পেল। দুই খলিফার প্রস্তাবক হযরত সাআদ ইবনে ওবাদা (রাঃ) সামনে অগ্রসর হয়ে বললেন–**"আনতুমুল উমারা ওয়া নাহ্নুল ওযারা"** অর্থাৎ "আপনারা মোহাজির কোরইশগণ হবেন শাসক এবং আমরা আনসারগণ হবো উযির বা পরামর্শদাতা"। একথা বলেই তাঁরা সবাই হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর হাতে হাত দিয়ে বাইআত করলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) সকিফা বনী সায়েদা-এর বাইআতের কাজ সমাপ্ত করে মসজিদে নববীতে চলে আসেন এবং মিম্বার শরীফে আরোহন করে আপন খেলাফতের ঘোষণা দেন ও নীতি নির্ধারণী ভাষণ প্রদান করেন। এ ভাষণে তিনি নবী করিম (দঃ)–এর পথ ও মত অনুসরণ করার কথা ঘোষণা করেন। তারপর শোকে বিহ্বল হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত যোবাইর (রাঃ) কে ডেকে আনেন এবং তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

"আপনারা দু'জন এখনও বাইআত না করে কি মুসলমানদের শক্তি ও ঐক্য দুর্বল করতে চান"? হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত যোবাইর (রাঃ) তদুত্তরে বললেন–"হে খলিফাতুর রাসুল! আপনার বিরুদ্ধে আমাদের কোন অভিযোগ নেই। আমরা আপনার নিকট বাইআত করলাম" (বেদায়া ও নেহায়া)।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

এই দুজনের বাইয়াতের মাধ্যমে নবী পরিবারের ঘনিষ্টজনদের বাইআতের কাজ সমাপ্ত হলো। সুতরাং শিয়াদের অভিযোগ খন্ডন হয়ে গেলো। তারা বলে, হযরত আলী (রাঃ) নাকি হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর হাতে বাইআত করেননি।

প্রসঙ্গ ঃ বাইআতে শেখ-এর দলীল :

হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর হাতে এই বাইআত ছিল খিলাফাত ও ইরাদাত উভয়টি। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় প্রকারের বাইআত-এর এই ধারা হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) পর্যন্ত চালু ছিল। খিলাফতের যুগের পর যখন মুলুকিয়াত বা রাজতন্ত্র শুরু হলো, তখন থেকে বাইআতে খেলাফত চলে যায় বাদ্‌শাহদের হাতে এবং বাইআতে ইরাদাত বা আধ্যাত্মিক বাইআত ও তরিকতের বাইআত থেকে যায় ইমাম হাসান-হোসাইন, সালমান ফারছী–প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামের হাতে। অদ্যাবধি আধ্যাত্মিক বাইআত বা তরিকতের বাইআত পীর মাশায়েখ-তথা রাসুলের খলিফাগণের হাতে চালু রয়েছে।

পীর তথা নবীজীর খলিফাগণের হাতে বাইআত হওয়া মূলতঃ নবী করিম (দঃ)-এর নিকটই বাইআত হওয়া। আর রাসূলের হাতে বাইআত হওয়া মূলতঃ আল্লাহর কাছেই বাইআত হওয়া (ফাতাহ, ১০ আয়াত) তাফসীরে রুহুল বয়ান সুরা আল ফাতাহ্-এর তাফসীরে 'বাইআতুশ শায়খ'-এর উপর খুব জোর দেয়া হয়েছে। ইসমাইল হক্কী (রহঃ) বলেন–

يقول الفقير (اسماعيل) ثبتت بهذه الآية سنة المبايعة
واخذ التلقين من المشائخ الكبار–

অর্থ–**"সুরা আল ফাতহ-এর ১০ নং আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, মহান মাশায়েখগণের নিকট বাইআত হয়ে তালক্বীন নেয়া সুন্নাত"**। কেননা আল্লাহকে পাওয়ার জন্য পীর অনুসন্ধান করা এবং তাঁদের সান্নিধ্য লাভ করার উপর কোরআন মজিদের সুরা মায়েদা ও সুরা তাওবায় তাকিদ ও নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

তাফসীরে সাভীতে উল্লেখ আছে– "বাইআতে শেখ এবং বাইআতে ইমামও উক্ত ১০ নং আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, ঐ আয়াতটির শানে নুযুল খাস হলেও হুকুম আম"। আরবী এবারতসহ বিস্তারিত বর্ণনা হোদাবিয়ার সন্ধি ৩৯ অধ্যায়ে দেখুন।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

বাইআতে ওসমান (রাঃ)-এর স্বরূপ ঃ

হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ইনতিকালের পূর্বেই তিনি হযরত ওমর (রাঃ) কে খলিফা মনোনীত করেন। এ ব্যাপারে সমস্ত সাহাবীই একমত পোষণ করেন।

হযরত ওমর (রাঃ) দশ বৎসর খেলাফত পরিচালনার পর আঁততায়ীর হাতে ২৩ হিজরীতে শাহাদাত বরণ করেন। ইনতিকালের পূর্বে মধ্যবর্তী সময়ে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য তিনি ৬ জন সাহাবীর মজলিশে সূরার প্যানেল তৈরী করে যান। এই ৬ জনের মধ্যে একজনকে খলিফা মনোনীত করার জন্য তিনি ওসিয়ত করে যান। অস্থায়ীভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যে ৬ জন উপদেষ্টা মনোনীত হয়েছিলেন-তাঁরা হলেন (১) হযরত ওসমান (২) হযরত আলী (৩) হযরত ত্বালহা (৪) হযরত যোবাইর (৫) হযরত ছাআদ (৬) হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর শাহাদাতের ৪র্থ দিনে হযরত ওসমান (রাঃ) খলিফা মনোনীত হন। তাঁর হাতে লোকেরা কিভাবে আইআত হলো-তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

فَاَخَذَ (عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ) بِيَدِهٖ فَقَالَ هَلْ اَنْتَ مُبَايِعِيْ عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ فِعْلِ اَبِيْ بَكْرٍ وَ عُمَرَ- قَالَ (عُثْمَانُ) اَللّٰهُمَّ نَعَمْ- قَالَ الرَّاوِيُّ فَرَفَعَ رَأْسَهٗ اِلٰى سَقْفِ الْمَسْجِدِ وَيَدُهٗ فِيْ يَدِ عُثْمَانَ- فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِسْمَعْ وَاشْهَدْ اَللّٰهُمَّ اِسْمَعْ وَاشْهَدْ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ قَدْ خَلَعْتُ مَا فِيْ رَقَبَتِيْ مِنْ ذٰلِكَ فِيْ رَقَبَةِ عُثْمَانَ- قَالَ الرَّاوِيُّ وَازْدَحَمَ النَّاسُ يُبَايِعُوْنَ عُثْمَانَ حَتّٰى غَشُوْهُ تَحْتَ الْمِنْبَرِ- قَالَ الرَّاوِيُّ فَقَعَدَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ مَقْعَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اَجْلَسَ عُثْمَانَ تَحْتَهٗ عَلَى الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ وَ جَاءَ اِلَيْهِ النَّاسُ يُبَايِعُوْنَ وَ بَايَعَهٗ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ اَوَّلًا وَيُقَالُ اٰخِرًا-

অর্থ - উপদেষ্টা মন্ডলীর অন্যতম সদস্য হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)-যিনি জনমত যাচাই করে হযরত ওসমানের পক্ষে সংখ্যা গরিষ্ঠের মতামত

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

পেয়েছিলেন–তিনি মসজিদে নববীতে লোকজনকে জড়ো করে খলিফা নির্বাচন ও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে হযরত ওসমান (রাঃ)–এর হাত ধরে শপথ বাক্য এরূপে পাঠ করালেন-"আপনি কি আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের সুন্নাত মোতাবেক এবং আবু বকর ও ওমরের নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য আমার কাছে শপথ গ্রহণ করতে রাজী আছেন? হযরত ওসমানের হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে তিনি মসজিদে নববীর ছাদের দিকে মাথা তুলে বললেন–" হে আল্লাহ! তুমি শুন এবং সাক্ষী থাকো, হে আল্লাহ! তুমি শুন এবং সাক্ষী থাকো–আমি আমার কাঁধের বোঝা এবার ওসমানের কাঁধে তুলে দিলাম। বর্ণনাকারী রাবী বলেন–শপথের পর দলে দলে লোকেরা এসে হযরত ওসমানের কাছে বাইআত করতে লাগলো–এমনকি তাঁরা হযরত ওসমানকে মিম্বারের নিচে ঢেকে ফেললো। রাবী বলেন–হযরত আবদুর রহমান তাঁকে তুলে মিম্বারের দ্বিতীয় সিঁড়িতে বসিয়ে নিজে প্রথম সিঁড়িতে নবীজীর বসার স্থানে বসে গেলেন–আর লোকেরা হযরত ওসমানের নিকট আইআত হতে লাগলো এবং প্রথমেই হযরত আলী (রাঃ) হযরত ওসমানের হাতে বাইআত করলেন- মতান্তরে হযরত আলী (রাঃ) সর্বশেষে বাইআত করেছেন" (বেদায়া-নেহায়া ৭ম খন্ড ১৩৯ পৃঃ দারুল হাদীস, কায়রো)।

বাইআতে হযরত আলী (রাঃ)–এর স্বরূপ ঃ

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর শাহাদাতের ৫ দিন পর ৩৫ হিজরীর যিলহজ্ব চাঁদের ১৯ তারিখ শনিবার–মতান্তরে ২৪ তারিখ বৃহস্পতিবার লোকেরা হযরত আলী (রাঃ)কে খলিফা নির্বাচিত করেন। **সর্বপ্রথম হযরত ত্বালহা (রাঃ) আপন ডানহাত হযরত আলীর হাতে রেখে বাইআত করেন। তারপর আশতার নাখয়ী তারপর সর্বসাধারণ হযরত আলীর হাতে বাইআত করেন। আরবী ইবারত–**

وَاَخَذَ الْاَشْتَرُ بِيَدِهٖ فَبَايَعَهٗ وَبَايَعَهُ النَّاسُ-

অর্থ–(মিশর, কুফা ও বসরাবাসীগণ খেলাফত গ্রহনের জন্য হযরত তালহা, যোবাইর, সাআদ ইবনে আবি ওয়াক্কাছ, ইবনে ওমর কাউকে না পেয়ে হয়রান পেরেশানীর পর তারা হযরত আলীর নিকট আসলেন) **"আশতার হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাত ধরে তাঁর কাছে বাইআত করলেন এবং আগত লোকেরাও তাঁর নিকট বাইআত করলো"** (বেদায়া-নেহায়া ৭ম খন্ড ২১৫ পৃঃ, দারুল হাদীস-কায়রো)।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

বাইআতে ইমাম হাসান (রাঃ)-এর স্বরূপ ঃ

হযরত আলী (রাঃ) ৪০ হিজরীতে খারেজী দুশমন আবদুর রহমান ইবনে মুলজিমের খঞ্জরের আঘাতে শাহাদাত বরণ করার পূর্বে লোকেরা তাঁর পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের জন্য আরয করেন। হযরত আলী (রাঃ) বললেন-"না, বরঞ্চ রাসুল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাতের সময় যেভাবে কাউকে খলিফা মনোনীত করে যাননি-আমিও কাউকে মনোনীত করবো না। আল্লাহ যাকে তোমাদের জন্য উত্তম মনে করবেন-তাকেই তিনি খিলাফত দিবেন এবং তোমাদেরকে তাঁর মাধ্যমেই ঐক্যবদ্ধ করবেন"। শাহাদাতের পর তাঁর জানাযায় ইমামতি করেছিলেন ইমাম হাসান (রাঃ)।

হযরত আলী (রাঃ)-এর দাফনের পর কুফাবাসী কয়েস ইবনে সাআদ ইবনে উবাদা ইমাম হাসান (রাঃ)-এর খেদমতে এসে বললো-

ابْسُطْ يَدَكَ اُبَايِعُكَ عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهٖ
فَسَكَتَ الْحَسَنُ فَبَايَعَهٗ وَبَايَعَهُ النَّاسُ بَعْدَهٗ -

অর্থ-"হে ইমাম পাক! আপনি অনুগ্রহ করে হাত বাড়িয়ে দিন-আমি আপনার নিকট বাইআত হবো আল্লাহর কিতাব ও নবীজীর সুন্নাতের অনুসরণের শর্তে। ইমাম হাসান (রাঃ) চুপ রইলেন। কয়েস ইবনে সাআদ ইমামে পাকের নিকট বাইআত করলেন। অতঃপর কুফাবাসী জনসাধারণ তাঁর নিকট বাইআত করলো"। (বেদায়া-নেহায়া ৮ম খন্ড ১৫ পৃষ্ঠা দারুল হাদীস - কায়রো)।

পর্যালোচনা ঃ অত্র অধ্যায়ে বাইআতে আবু বকর, বাইআতে উসমান, বাইআতে আলী ও বাইআতে ইমাম হাসান রিদওয়ানুল্লাহি তায়ালা আলাইহিম আজমাঈনগণের হাতে বাইআতের পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো। তাদের নিকট ঐ বাইআত ছিল বাইআতে খিলাফত ও বাইআতে ইরাদাত উভয়টি-অর্থাৎ খিলাফত ও মুরিদ হওয়ার বাইআত। ইহা সর্বজন স্বীকৃত। তাহলে দেখা যায়-রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বেছালের পর জনসাধারণ বাইআতে আবু বকর, বাইআতে ওমর, বাইআতে ওসমান, বাইআতে আলী ও বাইআতে ইমাম হাসান অনুসরন করতেন। ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর নামে কুফাবাসীগণ ইমাম মুসলিমের নিকট বাইআত করেছিল। এর পরবর্তী সময়ে ইমাম জয়নুল আবেদীন, ইমাম বাকের, ইমাম জাফর সাদেক প্রমুখ নবীবংশগণ

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

লোকজনকে বাইআত করাতেন নিজেদের নামে। সাহাবা যুগের প্রথম বাইআত ছিল বাইআতে আবু বকর (রাঃ)। হযরত ওমর তাঁর হাত ধরে বলেছিলেন–

فَاَخَذَ عُمَرُ بِيَدِهٖ وَقَالَ بَايَعْتُكَ فَبَايَعَهُ النَّاسُ ـ

অর্থ–"আমি আপনার নিকট বাইআত হলাম"। পরবর্তী বাইআত সমূহেও তাই প্রমাণিত হচ্ছে। ইহাই তো "বাইআতে শেখ"। ইহা অস্বীকার করা সত্যকেই অস্বীকার করা হবে। বাইআতে শেখের এর চাইতে বড় প্রমাণ আর কি আছে? যারা বাইআতে শেখ অস্বীকার করেন–তারা মূলতঃ সুন্নাতকেই অস্বীকার করেন। কেননা, চার খলিফার বাইআতের পদ্ধতিই তো সুন্নাত তরিকা। ইহার ব্যতিক্রম সুন্নাত হতে পারে না। সুতরাং হাত তুলে বাইআত করানো সুন্নাত নয়। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীর কাওলুল জামিলে বর্ণিত বাইআত পদ্ধতি ও শব্দাবলী খোলাফায়ে রাশেদীনের বাইআতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

কোন মোহাদ্দেস বা পীর যদি বলে–"বাইআতে রাসুল" ছাড়া পীরের বাইআত নাজায়েয বা হারাম, তাহলে নাজায়েয বা হারামের দালিলিক ও বাস্তব প্রমাণ দিতে হবে। বিনা দলীলের দাবী গ্রহণযোগ্য নয়।

বিঃ দ্রঃ বাইআতে রিদওয়ান ও বাইআতে আবু বকর–এই দুটি অধ্যায় (৩৯ ও ৫৭ অধ্যায়) খুব ভাল করে স্মরণে রাখলে বিতর্কের আর কোন অবকাশ থাকবে না। বাইআতে শেখ-ই বর্তমানে অনুসরন করতে হবে। বাইআতে শেখ-ই মূলতঃ বাইআতে রাসুল ও বাইআতুল্লাহ (তাফসীরে রুহুল বয়ান সূরা আল-ফাতাহ্ ১০নং আয়াতের তাফসীর দেখুন)।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

আটান্নতম অধ্যায়

কাফন দাফনের অগ্রীম সংবাদ

প্রসঙ্গ ঃ গোসল ও কাফন-দাফন ঃ

নবী করিম (দঃ) অসুস্থ অবস্থায়ই নিজের ইন্‌তিকাল পরবর্তীকালের সমস্ত অনুষ্ঠানাদির বিস্তারিত বিবরণ অগ্রিম বলে যান। কখন ইন্‌তিকাল হবে, কে গোসল দেবে, কোন্ দেশীয় কাপড় দিয়ে কাফন দেয়া হবে, কোন্ স্থানের পানি দিয়ে গোসল করানো হবে, কে প্রথম জানাযার সালাত আদায় করবে, কোন্ ধরনের জানাযা বা সালাত পড়া হবে, কে হুযুর (দঃ) কে রওযা মোবারকে নামাবে– ইত্যাদি বিষয়ে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর প্রশ্নের জবাবে নবী করিম (দঃ) অগ্রিম বলে গেছেন। ইমাম বায়হাকী কর্তৃক সংগৃহীত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণিত ইলমে গায়েব সম্বলিত এই হাদীসখানা ইবনে কাছির- ইবনে তাইমিয়ার অনুসারী হয়েও, আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন– তার অনুবাদ নিম্নে পেশ করা হলো।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর বর্ণনা ঃ

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন– যখন নবী করিম (দঃ) অসুস্থতার কারণে দুর্বল হয়ে পড়লেন, তখন আমরা কতিপয় ঘনিষ্ট সাহাবী হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ)-এর গৃহে একত্রিত হলাম। আমাদেরকে দেখে নবী করিম (দঃ) এর দুচোখ পানিতে ভরে উঠলো। তিনি আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন–

"বিদায়কাল অতি নিকটবর্তী। তোমাদের আগমন শুভ হোক। আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তমভাবে জীবিত রাখুন। আল্লাহ তোমাদেরকে হেদায়াত দান করুন। তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করুন। তোমাদেরকে উপকৃত করুন। তোমাদেরকে উত্তম কাজের তৌফিক দিন। দ্বীনের পথে তোমাদেরকে দৃঢ় রাখুন। তোমাদেরকে তিনি হেফাযত করুন। তোমাদেরকে সাহায্য করুন। তোমাদেরকে কবুল করুন। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর প্রতি ভয়-ভীতির জন্য অসিয়ত করে যাচ্ছি। আমার ইন্‌তিকালের পর তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌কে হেফাযতকারী রেখে গেলাম। আমি তোমাদের জন্য তাঁর পক্ষ হতে সুস্পষ্ট

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

সতর্ককারী। তোমরা আল্লাহর বান্দার ব্যাপারে এবং আল্লাহর রাজত্বে আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘন করবে না"।

তারপর তিনি পরকালের শাস্তি ও শান্তি সম্পর্কিত দুটি আয়াত তিলাওয়াত করলেন। ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমরা আরয করলাম– ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনার ইন্তিকাল কখন হবে? উত্তরে নবী করিম (দঃ) বললেন "নির্ধারিত সময় নিকটবর্তী। উত্তম বিছানা, পরিপূর্ণ পানপাত্র, সিদরাতুল মোন্‌তাহা এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের সময় ঘনিয়ে আসছে"।

আমরা পুনরায় আরয করলাম– ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনাকে গোসল দেবে কে? হুযুর (দঃ) বললেন–"আমার আহ্‌লে বাইতের পুরুষগণ; অতি নিকটজন, তারপর ক্রমান্বয়ে অন্যরা। সাথে থাকবে অনেক ফেরেস্তা। তারা তোমাদেরকে দেখেন, কিন্তু তোমরা তাদেরকে দেখোনা"।

আমরা আরয করলাম– ইয়া রাসুলাল্লাহ! কোন্‌ ধরনের কাপড় দিয়ে আপনার কাফন পরানো হবে? এরশাদ করলেন, "আমার পরিধানের জামা দ্বারা এবং ইয়ামেন দেশীয় কাপড় দ্বারা অথবা মিশরীয় সাদা কাপড় দ্বারা"।

আমরা আরয করলাম– ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে আপনার উপর সালাত বা জানাযা আদায় করবে? একথা শুনে তিনি কাঁদলেন। আমরাও কাঁদলাম। অতঃপর তিনি বললেন– "এ প্রসঙ্গ বাদ দাও। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন এবং তোমাদের নবীর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে তিনি উত্তম পুরস্কার দান করুন। শুন! যখন তোমরা আমাকে গোসল দিয়ে সুগন্ধি লাগাবে এবং কাফন পরাবে, তখন তোমরা আমাকে আমার রওযার কিনারে রেখে কিছুক্ষণের জন্য ঘর থেকে বের হয়ে যাবে। কেননা, এ সময়ে আমার দুই বন্ধ–জিব্‌রাঈল ও মিকাঈল, এরপর ইস্‌রাফীল, তারপর মালাকুল মউত অন্যান্য ফেরেস্তাগণকে সাথে নিয়ে আমার উপর দুরুদ পাঠ করবে। এরপর প্রথমে আমার আহ্‌লে বাইত বা পরিবারবর্গের পুরুষেরা আমার উপর দুরুদ পাঠ করবে। এরপর আমার পরিবারের মহিলাগণ দুরুদ পড়বে। এরপর তোমরা ভাগে ভাগে আমার গৃহে প্রবেশ করে দুরুদ পড়বে অথবা একা একা এসে দুরুদ পড়বে। রোনাজারীকারিনী কোন মহিলা দ্বারা আমাকে কষ্ট দিও না। আমার যেসব সাহাবী উপস্থিত হতে পারবে না– তাদের কাছে আমার সালাম পৌঁছিয়ে দিও। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

বলছি- যারা ইসলামে প্রবেশ করেছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত করবে–যারা আমার দ্বীনের বিষয়ে আমার অনুসরণ করবে, আমি তাদের সকলকে সালাম দিয়ে গেলাম" ।

আমরা পুনরায় আরয করলাম– ইয়া রাসুলাল্লাহ! কে আপনাকে রওযা মোবারকে নামাবে? নবী করিম (দঃ) এরশাদ করলেন– "আমার পরিবারস্থ পুরুষ লোকজন, নিকটতম ব্যক্তি, তারপর ক্রমানুসারে অন্যরা। সাথে অনেক ফেরেস্তা প্রবেশ করবে–যারা তোমাদেরকে দেখছেন, কিন্তু তোমরা তাদেরকে দেখতে পাচ্ছোনা" । (বায়হাকী সূত্রে আলবেদায়া ও নেহায়া ৫ম খন্ড ২৫৩ পৃষ্ঠা)।

দাফনে বিলম্বের কারণ ঃ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী করিম (দঃ)-এর গোসল ও কাফন-দাফনের পূর্বে খলিফা নির্বাচন করা ছিল রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ফরয কাজ। খলিফা নির্বাচনের পূর্বে এসব কাজ কার নেতৃত্বে করা হবে- এ নিয়ে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। তদুপরি, খলিফা নির্বাচন না করে কাফন–দাফন করে ফেললে প্রশাসনে শূন্যতা দেখা দিবে। তাই খলিফা নির্বাচন করা ছিল প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বিলম্বের ইহাই একমাত্র কারণ। সোমবারের অর্ধদিন এবং মঙ্গলবারের প্রথমভাগে উক্ত রাষ্ট্রীয় কাজ সমাধা করে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর নেতৃত্বে এবং তাঁর আদেশে গোসল ও কাফন-দাফনের দিকে মনোযোগ দেয়া হয়। নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন, **"নবীগণ যেস্থানে ইন্তিকাল করেন–সেখানেই তাঁদেরকে দাফন করা হয়"** ।

সে মোতাবেক হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ)-এর হুযরার ভিতরে রওযা মোবারক তৈরীর নির্দেশ দিলেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) মদিনা শরীফের আবু তাল্‌হা ইবনে সহল আনসারী (রাঃ) কে রওযা মোবারক খনন করার জন্য আনয়ন করেন। তিনি মদিনাবাসীদের অনুকরণে বগলী কবর খনন করেন এবং উপরে কাঁচা ইটের টাইল্‌স্‌ দ্বারা রওযা মোবারককে আবৃত করেন।

গোসল মোবারক ঃ

হযরত আলী (রাঃ), হযরত আব্বাস (রাঃ), তাঁর ছেলে হযরত ফযল (রাঃ), অপর ছেলে কুসাম (রাঃ), নবী করিম (দঃ)-এর পালিত পুত্রের ছেলে হযরত

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

উসামা (রাঃ) এবং তাঁর আশ্রিত হযরত সালেহ (রাঃ) গোসল দেওয়ার জন্য নির্ধারিত হলেন। মদিনার জনৈক আনসার সাহাবী হযরত আউছ ইবনে আওলা (রাঃ) হযরত আলীর (রাঃ) অনুমতি নিয়ে গোসলে শরীক হন। নবী করিম (দঃ)-এর পূর্ব নির্দেশ মোতাবেক কোবার 'গারছ' নামক কূপ থেকে পানি আনা হলো। পানির সাথে বরই পাতা ও কাপুর দেয়া হলো।

গোসলের সময় শরীর মোবারক থেকে পরিধানের কাপড় পৃথক করা হবে কিনা– এ নিয়ে বিভিন্ন মত প্রকাশ করা হলো। হঠাৎ করে তাঁদের মধ্যে তন্দ্রার ভাব দেখা দিল। এমতাবস্থায় তাঁরা শুনতে পেলেন-কে যেন বলছে–**"নবী করিম (দঃ)-এর বদন মোবারক থেকে কাপড় সরানো যাবে না"**। তাই করা হলো। কাপড়ের উপরেই পানি ঢেলে হযরত আলী (রাঃ) ডান হাত দিয়ে ধৌত করে দিলেন। নবী করিম (দঃ)-এর নির্দেশ ছিল– **"আলী ছাড়া অন্য কেউ যেন আমাকে গোসল না দেয়"**। (গোসলের বিলম্ব সম্পর্কে শিয়াদের প্রচারণা মিথ্যা। কেননা, হযরত আলী (রাঃ) এ কাজের একক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিলেন)।

সেমতে হযরত আলী (রাঃ) একা গোসলের কাজ সামাধা করেন। হযরত আব্বাস, ফযল ও কুসাম পিতা-পুত্রগণ নবী করিম (দঃ)-এর দেহ মোবারক এদিক সেদিক ডান-বাম করানোর কাজে সহায়তা করেন। পানি ঢালার কাজে সহায়তা করেন উসামা ও সালেহ; মতান্তরে উসামা ও আব্বাস (রাঃ)। হযরত আলী (রাঃ) বলেন– মৃত ব্যক্তির মলমুত্র পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয়। কিন্তু নবী করিম (দঃ)-এর ক্ষেত্রে তেমন হয়নি। কেননা, তিনি ইন্তিকালের পূর্বে ও পরে- সর্বাবস্থায়ই পাক পবিত্র ছিলেন। হযরত আলী (রাঃ) ডান হাত দিয়ে হুযুর (দঃ)-এর শরীর মোবারক ধৌত করেছিলেন। এর বরকতে তাঁর ডান হাতে সব সময় আতরের মত সুগন্ধি পাওয়া যেত (সুবহানাল্লাহ্)।

কাফন মোবারক ঃ

নবী করিম (দঃ)কে গোসল দেয়ার পর কাফন মোবারক পরিধান করা হয়। চেহারা মোবারক, কনুই মোবারক, হাঁটু মোবারক এবং প্রতি অঙ্গের জোড়ায় জোড়ায় কাপুর লাগানো হয়। তারপর তিনখানা কাপড় দিয়ে কাফন পরানো হয়। হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ), হযরত ফযল (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) থেকে কাফনের কাপড়ের নমুনা সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়াত

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

পাওয়া যায়। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে দেখা যায়, নবী করিম (দঃ) তিন ধরনের কাপড়ের মধ্যে যেকোন কাপড় দিয়ে কাফন দেয়ার কথা পূর্বেই বলে গেছেন– কাফনের কাপড় হবে ইয়েমেনের তৈরী অথবা মিশরীয় সাদা কাপড়। সে মতে দু'খানা সাদা কাপড় এবং হুযুর (দঃ)-এর নিজ গায়ের জামা মোবারক দিয়ে কাফন পরিধান করানো হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনা মতে হুযুর (দঃ)-এর ইন্তিকালের সময় গায়ের জামা এবং ইয়েমেন দেশীয় দু'খানা কাপড় (একজোড়া) দিয়ে হুযুর (দঃ) কে কাফন পরিধান করানো হয়। পাগড়ী পরিধান করানো হয়নি। হযরত আলী (রাঃ) বলেন– আমি নিজহাতে হুযুর আকরাম (দঃ) কে দু'খানা সাদা কাপড় ও একখানা চাদর দ্বারা কাফন পরিধান করিয়েছি। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর রেওয়ায়াত মোতাবেক তিনখানা সাদা 'সাহুলী' কাপড় দ্বারা কাফন পরানো হয়। ফযল (রাঃ)-এর বর্ণনা মতে দু'খানা সাদা সাহুলী কাপড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। মোট কথা নিজ জামাসহ তিন খানা কাপড়েরই উল্লেখ পাওয়া যায়।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

উনষাটতম অধ্যায়

হুযুরের জানাযার ধরন

জানাযা ঃ

উম্মতে মোহাম্মদীর সকলকেই চার তাকবীরের সাথে এক ইমামের পিছনে ইক্তাদা করে জানাযার নামায পড়ানো হয়। এতে তিনটি অংশ আছে। যথা– আল্লাহর সানা, নবী করিম (দঃ)-এর উপর দুরুদ শরীফ এবং মৃত ব্যক্তির জন্য আম দোয়া। এটাকে নামায বলা হয় এজন্য যে, এতে ইমাম ও মোক্তাদী আছে। শরীর পাক হতে হয়। কিবলামুখী হতে হয়। নাভীতে হাত বাঁধতে হয়। শুধু রুকু, সিজদা, বৈঠক ও ক্বিরাত নেই এবং তাশাহহুদও পড়তে হয় না। তবুও এটাকে নামায বলা হয় এজন্য যে, মূর্দাকে সামনে রেখে কেবলামুখী হয়ে হাত বেঁধে ইমামের পিছনে ইক্তাদা করতে হয়। এতেই প্রমাণি হয় যে, জানাযা হলো নামায। শুধু দোয়া হলে এসব করতে হতনা। এর একটি অংশ মাত্র দোয়া।

এজন্য হাদীস অনুযায়ী জানাযা নামাযের পরপরই সকলে গোল হয়ে আর একবার দোয়া করা হয় হাত তুলে। তৃতীয়বার দোয়া করা হয় মাটি দেয়ার পর। মিশকাত শরীফে আছে **"আক্‌ছিরোদ্‌ দোয়া লিল্‌ মাইয়্যিতি" অর্থাৎ "তোমরা মৃত ব্যক্তির জন্য বেশী করে দোয়া কর"**। বেশী অর্থ–ন্যূনতম তিনবার দোয়া করা। অপর হাদীসে এসেছে **"ইজা সাল্লাইতুম আলাল মাইয়েতে, ফা-আখ্‌লিছু লাহুদ্দোয়া" অর্থাৎ "যখন তোমরা মৃত ব্যক্তির জানাযা আদায় করবে, তার পরপরই বিনা বিলম্বে আর একবার খাছ দোয়া করবে"** (মিশকাত কিতাবুল জানায়েয)। মুসলমানগণ এভাবেই আমল করে আসছেন। এটা হলো সাধারণ মৃত ব্যক্তিদের কথা। (জানাযার পর দোয়া সম্পর্কে আমার লিখিত ফতোয়া ছালাছা পাঠ করুন)।

হুযুরের জানাযার ধরন ঃ

নবী করিম (দঃ)-এর ক্ষেত্রে জানাযার বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্য ছিল। হুযুর (দঃ)-এর বেলায় কোন ইমাম ছিলনা। মোক্তাদীও ছিলনা। কেবলামুখী হওয়াও ছিলনা। হাদীস শরীফে শুধু সালাত শব্দের উল্লেখ আছে। এখানে সালাত অর্থ দোয়া ও দুরূদ। ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর প্রতি নবী করিম (দঃ) যে অসিয়ত

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

করে গেছেন, সে অনুযায়ী সাহাবীগণ নবী করিম (দঃ)-এর হুজরা মোবারকে প্রবেশ করে রওযা মোবারকের কিনারায় রক্ষিত খাটের কাছে গিয়ে দুরূদ ও সালাম পেশ করে বের হয়ে আসতেন। একদল বের হওয়ার পর আর এক দল প্রবেশ করতেন এবং দুরূদ ও সালাম পেশ করতেন। এভাবে প্রথমে পুরুষগণ, তারপর মহিলাগণ, তারপর ছোট ছোট বালকগণ, তারপর আশ্রিত দাস-দাসীগণ ও মাওয়ালীগণ ব্যক্তিগতভাবে হুজরায় প্রবেশ করে দুরূদ ও সালাম পেশ করেছিলেন। সাধারণ জানাযা নামায হলে মহিলাগণ অংশগ্রহণ করতে পারতেন না।

আল্লামা সোহায়লী (রাহঃ) বলেন– আল্লাহ তায়ালা কোরআন মজিদের সুরা আহ্যাবে যেভাবে দুরূদ ও সালাম পড়ার জন্য মোমেনগণকে নির্দেশ করেছেন, ইন্তিকালের পরও অনুরূপভাবেই শুধু দুরূদ ও সালাম পেশ করা হয়েছিল (বেদায়া ও নেহায়া ৫ম খন্ড ২৬৫ পৃষ্ঠা)।

মাওয়াহিব-লাদুন্নিয়া গ্রন্থে আল্লামা শিহাবুদ্দীন কাস্তুলানী শারেহে বোখারী (রাহঃ) উল্লেখ করেছেন–

وَمِنْ خَصَائِصِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ صَلَّي عَلَيْهِ النَّاسُ اَفْوَاجًا اَفْوَاجًا
بِغَيْرِ اِمَامٍ وَبِغَيْرِ دُعَاءِ الْجَنَازَةِ الْمَعْرُوْفِ ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ.

অর্থ–**"নবী করিম (দঃ)-এর অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এটিও একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল যে, লোকেরা দলে দলে এসে ইমাম ছাড়াই দুরূদ পাঠ করতেন। তাঁরা প্রচলিত জানাযার দোয়া ও তাকবীর পড়েননি। ইমাম বায়হাকী ও অন্যান্য মোহাদ্দিসগণ এরূপই বর্ণনা করেছেন"** (আন্ওয়ারে মোহাম্মদীয়া মিন মাওয়াহিব লাদুন্নিয়া পৃষ্ঠা ৩২০)। হুযুর (দঃ) হায়াতুন্নবী, সেজন্যই প্রচলিত জানাযা হয়নি।

হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক জানাযা সালাতের ধরনঃ

হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ) কিভাবে জানাযার পরিবর্তে শুধু দুরূদ ও সালাম পাঠ করেছিলেন– তার একটি পরিষ্কার বর্ণনা আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া গ্রন্থের ৫ম খন্ড ২৬৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে। উভয় সাহাবীর আমল মোহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম নামে জনৈক রাবী লিখে রেখেছিলেন। ওয়াকেদী ঐ দলীলখানার ভাষ্য এভাবে বর্ণনা করেছেন–

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

لَمَّا كُفِّنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضِعَ عَلٰى سَرِيْرِهِ دَخَلَ اَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَمَعَهُمَا نَفَرٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ بِقَدْرِ مَا يَسَعُ الْبَيْتُ فَقَالَا: اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ وَسَلَّمَ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْاَنْصَارُ كَمَا سَلَّمَ اَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرُ ثُمَّ صَفُّوْا صُفُوْفًا لَا يَؤُمُّهُمْ اَحَدٌ- فَقَالَ اَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرُ وَهُمَا فِى الصَّفِّ الْاَوَّلِ حِيَالَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَشْهَدُ اَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ وَنَصَحَ لِاُمَّتِهِ وَجَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى اَعَزَّ اللّٰهُ دِيْنَهُ وَتَمَّتْ كَلِمَتُهُ وَاُوْمِنَ بِهِ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ فَاجْعَلْنَا اِلٰهَنَا مِمَّنْ يَتَّبِعُ الْقَوْلَ الَّذِيْ اُنْزِلَ مَعَهُ وَاجْمَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ حَتّٰى تَعْرِفْنَابِنَا وَتُعَرِّفَنَا بِهِ فَاِنَّهُ كَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفًا رَّحِيْمًا لَّا نَبْتَغِيْ بِالْاِيْمَانِ بِهِ بَدِيْلًا وَنَشْتَرِىْ بِهِ ثَمَنًا اَمَدًا فَيَقُوْلُ النَّاسُ: اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ وَيَخْرُجُوْنَ وَيَدْخُلُ اٰخَرُوْنَ حَتّٰى صَلَّى الرِّجَالُ ثُمَّ النِّسَاءُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ-

অর্থ–"নবী করিম (দঃ) কে কাফন পরিধানের পর খাঁটের উপর রেখে ঐ খাঁট (হুজরার ভিতর) রওযা মোবারকের পার্শ্বে রাখা হলো। হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ) হুজরার ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী কয়েকজন মোহাজির ও আনসারকে সাথে নিয়ে প্রবেশ করলেন। তাঁরা দু'জনে প্রথমে এভাবে সালাম আরয করলেন– "আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান্নাবীউ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু"। হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ)-এর ন্যায় মোহাজির ও আনসারগণও সালাম আরয করলেন। তারপর সকলে সারি বেঁধে খাটের চতুর্দিকে দাঁড়ালেন। তাঁদের মধ্যে কেউ ইমাম ছিলেন না। রাসুল করিম (দঃ)-এর খাটের চতুর্পাশ্বে দন্ডায়মান কাতারগুলোর মধ্যে প্রথম কাতারে হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) দাঁড়িয়ে এভাবে মুনাজাত করলেন ঃ

"হে আল্লাহ! আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নবী করিম (দঃ)-এর উপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি তা পরিপূর্ণভাবে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। উম্মতকে তিনি উপদেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহর পথে তিনি জেহাদ পরিচালনা করেছেন।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

তাঁর প্রচেষ্টার ফলে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর দ্বীনকে শক্তিশালী করেছেন। তাঁর কলেমা পূর্ণতা লাভ করেছে। লা শারীক আল্লাহর উপর লোকেরা ঈমান এনেছে। হে আমাদের মাবুদ! তুমি আমাদেরকে তাঁর উপর অবতীর্ণ যাবতীয় বাণীর অনুসরণকারী বানিয়ে দাও। তুমি আমাদের ও উনির মধ্যে মিলন ঘটিয়ে দাও। তুমি আমাদের (কার্যকলাপের) দ্বারা যেন তাঁর পরিপূর্ণ প্রকাশ্য পরিচয় পাও এবং তাঁর মাধ্যমেও আমাদের প্রকাশ্য পরিচয় পাও। কেননা, তিনি মোমেনদের প্রতি রউফ এবং রাহীম। তাঁর প্রতি ঈমান আনার বিনিময়ে আমরা কিছুই প্রতিদান চাইনা এবং তাঁর নাম ভাঙ্গায়েও আমরা কখনও দুনিয়ার কোন স্বার্থ হাসিল করতে চাইনা"। কাতারে দাঁড়ানো লোকজন শুধু আমীন আমীন বলেছেন। তাঁরা বের হয়ে যাওয়ার পর অন্য একদল প্রবেশ করতেন। এভাবে প্রথমে পুরুষগণ, তারপর মহিলাগণ, তারপর শিশুগণ ক্রমান্বয়ে প্রবেশ করে সালাম ও দুরূদ পেশ করেছেন। (আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া কৃত ইবনে কাছির ৫ম খন্ড ২৬৫ পৃষ্ঠা)।

মঙ্গলবার দিন গোসল ও কাফনের পর হতে মধ্যরাত পর্যন্ত এভাবেই পালাক্রমে দুরূদ ও সালামের অনুষ্ঠান চল্‌তে থাকে।

–সুতরাং নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হলো যে, ইমাম বিহীন এবং চার তাকবীর বিহীন শুধু দুরূদ, সালাম ও মুনাজাতের মাধ্যমেই জানাযার কাজ সমাধা করা হয়েছে।

অন্যদের বেলায় প্রচলিত জানাযার নিয়ম নবীজীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এরূপ করার অন্য একটি কারণ এও ছিল যে, নবী করিম (দঃ) ইন্‌তিকাল করলেও তাঁর সাথে রুহ্ মোবারকের যোগাযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি। তাই তিনি ইন্‌তিকাল অবস্থায়ও ঠোঁট মোবারক নেড়ে নেড়ে ইয়া উম্মাতী! ইয়া উম্মাতী! বলে কেঁদেছিলেন। এজন্যই একথার উপর সকলে একমত পোষণ করেছেন যে, "নবী করিম (দঃ) হায়াতুন্নবী-জিন্দা নবী। এই ইজমার অস্বীকারকারী কাফির"। তাই তাঁর জানাযা হয়নি–শুধু সালাম ও দরূদ পড়া হয়েছে।

উক্ত হায়াত বরযখী- না দুনিয়াবী-এ নিয়ে ইখতিলাফ থাকলেও শেষ সমাধান হলো–দুনিয়াবী হায়াতেই তিনি জীবিত আছেন। (আদিল্লাতু আহলিস সুন্নাহ, শিফাউস সিক্বাম, ফত্‌হুল বারী শরহে বোখারী, দ্বারু কুত্‌নী, জাআল হক, খলীল আহমদ আম্বেটীর প্রতারণামূলক গ্রন্থ 'আত তাস্‌দীকাত' এ বলা হয়েছে–নবীজী দুনিয়ার হায়াতে রওযা পাকে শুয়ে আছেন)। দাফনের অধ্যায়ে হায়াতুন্নবীর প্রামাণ্য দলীল সামনেই উল্লেখ করা হবে– ইন্‌শা আল্লাহ!

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

দাফন কার্য ঃ রওযা মোবারক ঃ

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) বলেন–

تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَدُفِنَ لَيْلَةَ الْاَرْبِعَاءِ -

অর্থ–**"রাসুল করিম (দঃ) সোমবার দিন ইন্তিকাল করেন এবং বুধবারের পূর্ব রাত্রে তাঁকে দাফন করা হয়"** (বায়হাকী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল)। এটাই বিশুদ্ধ মত। মঙ্গলবার দিন পবিত্র গোসলকার্য ও কাফন অনুষ্ঠান শেষে সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর নেতৃত্বে দুরূদ ও সালাম এবং দোয়া-মুনাজাত অনুষ্ঠানের পর পালাক্রমে পুরুষ, নারী ও শিশুগণ হুজরা মোবারকে প্রবেশ করে অনুরূপভাবে দুরূদ-সালাম ও দোয়া মুনাজাত করতে থাকেন। এই অনুষ্ঠান মঙ্গলবার দিবাগত মধ্যরাত্রি পর্যন্ত চালু থাকে। তারপর রওযা মোবারকে পবিত্র দেহ মোবারক স্থাপন করা হয়।

প্রথমে রওযা মোবারকে নবী করিম (দঃ)-এর একখানা লাল ইয়ামানী চাদর বিছানো হয়, যা তিনি সচরাচর পরিধান করতেন। এ চাদরখানা তিনি জঙ্গে হোনাইনে (৮ম হিজরী) গণিমতের মাল হিসাবে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। নবী করিম (দঃ) এ চাদরখানা তাঁর রওযা মোবারকে বিছিয়ে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়ে গেছেন। হযরত হাসান (রাঃ) বলেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْرِشُوْا لِيْ قَطِيْفَةً
فِيْ لَحْدِيْ فَاِنَّ الْاَرْضَ لَمْ تُسَلَّطْ عَلٰى اَجْسَادِ الْاَنْبِيَاءِ -

অর্থ–**"রাসুল করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন– তোমরা আমার রওযা মোবারকে আমার সম্মানে একখানা চাদর বিছিয়ে দিও। কারণ, এই জমিন নবীগণের শরীর মোবারক নষ্ট করতে পারে না বা বদন মোবারকে প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে না"** (বেদায়া পৃষ্ঠা ২৬৯)। ওয়াকিদী বলেন–

كَانَ هٰذَا خَاصًّا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ رَوَاهُ اِبْنُ عَسَاكِرٍ -

অর্থ–**"চাদর বিছানোর এই ব্যবস্থা শুধু নবী করিম (দঃ)-এর জন্যই খাস" (ইবনে আছাকির)**। কেননা, তিনি রওযা মোবারকে চিরদিন জীবিত থাকবেন।

রওযা মোবারকের স্থান নির্ধারণ নিয়ে প্রথমে বিভিন্ন মতামত দেয়া হয়। কেহ বলেন– জান্নাতুল বাক্বীতে দেওয়া হোক-কেননা সেখানে অধিক দোয়া-

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ইস্‌তিগফার করা হয়। কেউ কেউ মন্তব্য করেন– মিম্বার শরীফের কাছে রওযা করা হোক। আবার কেউ কেউ বলেন– বরং নবী করিম (দঃ)-এর মিহ্‌রাবে নামাযের স্থানেই কবর শরীফ করা হোক। প্রকৃত অবস্থা তাঁদের তখনও জানা ছিলনা। এমন সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) আসলেন এবং এর সমাধান এভাবে দিলেন–

إنّ عِندِي مِنْ هذا خَبَرًا وَعِلْمًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا قُبِضَ نَبِيٌّ إِلَّا دُفِنَ حَيْثُ تُوُفِّي (بَيْهقى)

অর্থ–"এ ব্যাপারে আমার কাছে একটি সঠিক সংবাদ ও তথ্য আছে। তা হলো– আমি স্বয়ং নবী করিম (দঃ) কে বলতে শুনেছি যে, নবীগণ যেস্থানে ইন্‌তিকাল করেন, সেখানেই তাঁদের দাফন করা হয় (বায়হাকী)"।

তারপর হযরত আবু বকর এভাবে নির্দেশ দিলেন–

فَأَخِّرُوْا فِرَاشَهُ وَحَفَرُوْا تَحْتَ فِرَاشِهِ -

অর্থ–"তোমরা নবী করিম (দঃ)-এর বিছানা মোবারক সরিয়ে নিয়ে যাও এবং সেস্থানেই রওযা শরীফ তৈরী করো" (ইমাম আহমদ)।

সিদ্ধান্ত মোতাবেক নবী করিম (দঃ) কে খাটে উঠিয়ে গোসল দেয়ার জন্য অন্য পার্শ্বে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বিছানার স্থানে রওযা মোবারক প্রস্তুত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। একাজের জন্য মক্কাবাসী আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ্ (রাঃ) এবং মদিনাবাসী আবু তাল্‌হা যায়েদ ইবনে সাহ্‌ল (রাঃ) কে অনুসন্ধান করার জন্য হযরত আব্বাস (রাঃ) দু'জন লোক পাঠান। মদিনাবাসী আবু তালহা সাহাবীকে প্রথম পাওয়া গেল। সুতরাং তিনি এসে মদিনা শরীফের নিয়মে বগলী বা সিন্ধুকী রওজা শরীফ তৈরী করেন।

তিন চাঁদের স্বপ্ন ঃ

এ প্রসঙ্গে বায়হাকী শরীফে বর্ণিত সাঈদ ইবনে মোসাইয়েব তাবেয়ী (রহঃ)-এর একখানা রেওয়ায়াত উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন–হযরত আয়েশা (রাঃ) একদিন স্বপ্নে দেখেন– তিনটি চাঁদ তাঁর কোলে পতিত হয়। এ ঘটনা পিতা আবু বকর (রাঃ) কে জানালে তিনি মন্তব্য করেন– "যদি তুমি সত্যই এ স্বপ্ন দেখে থাকো, তাহলে এর অর্থ হচ্ছে– তোমার গৃহে পৃথিবীর তিনজন শ্রেষ্ঠ মানবের মাযার শরীফ হবে। যখন নবী করিম (দঃ)-এর ইন্‌তিকাল হয়, তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত আয়েশাকে লক্ষ্য করে বলেন– يا عائشة هذا خير اقمارك

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

অর্থ-“**হে আয়েশা! তোমার স্বপ্নে দেখা তিন চাঁদের মধ্যে ইনিই হচ্ছেন প্রথম সর্বোত্তম চাঁদ**”। (বায়হাকী সূত্রে বেদায়া ও নেহায়া পৃষ্ঠা ২৬৮)। পরবর্তীতে আরো দুই চাঁদের মাযার হয় সেখানে-অর্থাৎ হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ)।

বেদনা বিধুর মূহুর্ত ঃ

মঙ্গলবার দিবাগত মধ্যরাত ক্রমেই ঘনিয়ে আস্‌ছে। উম্মাহাতুল মোমেনীনগণ এবং হযরত ফাতেমা (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর হুজরার অপর অংশে কান্নারত ছিলেন। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন-

بَيْنَمَا نَحْنُ مُجْتَمِعُوْنَ نَبْكِىْ لَمْ نَمْنْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ بُيُوْتِنَا وَنَحْنُ نَتَسَلُّ بِرُؤْيَتِهٖ عَلَى السَّرِيْرِ اِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ الْكَرَّارِيْنَ فِى السَّحَرِ فَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ فَصِحْنَا وَصَاحَ اَهْلُ الْمَسْجِدِ فَارْتَجَّتِ الْمَدِيْنَةُ صَيْحَةً وَّاحِدَةً وَاَذَّنَ بِلَالٌ بِالْفَجْرِ (وَاقِدِىْ)

অর্থ-“**আমরা বিবিগণ একত্রিত হয়ে কান্নাকাটা করছিলাম। রাত্রে আমাদের নিদ্রা হয়নি। নবী করিম (দঃ) আমাদের ঘরেই ছিলেন। আমরা নবী করিম (দঃ) কে খাটের উপর শয়নরত অবস্থায় দেখে মনকে এই বলে প্রবোধ দিচ্ছিলাম যে, তিনি তো আমাদের মাঝেই আছেন। ভোরের দিকে ক্রন্দনরত লোকদের কান্নার আওয়ায শুনতে পেলাম। উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন- আমরাও চিৎকার দিয়ে উঠলাম এবং মসজিদে অবস্থানরত শোকাতুর লোকেরাও চিৎকার দিয়ে উঠলো। সকলের কান্নার রোল মিলে মদিনার জমিন থর থর করে কেঁপে উঠলো। এমন সময়ই হযরত বেলাল (রাঃ) ফজরের আযান দিলেন**”। এটা ছিল দাফনের শেষ পর্যায়ের ঘটনা।

হাদীসঃ “যে আমার রওযা মোবারক যিয়ারত করবে, তার জন্য শাফাআত করা আমার উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে” (দারুকুত্‌নী)। হুযুর (দঃ)-এর রওযা মোবারক হচ্ছে আরশের চেয়েও উত্তম এবং রওযা মোবারক হতে মিম্বার শরীফ পর্যন্ত মধ্যখানের জায়গাটুকু হচ্ছে “রিয়াদুল জান্নাত” অর্থাৎ বেহেস্তের বাগান। নামাযে যাতায়াত কালীন সময়ে হুযুরের চরণধুলি পাওয়ার কারণে যদি স্থানটির এই মর্তবা হয়, তাহলে রওযা আত্‌হারের মর্যাদা কী হতে পারে? মুলকথা- বদন মোবারকের বরকতে রওযা পাকের মাটি আরশ হতেও উত্তম হয়েছে এবং কদম মোবারকের বরকতে মধ্যবর্তী স্থানটি রিয়াদুল জান্নাতে পরিণত হয়েছে।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ষাটতম অধ্যায়

হায়াতুন্নবী (দঃ)

প্রসঙ্গ ঃ রওযা মোবারকে পবিত্র দেহ স্থাপন এবং রূহ মোবারক ফেরতদান, তিনি হায়াতুন্নবী (দঃ) ঃ

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ)-এর হুজরার মধ্যে রওযা মোবারক তৈরী করা হয়। হযরত আলী (রাঃ), হযরত আব্বাস (রাঃ), হযরত ফযল ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং নবী করিম (দঃ)-এর আশ্রিত খাদেম হযরত সালেহ (রাঃ)-এই চারজন সাহাবী নবী করিম (দঃ) কে রওযা মোবারকে নামান। হযরত আব্বাস (রাঃ) দেখতে পেলেন-কাফনের ভিতরে হুযুর (দঃ)-এর ঠোঁট মোবারক নড়ছে-তিনি জীবিত। তিনি কান লাগিয়ে শুনতে পেলেন- নবী করিম (দঃ) **"রাব্বি হাব্‌লী উম্মতি"** বলে কাঁদছেন। ইমাম বায়হাকীর সূত্রে ইমাম তকিউদ্দিন সুব্‌কি রেওয়ায়াত করেন ঃ

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا دُفِنَ فِيْ قَبْرِهِ رَدَّ اللّٰهُ رُوْحَهُ وَاسْتَمَرَّتِ الرُّوْحُ فِيْ جَسَدِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِيَرُدَّ عَلَى مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ (شِفَاءُ السِّقَامِ فِيْ زِيَارَةِ خَيْرِالْأَنَامِ لِلْعَلَّامَةِ تَقِيِّ الدِّيْنِ سُبْكِيْ رح)

অর্থ-**"রাসুল মকবুল (দঃ) কে রওযা মোবারকে দাফন করার পরপরই আল্লাহ তায়ালা তাঁর রূহ মোবারককে ফেরত পাঠিয়ে দেন এবং রূহ মোবারক দেহ মোবারকের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত সবসময় অবস্থান করতে থাকবে- যাতে তিনি উম্মতের সালামের জবাব দিতে পারেন"** (ইমাম তকিউদ্দীন সুবুকী (৬২৭ হিঃ) কৃত সিফাউস সিকাম ফী যিয়ারাতে খাইরিল আনাম)।

<u>বিঃ দ্রঃ</u> ইব্‌নে তাইমিয়া কর্তৃক নবী করিম (দঃ)-এর রওযা মোবারক যিয়ারতের সফরকে শির্ক বলে ফতোয়া প্রদানের বিরুদ্ধে এবং যিয়ারত যে নৈকট্য লাভের শ্রেষ্ঠতম উপায়-সে সম্পর্কে সুবুকীর এই গ্রন্থখানা রচিত হয়। ইবনে তাইমিয়া (৭২৮ হিঃ) ছিল ওহাবী সম্প্রদায়ের মূল পূর্বগুরু। পরবর্তী গুরু হলো ইবনে কাইয়েম (৭৫১ হিঃ)। এর পরবর্তী গুরু ইবনে ওহাব নজদী (১২০৬ হিঃ)। তার পরবর্তী ওহাবী গুরু ঈসমাঈল দেহলভী (১২৪৬ হিঃ)। তার পরবর্তী গুরু

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

কাছেম নানুতবী, গাঙ্গুহী, থানবী প্রমুখ ওহাবী নেতা। ইমাম তকিউদ্দিন সুবকী (রহঃ) ছিলেন সে যুগের (৭৫১) সুন্নী ইমাম। তাঁর লিখিত শিফাউস সিকাম গ্রন্থখানা খুবই তথ্যবহুল ও হাদীস নির্ভর।

উপরে বর্ণিত ইমাম বায়হাকী (রহঃ)-এর রেওয়ায়াতখানা একথাই প্রমাণ করে যে, নবী করিম (দঃ)-এর রুহ্ মোবারক সোমবার দ্বিপ্রহরের কিছু পূর্ব হতে মঙ্গলবার মধ্যরাত পর্যন্ত প্রায় ৪০ ঘন্টা দেহ মোবারক থেকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে পৃথক থাকার পর ঐ রাত্রেই পুনরায় ফেরত দান করা হয়। কাজেই নবী করিম (দঃ) এখন সশরীরে রওযা মোবারকে হায়াতুন্নবী হিসাবে জীবিত আছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকবেন।

এই পবিত্র জীবন ও হায়াত দুনিয়াবী হায়াত। দেওবন্দী আলেম খলীল আহ্মদ আম্বেটী তার প্রতারণামূলক 'তাস্দীকাত' গ্রন্থে মক্কা মদিনার আলেমদের নিকট প্রতারণা করে স্বীকার করেছে যে, "নবী করিম (দঃ) দুনিয়াবী হায়াতের সাথেই রওযা মোবারকে জীবিত আছেন এবং ইহাই দেওবন্দের আক্বিদা। এই অর্থেই তিনি হায়াতুন্নবী (দঃ)"। খলিল আহ্মদ আম্বেটীর এই দাবী প্রতারণামূলক–কেননা ওহাবীপন্থী ইসমাইল দেহ্লভী তাক্ভিয়াতুল ঈমান গ্রন্থে বলেছে– "নবী করিম (দঃ) মরে-পঁচে-গলে মাটির সাথে মিশে গিয়েছেন" (নাউজুবিল্লাহ্)। (তাকভিয়াতুল ঈমান পৃষ্ঠা-৬০)। বাংলাদেশে ইসমাইল দেহ্লভীর অনেক অনুসারী আছে। তারাও হায়াতুন্নবী বিশ্বাস করেনা।

অথচ দেওবন্দেরই হেড মোহাদ্দেস শাহ্ আন্ওয়ার কাশ্মিরী তাঁর রচিত ফয়জুল বারী শরহে বোখারী ১ম খন্ডে ১ম পারায় উল্লেখ করেছেন–

اِتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلٰى حَيَاتِ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ -

অর্থ–"পূর্ব জামানার সমস্ত ওলামাগণের ঐকমত্য হচ্ছে নবী করিম (দঃ) সশরীরে জীবিত এবং অন্যান্য নবীগণও"। একারণেই তাঁর দেওবন্দের চাকুরী চলে যায়।

রাসূল মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–"যে কোন মুসলমান যে কোন স্থান থেকে আমাকে ছালাম জানায়–আল্লাহ তায়ালা আমার রূহানী তাওয়াজজুহ্ তার দিকে ফিরিয়ে দেন। অতঃপর আমি তার ছালামের জবাব দেই"– (আবু দাউদ ও মিশকাত)

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

বুঝা গেল–দুনিয়ার সব সালাম পাঠকারীর সালাম তিনি একসাথে শুনতে পারেন এবং একসাথে জবাবও দিতে পারেন। জালালুদ্দীন সুয়ুতি আল–হাভী গ্রন্থে নবী করিম (দঃ) কর্তৃক রওযা মোবারক থেকে ৫টি দায়িত্ব পালনের কথা উল্লেখ করেছেন। **যথা ঃ "উম্মতের যাবতীয় আমল প্রত্যক্ষ করা এবং অলী-আল্লাহদের জানাযায় শরিক হওয়া"**। ওয়াহাবী নেতা ইবনে কাইয়েম রচিত "জ্বালাউল আফহাম" নামক গ্রন্থে একখানা হাদীস এরূপ বর্ণিত হয়েছে **"আনা আছমাউ ছালাতাকুম আলাইয়া বিলা ওয়াছিতাতিন"**–অর্থাৎ–**"আমি ফিরিস্তাদের মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি তোমাদের সালাম শুনতে পাই"। (মুল নোছখা)**

বুঝা গেল–নবী করিম (দঃ) সদা জাগ্রত এবং প্রেমিকদের সালাম সরাসরি শুনেন। ফিরিস্তাগণ তাদের ডিউটি হিসাবে পরে তা পৌঁছান। মোহাদ্দেসীনগণ এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন–**"মহব্বতের সালাম তিনি নিজে শুনেন এবং মুখের সালাম ফিরিস্তারা পৌঁছায়** (সূত্র ঃ জাআল হক)।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

একষট্টিতম অধ্যায়

রওযা মোবারক-বনাম-আরশ মোয়াল্লা

প্রসঙ্গ ঃ রওযা মোবারকের মাটি উত্তম– নাকি আরশ উত্তম?

নবী করিম (দঃ)-এর পবিত্র দেহ স্পর্শকারী রওযা মোবারকের মাটি আসমান-জমীন, কা'বা, আরশ, কুরছি, লাওহ্-কলম– সব কিছুর চেয়েও উত্তম। ফতোয়া শামী ৩য় খন্ড যিয়ারত অধ্যায়ে ফতোয়া দেয়া হয়েছে এভাবে ঃ

إِنَّ التُّرْبَةَ الَّتِي اتَّصَلَتْ إِلَى أَعْظُمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ حَتَّى الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ -

অর্থ–**"রওযা মোবারকের যে মাটি নবী করিম (দঃ)-এর দেহ মোবারকের সাথে লেগে আছে, তা আসমান জমীন-এমনকি আরশ আযীম হতেও উত্তম"**। (শামী, যিয়ারত অধ্যায়)। রওযা মোবারকই যদি সর্বোত্তম হয়, তাহলে শরীর মোবারকের অবস্থা কি হতে পারে? এটা বলার অপেক্ষা রাখেনা (দেখুন মাওয়াহেব ৪র্থ খন্ড ৬০২ পৃষ্ঠা)।

এ আক্বিদা চার মাযহাবের ইমামগণ ঐক্যবদ্ধভাবে পোষণ করে থাকেন। এ আক্বিদার উপর চার মাযহাবের ইজ্‌মা প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং রওযা মোবারক খানায়ে কা'বা ও আরশ মোয়াল্লা হতেও উত্তম। ইহাই সুন্নি আক্বিদা। এ সম্পর্কে অসংখ্য কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। (মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া ৪র্থ খন্ড ৬০২ পৃষ্ঠা)।

হুযুর (দঃ)-কে রওযা শরীফে স্থাপন করে তারপর রওযা মোবারকের উপরিভাগ ৯ খানা কাঁচা ইটের ব্লক দিয়ে বন্ধ করা হয়। ইমাম বায়হাকী বলেন–

إِنَّهُ نُصِبَ عَلٰى لَحْدِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ تِسْعُ لَبِنَاتٍ -

অর্থ–**"নবী করিম (দঃ)-এর রওযা মোবারকের উপরিভাগ নয়খানা কাঁচা ইট দ্বারা বন্ধ করা হয়"**। নবী করিম (দঃ)-এর রওযা মোবারক পূর্ব পশ্চিমে করা হয়। মাথা মোবারক পশ্চিম দিকে রেখে দক্ষিণ দিকে কেব্‌লা মুখী করে শোয়ানো হয়। عَطِّرِ اللّٰهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرِيْمَ بِعَرْفٍ شَذِيٍّ مِّنْ صَلٰوةٍ وَّتَسْلِيْمٍ -

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

হুযুর (দঃ)-এর আড়াই বৎসর পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) ইন্তিকাল করলে তাঁকেও উক্ত হুজ্‌রা মোবারকে নবী করিম (দঃ)-এর বাম ও উত্তর পার্শ্বে হুযুরের কাঁধ বরাবর দাফন করা হয়। আরো দশ বৎসর পর হযরত ওমর (রাঃ)-কে হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর উত্তর ও বাম পার্শ্বে দাফন করা হয়। নবী করিম (দঃ)-এর কাঁধ বরাবর হলো হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর মাথা এবং হযরত আবু বকরের কাঁধ বরাবর হলো হযরত ওমরের মাথা। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) স্বপ্নে যে তিনটি চন্দ্র তাঁর কোলে পতিত হতে দেখেছিলেন-তাঁর সে স্বপ্ন তিন রওযা মোবারকের মাধ্যমে বাস্তবে পরিণত হলো। আল্লাহ পাক সকলকে আরশে মোয়াল্লার চেয়েও উত্তম স্থান রওযা মোবারক দর্শন করার সৌভাগ্য নসিব করুন। আমিন!

عرش سے زیادہ رتبہ روضہ رسول اللہ کا

اسی روضہ انوار پہ غلاموں کے لاکھوں سلام-

আরশ হতে অধিক উত্তম দয়াল নবীর রওযা পাক,
সে রওযাতে গোলামদেরই লক্ষ কোটি ছালাম যাক।

লেখক।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

বাষট্টিতম অধ্যায়

হায়াতুন্নবীর চাক্ষুস প্রমাণ

প্রসঙ্গ ঃ মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ ও রওযা মোবারককে মসজিদের ভিতরে আনয়ন ঃ হযরত ওমর (রাঃ)-এর পা এবং রাসুলুল্লাহ্ (দঃ)-এর হাত মোবারক প্রকাশ।

৮৬ হিজরী সনের ঘটনা ঃ

৮৬ হিজরী সনে উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিক-এর যুগে মসজিদে নববী দ্বিতীয়বার সম্প্রসারিত হয়। তখন মদিনার গভর্ণর ছিলেন হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযিয (রাঃ)। তিনি যাজান নামক এক কারিগরের দ্বারা মসজিদে নব্বীর সম্প্রসারণ কাজ সমাধা করেন। তিনি মসজিদকে পূর্বদিকে সম্প্রসারণ করে রওযা মোবারককে মসজিদের ভিতরে নিয়ে আসেন।

সেসময়ে একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছিল–রওযা মোবারকের এক দিকের দেয়াল ঐ সময় ভেঙ্গে যায়। রওযা মোবারকের ভিতর থেকে একখানা পা মোবারক দৃষ্টিগোচর হয়। উপস্থিত সকলে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন এ কথা ভেবে যে, হয়তো বা উহা নবী করিম (দঃ)-এর কদম মোবারক হবে। কিন্তু উপস্থিত হযরত উরওয়াহ্ ইব্নে যোবাইর (রাঃ) অনুসন্ধান করে বললেন– ইহা হযরত ওমর (রাঃ)-এর কদম মোবারক–রাসুলুল্লাহ্‌র নয়। সুব্হানাল্লাহ! ২৩ হিজরীতে হযরত ওমর (রাঃ) শহীদ হন। ৮৬ হিজরীতে এসেও তাঁর কদম মোবারক তরতাজা ছিল। মূলতঃ শহীদগণ অমর।

৫০৯ ও ৫৫৭ হিজরী সনের ঘটনা ঃ

অনুরূপভাবে ৫০৯ হিজরী সালে এবং ৫৫৭ হিজরীতে যথাক্রমে হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) ও সাইয়েদ আহমদ রেফায়ী (রাঃ) মদিনা শরীফে যিয়ারতকালে তাঁদের ফরিয়াদে জিন্দা নবী রাসুলে করিম (দঃ)-এর ডান হাত মোবারক রওযা শরীফ থেকে উপরে উঠে আসে এবং তাঁরা হস্ত মোবারক চুম্বন করেন (বাহ্জাতুল আসরার, নুজহাতুল খাতির, হুসনুল মাকাসিদ–প্রভৃতি গ্রন্থ)। নবীগণ এবং অলীগণ কবরে যিন্দা থাকেন-তার বাস্তব প্রমাণ উক্ত তিনটি ঘটনা। জালালুদ্দীন সূয়ুতির হুসনুস মাকাসিদ, আবুল হাসান শাত্নুফীর বাহ্জাতুল আসরার ও মোল্লা আলী ক্বারীর নুজ্হাতুল খাতির গ্রন্থের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে কারো কোন সন্দেহ থাকতে পারেনা। অধমের রচিত কারামাতে গাউসুল আযম (রাঃ) গ্রন্থে হুযুরের হাত উত্তোলনের আরবী দলীল দেখুন।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

তিষট্টিতম অধ্যায়

হযরত ফাতেমা (রাঃ)—এর আহাজারী

প্রসঙ্গ ঃ হযরত ফাতেমা (রাঃ) ও খিযির আলাইহিস সালামের শোক প্রকাশ, ফাতেমার বিলাপ ঃ

নবী করিম (দঃ)-এর ইন্তিকালের পর হযরত ফাতেমা (রাঃ) এভাবে শোক প্রকাশ করেছিলেন— **"হায় আব্বাজান! আপনি আল্লাহর ডাকে প্রস্থান করেছেন। হায় আব্বা— জান্নাতুল ফেরদাউস আপনার আবাসস্থল। হায় আব্বা! ইন্তিকালের সময়ে জিবরাইলের সাথে তো আপনি গোপনে কথা বলেছিলেন"। যখন নবী করিম (দঃ) কে দাফন করা হয়, তখন বিবি ফাতেমা (রাঃ) আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) কে লক্ষ্য করে কেঁদে কেঁদে বলেন— "হে আনাস! রাসূলে খোদার উপর মাটি স্থাপন করে কি তোমাদের হৃদয় এবার শান্ত হয়েছে"?** (বোখারী-সূত্র আনাস (রাঃ)।

ফিরিস্তার সান্তনা বাণী ঃ

ইমাম বায়হাকীর একটি দীর্ঘ হাদীস ইবনে কাছির তার আল-বেদায়া গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে যে, "নবী করিম (দঃ) অসুস্থ হওয়ার পর ফেরেস্তাগণ দলে দলে এসে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। ইন্তিকালের দিন হযরত জিব্রাইল (আঃ)-এর সাথে একজন ফিরিস্তা আসলেন। তাঁর নাম ইসমাঈল (আঃ)। তাঁর সাথে ছিল একলক্ষ ফেরেস্তা—আবার প্রত্যেকের সঙ্গে ছিলেন একলক্ষ ফেরেস্তা। এভাবে এক হাজার কোটি ফিরিস্তা অনুমতি নিয়ে হযরত জিব্রাইল (আঃ) সহ হুযুরের হুজরা মোবারকে প্রবেশ করেন। অতঃপর জিব্রাইল (আঃ) বললেন— ইয়া রাসুলাল্লাহ! মালাকুল মউত আপনার জান কব্য করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করছেন। আপনার পূর্বে তিনি কারো অনুমতি প্রার্থনা করেননি এবং আপনার পরেও কারো অনুমতি প্রার্থনা করবেননা। নবী করিম (দঃ) বললেন— আসতে বলো। আযরাইল (আঃ) প্রবেশ করে নবী করিম (দঃ) কে সালাম দিয়ে আরয করলেন— "হে প্রিয় মোহাম্মদ (দঃ)! আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে আপনার খেদমতে এই নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন যে, যদি আপনি জান কব্য করার অনুমতি দেন, তাহলেই যেন আমি রূহ মোবারক কব্য করি। আর যদি নিষেধ করেন— তাহলে যেন ফিরে যাই"। নবী করিম (দঃ) জিজ্ঞাসা করলেন— হে মালাকুল মউত! তুমি কি রুহ কব্য করার ইচ্ছা করো? আযরাইল

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

বললেন– "হাঁ। আমি একাজ করতে আদিষ্ট হয়েছি। তবে আমাকে এ নির্দেশও দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন আপনার নির্দেশের আনুগত্য করি"।

নবী করিম (দঃ) জিবরাইলের দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টি দিলেন। হযরত জিব্রাইল (আঃ) বললেন– হে প্রিয় মোহাম্মদ (দঃ)! আল্লাহ তায়ালা আপনার দীদারের প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হয়ে আছেন। একথা শুনে নবী করিম (দঃ) আযরাইলকে বললেন– "নির্দেশ মোতাবেক তোমার কাজ সমাধা করো"। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন!

হযরত খিযিরের শান্তনা বাণী ঃ

যখন নবী করিম (দঃ) ইন্তিকাল করলেন, তখন চতুর্দিক থেকে কান্নার রোল ভেসে আসলো এবং শোকের ছায়া নেমে আস্লো। ঐ সময় সকলে হুযুরের ঘরের এক কোণ থেকে একটি আওয়ায শুনতে পেলেন–"আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহ্‌লাল বাইত; ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রত্যেক মসিবতে শান্তনা একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতে"।

"হযরত আলী (রাঃ) অন্যদেরকে বললেন–ইনি কে–আপনারা কি জানেন? ইনি হচ্ছেন খিযির আলাইহিস সালাম"। এটা ছিল হযরত আলীর কারামত।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন–"নবী করিম (দঃ)-এর ইন্তিকালে সাহাবায়ে কেরাম তাঁর চারপাশে বসে কান্নাকাটি করছিলেন। এমন সময় উজ্জ্বল চেহারা ও সাদা দাঁড়ি বিশিষ্ট একজন লোক ঘরে প্রবেশ করে কেঁদে ফেললেন এবং উপস্থিত সাহাবীদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন– প্রত্যেক মুসিবতে আল্লাহর হাতেই শান্তনা"। একথা বলেই তিনি চলে গেলেন। লোকেরা একজন অপরজনকে জিজ্ঞাসা করলেন– তাঁকে চিনেন কিনা? হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) বললেন– হাঁ! চিনি–ইনি রাসুল পাক (দঃ)-এর সজাতি ভাই হযরত খিযির (আঃ)। (আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া ৫ম খন্ড ২৭৭ পৃষ্ঠা)।

হে আল্লাহ! তুমি সকলকে হোব্বে রাসুল ও দীদারে রাসুল নসীব করো। ওয়া ছাল্লাল্লাহু আলা খাইরি খালক্বিহী ওয়া নূরে যাতিহী ওয়া জীনাতি ফারশিহী সাইয়েদিনা ওয়া মাওলানা মোহাম্মাদিও ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাঈন। আমিন!

(পান্ডুলিপি লেখার কাজ মধ্য মার্চ '৯৫ থেকে শুরু করে ১৪ই নভেম্বর '৯৫ মঙ্গলবার সমাপ্ত)।

খাদেমুল ইলম
হাফেয মুহাম্মদ আবদুল জলিল

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

সংযোজনী-১

নবী করিম (দঃ)-এর কতিপয় একক মর্যাদা

নবী করিম (দঃ)-এরশাদ করেছেন– "আমাকে আল্লাহ তায়ালা পাঁচটি বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন- যা আমার পূর্বে কোন নবীকেই দান করেননি"। তা হচ্ছে–

১। আমাকে ব্যাপক অর্থবোধক সংক্ষিপ্ত কালাম করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

২। প্রত্যেক নবী তাঁদের স্বজাতির প্রতি প্রেরিত, কিন্তু আমি নিখিল বিশ্বনবী।

৩। আমার পূর্বে যুদ্ধলব্ধ গণিমতের মাল হালাল ছিল না। কিন্তু আমার উম্মতের জন্য তা হালাল।

৪। আমার উম্মতের জন্য সমগ্র জমিনকেই সিজদার উপযুক্ত করে দেয়া হয়েছে এবং পানির অভাবে অযু গোসলের পরিবর্তে মাটি দ্বারা তৈয়ম্মুম করার অনুমতিও দেয়া হয়েছে।

৫। এক মাসের দূরত্বে আমার নামের ভয়-ভীতি সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে। (মিশকাত)

৬। আমাকে সবার জন্য শাফাআত করার অধিকার দেয়া হয়েছে। – (বোখারী শরীফ)

৭। আরশ-কুরছি, লওহ-কলম, আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য সব মাখলুক নবীজীর নূরে পয়দা আর তিনি পয়দা স্বয়ং আল্লাহর যাতী নূর হতে। মুসান্নাফ – হযরত জাবের (রাঃ)

৮। আরশে আযীমে আল্লাহর নামের সাথে শুধু নবী করিম (দঃ)-এর নাম মোবারক অঙ্কিত। – কানযুল ওম্মাল

৯। তিনি নির্মল ও পাক পবিত্র অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করেছেন। – ইবনে ছাআদ

১০। শিশুকালে চাঁদের সাথে তিনি কথা বলতেন ও খেলা করতেন। – আব্বাস (রাঃ)

১১। খররৌদ্রতাপে মেঘমালা তাঁকে ছায়া দিত। – আবু নোয়াইম

১২। কোরআন মজিদে হুযুর (দঃ)-এর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিবরণ। – আল-কোরআন

১৩। তিনি সামনে, পিছনে, দিনে ও রাত্রে সমান দেখতেন। –বুখারী, বায়হাকী

১৪। তিনি নিদ্রাবস্থায়ও সবকিছু দেখতেন ও শুনতেন। –বোখারী

১৫। হুযুর (দঃ)-এর ঘাম মোবারক মেশ্‌ক-এর চেয়েও বেশী সুগন্ধ ছিল। – আবু নোয়াইম

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

১৬। তাঁর দেহ মোবারকের ছায়া ছিল না। কেননা, তিনি ছিলেন আপাদমস্তক নূর। – তাফসীরে কবীর ও শিফা শরীফ

১৭। মি'রাজ রজনীতে সশরীরে ও সচক্ষে আল্লাহর দীদার লাভ। বিশ্ব জগত তাঁর পদতলে। তিনি লা-মাকানের বাসিন্দা। – বোখারী ও মুসলিম এবং মুসান্নাফ

১৮। নবীগণের মধ্যে একমাত্র তিনিই উম্মী (সৃষ্টির মূল) উপাধী প্রাপ্ত। – রুহুল বয়ান

১৯। সমস্ত ধনভান্ডার ও ইলমে গায়েব-এর চাবি তাঁর অধিকারে। – মাওয়াহিব

২০। তিনি পঁয়ষট্টি হাজার মোজেযার অধিকারী। অন্যান্য নবীগণ অনধিক নয়টির অধিকারী। – পয়গামে মোহাম্মদী

২১। সমস্ত নবীগণের সম্মিলিত উম্মতের চেয়ে হুযুর (দঃ)-এর উম্মত বেশী। – সুরা কাউছার

২২। সমস্ত নবীগণকে নাম ধরে সম্বোধন, কিন্তু হুযুর (দঃ) কে তাঁর উপাধী ধরে সম্বোধন করা হয়েছে। – আল-কোরআন

২৩। সকল নবী আল্লাহর প্রেমিক, কিন্তু আল্লাহ হলেন নবীজীর প্রেমিক। তিনি একাধারে খলিলুল্লাহ ও হাবীবুল্লাহ (আল্লাহর প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ)। – মাওয়াহিব

২৪। তিনি ভুল-ত্রুটি হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। – দিওয়ানে হাসসান ও বায়যাভী

২৫। কবরে শুধু হুযুর (দঃ)–এর পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হবে-অন্য কোন নবীর পরিচয় নয়। – তাফসীরে নাঈমী ও মাওয়াহিব

২৬। শয়তান নবী করিম (দঃ)-এর সুরত ধারণ করতে পারেনা। – মেশকাত ও বুখারী

২৭। রাসুল (দঃ)-এর সকল সাহাবী আদেল ও নির্ভরযোগ্য। – মাওয়াহিব

২৮। শরীয়তের বিধানে বিশেষ ব্যক্তির জন্য তিনি বিশেষ ধরনের বিধান নির্ধারনের এখতিয়ার প্রাপ্ত। যেমন– সাহাবী খোযায়মার সাক্ষী দু'জনের সমান, হযরত ফাতেমার উপর অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা হযরত আলীর জন্য হারাম ঘোষণা। – মাওয়াহিব

২৯। বিনা ইমামে এবং চার তকবীর ব্যতিত শুধু দুরুদ ও সালামের মাধ্যমে হুযুর (দঃ)-এর জানাযা। – মাওয়াহিব ও বেদায়া

৩০। রওযা মোবারকে দুনিয়ার শরীর মোবারক নিয়েই জীবিত বা হায়াতুন্নবী। তিনি মদিনা শরীফ থেকেই সমস্ত উম্মতের সালাম শুনতে পান। – তাবরানী শরীফ

৩১। দিনে-রাতে একলাখ চল্লিশ হাজার ফেরেস্তা রওযা পাকে কিয়াম অবস্থায় দুরুদ পাঠে রত। –মিশকাত

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

৩২। কেয়ামতের দিনে ৭০ হাজার ফিরেস্তা বেষ্টিত হয়ে নবীজীর ময়দানে হাশরে গমন। – মিশকাত–কা'ব আহ্বার

৩৩। তিনি চাঁদকে আঙ্গুলের ইশারায় দ্বি-খন্ডিত করেছিলেন। – আল কোরআন ও হাদীস

৩৪। মাকামে সাহবায় ৭ম হিজরীতে তিনি ডুবন্ত সূর্যকে পুনরায় উদিত করেছিলেন। – বেদায়া নেহায়া-আসমা বিনতে উমায়ছ বর্ণিত হাদীস

৩৫। আল্লাহর মাহমুদ ও আহাদ নাম হতে নবীজীর নাম মুহাম্মদ ও আহমদ রাখা হয়েছে। – তাফসীর রুহুল বয়ান ও হযরত হাসসান (রাঃ)

৩৬। আল্লাহর ৯৯ সিফাতি নামের মধ্যে ৭০টি নাম রাসুল (দঃ) কে দান করা হয়েছে। যেমন- রাহিম, করিম, রাউফ, আউয়াল, আখের, যাহের, বাতেন, নূর ইত্যাদি। – মাদারেজুন্নবুয়ত।

৩৭। রাসুল (দঃ) সকল নবী ও উম্মতের কার্যকলাপের একমাত্র চাক্ষুস সাক্ষী– হাযির ও নাযির। –আল কোরআন ও আখবারুল আখইয়ার–আবদুল হক দেহলভী

৩৮। মাকামে মাহমুদের (শাফাআত–কুবরা) অধিকারী একমাত্র নবী করিম (দঃ)। – আল-কোরআন

৩৯। ৭০ হাজার উম্মত বিনা হিসাবে নবীজীর শাফাআতে বেহেস্তী। আবার প্রত্যেকের সাথে পুনরায় ৭০ হাজার করে সর্বমোট চারশ নব্বই কোটি বিনা হিসাবে বেহেস্তী। – হাদিকা, মাওয়াহিব, কাযী আয়ায

৪০। রওযা মোবারক আরশ হতেও উত্তম। মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া, ফতোয়া শামী

৪১। নামাযের মধ্যে নবী করিম (দঃ) কে সম্বোধন করে ছালাম দেওয়া ওয়াজিব। অন্য কাউকে ছালাম দিলে নামায ভঙ্গ। – আলমগীরী ও শামী

৪২। ৪০ টি আয়াতে আল্লাহ ও রাসূলের নাম একসাথে লিখিত। (সংযোজনী ৪ দেখুন)

বিঃ দ্রঃ– ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতি খাসায়েছে কোবরা গ্রন্থে ১২০০ (বার শত) বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করেছেন। নমুনা স্বরূপ ৪২টি বৈশিষ্ট্য পেশ করা হলো।

অধম

হাফেয মোহাম্মদ আবদুল জলিল

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

সংযোজনী-২

এক নযরে নবীজীর বংশ পরিচয়

চার কুর্‌ছি

১। সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)।
২। মাতা ঃ হযরত আমেনা (রাঃ) (মুসলিম)।
৩। পিতা ঃ হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) (মুসলিম)।
৪। দাদা ঃ আবদুল মোত্তালিব (হানীফ-মিল্লাতে ইবরাহীমী)।
৫। দাদার পিতা ঃ হাশেম (হানীফ-মিল্লাতে ইবরাহীমী)।
৬। দাদার পিতামহ ঃ আব্‌দে মুনাফ (হানীফ-মিল্লাতে ইবরাহীমী)।

পবিত্র উম্মাহাতুল মোমিনীন

১। হযরত খাদিজাতুল কোব্‌রা (রাঃ) (প্রথম মুসলিম জননী) – কোরায়শী।
২। হযরত ছাওদা বিন্‌তে জাম্‌আ (রাঃ) – কোরায়শী।
৩। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা বিন্‌তে আবু বকর (রাঃ) – কোরায়শী।
৪। হযরত হাফ্‌ছা বিন্‌তে ওমর (রাঃ) – কোরায়শী।
৫। হযরত উম্মে হাবীবা বিন্‌তে আবু সুফিয়ান (রাঃ) – কোরায়শী।
৬। হযরত উম্মে ছাল্‌মা (রাঃ) বিন্‌তে আবু উমাইয়া – কোরায়শী।
৭। হযরত যয়নব (রাঃ) বিন্‌তে জাহাশ (ফুফাতো বোন) – বনী আছাদ, আরবী।
৮। হযরত যয়নব (রাঃ) বিন্‌তে খোযায়মা উম্মুল মাছাকীন – বনী হেলাল, আরবী।
৯। হযরত মায়মুনা (রাঃ) বিন্‌তে হারেছ – বনী হেলাল, আরবী।
১০। হযরত জোয়াইরিয়া (রাঃ) বিন্‌তে হারেছ – বনী মোসতালাক, আরবী।
১১। হযরত ছফিয়া (রাঃ) বিন্‌তে হুয়াই – বনী নাযির, ইসরাইলী, খায়বর।
১২। হযরত মারিয়া কিব্‌তিয়া (রাঃ) – মিশরীয় কিব্‌তী বংশ।

পবিত্র সন্তান সন্ততি ঃ

১। হযরত কাছেম (রাঃ)।
২। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) (তৈয়্যেব ও তাহের উপাধী)।
৩। হযরত ইব্রাহীম (রাঃ)।
৪। হযরত জয়নাব (রাঃ)।
৫। হযরত রোকাইয়া (রাঃ)।
৬। হযরত উম্মে কুলছুম (রাঃ)
৭। হযরত ফাতেমা (রাঃ), বেহেস্তী মহিলাগণের ছরদার এবং পরবর্তী আওলাদে রাসুলগণের জননী।

(হযরত ইবরাহীম (রাঃ) মারিয়া কিবতিয়া (রাঃ)-এর গর্ভে এবং অন্যান্য ৬ অথবা ৮ জন সবাই হযরত খাদিজা (রাঃ) এর গর্ভে।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

সংযোজনী-৩

হযরত রাসুল করিম (দঃ)-এর পবিত্র ১৬১ নাম ঃ

আল্লাহর যেমন যাতি ও সিফাতি নাম আছে-তদ্রুপ নবী করিম (দঃ)-এরও যাতি এবং সিফাতি নাম আছে। আল্লাহ তায়ালার ৯৯ নাম। রাসূলে পাকেরও ৯৯ নাম। আবু বকর ইবনে আরবী (রহঃ) বলেছেন- সুফিয়ায়ে কেরামের মতে আল্লাহর এক হাজার নাম এবং রাসূলে পাকেরও এক হাজার নাম। কাযী আয়ায (রহঃ) বলেন- আল্লাহ তাঁর ৯৯ নাম থেকে ৩০ টি নবীজীকে দান করেছেন। শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেছ দেহলভী (রহঃ) তাঁর মাদারেজ গ্রন্থে এবং আল্লামা কাসতুলানী তাঁর মাওয়াহিব গ্রন্থে বলেছেন- আল্লাহ তায়ালা ৯৯ নাম থেকে ৭০টি নাম রাসুল (দঃ) কে দান করেছেন। (দেখুন আনওয়ারে মোহাম্মদীয়া)

وَسَمَّاهُ مِنْ أَسْمَائِهِ الْحُسْنٰى بِنَحْوِ سَبْعِيْنَ اِسْمًا (اَلْاَنْوَارُ الْمُحَمَّدِيَّةُ)

ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রেয়া (রাঃ)-এর মতে হুযুরের ১৪০০ সিফাতি নাম রয়েছে। ঐ সব পবিত্র নাম বিভিন্ন গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া কিতাবে আল্লামা শিহাবুদ্দিন কাস্‌তুলানী শারেহে বোখারী এরূপ চার শতাধিক নামের তালিকা লিখেছেন। উক্ত গ্রন্থ থেকে আল্লামা ইউসুফ নাব্‌হানী (রহঃ) তাঁর আনওয়ারে মোহাম্মদীয়া গ্রন্থে কতিপয় নামের উল্লেখ করেছেন। ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত শাহ আহ্‌মদ রেযা খান (রাঃ) তাঁর তাফসীর "কান্‌যুল ঈমানে" হুযুর (দঃ)-এর কতিপয় নাম লিখেছেন। উক্ত দুটি গ্রন্থ হতে নিম্ন তালিকা পেশ করা হলো - লেখক।

বিঃ দ্রঃ প্রত্যেক নামের পরে দুরূদ শরীফ পড়ে নেবেন।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

১। مُحَمَّدٌ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

২। أَحْمَدُ (আহমদ) (দঃ)

৩। مَحْمُوْدٌ (মাহমুদ)

৪। نُوْرٌ (নূর)

৫। مُنِيْرٌ (মুনির)

৬। أَوَّلُ (আউয়াল)

৭। أٰخِرُ (আখির)

৮। ظَاهِرُ (যাহির)

৯। بَاطِنُ (বাতিন)

১০। بَرٌّ (বাররুন)

১১। رؤوف (রাউফুন)

১২। رَحِيْمٌ (রাহিমুন)

১৩। حَقٌّ (হাককুন)

১৪। بَيِّنٌ (বাইয়েনুন)

১৫। عَظِيْمٌ (আযীমুম)

১৬। عَزِيْزٌ (আযিযুন)

১৭। جَبَّارٌ (জাববারুন)

১৮। عَلِيْمٌ (আলীমুন)

১৯। حَلِيْمٌ (হালীমুন)

২০। خَبِيْرٌ (খাবীরুন)

২১। كَرِيْمٌ (কারীমুন)

২২। رَشِيْدٌ (রাশীদুন)

২৩। بَصِيْرٌ (বাছীরুন)

২৪। شَكُوْرٌ (শাকুরুন)

২৫। حَبِيْبٌ (হাবীবুন)

২৬। حَسِيْبٌ (হাছীবুন)

২৭। مُجِيْبٌ (মুজীবুন)

২৮। مؤمن (মু'মিনুন)

২৯। أَمِيْنٌ (আমীনুন)

৩০। مَأْمُوْنٌ (মা'মুনুন)

৩১। مُؤْتَمِنٌ (মো'তামিনুন)

৩২। حَافِظٌ (হা-ফিযুন)

৩৩। نَاصِرٌ (না-ছিরুন)

৩৪। كَامِلٌ (কা-মিলুন)

৩৫। مَنْصُوْرٌ (মানছুরুন)

৩৬। قَرِيْبٌ (ক্বারীবুন)

৩৭। مَتِيْنٌ (মাতীনুন)

৩৮। شَهِيْدٌ (শাহীদুন)

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

৩৯। شَاهِدٌ (শা-হিদুন)

৪০। شَفِيْعٌ (শাফীউন)

৪১। شَافِعٌ (শা-ফিউন)

৪২। يَتِيْمٌ (ইয়াতিমুন)

৪৩। شَارِعٌ (শা-রিউন)

৪৪। وَلِيٌّ (ওয়ালিয়্যুন)

৪৫। وَفِيٌّ (ওয়াফিয়্যুন)

৪৬। صَفِيٌّ (ছাফিয়্যুন)

৪৭। نَقِيٌّ (নাকিয়্যুন)

৪৮। قَوِيٌّ (ক্বাভিয়্যুন)

৪৯। حَفِيٌّ (হাফিয়্যুন)

৫০। آمِرٌ (আ-মিরুন)

৫১। نَاهِيٌّ (না-হিয়ুন)

৫২। أُمِّيٌّ (উম্মিয়্যুন)

৫৩। أُحِيْدٌ (উহীদুন)

৫৪। أَوْلٰى (আওলা)

৫৫। أَكْرَمُ النَّاسِ (আক্রামুন্নাছ)

৫৬। إِمَامُ الْخَيْرِ (ইমামুল খাইরী)

৫৭। إِمَامُ الْمُتَّقِيْنَ (ইমামুল মুত্তাক্বীন)

৫৮। إِمَامُ النَّبِيِّيْنَ (ইমামুন নাবিয়্যীন)

৫৯। بَشِيْرٌ (বাশীরুন)

৬০। نَذِيْرٌ (নাযীরুন)

৬১। بُرْهَانٌ (বুরহানুন)

৬২। بَارْقَلِيْطُ (বারক্বালীত)

৬৩। تِهَامِيٌّ (তিহামিয়্যুন)

৬৪। جَوَّادٌ (জাওয়াদুন)

৬৫। حَاشِرٌ (হা-শিরুন)

৬৬। حَامِدٌ (হা-মিদুন)

৬৭। حَمَّادٌ (হাম্মাদুন)

৬৮। حِجَازِيٌّ (হিজাযিয়্যুন)

৬৯। حَنِيْفٌ (হানীফুন)

৭০। حَمْطَايَا (হাম্ত্বায়া)

৭১। خَلِيْلٌ (খালীলুন)

৭২। خَاتَمٌ (খা-তামুন)

৭৩। خَلِيْفَةٌ (খালীফাতুন)

৭৪। خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (খাইরুল বারিয়্যাহ)

৭৫। خِيَرَةُ اللّٰهِ (খিয়ারাতুল্লাহ)

৭৬। خَطِيْبُ الْاَنْبِيَاءِ (খাতীবুল আম্বিয়া)

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

৭৮। دَلِيْلُ الْخَيْرَاتِ (দালীলুল খাইরাত)

৭৯। دَارُالْحِكْمَةِ (দারুল হিকমাহ্)

৮০। رَسُوْلٌ (রাছুলুন)

৮১। رَسُوْلُ الرَّحْمَةِ (রাছুলুর রাহমাত)

৮২। رُوْحُ الْقُدُسِ (রুহুল কুদ্দুছ)

৮৩। رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِيْنَ (রাহমাতুল্লিল আলামিন)

৮৪। سِرَاجٌ (ছিরাজুন)

৮৫। سَعِيْدٌ (ছায়ীদুন)

৮৬। مَسْعُوْدٌ (মাছউদুন)

৮৭। سَيِّدٌ (ছাইয়েদুন)

৮৮। شَمْسٌ (শামছুন)

৮৯। قَمَرٌ (ক্বামারুন)

৯০। شَافٍ (শাফিন)

৯১। صَادِقٌ (ছাদিকুন)

৯২। مَصْدُوْقٌ (মাছদূকুন)

৯৩। صَالِحٌ (ছালিহুন)

৯৪। مُصْلِحٌ (মুছলিহুন)

৯৫। صَفْوَةٌ (ছাফওয়াতুন)

৯৬। صَفُوْحٌ (ছাফুহুন)

৯৭। صَاحِبُ اللِّوَاءِ
(ছাহিবুল লিওয়া)

৯৮। صَاحِبُ الْحَوْضِ الْكَوْثَرِ
(ছাহিবুল হাউযিল কাউসার)

৯৯। صَاحِبُ الْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ
(ছাহিবুল মাক্বামিল মাহমুদ)

১০০। صَاحِبُ الْمُعْجِزَاتِ
(ছাহিবুল মুজিযাত)

১০১। ضَحَّاكٌ (দাহ্হাকুন)

১০২। طَيِّبٌ (ত্বাইয়িবুন)

১০৩। طَاهِرٌ (ত্বা-হিরুন)

১০৪। مُطَهِّرٌ (মুত্বাহ্হারুন)

১০৫। طٰهٰ (ত্বা-হা)

১০৬। طَابَ طَابَ (ত্বাবত্বাব)

১০৭। عَادِلٌ (আ-দিলুন)

১০৮। عَاقِبٌ (আ-ক্বিবুন)

১০৯। عَبْدُ اللّٰهِ (আবদুল্লাহ)

১১০। عِلْمُ الْيَقِيْنِ (ইলমুল ইয়াক্বীন)

১১১। عُرْوَةٌ وُثْقٰى (উরওয়াতুন উছক্বা)

১১২। عَطُوْفٌ (আতূফুন)

১১৩। عَفُوٌّ (আফ্উন)

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

১১৪। فَاتِحٌ (ফা–তিহুন)
১১৫। فَارُوقٌ (ফা–রুকুন)
১১৬। قَاسِمٌ (ক্বা–ছিমুন)
১১৭। قُرَشِيٌّ (ক্বারশিউন)
১১৮। قُثَمٌ (কুছামুন)
১১৯। مُزَّمِّلٌ (মুযযাম্মিলুন)
১২০। مُدَّثِّرٌ (মুদ্দাচ্ছিরুন)
১২১। مَاحِيٌّ (মা–হিয়ুন)
১২২। مِصْبَاحٌ (মিছবাহুন)
১২৩। مُخْمِنًا (মুখমিনান)
১২৪। مُشَفَّحٌ (মুশাফফিহুন)
১২৫। مُقِيْمُ السُّنَّةِ (মুক্বীমুছ ছুন্নাত)
১২৬। مَاذْ مَاذْ (মাযমায)
১২৭। مُوذْ مُوذْ (মুযমুয)
১২৮। مُذَكِّرٌ (মুযাক্কিরুন)
১২৯। مُبَلِّغٌ (মুবাল্লিগুন)
১৩০। مُيَسِّرٌ (মুয়াছছিরুন)
১৩১। مُبَشِّرٌ (মুবাশশিরুন)
১৩২। مُنْذِرٌ (মুনযিরুন)
১৩৩। مُبَارَكٌ (মুবারাকুন)
১৩৪। مُخْتَارٌ (মুখতারুন)
১৩৫। مَوْلٰى (মাওলা)
১৩৬। مَكِّيٌّ (মাক্কিয়্যুন)
১৩৭। مَدَنِيٌّ (মাদানিয়্যুন)
১৩৮। عَرَبِيٌّ (আরাবিয়্যুন)
১৩৯। مُصْطَفٰى (মুস্তাফা)
১৪০। مُجْتَبٰى (মুজতাবা)
১৪১। مُرْتَضٰى (মুরতাদ্বা)
১৪২। مُؤَيَّدٌ (মুআইয়িদুন)
১৪৩। مُخْلِصٌ (মুখলিছুন)
১৪৪। مُقَدَّسٌ (মুক্বাদ্দাছুন)
১৪৫। مَعْصُوْمٌ (মা’ছুমুন)
১৪৬। مَكِيْنٌ (মাকীনুন)
১৪৭। مُنْجٍ (মুনজিন)
১৪৮। مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ (মিকতাহুল জান্নাত)
১৪৯। مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ (মাদীনাতুল ইলম)
১৫০। نَقِيْبٌ (নাক্বীবুন)
১৫১। نَبِيٌّ (নাবিয়্যুন)

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

১৫২।	نَبِيُّ الرَّحْمَةِ	(নাবিয়্যুর রাহ্মাত)	১৫৭।	هَادِيٌّ	(হা-দিয়ুন)
১৫৩।	نَبِيُّ الْمَلَاحِمِ	(নাবিয়্যুল মালাহিম)	১৫৮।	اَلْهُدٰى	(আল্হুদা)
১৫৪।	نَبِيُّ التَّوْبَةِ	(নাবিয়্যুত তাওবাহ্)	১৫৯।	هَدِيَّةُ اللّٰهِ	(হাদ্ইয়াতুল্লাহ)
১৫৫।	نَجْمٌ	(নাজমুন)	১৬০।	يٰسٓ	(ইয়াছীন)
১৫৬।	نَاصِحٌ	(না-ছিহুন)	১৬১।	حٰمٓ	(হা-মীম)

ইসলামের পঞ্চবেনা ঃ

ইসলামের পঞ্চবেনা নাযিলের ক্রমধারা- উক্ত পঞ্চবেনার তাবলীগ করা ফরযে কেফায়া ঃ

১। **কলেমা বা ঈমান ঃ** জাবালে নূর বা গারে হেরায় ৬১০ খৃষ্টাব্দে ২৭শে রমযান সোমবারে নাযিল হয়েছে।

২। **নামায বা ছালাত ঃ** নবুয়তের দ্বাদশ সালে রজবের ২৭ তারিখ শবে মে'রাজে লা মাকানে ফরয করা হয়েছে।

৩। **রোযা বা সিয়াম ঃ** ২য় হিজরীর শা'বান মাসের ১৫ই শবে বরাত রাত্রে ফরয হয়েছে।

৪। **যাকাত ঃ** ২য় হিজরীর মধ্য রমযানে ফরয হয়েছে।

৫। **হজ্ব ঃ** ৯ম হিজরীর শাওয়াল মাসে ফরয হয়েছে।

হানাফী মাযহাব মতে আল্লাহর হক্ব- ঈমান, নামায, রোযা ও হজ্ব প্রথমে এবং বান্দার হক্ব যাকাত পরে হবে। এই ক্রমানুসারেই সমন্বয় করতে হবে। (কলেমা, নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত)

বিঃ দ্রঃ মোট ২২ বৎসরে ইসলামের পঞ্চবেনা নাযিল হয়েছে। ঈমানের ১২ বৎসর পর নামায, ১৫ বৎসর পর রোযা ও যাকাত এবং ২২ বৎসর পর হজ্বের আদেশ নাযিল হয়েছে। ক্রম অনুসারেই গুরুত্ব।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

সংযোজনী-৪

কোরআন মজিদের ৪০ আয়াতে আল্লাহ্-রাসুলের নাম একসাথে পাশাপাশি লিখাঃ যেমন–

(١) وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا –

(১) "যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের অনুগত হবে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন"। (নিসা-১৩)

(٢) وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا –

(২) "আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্য হবে, তাকে তিনি জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন"। (নিসা-১৪)

(٣) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ –

(৩) "হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর অনুগত্য করো এবং রাসুলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে উলিল আমরেরও"। (নির্দেশ দাতা) (নিসা-৫৯)

(٤) فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ –

(৪) "যদি তোমরা কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহনে বিবাদে লিপ্ত হও– তাহলে উক্ত বিষয়টির ফায়সালা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কাছে ন্যাস্ত করো"। (নিসা-৫৯)

(٥) مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ –

(৫) "যে রাসুলের আনুগত্য করে, সে মূলতঃ আল্লাহরই আনুগত্য করলো" (নিসা-৮০)

(٦) اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ
وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ
ذٰلِكَ سَبِيْلًا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا –

(৬) "যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলগণকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলগণের মধ্যে তারতম্য করতে ইচ্ছা করে এবং বলে– আমরা কিছু মানি– কিছু মানিনা এবং আল্লাহ ও রাসুলগণের মধ্যবর্তী তৃতীয় রাস্তা উদ্ভাবন করতে

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

চায়- তারাই পাক্কা কাফের"। (নিসা-১৫০)

(৭) إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا
اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْا۔

(৭) "যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং জমীনে ফাছাদ সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের একমাত্র শাস্তি হচ্ছে কতল করা অথবা ফাঁসিতে চড়ানো"। (মায়েদা-৩৩)

(৮) قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ـ

(৮) "বলুন হে প্রিয় হাবীব! যুদ্ধেপ্রাপ্ত সম্পদের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল (দঃ)"। (আন্‌ফাল-১)

(৯) وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ـ

(৯) "যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্য হয়, নিঃসন্দেহে (তাদের জন্য) আল্লাহ্‌র শাস্তি অতি কঠোর"। (আনফাল-১৩)

(১০) فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ - ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ـ

(১০) "হে ফিরিস্তাগণ, তোমরা বদরের যুদ্ধে কোরাইশ কাফিরদের গর্দানের শাহ্‌গে এবং তাদের শরীরের জোড়ায় জোড়ায় আঘাত হানো। কেননা, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্য হয়ে গেছে"। (আনফাল-১৩)

(১১) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ ـ

(১১) "হে মোমেনগণ, তোমরা আল্লাহ-রাসুলের ডাকে সাড়া দাও-যখনই রাসুল তোমাদেরকে ডাকেন"। (আন্‌ফাল-২৪)

(১২) وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ ـ

(১২) "হে মোমেনগণ! জেনে নাও- তোমরা গনিমতের মাল হিসাবে যা কিছু পেয়েছো- তার পঞ্চমাংশ বা ৫ ভাগের এক ভাগের খাস মালিক হচ্ছেন আল্লাহ ও তাঁর রাসুল"। (আন্‌ফাল-৪১)

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

(١٣) بَرَاءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ –

(১৩) "আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ হতে সম্পর্কচ্ছেদ করা হলো মুশরিকদের সাথে"। (তাওবা-১)

(١٤) وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِيْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُوْلُهٗ –

(১৪) "আর হজ্বে আকবরের দিনে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ হতে এই ঘোষনা করা হলো যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল (দঃ) মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন"। (তওবা-৩)

(١٥) وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً –

(১৫) "যারা আল্লাহ্, তাঁর রাসুল ও মোমেনগণ ব্যতিত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা থেকে বিরত না রয়েছে"- (সেসব মুনাফিকদেরকে এমনিতে ছেড়ে দেয়া হবে না)। (তওবা-১৬)

(١٦) وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ –

(১৬) ("যুদ্ধ করো তাদের বিরুদ্ধে)- যারা হারাম মনে করেনা ঐ জিনিসকে- যা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল (দঃ) হারাম ঘোষনা করেছেন" (তাওবা-২৯)।

(١٧) وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّآ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ –

(১৭) "মুনাফিকদের দান কবুল না হওয়ার একমাত্র কারণ হলো- তারা আল্লাহও তার রাসুলকে অস্বীকার করছে"। (তাওবা -৫৪)

(١٨) وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ –

(১৮) "কতই না ভাল হতো- যদি মুনাফিকরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল প্রদত্ত গনিমতের সম্পদে রাযী থাকতো"। (তাওবা-৫৯)

(١٩) وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَرَسُوْلُهٗ –

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

(১৯) (আর মুনাফিকরা যা পেয়েছে, তাতে সন্তুষ্ট থেকে)– "যদি তারা বলতো- আল্লাহ ও তাঁর রাসুল আপন অনুগ্রহে যা দিয়েছেন– ইহাই আমাদের জন্য যথেষ্ট– তাহলে কতই না ভাল হতো"। (তাওবা-৫৯)

(٢٠) وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ –

(২০) "আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসুলকে রাজী রাখাই অত্যাবশ্যক-যদি তারা মোমেন হয়ে থাকে"। (তাওবা-৬২)

(٢١) اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّهٗ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا –

(২১) "তারা কি একথা অবগত নয় যে, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের সাথে শত্রুতা করছে– তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন"। (তাওবা-৬৩)

(٢٢) اَغْنٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ –

(২২) **"আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসুল আপন অনুগ্রহে তাদেরকে ধনী বানিয়েছে"**। (তাওবা-৭৪)

(٢٣) وَاِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ –

(২৩) "যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসুল মোনাফিকদেরকে আহবান করেন তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দিতে, তখন তাদের একটি দল মুখ ফিরিয়ে নেয়"। (ছুরা নূর-৪৮)

(٢٤) اَفِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَمِ ارْتَابُوْا اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهٗ بَلْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ –

(২৪) "মুনাফিকরা কি ভয় পায় যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল তাদের প্রতি অবিচার করবে" (নূর-৫০)

(٢٥) اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ –

(২৫) "প্রকৃত মুমিনতো তারাই– যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান এনেছে (নূর-৬২)।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

(২৬) وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ –

(২৬) "খন্দকের যুদ্ধে শত্রুসৈন্য দেখে "সাহাবীগণ বলে উঠলেন– ইহারই তো আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল" (আহযাব-২২)

(২৭) وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا –

(২৭) "সাহাবীগণ আরো বললেন– আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল সত্য বলেছেন। এতে তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পনের মনোভাব আরো বৃদ্ধি পেলো" (আহযাব-২২)।

(২৮) وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا –

(২৮) "হে নবী পত্নীগণ, তোমরা যদি ভোগবিলাস ত্যাগ করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল এবং আখেরাতকে প্রাধান্য দাও, তাহলে তোমাদের পূতঃ পবিত্রজনদের জন্য আল্লাহ্ তায়ালা বিরাট পুরস্কার তৈরী করে রেখেছেন।" (আহযাব-২৯)

(২৯) وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا –

(২৯) "হে নবীপত্নীগণ, তোমাদের মধ্যে যিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অনুগত হবে এবং নেক আমল করবে, আমি তাঁকে ডাবল পুরস্কার দেবো"। (আহযাব-৩১)

(৩০) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ –

(৩০) "কোন বিষয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল নির্দেশ দেয়ার পর ঐ বিষয়ে কোন ঈমানদার পুরুষ এবং কোন ঈমানদার নারীর ভিন্নমত পোষণ করার অধিকার নেই" (আহযাব-৩৬)।
(যায়েদ ইবনে হারেছার (রাঃ) সাথে বিবি যয়নব (রাঃ) এর বিবাহের ব্যাপারে তাঁর ভাই আবদুল্লাহর আপত্তি সম্পর্কে এই উক্তি)।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

(৩১) وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا –

(৩১) "আর যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্য হবে– তারা স্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে পতিত হয়ে গিয়েছে" (আহযাব-৩৬)।

(৩২) اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ –

(৩২) "যারা আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় রাসুলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্ তাদেরকে দুনিয়া ও পরকালে লা'নত করবেন বা অভিশপ্ত করবেন" (আহযাব-৫৭)

(৩৩) اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا –

(৩৩) "হে প্রিয় রাসুল, আমি আপনাকে চাক্ষুস স্বাক্ষী (হাযির-নাযির), জান্নাতের সুসংবাদদাতা ও জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শনের ক্ষমতা দিয়ে প্রেরণ করেছি– যাতে তোমরা (মানুষ) আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান আন, রাসুলকে সাহায্য করো, তাঁকে উচ্চমানের সম্মান প্রদর্শন করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর সালাত পাঠ করো"। (আল-ফাত্হ-৯)

(৩৪) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ –

(৩৪) "হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্ রাসুলের সামনে আগবাড়িয়ে কিছু করোনা" (হুজুরাত-১)

(৩৫) اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ –

(৩৫) "তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উপর– আর ব্যয় কর ঐ সম্পদ থেকে– আল্লাহ্ যার উত্তরাধিকারী করেছেন তোমাদেরকে" (ছুরা হাদীদ-৭)

(৩৬) وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ –

(৩৬) "তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করছোনা? –অথচ রাসুল (দঃ) তোমাদেরকে আহবান জানাচ্ছেন–যাতে তোমরা তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আন"। (হাদীদ-৮)

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

(৩৭) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ اُولٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ –

(৩৭) "যারা আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসুলগণের উপর ঈমান এনেছে, তারাইতো আল্লাহর নিকট সিদ্দিক ও শহীদ বলে গণ্য" (হাদীদ-১৯)

(৩৮) اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَادُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ كُبِتُوْا –

৩৮) "যারা আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসুলের বিরুদ্ধাচারণ করে- তারা অপদস্ত হয়েছে"। (মুজদালাহ-৫)

(৩৯) لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ –

(৩৯) "হে প্রিয় রাসুল, যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী-এমন কাউকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসুলের বিরূদ্ধাচারণকারীর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনকারীরূপে পাবেননা" (মুজাদালাহ-২২)। (তাঁদের উপাধী রাদিয়াল্লাহু আনহু)

(৪০) وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ‏.

(৪০) "শক্তি ও সম্মান তো আল্লাহ–রাসুলের ও মোমিনদের প্রাপ্য–কিন্তু মুনাফিকরা তার ভেদ জানেনা" (ছুরা মুনাফিকুন-৮)

নোট ঃ 'আল্লাহ ও রাসুলের নাম একসাথে পাশাপাশি'–এর প্রমাণস্বরূপ কোরআন মজিদ থেকে মাত্র ৪০টি আয়াত উল্লেখ করা হলো। কোরআনের সর্বত্র আল্লাহ–রাসুলের নাম একসাথে এসেছে। খোদ ঈমানী কালেমায় "আল্লাহ ও মুহাম্মদ" নাম একসাথে পাশাপাশি রয়েছে।এর মধ্যখানে "এবং" অব্যয়টি নেই। এতেই বুঝা যায়-আল্লাহ-রাসুল কত ঘনিষ্ট।

কি সাধ্য আছে মোর–গাইতে নবীর গান
কলম মোর ধন্য হলো–লিখে নবীর শান।

তারিখ ঃ নভেম্বর, ২০০৭ইং —অধম লেখক

http://khasmujaddedia.wordpress.com/